বহুমুখ

চতুর্থ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২৩





সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ● ৪

উপন্যাস

ডাকিনীচক্র - সৌম্যজিৎ দেবনাথ ● ৮৬

শ্রুতিলেখকের এই অরণ্য - প্রদীপ কুমার বিশ্বাস ● ১৭৫

বড় গল্প

স্বর্ণহার- অমৃতা চ্যাটার্জী ● ৩৩

কার্বন রহস্য – মিঠুন মন্ডল ● ৩৬৪

গল্প

উপলব্ধি – দোয়েল বর্মণ ● ৫

তের নম্বর ঘরের কয়েদী - ডঃ জি মিত্র ● ৩৩৮

রক্তচন্দ্র - সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ● ১৩৩

বিকল্প – সুদীপ দেব ● ৩৮২

অণুগল্প

দাস্তান এ বিহঙ্গ - শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায় ● ১৭০

মন্টুর রেজাল্টের দিন - রুমা মোদক ● ১৪

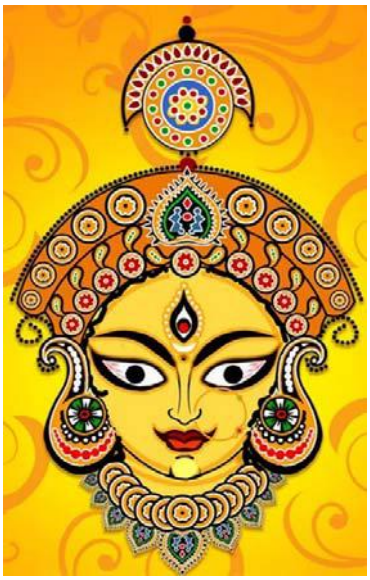
লাভ ডিটেকটেড – স্বাতী রায় ● ৭৬

ছবি - দিব্যেন্দু সিংহ রায় ● ৭৯

সেই মেয়েটি – অরূপ পাল ● ৮০

প্রতিচ্ছবি – অর্পণ মন্ডল ● ৩৭৯

#



ভ্রমণ উপন্যাস

ব্রহ্মকমলের সন্ধানে- অঙ্কিতা ● ২৯০

স্মৃতিচারণ

আমি, সে ও সখা - সূর্যনাথ ভট্টাচার্য ● ১৭

টুকরো কথাঃ ডায়মন্ড কমিক্স - শৌণক বিশ্বাস ● ৩৬১

কমিক্স

ওবেলিক্স অ্যান্ড কোং – আ. গোসিনি ও এ. ইউদেরজো- অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ সাওন দত্ত ● ২৪০

পল্টুর কেরামতি – ডেভিড শেভিল্লি - অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ● ৩৯৫

উড়ন্ত গোলক - জ্যাক স্পারলিং – অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ টিনটিন দি গ্রেট ● ৩৫৪

অ্যালজি – উভয় সঙ্কট - অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ রূপক ঘোষ ● ১৫৬

লাকি লুক – বাউণ্ডুলে – গস্‌কিনি ও মরিস্‌ অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ সুব্রত চক্রবর্তী ● ৬৯

বিতর্ক ● ২৩৫

জনপ্রিয় লেখা মানেই ভাল লেখা অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে ভাল লিখলে লেখক এবং তাঁর লেখা অবশ্যই জনপ্রিয় হবে।

প্রবন্ধ

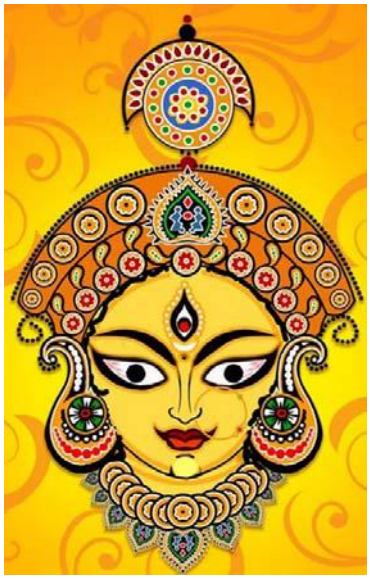
পূর্ববঙ্গ গীতিকাঃ যে দিন গেছে হারিয়ে - সৌমেন নাথ ● ২২

অর্থশাস্ত্র ও পৌর আইন – সুশোভন রায় ● ২২৮

মনসামঙ্গল এবং একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান - রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ● ২৮৭

অদ্রীশ বর্ধনঃ কল্পবিজ্ঞানের ‘আশ্চর্য’ কিংবদন্তি - বিশ্বদীপ দে ● ৩৪৯

#



সত্যি অনন্য সম্ভবনা! – কৌশিক রায় ● ১৪৩
আমাদের সোনার কৈশোরের চাবিকাঠিঃ চাঁদমামা
জানা অজানা কিছু কথা – সুজয় দত্ত ● ১৪০
দ্রোহকাল - অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ ● ৩৩২
ঐশ্বরিক মেষশাবকের ভজনা – স্বাগতা ঘোষ ● ৫১

রান্নাবান্না

কিছু গল্প কিছু রান্না – চুপি গুপ্তা ● ১৫৯
বিকেলের জলখাবার - অভিষেক ঘোষ ● ১৩১
ডাল মালাই – সিজন ● ১২৯

কবিতা

...সাঁকোটা দুলছে - সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ● ৩৪৬

পাঠ প্রতিক্রিয়া

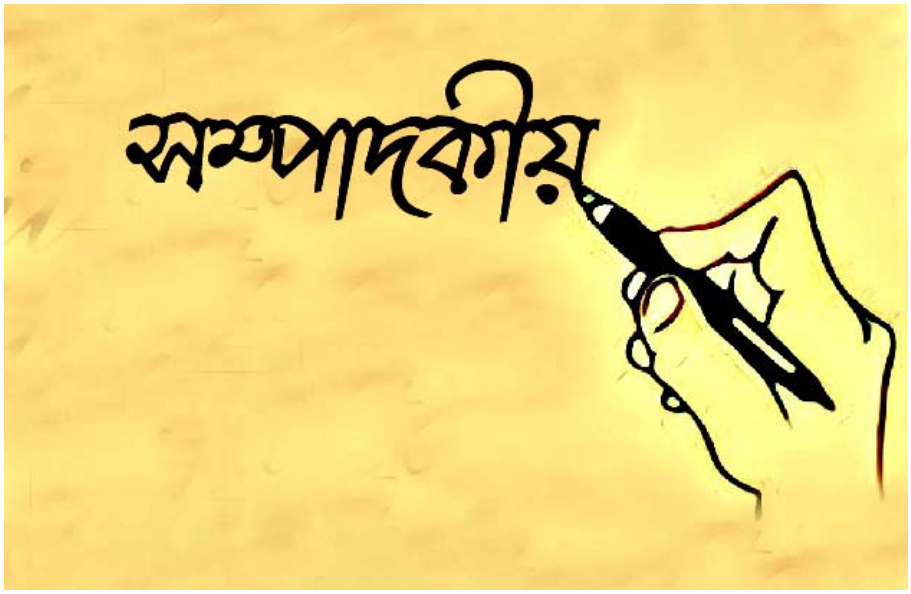
ডানাওলা মানুষ - অরুন্ধতী সিংহ রায় ● ১২৩
পাঞ্চজন্য - শাশ্বত চৌধুরী ● ১২৬

সিনেমা সমালোচনা

কালচক্রের ছবি - সৈকত ভট্টাচার্য ● ৮২

প্রচ্ছদঃ অঙ্কিতা, সুমন দাস ও দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, অর্পণ মন্ডল, সৌম্যজিৎ দেবনাথ, শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ দে
প্রুফ সংশোধনঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সৌম্যজিৎ দেবনাথ
প্রধান উপদেষ্টাঃ সুদীপ দেব
সম্পাদকঃ অঙ্কিতা, সন্তু বাগ ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

#



দেবীপক্ষের শুভ সূচনার শারদপ্রাতে প্রকাশিত হল "বহুমুখী"। আদ্যন্ত ভালোবাসায় মোড়া এমন একটি উপহার আপনাদের সামনে আনতে পেরে সম্পাদক হিসাবে যতটা না তৃপ্ত লাগে, পাঠক হিসাবে কিন্তু মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাস, গল্প, অণুগল্প, কমিকস, অনুবাদ, রন্ধনকৌশল মিলিয়ে "বহুমুখী" আক্ষরিক অর্থেই ছত্রে ছত্রে নানা রূপে আপনাদের কাছে ধরা দেবে, আপনাদের বিস্মিত করবে এবং ভালো লাগাবে, সেটুকু আত্মবিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই রাখা যায়। কারণ পাঠক/পাঠিকাদের এই চাওয়া এবং আনন্দই তো "বহুমুখী"-কে টেনে নিয়ে এসেছে এতদূর এবং নিয়ে চলবে আজীবনকাল।

তবে এই শুভ দিনেও দেশের সীমান্তে যে হিংসার ঘনঘটা কালো মেঘের মতো ধেয়ে আসছে; তাই আজ 'বহুমুখী'র প্রচ্ছদ ভাবনায় ফুটে উঠেছে দেবীর এই প্রজ্জ্বলিত দশমহাবিদ্যারূপ। মহামাতৃকাশক্তির এই দশটি রূপের সম্মিলিত শক্তিতে মুছে যাক সমস্ত কালিমা, বিকলতা, অন্ধকার। জ্ঞান, প্রেম ও করুণার আদর্শে আবারও কল্যাণপ্রদীপ জ্বলে উঠুক ভারতমাতার মশালে। সহমর্মিতা আর কর্মকুশলতা প্রকাশ হোক সবার মনে। হৃদয়ে জাগরিত হোক মাতৃচেতনার বোধ।

শেষে বলি, এই পত্রিকাকে মহালয়ার আলো দেখানোর জন্য যে কয়েকজন দিনরাত্রি এক করে পরিশ্রম করেছেন, নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার এ অতুলনীয় সৃষ্টির পূণ্যলগ্নে তাদের সাধুবাদ জানিয়ে ছোট করব না, তাদের জন্য রইল এক পৃথিবী ভালোবাসা আর অনেক শুভকামনা। আর পাঠককুলের জন্য শারদীয়ার শুভেচ্ছা আর "বহুমুখী" বিস্ময়।

আসুন - অবগাহন করা যাক।



তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সে অ্যালার্ম শুনতে পায়নি। অ্যালেক্স ডাটন হোটেলের টেলিফোনিস্টকে অনুরোধ করেছিল সকাল সাতটায় ফোন করতে আর এখন আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, তার মানে ম্যাক্স শুরু করে দিয়েছে তার আগেই। তার প্রথম মিটিং শুরু হবার কথা ছিল আর দশ মিনিটের মধ্যে, যার আগে তাকে শেভ করতে হবে, স্নান করতে হবে এবং জামাকাপড় পরে তৈরি হতে হবে। যেহেতু ডিনার খেতে খেতে প্রায় রাত দুটো হয়ে গেছিল, সেইজন্য বড়জোর সে হয়তো ব্রেকফাস্টটা বাদ দিতে পারে। এইরকম কাজের ট্যুরগুলোতে তার চার ঘণ্টাই ঘুমানো অভ্যাস। ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে মেটাতেই তার সময় চলে যায়, ঘুমাবে কখন? সে চটজলদি শেভ করে নিল, ল্যাপটপটা চালু করে ই-মেইল দেখতে দেখতে দ্রুত প্যান্ট শার্টটা গলিয়ে নেগ্রেস্ক'র কনফারেন্স-এ ঢুকে পড়ল।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" – তার সহকারী নাঈম। "হংকং-এর মিটিংটা মিস্ হয়ে গেল যে!"

"ঘুম ভাঙেনি।"

"হুম্, বুঝতে পারছি।" সে অ্যালেক্স-এর শার্টের কলারটা একটু ঠিক করে দিল। অ্যালেক্স বুঝে পায়না নাঈম সবসময় এত পরিপাটি থাকে কি করে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সারারাত কোন বাক্সের মধ্যে এইভাবেই ছিল, কনফারেন্স শুরু হতেই টুক্ করে বাক্স থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিছু লোক কর্পোরেট জীবনকে এত সিরিয়াস্লি নেয় যে, কাজ ছাড়া তাদের অস্তিত্বই নেই বলে মনে হয়। "ম্যাক্স কিন্তু পনের মিনিট আগেই পৌছে গেছে।"

"সেতো সবসময়-ই হয়ে থাকে।"

"হয়তো ওই তোমার অ্যালার্ম বিগড়ে দিয়েছে।"

#

"নাহ্, ম্যাক্স ওরকম করবে না, ও সোজাসাপ্টা লোক।" সবার জীবনেই এমন একজন ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা দরকার যে সবসময় তাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, তাড়া করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ম্যাক্স-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বী কারুর দরকার নেই। সবসময় ঠিক সময়ে পৌঁছনো, সবসময় একধাপ এগিয়ে, সবসময় পুরোপুরি সৎ ক্লায়েন্টদের সঙ্গে। হে ভগবান, ম্যাক্স সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট তার থেকে! যেখানেই অ্যালেক্স যাবে, ম্যাক্স আগেভাগেই উপস্থিত, উজ্জ্বল সুন্দর ম্যাক্স, ক্লায়েন্টদের তাবেদারী করে ব্যবসা হাতিয়ে নিচ্ছে।

"ড্যানিয়েল চায় যে তুমি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট গিয়ে অ্যাংলো-কম কনফারেন্সে যোগ দাও।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে, সেটায় তো ড্যানিয়েলের যাওয়ার কথা! আমি তো সবে এখানে এলাম।" ও নিস্-এ পৌঁছে গেছে গত সন্ধ্যায় তিন দিনের কনফারেন্স-এ। "প্লিজ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট না। গত মঙ্গলবার তো ওখানেই ছিলাম।"

"তোমার টিকিটও হয়ে গেছে" – তার হাতে একটা মোটা সাদা খাম ধরিয়ে দিল। "চারটে-র ফ্লাইট।"

"এত দেরীতে কেন?"

"তোমাকে প্রথমে রাফায়েলা-র সঙ্গে দেখা করতে হবে ভেন্টিমিগ্লিয়াতে। আমি দশটা কুড়ির ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছি।"

"খুব বাজে ব্যাপার, নাঈম। গত এক সপ্তাহে আমি পাঁচটা দেশে ঘুরেছি সেটা জান?"

"আরও বাজে ব্যাপার - নিস্ থেকে হিথ্রো-র বিজ্নেস ক্লাশ পুরো ভর্তি থাকার জন্য তোমাকে সেটা দেওয়া যায়নি।" -আর ম্যাক্স নিশ্চয়ই বিজ্নেস ক্লাশ পেয়ে গেছে, শয়তানটা এসব করে কিকরে?

পুরো ভর্তি নিস্-ভেন্টিমিগ্লিয়া ট্রেন ইতালীর বর্ডার পেরোনো মাত্র এক হাজারটা মোবাইলের বিপ্-বিপ্ মেসেজ জানান দিল যে দেশে সীমার বাইরে নেটওয়ার্ক চলে গেছে। রাফায়েলার সঙ্গে মিটিং চললো কুড়ি মিনিট – অনেকটা সময় চলে গেল ওর বাজে বকবক শুনতে, সেই একই কথা –এত দেরীতে ডেলিভারি! রাফায়েলা ম্যাক্সের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তিতে সই করেছে। সে ফিরে গেল স্টেশনে –গিজগিজ করছে লোক।

অ্যালেক্স চুপচাপ নিজের আসনে বসে বাইরের দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সমুদ্র পেরোল একটা – ইচ্ছা করছিল শার্ট খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলে – যারা স্নান করছেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে - কিন্তু এসবের সময় কোথায়? কিছু করারই বা সময় কোথায়? ব্যবসা মন্দা চলায় তাদের অফিস বেশী কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেনা বলেই দিয়েছে, এদের সবসময়ই ব্যবসা মন্দা। তার কাজের চাপ বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে, এমন অবস্থা যে সে এখন তিন সপ্তাহে একবার তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে। যখনই মেয়ে জেডের সঙ্গে দেখা হয়, মনে হয় যে সে আরও তার হঠাৎ ভক্ত হয়ে ওঠা মায়ের প্রভাবে চলে যাচ্ছে। ডোনা এখন বৌদ্ধধর্মের ভক্ত এবং যে তার কথা শুনবে সে তার কাছেই বুদ্ধদেবের বাণী প্রচার করতে থাকে। তবু বাঁচোয়া যে বৌদ্ধধর্ম অনেক সহজবোধ্য বাকীগুলোর চেয়ে। সে ভাবতে থাকে – সবাই কী করে সুষ্ঠভাবে সবকিছু মানিয়ে চলে! তাদের এমন কী আছে যা তার নেই? বয়স? তিক্তভাবে ভাবতে থাকে

সে- এক তরতাজা ভাব! ম্যাক্স এমনভাবে তার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলে যেন এটাই তার প্রথম দিন এই চাকরীতে। এমন এক সততা ওর মধ্যে আছে যেটা আজকাল একদমই দেখা যায় না।

নিস্-হিথরো ফ্লাইট-এ একগাদা লাল-মুখো, জঘন্য বড় বড় টুপিওয়ালা ইংরেজদের ভীড়। সে রৌদ্রস্নাত লাউঞ্জে বসলো যেখানে আগে থেকেই একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। ম্যাক্সকে দেখা গেল সবার আগে ফ্লাইটে উঠতে - অ্যালেক্স তার হিংসুটে মনকে পরাস্ত করলো। মেদহীন, লম্বা, ঝকঝকে ম্যাক্স। তার এমনই ব্যক্তিত্ব যে ফ্লাইট–অ্যাটেন্ডেন্টরা ওকে দেখে মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। তাকে কখনও চেষ্টা করে কারুর নজর কাড়তে হয় না, যেটাতে অ্যালেক্স চেষ্টা করেও ব্যর্থ। হোটেল আর এয়ারপোর্টের কর্মচারীদের নজর তার উপরে পড়লেও তারা তাকে এক অতি সাধারণ ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। আস্তে আস্তে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ম্যাক্স তার নিয়তি হয়ে যাচ্ছে।

ফ্লাইটটা এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে যা সময় লাগে তার থেকেও কমসময়ে পৌঁছে দিল। তার ইচ্ছা ছিল নিস্-এ থেকে যাবার, সমুদ্রতীর থেকে মোনাকো শহরকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ড্রাইভ করার, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করাই সার, এত কাজ রয়েছে! সে আগেও কখনো এসব করতে পারেনি, ভাবলো কি করে যে এখন করবে? একে কি বেঁচে থাকা বলে?

সে চট্ করে অফিসে একবার মুখ দেখিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়ে, ফ্ল্যাট থেকে জামা-কাপড় নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল, একবারও মনে পড়ল না যে জেড্‌কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়নি। যখন মনে পড়লো অনেক দেরী হয়ে গেছে; ফোন বন্ধ, কারণ সে ফ্লাইটে উঠে পড়েছে।

মনে হয়নি সম্ভব হবে, কিন্তু সপ্তাহটা বেশ ঘটনাবহুল গেল। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে একজনকে হৃদ্‌রোগে মারা যেতে দেখলো, একজোড়া দম্পতিকে সবার সামনে যুদ্ধ করতে দেখা গেল এবং অত্যন্ত অশালীনভাবে সেটা তারা মিটিয়েও নিলেন। অ্যালেক্সকে আর কিছুই তেমন ছুঁতে পারেনা, তবে শেষ কিছুদিনে সে বিভিন্নরকম মনুষ্য অভিব্যক্তি দেখে ফেলেছে।

সে খুশি হল শুনে যে অফিস তাকে আর এক জায়গায় পাঠাতে চায়। কাজের চাপে সে ম্যাক্স-এর কথা প্রায় ভুলেই গেছিল, সব ই-মেল আর ব্যবসায়িক জার্নালে ম্যাক্সের উল্লেখ থাকলেও। যদিও ততক্ষণই যতক্ষণ না ম্যাক্স এক আন্তর্জাতিক উৎসবে এক সোনার মেডেল জিতে নিল সেই বছরের সেরা সেলস্‌ম্যান হিসেবে। সেটাও ততটা খারাপ লাগেনি, কিন্তু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে তখনি লাগলো যখন ম্যাক্স এসে তাকে বলে, "কি হে, মুখটা এর'ম গম্ভীর কেন?"

খুব বেশী ড্রিংক করা হয়ে গেল – সে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। বাকী লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে ভুলে থাকার চেষ্টা করলো, যেটা খুব তাড়াতাড়ি একটা ম্যাক্স হারউডের নিন্দার আলোচনায় পরিণত হয়ে উঠলো।

"ও তো সব মহিলা ক্লায়েন্টদের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করে" – মিলান অফিসের পিটার ওলেক্সা বলে উঠলো। "তারপর তাদের দিয়ে তিন বছরের চুক্তি সই করিয়ে কেটে পড়ে।"

"ও এমন একটা গতি নিয়ে চলে যেটা অন্যদের পক্ষে অসম্ভব কঠিন হয়ে যায়"- সিমন কারটার-ফিলিপস্ অভিযোগ জানায়। "ও আমাদের সবার নাম খারাপ করে দিচ্ছে।"

অ্যালেক্স আর সহ্য করতে না পেরে উঠে পড়লো, হে ভগবান, ম্যাক্স তো নিজের কাজ-ই করছে। এরা সবাই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরতে গেলে ম্যাক্সের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। দেখলো, ম্যাক্স ঘরে ঢুকছে। সে বলতে চাইছিল – আসলে সে জিজ্ঞেস করতে চাইছিল ম্যাক্সকে যে সে কী করে সবকিছু সামলে চলেছে, কী করে সে তার নিজের কাজে সবথেকে উপরে থাকছে – কিন্তু নাহ্, ম্যাক্সের এই দাম্ভিক স্বভাব – আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলো না।

পরের কিছু মুহূর্তে যে কি হয়ে গেল সেটা আজ ও এক রহস্য। ম্যাক্স ঘরে ঢুকে বিছানার ধারে হঠাৎ করে উল্টে পড়ে গেল। মাথাটা ছোট কাচের টেবিলের দড়াম্ করে ঠুকে গিয়ে এমন জোরে মাটিতে উল্টে পড়ল যে অ্যালেক্স ওর খুলি ভাঙার আওয়াজটাও যেন স্পষ্ট শুনতে পেল যেন। প্রচুর রক্ত ম্যাক্সের মাথার চারপাশে – কালো আর চকচকে রক্ত। অ্যালেক্স আস্তে আস্তে ম্যাক্সের পালস্ চেক্ করতে গিয়ে দেখে – কোন পালস্ নেই। ম্যাক্সের শিরায় আর রক্ত বইছে না। তারা সবাই প্রচুর ড্রিংক করেছিল সেই সন্ধ্যেয় – অ্যালেক্স কোথায় যেন পড়েছিল যে অতিরিক্ত মদ্যপানে রক্তের শিরা অনেক সময় তাড়াতাড়ি ফেটে যেতে পারে, এতটাই তাড়াতাড়ি যে সামান্য এক পতনেও প্রাণ সংশয় দেখা দিতে পারে – ম্যাক্স একশো ভাগ মৃত, কোন সংশয় নেই এ ব্যাপারে।

ঘরের দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে অ্যালেক্স হোঁচট খেতে খেতে করিডরে পৌছলো, এত উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও সে দরজার হাতলটা ভাল করে মুছে দিয়েছিল, যাতে তার কোন চিহ্ন না থাকে ওই ঘরে। রাত প্রায় বারোটা হবে - করিডর ফাঁকা – অ্যালেক্স টলতে টলতে তার ঘরে পৌঁছে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকল। কেউ না কেউ তো জানতেই পারবে কি হয়েছিল, কিন্তু এই মৃত্যুর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ বার করা প্রায় অসম্ভব। ম্যাক্স তার নিজের ঘরে উল্টে পড়ে মারা গেছে, অ্যালেক্সের তার সঙ্গে কি যোগাযোগ? তারা তো একসঙ্গে লিফটেও ওঠেনি। হলে কোন ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা ছিল বলে তো মনে হয়না। তারা দুজনে উৎসবের আগে একটা কথাও বলেনি, আর তারপরেও তারা যথেষ্ট ভালভাবেই কথা বলেছে। সবকিছু ঠিক মনে হলেও অ্যালেক্স ডাটন সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

কেউ খেয়ালও করলো না যে ম্যাক্স প্রাতরাশে আসেনি। অবশ্য ও সাধারণত রাস্তায় গাড়িতে খেয়ে নেয় এয়ারপোর্টের দিকে যেতে যেতে। কিছুদিন সময় লাগলো ম্যাক্সকে নিয়ে আলোচনা শুরু হতে। বার্লিনে এক কনফারেন্সে– "শুনেছ, কি হয়েছে ম্যাক্সের? সেই অনুষ্ঠানের দিন ওর স্ট্রোক্ হয়েছিল এবং তাতেই মারা যায়।" প্যারিস কনফারেন্সে– "ম্যাক্সের হার্ট-অ্যাটাক্ হয়েছিল, অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত হোটেলের খাবার এছাড়া আর কি? শুনলাম ওরা নাকি লোক খুঁজছে ম্যাক্সের জায়গায়।" অ্যামস্টারডামে– "ও ঘরে বসে ড্রিংক করছিল, হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাচ্ছিল, আর সেই খাবার গলায় আটকে গিয়ে মৃত্যু। কি আশ্চর্য নিয়তি একটা এত ভাল মানুষের!"

অ্যালেক্স সেই চাকরীতে আবেদন করেছিল, যেটা ম্যাক্স করত। সে চাকরীটা পেয়ে এতটাই অবাক হয়ে গেল, যে প্রথমে তো মনে হল ওরা নির্ঘাত কিছু ভুল করেছে। জবাব আসার দুদিনের মধ্যে সে চাকরীটা নিয়ে নেয়, যদি হঠাৎ ওরা মন বদল করে ফেলে? ব্রেন্ট কায়ে, এক মোটাসোটা পঞ্চাশোর্ধ আমেরিকান তাকে প্রথম দিন স্বাগত জানায়, শুক্রবার কোম্পানীর মালিকদের সঙ্গে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানায়। তারা এক বারে গিয়ে কিছুক্ষণ ড্রিংক করে, তারপর দুজনে খেতে যায় একসঙ্গে। ব্রেন্ট বেশ ভালই ড্রিংক করতে পারে এক আমেরিকান হিসেবে।

"খুব ভাল লাগছে তোমাকে এই কোম্পানীতে দেখে" –কাঁধ চাপড়ে ব্রেন্ট জানায়। তার হাবভাব যেন কিরকম, কিন্তু বেশ কাছের মানুষের মত। "শেষপর্যন্ত এখানে পৌঁছতে পেরেছ, তুমি এখন আমাদেরই একজন।" অ্যালেক্স প্রথমে ভাবছিল যে ও কোম্পানীর কথা বলছে, কিন্তু ব্রেন্ট তার বুকের কাছে একটা সোনার ব্যাজ-এর দিকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছিল। ব্যাজটা খুব অদ্ভুত দেখতে– দুটো 'ই' অক্ষর জড়ানো-প্যাঁচানো মতন।

"আগে কোথাও দেখেছ এইরকম ব্যাজ, নিশ্চয়ই দেখেছ, না?"

অ্যালেক্স মনে করার চেষ্টা করলো – হ্যাঁ, দেখেছে তো, প্রায় কয়েক বছর ধরেই বেশ কিছু লোককে এইরকম ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরতে দেখেছে। "এই দুটো 'ই' দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে?" –সে জিজ্ঞেস করল।

"এক্সিকিউটিভ এলিট", ব্রেন্ট বোঝালো। "তুমি কি বলতে চাইছো যে তুমি কখনো আমাদের কথা শোননি?"

অ্যালেক্স ভাবলো, এটা কি এল্ক-এর সঙ্গে কোনভাবে জড়িত? সে ব্যাজটার উপরে একটা আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, "আমি কিন্তু এই লোগোটা প্রচুর দেখেছি"।

"হায় ভগবান! এটা একটা সাধারণ লোগো নয়, এটা লোগোর থেকে অনেক বড় ব্যাপার। তুমি আগে দেখেছ কারণ তুমি আমাদের পরিচিতি মহলে ঘোরাফেরা কর।" – ব্রেন্ট তার ওয়াইন গ্লাস থেকে বাকীটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন একটা গ্লাস হাতে নিল। সে তার পকেট হাতড়ে একটা খয়েরী রঙের ছোট্ট ব্যাগ বার করে সেটা অ্যালেক্সের দিকে এগিয়ে দিল। "খুলে দেখ, তুমি এটা অর্জন করেছ।"

অ্যালেক্স ছোট্ট ব্যাগটা ঝাঁকিয়ে ঠিক ওইরকম একটা ব্যাজ বার করলো। "কিছু বুঝতে পারছিনা তো? কি এমন করলাম আমি যে এটা পেলাম?"

"থাক থাক, আর বিনয় দেখিয়ে কাজ নেই। আমি জানি যে তুমি খুব ভালই জান যে কি করেছ। আস্তে আস্তে বুঝবে, যে এই ছোট্ট ব্যাজ তোমার জীবনে কত বড় বড় দরজা খুলে দেবে।" ব্রেন্ট লক্ষ্য করল যে সে ধীরে ধীরে ব্যাজটা পরে নিল, কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না।

পরের দিন সারাদিন মিটিং-এর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও সে লক্ষ্য করতে থাকল, কে কে ওইরকম ব্যাজ পড়ে আছে –সে দেখলো ব্যাজধারীরা যদিও বিভিন্ন দেশে থেকে আসা; কিন্তু কোথাও সবার মধ্যে একটা মিল আছে, তাকানোর ভঙ্গি, হাবভাব – সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে কোথায় মিল এদের সবার মধ্যে। ব্যাজধারীদের মধ্যে কেউ যদি তার

ব্যাজটা দেখে, কোন মন্তব্য করে না। সপ্তাহান্তে, সে সিলভি-র সঙ্গে সময় কাটালো। সিলভি একজন বড় উকিল, যার সঙ্গে তার দেখা এবং কিছু ভাব ভালোবাসা হয়েছিল প্যারিসে। সিলভি কিছু কাজে ব্যস্ত থাকায় অ্যালেক্স টেলিভিশন দেখতে শুরু করল এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে 'ইউনাইটেড নেশনস্'-এর মিটিং এও কিছু বড় মাথা ওইরকম ব্যাজ পরে আছে। আস্তে আস্তে সে ভয় পেতে শুরু করল, যতবার ওই ব্যাজটাকে দিকে চোখ যাচ্ছিল, ঠিক মনে হচ্ছিল ওটা যেন 'এস এস ইনসিগ্‌নিয়া'-র এক আধুনিক সংস্করণ। আর যারা এটা পরে আছে – সে ছেলেই হোক কি মেয়ে – তাদের দেখে মনে হচ্ছিল এরা নিশ্চিন্ত মনে অস্বীকার করতে পারে যে তারা কোন নির্দয় মিলিটারি দলের সদস্য। রাতে বাড়ি ফিরে সে ভালভাবে ব্যাজটা লক্ষ্য করল – আলোর তলায় রেখে।

ই.ই.

এক্সিকিউটিভ এলিট – এর মানে কি? হ্যাঁ, সে একধাপ উপরে উঠেছে, কিন্তু তার জন্য এত গোপনীয়তা কেন? এটা সত্যি যে, তার উপরের তলার লোকেরা তার সঙ্গে অনেক বেশী সম্মানের সঙ্গে কথা বলছে, আর এটাও সত্যি যে কাজের ক্ষেত্রে দরজাগুলো অনেক সহজে খুলে যাচ্ছে, আগের থেকে অনেক বেশী সহজে এবং তাড়াতাড়ি – এটা কি তার মনের ভ্রম –কে জানে! কিন্তু সে এমন কি করেছে যার জন্য এগুলো হচ্ছে? কি জন্য তাকে তার সমসাময়িক ব্যবসায়ীদের থেকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে?

হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল– এটা তো অনেক আগেই বোঝা উচিৎ ছিল! কি করে সে আগে এটা বুঝতে পারল না? সে মানুষ খুন করেছে! সে একজন খুনী এটাই সবাই ভেবেছে – আর ঠিক এই কারণেই সে একজন খুনী শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছে! সে সেই খুনীদলের সদস্য হতে পেরেছে – যেই দলে সবাই খুন করেও ছাড় পেয়ে গেছে – লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তারা ভেবেছে যে সে ম্যাক্সকে খুন করেছে উপরে ওঠার জন্য। প্রমাণ করতে পেরেছে যে তার মধ্যে সেই প্রতিভা আছে দলের সদস্য হবার। সহজসরল সৎ ম্যাক্স, যাকে সবাই ভালবাসত, কিন্তু উপরমহলে সবাই তার এই গুণগুলোর জন্যই তাকে ঘৃণাও করত।

বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে অনেকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখল। সে কখনোই একজন খুনী নয়। ম্যাক্স এক দুর্ঘটনার শিকার, এর থেকে বেশী কিছুই হয়নি। এটা খুব সাধারণ এক দুর্ঘটনা, অনেকের সঙ্গেই হয়ে থাকে। কারুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ব্রেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

"এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউশন!" ব্রেন্ট ভয়ে শিউরে উঠল। "পাগল হয়ে গেলে নাকি অ্যালেক্স? এসব কথা এখানে বলা যায় না"। তারা একটা বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, ভিতরে যাবার অপেক্ষা করছিল। "আমরা ভিতরে গিয়ে কথা বলি?" রাত আটটা বেজে পঁচিশ, আস্তে আস্তে ভীড় বাড়ছিল সেখানে। ব্রেন্ট জল খেল, বেশ নার্ভাস লাগছিল ওকে। "দেখ অ্যালেক্স, শেষের ই-টার মানে হল এলিট। কেউ কক্ষনোও এক্সিকিউশন কথাটা উচ্চারণও করে না এখানে। আমি সবসময়ই ওদের বলতাম যে নতুন সদস্যদের আর একটু ব্যাপারটা খোলসা করে বলা দরকার। কেউ পাত্তা দেয়নি আমাকে, বোর্ডের সদস্যরা চায় যে নতুনরা নিজেরা বুঝে নিক, ই.ই.-র মানে। তুমি কি করে বুঝতে পারলে এত তাড়াতাড়ি?"

"ভেবে ভেবে বার করেছি। তোমরা নিজেদের এলিট বল বটে, কিন্তু আসলে তোমরা এলিট বোঝাতে চাওনা কখনোই।"

"আমি জানতাম যে তুমি বেশ বুদ্ধিমান। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে।" ব্রেন্ট হেসে বলে – "যাকগে, এখন যখন জেনেই গেছ, যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বলতে পার আমাকে।"

"আমাকে এখন কি করতে হবে?"

"কিচ্ছুটি না, তোমায় কিছুই করতে হবে না। তুমি সবার সম্মান অর্জন করে ফেলেছ। এখন তুমি যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, অনেককেই দেখবে আমাদের ক্লাবের সদস্য, কিন্তু কেউ কোন কথা বলবেনা এ ব্যাপারে, কারণ এ ব্যাপারে কথা বলার কোন দরকার নেই। এটা এমন এক ক্লাব অ্যালেক্স, যেখানে তোমাকে সদস্য হবার জন্য জিজ্ঞেস করতে হবে না। তুমি যেটা করেছ সেটা করলে আমরা নিজেরাই তোমাকে আমাদের দলে টেনে নেব। আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে সদস্য আছে – ব্যাঙ্কিং-এ, বীমা কম্পানীতে, আইন আদালতে, প্রচার মাধ্যমে – খবরের কাগজের অফিসে, সব জায়গায় আমাদের সদস্য ছড়ানো। তুমি যা করেছ তার জন্য যেন যে তুমি সোনার চামচ পেয়ে গেছ।"

"আর সেইজন্যই আমি এই ব্যাজটা পরতে পারব?"

"হ্যাঁ, সেটা একটা অংশ তো বটেই। কিন্তু আসলে এই ব্যাজটা তোমার রক্ষাকবচ। তার মানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি এখন নিরাপদ। তুমি যে কাজ করেছ, আর কেউ সেটা তোমার সঙ্গে করবে না। আর তাছাড়া সেইরকম ক্লাব থাকার মানেটাই বা কি, যা তার নিজের সদস্যদের সুরক্ষা দেয় না?" ব্রেন্ট ওয়েটারকে ডেকে ড্রিংক-এর অর্ডার দিল।

অ্যালেক্সের ভাল লাগার কথা ছিল। কেউ কখনো জানতেও পারবেনা যে সে খুনটা করেনি, আসলে সে মাতাল অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে। বিছানার পাশে জুতো খুলতে খুলতে তার লজ্জা লাগলো, হায় রে, এই কি তার কর্মজীবন? এর জন্যই এত ত্যাগ, সবকিছু ছেড়ে এর পিছনেই ছুটে যাওয়া? যদি সে ম্যাক্সকে একটা খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, তাহলেও তো সে এই ব্যাজটা পেত। ম্যাক্স উপরমহলকে এতটাই চটিয়ে ফেলেছিল যে তার মৃত্যু সংবাদ কাউকেই দুঃখ দেয়নি।

এই ব্যাজটার জন্য, যে লোকগুলো কিছুদিন আগে তার ফোন পর্যন্ত ধরত না, এখন তাদের সঙ্গে তার নিয়মিত মিটিং চলতে থাকল। আস্তে আস্তে সে অনেক চুক্তিতে সই করাতে পারল, কোম্পানীকে অনেক লাভ এনে দিতে পারল – সেরকম কিছু যে খারাপ লাগছিল তাও নয়। একটা বেশ লম্বা ছুটি নিলে কেমন হয়, সিলভিকে নিয়ে এমন কোথাও যাওয়া যায় যেখানে তারা কেউই আগে কখনো যায়নি। এসব ভাবতে ভাবতে জানালার কাচে দেখে ব্রেন্ট এর মুখ। মোটা আমেরিকানটা তার পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায়নি। ব্রেন্টের মুখে সেই চির পরিচিত হাসিটাও উধাও।

"ব্রেন্ট, কি খবর? অ্যান্টওয়ের্প যাচ্ছ নাকি মিটিং-এ?" – ব্রেন্ট কে দেখামাত্রই সেই খারাপ লাগাটা ফিরে এল। কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে সে এদের ঠকিয়েছে।

"আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি অ্যালেক্স।"

"আমার সঙ্গে? কেন বুঝলাম না।"

"আমার তো মনে হয় তুমি ভালই বুঝেছ।"

"ব্রেন্ট, চলো কোথাও বসে কথা বলি?" –সে বেশ নার্ভাস হয়েই কথাগুলো বলল।

"না ঠিক আছে, আমি বেশী সময় নেব না। তুমি আমাদের সত্যি কথা বলনি যে ওইরাতে তোমার আর ম্যাক্সের মধ্যে কি হয়েছিল। কেন বলনি অ্যালেক্স?"

অ্যালেক্স খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল, সে এটা নিয়ে খুব কম হলেও হাজারবার ভেবেছে। কোনভাবেই কারুর জানার কথা নয়, যে সে রাতে কি হয়েছিল হোটেলে। সে প্রচণ্ড ভয়ে ভয়ে বললো – "তুমি জান কি হয়েছিল!"

"এখন জানি"

"তার মানে? কি করে?"

"আমি জানি তার কারণ ম্যাক্স হারউড আমাকে বলেছে।"

"কি যা তা বলছো ব্রেন্ট!"

"ও আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে।"

"কিন্তু ও তো মৃত!" – অ্যালেক্স চীৎকার করে উঠল, বাকীরা ওর দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল।

"ম্যাক্স আমার হোটেলে এসেছিল কাল রাতে, তিনসপ্তাহ এক ডাক্তারখানায় কাটিয়ে। ওর কিছু মনে ছিল না। শেষ যেটা মনে ছিল যে তোমার থেকে দূরে যেতে গিয়ে খাটের ধারে উল্টে পড়ে। যেটার মানে..." ব্রেন্ট তার শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাজটা বার করে নিল – "তুমি আর এটার যোগ্য নও। এটা বোঝা গেল যে তোমার সে ক্ষমতা নেই, যেটা আমরা ভেবেছিলাম।" হাতে ব্যাজটা নিয়ে কিছুক্ষণ দোলাতে থাকল, "এর মানে এটাও যে তুমি আর নিরাপদ নও অ্যালেক্স।"

"আমি এখন তোমাদের পক্ষে বিপদজনক!" অ্যালেক্স বলে উঠল, তার নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে।

"হয়তো, কিন্তু সেটা খুব বেশীদিনের জন্য নয়।" –ব্রেন্ট হাসল। "তোমার ফ্লাইট ছেড়ে দেবে তাড়াতাড়ি যাও।" মারাত্মক শয়তানি হাসি দিয়ে বলল –"অবশ্য তুমি এখন জান যে কার থেকে বিপদ আসতে পারে।"

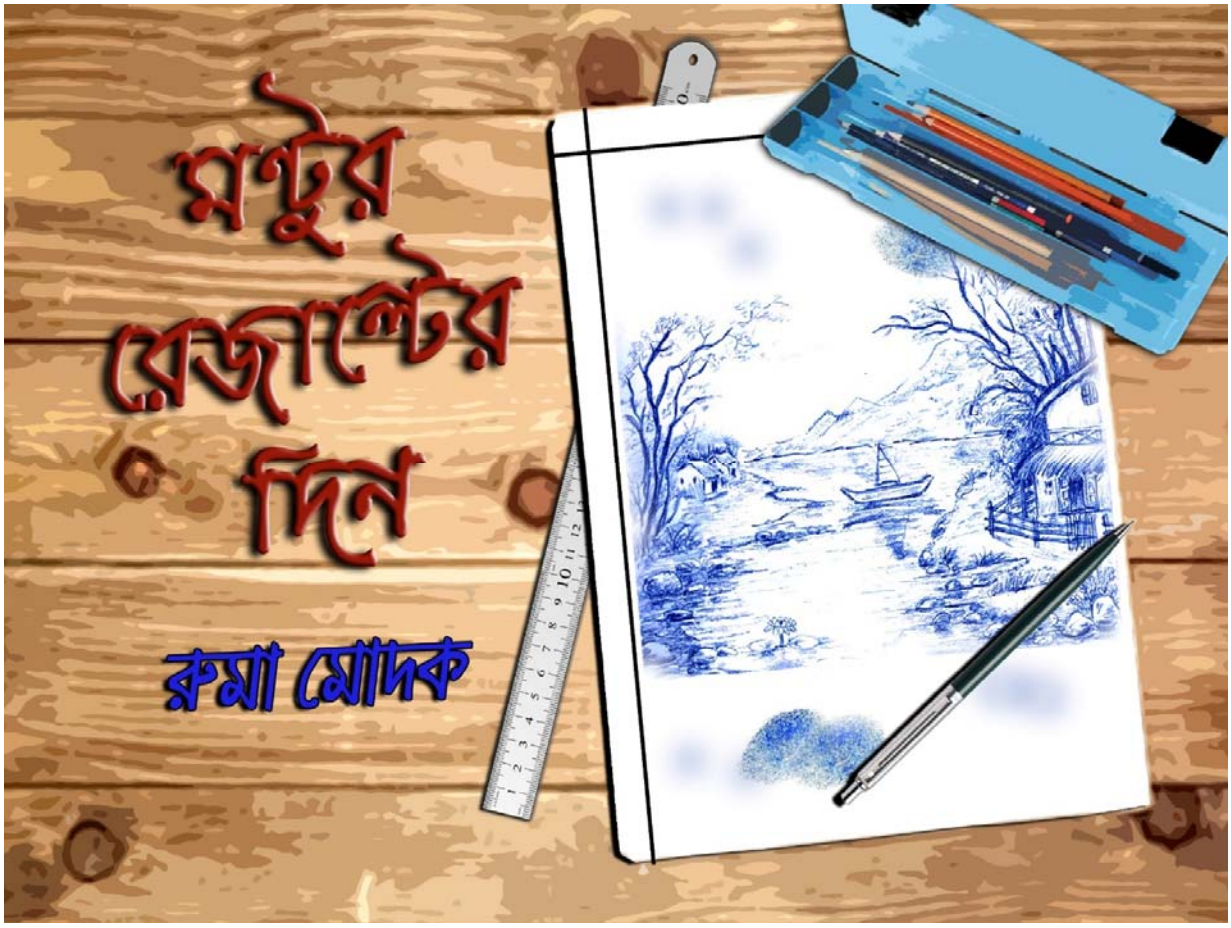
অ্যালেক্স নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটতে থাকল, তার জীবন আগে তো ভয়ানক ছিলই; কিন্তু এখন থেকে আর কয়েকঘণ্টা পর যে কি হতে চলেছে সেটা তার ধারণারও বাইরে।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

দোয়েল বর্মণ ফলিত গণিত গবেষণা করেছেন। এখন একটি বহুজাতিক গ্যাম্বলিং, ক্যাসিনো টেস্টিং কোম্পানীতে গণিত বিভাগে কর্মরতা। সময় পেলেই গল্পের বই নিয়ে বসে পড়েন। তার সবচেয়ে পছন্দের বিষয় হল গোয়েন্দা গল্প, সে ছোটদেরই হোক কি বড়দের।

#



সকালে ঘুম ভেঙেই বুকটা ধুকপুক করছে মন্টুর। এই ধুকপুক কারো কাছে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে অন্যান্য দিনের মতোই হাসিমুখে ইউনিফর্ম পরে খাবার টেবিলে বসতে হয়েছে। কিন্তু বুকের ভিতর প্রচণ্ড ধুকপুকানি নিয়ে মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না মন্টুর। সামনে রাখা দুধের গ্লাস, ডিমভাজা, পটলভাজা, রুটি সবকিছুর গন্ধে যেন ভিতর থেকে উগড়ে বমি আসতে চাইছে, কিন্তু এটা কিছুতেই মা বাবার সামনে প্রকাশ করা যাবে না। কারণ তারা জানেন পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। বিশেষ করে অঙ্কটা। 'এ' প্লাস নাম্বার তো থাকবেই থাকবে। বাবা-মা নিজেরা গল্প করেন, এবার মন্টু অঙ্কে 'এ' প্লাস নাম্বার পেলে রাতে চাইনিজ খেতে যাবো। তাদের গল্পে ভিতরের ধুকপুকানি আরও দ্রুত হতে থাকে। হৃৎপিণ্ডটা যেন কানের কাছে এসে হাতুড়ি পেটানো শুরু করেছে। মা-বাবাকে আপাতত এসব কিছুই বুঝতে দেয়া যায় না। পরের প্রতিক্রিয়াটুকু সে কল্পনাও করতে চায় না। আজ মন্টুর স্কুলে পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে। অন্য বিষয়ে যেমন তেমন, মুশকিলটা হল অঙ্ক নিয়ে। অঙ্ক পরীক্ষার দিন তার মাথায় কিছুই আসছিলো না। খালি খাতা কি করে জমা দেয়, তাই খাতা জুড়ে বসে বসে ছবি এঁকেছিলো সে। ওঃ, কি অসহ্য লাগছিলো তার হলের ভিতর। সবাই মনোযোগ দিয়ে মাথা নিচু করে অঙ্কের হিসাব নিকাশ মেলাচ্ছে আর ও বোকা হাঁদার মতো বসে আছে। মিসও কেমন বারবার সন্দেহের চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিল। প্রশ্নপত্রের অঙ্কগুলো বারবার দেখেছে সে। দূর দূর, সব অপরিচিত। পিতার বয়স পুত্রের

#

বয়স... নল দিয়ে চৌবাচ্চায় জল... এসব অঙ্ক সে কখনো করেছে বলে মনেই পড়ে না। কি আর করা! সময়টা কাজে লাগানোর জন্য বসে বসে ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে। কয়েকদিন থেকেই আইডিয়াটা মাথায় ঘুরছিলো। কিন্তু পরীক্ষার পড়ার চাপে ছবিটা আর আঁকা হয়ে উঠছিল না। মন্টু ভাবলো, আজ সুযোগে আঁকা হয়ে যাবে। মনের আনন্দে জ্যামিতি আঁকার জন্য আনা পেন্সিল আর ইরেজার নিয়ে ছবি আঁকতে বসে গিয়েছিল মন্টু।

খুব ভালো আঁকে মন্টু এটা সবাই স্বীকার করে। আর্ট-টিচারও ক্লাসে মন্টুকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এমনকি হেড টিচারও মাঝে মাঝে ক্লাসে ঢুকে আনমনা মন্টুকে ক্লাসের জানালা দিয়ে দূরে সাহা বাড়ির পুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, পুকুরে ভেসে বেড়ানো রাজহাঁসগুলোর ছবি আঁকার জন্য তার রুমে ডেকে নিয়ে যান। আর ছবি দেখে স্যার বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। ক্লাসে মনোযোগী নয় বলে যেদিন ক্লাস-টিচার তার বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেদিনও হেডস্যারের রুমে হেডস্যার বাবাকে বলেছিলেন- "আস্তে আস্তে সব হবে। ভাববেন না। সবার তো সব প্রতিভা থাকে না। ওর যে ছবি আঁকার হাত, একদিন ছবি এঁকেই ও অনেক নাম করবে দেখবেন।"

বাবা কি আর এসব বোঝেন? তিনি খালি বলেন বিপুল ক্লাসে ফার্স্ট হয়। নিশিতা অঙ্কে কখনো নিরানব্বুই-এর নীচে পায় না। অথচ মন্টু! সারাক্ষণ এক কথা মন্টুর আর শুনতে ভাল লাগে না। আরে বাবা সবার কি আর অঙ্ক ভালো লাগে? ভালো লাগতে হবে এমন কোনো কথা আছে? নিশিতা, বিপুল ওরা কি ছবি এঁকে প্রথম পুরস্কার পায়?

বাবা এসব বুঝতে মোটেই রাজী নয়। এবার বছরের শুরুতেই বাবা স্কুলের সবচেয়ে ভালো টিচারকে অঙ্কের জন্য রেখে দিয়েছেন। টিচার সারা বছর ধরে বাড়ি এসে অঙ্ক করিয়েছেন। মন্টুও মনোযোগ দিয়ে স্যারের কাছে অঙ্ক শিখেছে। কিন্তু পরীক্ষার হলে এসে কী যে হল সবগুলো অঙ্কই মনে হচ্ছিল অচেনা। সে যেন ওই ধরণের অঙ্ক কস্মিনকালেও কখনো দেখেনি।

মন্টু আজ রেজাল্ট নিয়ে বাড়িতে এসে কী যে জবাব দেবে? আর বাবা কতটা রেগে মেগে আগুন হয়ে উঠবে ভাবতেই মন্টুর হাত পা কাঁপছে। ইচ্ছে করছে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়। যথারীতি মন্টুকে স্কুলে যেতে হল। ক্লাসে বসে থাকতে হল রেজাল্টের অপেক্ষায়। ফাইনাল পরীক্ষার পরে আজ প্রায় এক মাস বাদে স্কুল খুলেছে। মন্টু ক্লাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, দূরে স্কুল বাউন্ডারির সীমানা ঘেঁষে ঘাস খাচ্ছে একটা খুঁটি বাঁধা গরু। গরুটার দিকে তাকিয়ে আজ মন্টুর মনে হল, আহা এই গরুটা কি সুখী, তাকে পরীক্ষা দিতে হয় না, রেজাল্টের জন্য বুক ধুকপুকানি নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় না, রেজাল্ট খারাপ হলে বাবার কাছে, টিচারের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। এই গরু এই মাঠের ছবিটাই সে এঁকেছে অঙ্ক পরীক্ষার খাতায়। শুধু স্কুল বিল্ডিং-এর জায়গায় একটা নদী, যে নদীটা মামাবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সেই নদী, আর তার তীর ঘেঁষে কাশবন। ঐ যে পতাকার বেদীটা যেখানে, ঠিক সেখানটায় কাশবনটা আর সেই কাশবন ধরে দৌড়াচ্ছে তার বোন আর সে, ঠিক যেমনটি পড়েছিলো পথের পাঁচালিতে অপু আর দুর্গার কথা, রেললাইন দেখতে ছুটে গিয়েছিল কাশবন ধরে... পুরোটাই পেন্সিল স্কেচ।

ঘণ্টা বাজার পরেই হেডস্যার ক্লাসে ঢুকলেন, ঢুকেই মন্টুকে কাছে ডাকলেন। গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন পরীক্ষা কেমন হয়েছে? মন্টুর তো তখন ভয়ে কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মন্টু মাথা নিচু করে রইলো, কোনো

উত্তর দিতে পারলো না। কিন্তু এই ভয়ার্ত পরিবেশেও মাথায় নানা চিন্তা খেলা করতে লাগলো মন্টুর। আচ্ছা ওতো প্রতিবছরই পরীক্ষায় খারাপ করে, কই কোনো বছর তো হেডস্যার জিজ্ঞেস করেন না! এ বছর কেন হেডস্যার নিজেই জিজ্ঞেস করছেন! মন্টুকে অবাক করে দিয়ে হেডস্যার আদেশ দিলেন- "তোমরা সবাই মন্টুর জন্য হাততালি দাও।"

কী অদ্ভুত কাণ্ড! নিশ্চিত সে এমন কোন রেজাল্ট করে নি যে হাততালি দিতে হবে। কিন্তু হেডস্যার এটা কেন করছেন? ওকে লজ্জা দেয়ার জন্য কি? এটা তো হতে পারে না। হেড স্যার তো তেমন মানুষই নন। কিন্তু যে কিনা সব বিষয়ের খাতায় ফুল-মার্কসের উত্তরই দেয়নি, গণিতের খাতায় একটা অঙ্কও না করে জমা দিয়ে এসেছে তার জন্য হাততালি কেন? লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে মন্টুর। শেষপর্যন্ত হেডস্যারও তাকে লজ্জা দিতে এলেন পুরো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সামনে! লজ্জা অপমান কান্না হয়ে যখন মন্টুকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিলো, হেডস্যার ঠিক তখনই টেবিলে উল্টে রাখা একটা ফ্রেম সবার সামনে তুলে ধরলেন। মন্টু দারুণ অবাক হল! আরে এটা তো সেই ছবি, যে ছবি সে অঙ্ক খাতায় এঁকেছিল। এ ছবি এভাবে ফ্রেমে বাঁধাই করলো কে? কী আশ্চর্য! মন্টু পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মন্টুকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে হেডস্যার তখন ক্লাসে ঘোষণা করলেন- "মন্টুর আঁকা এই ছবিটি জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আজকের পত্রিকায় বড় করে মন্টুর নাম আর সেই সঙ্গে স্কুলের নামও ছাপা হয়েছে। মন্টুর কারণে আজ এই স্কুল সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়েছে।"

আসলে অঙ্কস্যার মন্টুর খাতা পেয়ে খুব রেগেমেগে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। হেডস্যার ছবিটি দেখে এতোই মুগ্ধ হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে এটি বাঁধাই করে প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে আজকের এই ফলাফল, যে ফলাফলে স্কুলের সব ফার্স্ট বয়দের আনন্দকে পিছনে ফেলে দিল মন্টু। আনন্দে হেডস্যার মন্টুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন- "তোমার মা-বাবাকে খবর দেয়া হয়েছে। ওঁরা আসছেন। ওঁরা এলে আমরা সবাই মিলে আনন্দ করবো আজ।" মন্টু এবার হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারলো না।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

রুমা – জন্ম ৭ ই মে, হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, বর্তমানে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত, বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও লিটল ম্যাগ-এর নিয়মিত লেখিকা, মঞ্চ নাটকের জন্য ওপার বাংলার "তনুশ্রী" পদকে ভূষিত।



এ যে সময়ের কথা, তখনও অন্তর্জালের অন্তরীক্ষে মার্ক জাকারবার্গ তাঁর স্বর্ণময় অশ্বডিম্বটি প্রসব করেননি। ফেসবুকের আবির্ভাব হয়তো হয়েছে কিন্তু তখনও তা পূর্ণবিভূতিতে প্রস্ফুটিত হয়ে অপামর জনগণের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেয়নি।

তাই সেই সময়ে হাতে কিছুটা অবসর থাকতো আর কয়েকটা বাংলা ফোরাম ছিল আমার তখনকার বিনোদন। তাছাড়া হাস্যরসে তো কর্পোরেট মোহর লাগে না, চিয়ারলীডার ছাড়াই দিব্যি চিয়ারফুল থাকা যায়। আর সঙ্গে ছিল লাফটার চ্যালেঞ্জ এবং মীরাক্কেল। সুতরাং, কাত্তিকদা ততদিনে এসে গেছেন বাঙ্গালীর জীবনে। কম্পিউটারে আমার বাংলায় লেখালিখিও শুরু কাত্তিকদার হাত ধরে।

স্বীকার না করে উপায় নেই, এতে ইন্ধন যুগিয়েছিল এই বেঙ্গলীডাউনলোড! সংক্ষেপে বিডি। সমাজমাধ্যমের বাল্যকালে প্রথম দিককার এক বাংলা ফোরাম। এই ফোরামের সদস্য ছিল আমার ভাই, তারই আবাহনেই ঢুকে পড়া। নামের অনুরূপ ডাউনলোডিং তখন অবশ্য ছিল না। তার বেস সবে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু অনেরকম মজার খেলা চলত, উপদেশ দেওয়া, ধমকানো, শব্দ বানানো...। আর মেম্বারদের কি সব অদ্ভুত নাম— আমার ভাইএর নাম ছিল রুট-টু, আর একজনের নাম কংকালিমাস করোটীভূষণ! আরও সব ছিল— সীজন, বিছুটি, গজুয়া, আর একজন আবার পাই-বাই-টু!

কণিক সেকশন পড়ার সময়ে শঙ্কুর আকৃতি কৌতূহলোদ্দীপক ঠেকেছিল। তাছাড়া সত্যজিৎ রায় প্রিয় লেখক। শঙ্কু নামটা তাই মনে ধরে গেছিল। বিডি-তে আমি হলাম— শঙ্কু!

#

খেলাধুলোর বাইরে আর কি পোষ্ট করা যায় ভেবে না পেয়ে একদিন ঠিক করলাম, আমার জোকসের সংগ্রহ ‘পাব্লিক’ করে দেওয়া যাক। প্রায় দু'হাজার জোকস আছে আমার খাতায়, তার সবই যে খুব ভালো তা নয়। কিন্তু অর্ধেকটা ভালো হলেও যে সংখ্যাটা হয় তাই দিয়ে অনেকদিন চালিয়ে দেওয়া যায়। শুরুটা হলও ভালো। আমি হেন নতুন মুখের জোক পোষ্টগুলো ছিল ইন্সট্যান্ট হিট!

কিন্তু জোকস শুধু সংগ্রহ/একত্র করা ছাড়া আমার আর কোন কৃতিত্ব নেই। কপিরাইটেরও তোয়াক্কা করিনি। তাই বোধহয় সুখ বেশীদিন সইল না। হঠাৎ একদিন দেখি ফোরাম বন্ধ হয়ে গেছে! অন্তর্জালে ঢুকেই বিডি-র পরিচিত স্ক্রীন দেখতে এতোটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল! আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম। কি হল কিছুই জানতে পারছি না। ভাই ছাড়া ফোরামের কারুর সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিচিতি নেই যে খবর নেবো। বেশ ক'দিন পরে ভাই খবর দিল কোনও কারণে বিডি-র পুরনো ঠিকানা ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু নতুন ঠিকানায় শিগগিরই বেঙ্গলীডাউনলোডের পুনরাবির্ভাব হতে চলেছে।...

নির্দিষ্ট দিনে নতুন অবতারে বিডি-কে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এলো। তাড়াতাড়ি মেম্বার হওয়া, আগের বিডি-তে সদস্যপদ থাকায় বিশেষ সমস্যা হল না। পুরনো বিডি-র নতুন সদস্য আমি নতুন বিডি-র 'পুরনো' মেম্বার হয়ে গেলাম।

তারপর দিনগুলো কাটতে লাগলো তরতর করে। জোকস, খেলা, আলোচনা, টুকটাক আপলোড-ডাউনলোড। এবং শেষকালে অঙ্ক!

স্কুলের অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে বেশ লাগতো। জয়-মা বলে খুলে দিয়েছিলাম একটা অঙ্কের থ্রেড। মজার মজার অঙ্ক আলোচনা করতে। খুব যে সাড়া পাবো তেমন আশা করিনি। কিন্তু ঈষদুষ্ণ প্রত্যুত্তরের মাঝেও বেশ কয়েকটা ভালো প্রবলেম পেলাম পিবি-র কাছে।

পিবি হল সেই পাই-বাই-টু। নাম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন দেখলাম পিবি-রও অঙ্কের বাতিক। ভাইএর কাছে শুনেছিলাম পিবি ছিল ফোরামের হর্তাকর্তাদের একজন। অঙ্কের সূত্রে একটা সমকম্পাংকের আভাষ পেলাম। তখনও জানি না পিবি-র আর এক বাতিকের কথা। সে আবার একদম আমার বিপরীত মেরুর!

একটা খোলা আলোচনার থ্রেড শুরু করেছিলাম বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ নিয়ে। তাতে প্রায় সরাসরি জানিয়েই দিয়েছিলাম ঐ সময়ের বাংলা সিনেমা সম্বন্ধে আমার বিরাগের কথা। মনের উষ্মা জানিয়েছিলাম এইরকম কিছু শব্দে—

“খুব ভালো করে ভেবে নিয়েই বলছি, ল্যাভেন্ডার ক্রীম লিপষ্টিক লাগানো নায়ক-নায়িকার নেতানো পাঁপড় মার্কা প্রেমকাহিনী দিয়ে অপরিণত মানসিকতায় সুড়সুড়ি দেওয়া যায়, সেন্টিমেন্টাল বাঙালিয়ানা ভাঙিয়ে ব্যবসা করা যায়। কিন্তু ভালো সিনেমা তৈরী হয় না। কোনো সন্দেহ নেই, এইসব অভিনেতা অভিনেত্রীরা বাংলার জন-গণ-মানসকে একটা সময় মোহ-মুগ্ধ করে রেখেছিল। এক সময়ে তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কিন্তু এই মুগ্ধতা ছিল ভীষণভাবে আঞ্চলিক। বাংলার বাইরে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। এমনকি আজকের বাঙালি নব্যসমাজ, যারা বিশ্বায়নের একটু আভাসও পেয়েছে, তারা সেই সব বাংলা ছবি দেখলে নাক কুঁচকোবে। এটা শুধুমাত্র আই-টি, সেলফোন আর ইন্টারনেট যুগের উন্নাসিক তাচ্ছিল্য

নয়, এর জন্য সত্যিসত্যিই দায়ী ওই সিনেমাগুলোর গুণমানের নিকৃষ্টতা। চিত্রনাট্য, সংলাপ, অভিনয়, কারিগরী, চলচ্চিত্রবোধ— সিনেমাশিল্পের কোনো একটা আঙ্গিকে যে একটু প্রশংসা করব, তার উপায় নেই। শুধু আড়াইঘন্টাব্যাপী এক ভ্যাদভ্যাদে সেন্টিমেন্টালিটি। কোনো ভুল নেই, মুগ্ধতার আর একটা মানে হয় বোকামি।..."

"এর জন্য দায়ী অবশ্যই ঐ সময়ে তৈরি বেশীরভাগ বাংলা চলচ্চিত্র, শিল্প হিসেবে যাদের নাম মুখে আনতে নেই। ভালো সিনেমা একেবারেই হয়নি এমন নয়, কিন্তু এখানে আমি সেইসব জুড়ি-নির্ভর সিনেমাগুলোর কথাই বলছি, যাদের জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিল অবুঝ দর্শকের অর্থহীন মোহমুগ্ধতা।..."

"ভাই, রাগও হয় আবার দুঃখও। আজ এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে যখন ওই সিনেমাগুলো আবার দেখি, নস্টালজিয়ার পর্দাটা সরালে শুধু চোখে পড়ে কতকগুলো অপরিণত প্রাপ্তবয়স্কের ন্যালব্যালে হাত-পা নাড়া। সীমাহীন তাদের চিন্তাশক্তির দৈন্য, দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর অপরিসীম উদাসীনতা। ভাবতে অবাক লাগে, এসব ছবির নির্মাতা-কলাকুশলীরা পরিণতমনা বুদ্ধিজীবী।..."

"সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের(!) জনপ্রিয় নায়কনায়িকাদের এককথায় সবার সেরা বলতে পারলাম না। জানি আমি এই কথা বলায় অনেকের বিরাগভাজন হবো। আমি অপারগ, কেননা সে ব্যাপারে আমার কতকগুলো নিজস্ব যুক্তি আছে। সেগুলো আবার বেশীর ভাগই চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে এবং কোনটাই প্রায় তর্কাতীত নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তাই অন্যকে একমত করবার তর্কে আর যেতে চাই না। তবে এই যুগের বাংলার কিছু নামী অভিনেতা ও সে সময়ের জনপ্রিয়তম জুটির সম্বন্ধে আমার মতের পরিবর্তন হবে না।"... ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাংলা ছবির বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের জমে থাকা ক্ষোভ ও হতাশার প্রতিক্রিয়ায় আবেগের মাত্রা কিঞ্চিৎ ছাড়িয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাই রচনাটিতে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা যে পরিমাণে ছিল, সারবস্তু সে তুলনায় কম। সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবিতে উৎকর্ষের অভাবই আলোচ্য ছিল, বিশেষ কোনও অভিনেতা বা মুখ্য জুটির বিষয়ে প্রত্যক্ষ মন্তব্য কিছু ছিল না। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু এসে গিয়ে থাকবে। সেটা উপলব্ধি করি পিবি-র উত্তরে।

আমার বক্তব্যের জবাবে পিবি-র প্রতিক্রিয়া ছিল একদম চাঁচাছোলা। বেশ কড়া করেই জানিয়েছিল যে আমার লেখায় যদি উত্তমকুমার সম্বন্ধে যদি কোনও কটাক্ষ থাকে তাহলে সে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মহানায়ক এক নম্বর!

কোনও বিশেষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আলোচনায় যাবার ইচ্ছে ছিল না। এখানে কিন্তু সেই পথেই যেতে হল। বললাম, তাই কি? প্রায়শই তাঁর অতি অভিনয়, চলচ্চিত্রবোধের সীমাবদ্ধতা, জড়ানো সংলাপ, এমন কি তাঁর যে ম্যানারিজমে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পাগল ছিল, তা কি চোখে লাগে না? আমার মতে উত্তমকুমারকে যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলেন, তাহলে অতীত ও বর্তমানের আরও বেশ কয়েকজন অভিনেতার প্রতি অবিচার করা হয় না কি?

ত্বরিতেই আসে পিবি-র উত্তর, ঠিকই, কিছু কিছু জায়গায় অতি অভিনয় চোখে লাগে, কিন্তু আর কোন বাঙালি অভিনেতা কি সেই জায়গায় পৌঁছেচে?

চলচ্চিত্রের উৎকর্ষতার প্রশ্নে অবধারিতভাবেই দেখেছি অভিনেতার জনপ্রিয়তার আবেদনটাই মাথা তোলে। পিবি-কে বললাম, নায়কের জনপ্রিয়তাই কি সিনেমার শেষকথা? বাংলার বাইরে কোথায় তাঁর জনপ্রিয়তা? আজকের প্রজন্মের কাছেও কি আছে সেই অবুঝ আনুগত্য?

—একটু ভেবে দেখো তো, তোমাদের সময় শুকতারা নন্টে ফন্টে আর বাঁটুল ছিল, এখন কজন সেসব পড়ে? অমর চিত্র কথার নাম কজন জানে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট চেঞ্জ হয়। তাই ভারতের শ্রেষ্ট অভিনেতার জন্য বলব না, কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা আর কারো মাথায় কি বসতে পারে? কখনো?

—ভাই, অভিনেতাকে কি গুণে বিচার করবে, তার ওপর নির্ভর করছে। তা কি শুধুই দেখতে সুন্দর বা তার কোন একটা নিজস্ব স্টাইল বা ম্যানারিজম? সে বিচারে তো রাজেশ খান্না, দেব আনন্দ কম যান না।

—তাহলে কোন গুণে বিচার করবে সে বিষয়ে তোমার মতটা শুনি।

—আমি মনে করি, একজন অভিনেতার বিচার হওয়া উচিত তার অভিনয়ের স্বাভাবিকতা ও বহুমুখীনতায়। যে কোন চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে সে কতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে, তার ওপর। সে চরিত্রটা যখন দেখব, তখন কে অভিনয় করছে যেন বোঝা না যায়। খুবই শক্ত কথা, তবে কিছু অভিনেতা আছেন যাঁরা তার কাছাকাছি যেতে পারেন। উত্তমকুমারের অভিনীত চরিত্রগুলি কখনই 'উত্তমকুমার'কে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। বাঙালি দর্শক সেইসময়ে অবশ্য তাই-ই চাইত।

—তাহলে স্বীকার করছ উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা?

—অস্বীকার করার কোনও রাস্তাই নেই। কিন্তু ঐ যে বললাম, বাঙালীরা চাইত শুধু উত্তমকুমারকে দেখতে, তাঁর অভিনয় নয়। সেটাই উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তার মূলকথা। আমার কাছে সেটাই কিন্তু অভিনেতা হিসেবে উত্তমকুমারের ব্যর্থতা।

পরের উত্তরেই বুঝলাম পিবি রেগেছে। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, আর সুচিত্রা সেন? উত্তম-সুচিত্রা জুটি যে বাংলা সিনেমার সর্বকালের সেরা, আশা করি তাতে সন্দেহ নেই?

—না, তা নেই। কিন্তু ঐ যে বললাম, জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনয় প্রতিভার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

—বুঝলাম বুঝলাম— (বেশ কয়েকটা রাগত স্মাইলি)— কিন্তু তাই বলে জনপ্রিয় হলেই যে অভিনয় প্রতিভা কম তা তো নাও হতে পারে।

—অবশ্যই। কিন্তু কথা হল তুমুল জনপ্রিয় না হলেও অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা— এটাও সম্ভব। এখনই যে নাম দুটো মনে আসছে, তাঁরা ছবি বিশ্বাস ও তুলসী চক্রবর্তী। উৎপল দত্ত-ও আমার অসাধারণ ফেভারিট, অবশ্য তাঁর অভিনয় একটা বিশেষ ধরনের।

—আর সুচিত্রা সেন? আজকে অনেক অভিনেত্রীকে নিয়ে তো খুব পাব্লিসিটি হচ্ছে কিন্তু সুচিত্রা সেনকে নিয়ে যতটা মাদকতা ছিল, তার—

—পাব্লিসিটি-মাদকতা সরিয়ে শুধু অভিনয়ের বিচারে সুচিত্রা সেন দশের মধ্যে—

যে নম্বরটা বলেছিলাম তা খুব গৌরবজনক ছিল না। পিবি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এই রে!! সামনে থাকলে মার মার কাট কাট হয়ে যেত এক্ষুণি!!! (অগ্নিবর্ষী ড্রাগনের স্মাইলি!)

—মার কাট করার দরকার নেই, ভাই। বুঝেছি তুমি সুচিত্রা সেনের অন্ধভক্ত। সে তুমি হতেই পারো। সবার আলাদা আলাদা পছন্দ। তবে যাই বলো, সুচিত্রা সেন অভিনয় করতে পারতেন না।

বুঝলাম বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে চলেছি। কিন্তু যা সত্যি মনে করি না বললে চলে কি করে? পিবি গরগর করে বলল, তাহলে অভিনয়টা কে করে ? ...? বলে আর এক আধুনিক লাস্যময়ী অভিনেত্রীর নাম করল।

আমি বললাম, পুরোপুরি না। তবে অপেক্ষাকৃত ভালো।

পিবির কথায় এবার সম্পূর্ণ বিস্ফোরণ। প্রচুর হিংস্র স্মাইলি সহযোগে আরও কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম করে তুলনামূলক বিচারে শ্রীমতী সেনের অবস্থিতির চ্যালেঞ্জ জানালো। বালকোচিত উল্লাসে পিবি-কে আরও উসকে দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না। বললাম, এতো সূক্ষ্ম বিচার করতে পারি না বাপু। তবে মিসেস সেনের রোলগুলো এখনকার একটা ভালো রোবট দিয়ে অনায়াসে করিয়ে নেওয়া যেতো।

সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড! এখন মনে হলে হাসি পায়। সেদিনের সেই তর্ক কতদূর গড়িয়েছিল তা আর মনে নেই। অবশ্যই কোনও মীমাংসা হয়নি নিশ্চই। ঘটি-বাঙাল, উত্তম-সুচিত্রা, মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল, কংগ্রেস-সিপিএম— এইরকম কিছু তর্কে প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী আজও শৈশবে চলে যেতে চায়। মীমাংসার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

কিন্তু পরাজাগতিক সমরাঙ্গণে সেদিন সূচনা হয়েছিল এক অদেখা বন্ধুত্বের! আজও তা রয়ে গেছে একইরকম।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

শঙ্কুর অধীত বিদ্যা বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি, পেশা সরকারি চাকরি। বাংলার বাইরে বিশ বছরের প্রবাসজীবন। যাদবপুরের স্নাতক, খড়গপুরে স্নাতকোত্তরণ। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো একটা এম-বি-এ ডিগ্রীও আছে। ছোটবেলা থেকে গল্প পড়তে ভাললাগা। বই পড়া ছাড়া প্রিয় অবসর (কোথায়?) বিনোদন ইতিহাস আর অঙ্কে। লেখালিখিটা সম্পূর্ণ শখের। ছন্দ মেলাতে অক্ষম। মনেপ্রাণে সাবেকী। গদ্যেও প্রাচীনপন্থী।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা – যে দিন গেছে হারিয়ে

সৌমেন নাথ

'সানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল ।

পাইক্যা আইছে সাইলের ধান সোনার ফসল ।।

তা দিয়া কুটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা ।

এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরা' ।।

- মহুয়া পালা

মুসলমান শাসনের মাঝামাঝি সময়ের থেকে ইংরেজ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত, গ্রামবাংলার অজানা-অনামা মেঠো কবিদের সহজ-সরল ভাষায় উঠে আসা সবুজ-শ্যামল গ্রামবাংলার কথা। কখনও নিতান্তই উপকথা নির্ভর, কখনও ইতিহাসের সঙ্গে কবিকল্পনার মিশেল। কোথাও জমিদার-রাজা-সওদাগর, কোথাওবা জঙ্গুলে ব্যাধ। বর্ণময় সব চরিত্র। আর তার সঙ্গে বাংলার বর্ণনা। তার শান্ত-স্নিগ্ধ ছবি। সবুজের বিবরণ। সম্পন্ন গৃহস্থের হোক বা সামান্য চাষি, বাগ-বাগিচা-বাগানের গল্পকথা। ফল-ফুলের মেলা। জলের মাছের কথা। অতিথি আপ্যায়নে রান্নার মশলা। বন-বাদারের জঙ্গুলে গাছপালা। বারমাসের রূপ – বারমাস্যা। পাখ-পাখালি, গরু-বাছুর, কখন বা ফসলভরা ক্ষেতখামার। রূপকথার মতন শুনতে পাওয়া এই হারিয়ে যাওয়া দেশের কিছু কথা আর কিছু প্রথা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি।

(১)

'কেহ বলে আমার বাড়ীৎ আইস পরীজান ।

তুলসীমালার ভাত দিয়ম ছালৈন নানান ।।

সাঁচি বরর পান আর দিয়ম বাট্টা ভরি রে' ।

- পরীবানুর হাঁহলা

'অতিথি নারায়ণ' বা 'অতিথি দেব ভব'– কথাটা বহুল প্রচলিত। অতিথিকে মনে করা হয় স্বয়ং ঈশ্বর। গৃহস্থ সাধ্যমতন তাঁর সেবা যত্নের ব্যবস্থা করেন। একদম-ই নিজস্ব এই আপ্যায়ন। অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিকতায় ভরপুর। খই, দই, গাছের কলা, বাগানের সবজি, পুকুরের মাছ – এত একজন গৃহস্থের কথা। এসো ভাই, বস ভাই, আমার গাছের

#

ফল-পাকুর খাও ভাই, আমার পুকুরের মাছ খাও ভাই..... আম বাঙ্গালীর কথা। একদম প্রাত্যহিক রান্নার পদ, বাহুল্যতা নেই, কিন্তু শুনলেই রসনা সিক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সেই ছবি আমরা দেখি 'মলুয়া' পালায়। দেখা যাক, কিভাবে আপ্যায়িত করা হত অতিথিকে।

বিনোদ (চান্দ বিনোদ), মলুয়ার বাড়ি গেলে,

'.....

লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি ।

.....'

এরপর আসে অতিথির জন্যে রান্নাঘরের আয়োজন আর খাওয়া-

'মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার ।

মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার ।।

কাইট্টা লইছে কই মাছ চরচরি খারা ।

ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়্যা কাল্যাজিরা ।।

একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি ।

শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি ।।

.....

শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা ।

পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা ।।

পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি ।

পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলঢলি ।।

আচাইয়া চান্দ বিনোদ উঠিল যখন ।

বার-দুয়ারিয়া ঘরে গিয়া করিল শয়ন ।।

বাটাভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া ।

#

পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয়া ।।

শুইতে দিছে শীতল পাটী উত্তম বিছান ।

বাতাস করিতে দিছে আবের পঙ্খাখান' ।।

(শব্দার্থঃ সরুয়া – ঝোল, শুকত- শুক্ত, শিস্যায় ভরা- দুধের শিষে ভরা, ক্ষীর দিয়ে ভরা, চিত- চিতই, আসকে, পোয়া – মালপো, চই- একরকম ঝাল গুল্ম/শাক)

এই হল অতিথি সৎকারের নমুনা। এখানে খুব লক্ষ্যনীয় কতকগুলো বিষয় আছে। জিরে, লবঙ্গ আর এলাচ ছাড়া এমন কোন জিনিস বিশেষ নেই, যেটা সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে জন্মায় না বা পুকুরে হয় না (মনে রাখতে হবে, বাড়ি পূর্ববাংলার গ্রামে)। কালোজিরে কিন্তু আমাদের এখানে খুব ভাল হয়। অদ্ভুতভাবে মাংসের অনুপস্থিতি। 'মাছে-ভাতে বাঙালি' – কথাটা এমনি এমনি আসেনি। এখনো আমাদের মধ্যে অনেক পরিবারে শুভকাজে মাংস হয় না। সাধারণত শুঁটকি মাছ সেদ্ধ করে রান্না করা হয়; এখানে পুড়িয়ে রান্না করা হচ্ছে। শুঁটকি মাছ পুড়িয়ে রান্না করলে মাছের আঁশগুলো ছাড়াতে সুবিধে হয়।

কাজলরেখা পালায় –

'.....মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া ।।

জোড়া কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি ।

পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী ।।

নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত ।

চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত ।।

চই চপড়ি পোয়া সরস রসাল ।

তা' দিয়ে সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল ।।

ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া ।

রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া ।।

উত্তম কাঁঠালের পিঁড়ি ঘরেতে পাতিল ।

ছিটা ছড়া দিয়া কন্যা পরিচ্ছন্ন কইল ।।

সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত ।

#

ঘরে ছিল পাতি নেম্বু কাইট্যা দিল তাত ।।

সোনার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর ।

ঘরে মজা সবরি কলা কইলা দিল চির ।।

সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি ।

তাম্বুলে সাজায় কন্যা সোনার বাটাখানি ।।

কেওয়া খয়ার দিল কন্যা গন্ধের লাগিয়া ।

রন্ধনশালা ঘরে রইল রান্ধিয়া বাড়িয়া' ।।

(শব্দার্থঃ আকিরত - আকৃতি, চপড়ি – চিতে পিঠে, ছিটা ছড়া – জলের ছিটা, ঘরে মজা সবরি কলা – ঘরে পাকান চাটিম কলা)

এখানেও সেই এক-ই ব্যাপার। গৃহস্থ বাড়িতে পাওয়া বেশিরভাগ জিনিস, যদিও এটা রাজার রান্নাঘরের রান্না। ভাবা যায়!! সাধারণ গৃহস্থের রান্নাঘরের সঙ্গে রাজার রান্নাঘরের কোন তফাত নেই। নিজের বাড়ির জিনিসে অতিথি আপ্যায়নের আনন্দ, আমরা আজ ভুলতে বসেছি। কোথায় বা সেই বাগ-বাগিচা-বাগান আর কোথায় পুকুর।

মানিক তারা পালায় আরও সব নতুন খাবারের নাম পাওয়া যাচ্ছে – কই ভাজা, বেগুন পোড়া, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, তিলের বড়া, কলাই শাক দিয়ে কইমাছের মুড়িঘন্ট, খলশে-পুটির চচ্চরি, মুসুরির ডাল, বোয়াল মাছের মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল, টকটকে লাল – বিষম ঝাল বোয়াল মাছের পেটির ঝোল, রুই মাছ, রুই মাছের মুড়িঘন্ট, কাঁচা আমের অম্বল, দুধ, দই আর খই। বাসুকে তার ভাবি শ্বশুর খাওয়াচ্ছে।

(২)

'ডুগ ডাগর আঁখি ।

তারার সমান দেখি ।।

লাম্বা কেশ উড়ে ।

আড়ু বাইয়া পরে

বান্ধি বা না বান্ধি' ।।

- সন্নমালা

#

এবার আসা যাক মেয়েদের সৌন্দর্য বর্ণনায়। সুন্দরী মেয়ের কথা বলতে গেলেই বারবার এসেছে একঢাল কালো চুলের কথা; মাটি পর্যন্ত লুটনো। আর মুখের কথা বলতে গিয়ে এসেছে ফুলের কথা। মহুয়ার সৌন্দর্যের কথায় দেখি,

'হাট্টীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল ।

মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল' ।।

আহা, এতো সেই কেশবতী কন্যার কথা। আবার, মলুয়াকে বলছে,

'এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মুল ।

শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল' ।।

মলুয়ার রূপে মোহিত কাজী বলছে,

'ভুঁয়েতে বাইয়া তার পড়ে লম্বা চুল

সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল' ।।

কমলার রূপবর্ণনায় আবার সেই ফুল-ফলের উপমা .....

'চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল ।

সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট তেলাকুচ ফল ।।

জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি'।।

রূপবতী পালায় বিভিন্ন গণক রূপবতীর রূপের তুলনা টানতে গিয়ে কেউ 'পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ' বলে তো অন্যজন বলে 'পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি ।'

কঙ্ক ও লীলা পালায় বলছে,

'সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল ।

হাটিয়া জাইতে লীলার মাটীত পরে চুল' ।।

কাঞ্চনমালার রূপের কথায় –

'মাথায় দীঘল কেশ পাও বাইয়া পরে ।

কেশের ভারেতে কন্যা হাঁটিতে না পারে ।।

#

আকাশের তারা যেন দুই চক্ষু দেখি ।

ঘনই সিন্দুরা যেন রাখে দুই ঠোঁটে মাখি'।।

তাকে দেখে কাঠুরে-কাঠুরে বৌ বলে ওঠে- 'চন্দ্রের ছোরত কন্যা যেন দানা পরী' । (ছরত- সুরত)

মইষাল বন্ধু পালায় বলছে-

'কাউয়া কালা কোকিল কালা কালা দইরার পানি

তাও হইতে অধিক কন্যার কেশের বাখানি' ।।

মানিক তারা বা ডাকাতের পালা-

'সামাইল গামছা বুকে রইচে ছাইড়া দিচে চুল।

সেহি চুলে পায়ের পাতা পাইছে যে নাগুল' ।।

ভেলুয়ার রূপ (দ্বিতীয় পালায়)-

'আঁখির তারা যে কন্যার অতি মনোহর

পর্দ্দফুলের মাঝে যেন রসিক ভোমর ।।

.....

হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার।

চাচর চিকণ কেশ পায়ে পড়ে তার।।

হস্ত সোন্দর পদ সোন্দর যেমন কুন্দের শলা।

গায়ের রঙ যেন তার চিনি-চাম্বা কলা।।

চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল ।

রাঙা ঠোট যেন তার তেলাকুচি ফল'।।

(শব্দার্থঃ কুন্দের শলা – কুঁদনের শলাকা, চিনি-চাম্বা কলা – চিনিচাঁপা কলা, চান্নির- চাঁদের)।

#

বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে নির্ঘাত বলতেন - হায় আধুনিকা, তুমি তো পাকা তেলাকুচা ফল দেখো নাই। তোমার ওষ্ঠরঞ্জনী ম্লান হইত ইহার গরিমার নিকট।

(৩)

'পিরীতি অজপা মন্তর পিরীত কর সার

পিরীতি নৌকায় হবে ভবনদী পার

মানুষ পিরিত কইরা দেবতারে বান্ধি...'

- পীর বাতাসী

পিরিতি পরমনিধি। কাব্য বা পালা .... যাই বলা হোক, এখানেও এসেছে প্রেম-বিচ্ছেদ, লোভ-লালসা। কবিরা নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মানবমনের দুটি দিক-ই ... সু এবং কু। নায়ক-নায়িকার প্রায়শই মন দেওয়া –নেওয়া হয়েছে একপলকেই, একেবারে Love at First Sight যাকে বলে। দুচারটে ঘটনা দেখি –

'কাঁদের কলসী ভুমিত থইয়া মলুয়া সুন্দরী ।

লামিল জলের ঘাটে অতি তরাতারি ।।

একবার লামে কন্যা আরবার চায় ।

সুন্দর পুরুষ এক অঘুরে ঘুমায় ।।

.....

এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন ।

কার ঘরের উজল বাতি চুরি করিল মন'।।

- মলুয়া পালা

কমলা পালাতে কমলাকে দেখে প্রদীপকুমারের প্রথম অনুভুতি,

'সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ

লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ' ।

এই পালাতেই একদম শেষে কমলা নিজের মনে বলে -

'যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তমায় মৈষালের বাড়ী।

#

সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হৈয়া ফিরি ।।

আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূর্যতারা।

তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হারা'।

দেওয়ান ভাবনা পালায় সোনাই বলে -

'কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীঘর ।

মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর' ।।

যার জন্যে সোনাই এর এই প্রশ্ন, মাধব পদ্মপাতায় সোনাইকে লেখে –

'তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা ।

তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা' ।।

প্রেমে পড়েও সন্দিহান প্রেমিকা কাঞ্চন (ধোপার পাট গীতিকা) বলছে,

'তোমার না বাপ মাও রাজ্যের না রাজা।

বাপের ধোপা আমার বাপ তোমার বাপের পরজা ।।

চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়াও হাত ।

লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরছাৎ ।।

সোণার ভোমরা তুমি খাইবা ফুলের মধু ।

আলাগিয়া পিরীতে না পাইবে সুখ' ।।

(শব্দার্থঃ পরছাৎ – পশ্চাৎ, আলাগিয়া- আলগা)

আবার নিজের মনেই এই কাঞ্চন বলে,

'শুইলে স্বপনে দেখি তোমার চান্দমুখ ।

নিশাকালে অভাগীর এইমাত্র সুখ' ।।

ভেলুয়া পালায় নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা আর তারপরে দুজনের মানসিক অবস্থা-

'আইজ কিরে পরভাতের ভানু ডিঙ্গা বাইয়া যায়।

#

সাধুর পানেতে কন্যা আড় নয়নে চায় ।।

জলেতে ভাসিয়া যায় পুন্নু মাসীর চান ।

কন্যারে দেখিয়া সাধু হারাইল জ্ঞান ।।

এই দেখা পরথম দেখা জলের ঘাটে অইল ।

উভেতে উভেরে দেখ্যা পাগল অইয়া গেল ।।

চান্দ সুরুষে যেমন হইল মিলন।

মনের যতেক কথা কহিল নয়ন' ।।

(শব্দার্থঃ সাধু- সওদাগর, পুন্নুমাসী- পৌর্ণমাসী)

মানিক তারা বা ডাকাতের পালায় তো আর স্পষ্টভাবে দুজনের কথোপকথন-

'কে রমণী রসমতী, জলে নাই মাছ

মুখখানি পুন্নিমার চন্দ্র, রৈদে ঘাইমাছ।

বাইলা খালির টলটলা জল, আঁচল ধৈরা টানে

অঙ্গের বর্ণক দেইখা, লৌ ছোটে জানে ।

.....

ভুত পিচাশ না বৈশ্যাল নারে, নয়রে পরী জিন

চান্ বদন দেইখা আমি, পাইয়াছি যে চিন।

দেইখাছি গোঞ্জের ঘাটে, আইজ দেখলাম খালে

আমার দ্যাপতা আইচে ঘরে, আমার কপালে'।

(শব্দার্থঃ বর্ণক- বর্ণকে, লৌ ছোটে জানে- রক্তপ্রবাহ দ্রুত আর গরম হয়, বৈশ্যাল – বেশ্যা, দ্যাপতা – দেবতা)

মাঞ্জুর মা গীতিকবিতায় নায়ক-নায়িকার মনের গোপন ইচ্ছে এভাবে বলা হচ্ছে –

'মাঞ্জুর মার মনের আলকাপ রে

আরে ভালা হাছেনে করত বিয়া।

#

হাছেনের মনের আলকাপ রে

হায়দুন ভালা মাঞ্জুর মার লাগিয়া' ।।

(শব্দার্থঃ আলকাপ- ইচ্ছে, অভিলাষ)

বীরনারায়ণের পালায় ভালোবাসার মেয়েটিকে উদ্ধার করার ঘটনা বেশ রোমাঞ্চকর –

'..... চুপাচুপ গিয়া কুমার হাতিয়ার পাতি যতে।
এক এক কর্‌্যা ফালাইল গাঙ্গের মধ্যেতে ।।
বাছিয়া লইল কুমার ভালা রামদাওখানি ।
চরের মতন আইল কুমার ডিঙ্গার পিছনি ।।
পাছাত আইয়া কুমার কাটে কাড়ালীরে ।
কাড়ালীর সাজ ধইরা কুমার ডিঙ্গার কাড়াল ধরে ।।
.....
এন কালে বীরনারায়ণ কোন কাম করে।
দাখিল হইল গিয়া কন্যার গোচরে ।
দেখিয়া যে কন্যা সোণা কুমারে চিনিল ।।
কুমারের দুই পায় বেরিয়া ধরিল ।
গায়েত লাগিয়া কন্যা জুড়িল কান্দন ।।
কুমার বলে উদ্ধার করবাম না কর চিন্তন।
.....
রামদাও ভাঞ্জাইয়া কুমার খারাইল ডেঙ্গিতে।
বৈঠা ধইরা কন্যা বায় মাইঝ গাঙ্গেতে' ।।

(শব্দার্থঃ কাড়ালী- কান্ডারী, যে হাল ধরে থাকে, সোণা- মেয়ের নাম, ভাঞ্জাইয়া- প্রস্তুত হয়ে)।

শুধু যে চার চোখের মিলন, মন দেওয়া নেওয়া বা মিলনের পথে বাধা বিঘ্ন তা নয়, গভীর দর্শনের কথাও এই পালা কাব্যের কবিয়ালরা বলে গেছেন। মাঞ্জুর মা পালা কাব্যে –

'পীরিত যতন পীরিত রতন রে

আরে ভালা পীরিত গলার হার ।

পীরিত কর্‌্যা যে জন মরে রে

আরে ভালা সফল জীবন তার'।

#

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এভাবে, শুধু পালা গান বা গ্রাম্য জীবনের কথা নয়, হয়ে উঠেছে সেই সময়ের গ্রাম বাংলার এক জীবন্ত কথাচিত্র। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন ভাষায় এর তুলনা পাওয়া একান্তভাবেই শক্ত। বাঙ্গালী হিসেবে আমরা গর্বিত এমন এক অতুলনীয় কাব্যসমাহারের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

‘এইখানে পালা মোর করিলাম ইতি।

নিজগুনে ক্ষেমা মোরে কর সভাপতি’।।

তথ্যসূত্রঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকা – (১-ম, ২-য়, ৩-য় ও ৪-র্থ খণ্ড) - দীনেশচন্দ্র সেন, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারী-২০০৯

লেখক পরিচিতি

সৌমেন নাথের জন্ম কোলকাতায়। পড়াশোনা রামকৃষ্ণ মিশন আর স্কটিশচার্চ কলেজে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তরে কর্মরত। লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে উৎসাহী। অজানা অচেনা জায়গায় ঘুরতে ভালবাসেন।



রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতেই বেদাত্রয়ী হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে সূর্যোদয় দেখা ওর প্রিয়তম কাজ। রাতের ময়লা আকাশ যখন একটু একটু করে দিনের রঙে লাল কমলা হয়ে ওঠে তখন ওর মনটাও রঙিন হয়ে যায়, দিনটা ভালো কাটে। আজকের দিনটাও ভালো কাটবে ভেবেই বেরিয়েছিল কিন্তু অন্ধকার একটু পাতলা হতেই বেদাত্রয়ী দেখতে পেল একটা লাল টুকটুকে কাপড় সমুদ্রের তীর থেকে খানিকটা দূরে পড়ে আছে, আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুঝলো কাপড় না, লাল সালোয়ার পরা একটা মেয়ে। ভোরের নরম আলোয় দেখে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে, এখনি জাগবে।

মৈনাকের দিনের শুরু হয় গান দিয়ে, প্রতিদিন সময় পায় না তবু চেষ্টা করে যাতে রোজ অন্তত আধ ঘন্টা রেওয়াজ করতে পারে। আজও সবেমাত্র ভৈরবীর আলাপ শুরু করেছে এমন সময়ে তীব্র শব্দে বেজে উঠলো মোবাইল। মেজাজ বিগড়ে গেল মৈনাকের।

"হ্যালো...ইন্সপেক্টর মৈনাক দত্ত বলছি.... বডি?... আইডেন্টিফাই করা গেছে?... আসছি।"

মৈনাকের গাড়ি যখন উদয়পুর সমুদ্রসৈকতে পৌছল তখন দিন সবে শুরু হয়েছে। উদয়পুর শান্ত নির্জন জায়গা, এখানে সমুদ্রের ধারে মৃতদেহ পাওয়া বেশ বিরল ঘটনা। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভিড় জমেছে; পুলিশের গাড়ি আসতে লোকজন একটু সরে দাঁড়ালো। একনজর বডির দিকে তাকিয়েই মৈনাক হুকুম দিল, "বডি পোস্টমর্টমে পাঠাও। কে প্রথম

#

দেখতে পেয়েছে বডি?" ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ছিপছিপে কালো মেয়ে বেরিয়ে এলো, সকালের রোদ পড়ে তার নাকে হীরের নাকছাবি ঝিলিক দিচ্ছে। দেখেই মৈনাক বুঝতে পারলো তার সকালের বিগড়ে যাওয়া মেজাজ পাল্টে যাচ্ছে।

"আমি...আমার নাম বেদাত্রয়ী মিত্র"

"আপনাকে একটু আমার সঙ্গে থানায় আসতে হবে"

"চলুন"

তার ভাঙা লরঝরে জীপটায় বেদাত্রয়ীকে তুলতে বেশ একটু লজ্জা হচ্ছিল মৈনাকের। এর আগে গুটিকয়েক ছিঁচকে চোর ছাড়া আর কাউকে এই গাড়িতে তোলবার প্রয়োজন হয়নি।

"আসুন, বসুন... এই এখানে দু কাপ চা দিয়ে যা..", থানায় এসে বেদাত্রয়ীকে বসিয়ে মৈনাক নিজেও বসলো।

"আপনি এখানে থাকেন, না বেড়াতে?"

"বেড়াতে... সকালে সানরাইজ দেখব বলে বেরিয়েছিলাম, তখনি দেখি বডিটা পড়ে আছে।"

"পুলিশে কি আপনিই খবর দেন?"

"না খানিকটা দূরে একটা চায়ের দোকান খোলা দেখে আমি সেখানে জানাই... আচ্ছা বডি কি আইডেনটিফাই করা গিয়েছে?"

"হুম... খুব সম্ভবত এখানকার একটি হোটেল মালিকের স্ত্রী, নাম মীরা ঘোষ। একটা বুটিক চালান, মানে চালাতেন আর কি। ওই হোটেল মালিককে ডেকে পাঠানো হয়েছে, দেখা যাক উনি আইডেন্টিফাই করেন কিনা। আপনাকে পরে আবার প্রয়োজন পড়তে পারে, আপনার হোটেলের নাম আর আপনার কন্টাক্ট ইনফরমেশনগুলো একটু এখানে লিখে দেবেন প্লিজ।" বলে ওর দিকে একটা নোটপ্যাড এগিয়ে দিল মৈনাক। খস খস করে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে বেদাত্রয়ী বলল, "মিস্টার সেন আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল।"

ভুরু কুঁচকে তাকালো মৈনাক, "কি বলুন তো?"

"আপনার এই কেসটার কি হল না হল আমি যদি একটু খবর নিতে চাই, পেতে পারি?"

"কেন বলুন তো? নিছক কৌতুহল?"

"খানিকটা কৌতুহল তো বটেই, তাছাড়া আমি কয়েকটা কাগজে ফ্রিলান্সিং করি। এখানে এসেছিলাম একটা ফিচার লিখব বলে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা মার্ডার কেস যখন পেয়েই গেলাম..."

"মার্ডার কেস? এখনো পোস্টমর্টম রিপোর্ট এলো না আর আপনি ধরে নিলেন মার্ডার?" যদিও মৈনাক নিজেও বুঝেছিল এটা নিছক সুইসাইড নয় তবু এই পুঁচকে মেয়েটার কনফিডেন্স দেখে অবাক হলো।

"অ্যাক্সিডেন্ট বা সুইসাইড হলে মোবাইল ব্যাগটা এখনো সযত্নে ওঁর জামার ভিতর রাখা থাকত না; আর কেউ কি ম্যাচিং গয়না, দামী সালোয়ার পরে আত্মহত্যা করতে যায়? হয়ত আমি ভুল বলছি কিন্তু আমার মন বলছে এটা সুইসাইড নয়।"

"দেখা যাক রিপোর্ট কি বলে! ঠিক আছে জানাবো আপনাকে।"

"স্যার মীরা ঘোষের স্বামী..." তীব্র পান মশলার গন্ধ নিয়ে ঘরে যে লোকটা ঢুকলো তাকে দেখে বেদাত্রয়ীর শরীর চিড়বিড় করে উঠলো। কোনো রকমে ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে ও উঠে চলে এলো।

।। ২ ।।

বেদাত্রয়ী দাঁড়িয়ে ছিল একেবারে সমুদ্রের কিনারে, পাহাড়ের মত উচু ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে ওকে, হঠাৎ দেখলো ওর পাশেই শুয়ে আছে মীরা আর ওর জামার ভিতর থেকে ওর ফোন অবিরাম বেজে চলেছে... ধড়ফড় করে উঠে বসলো বেদাত্রয়ী, ওরই ফোন বাজছে। "হ্যালো", ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

"ক্রাইম রিপোর্টার এত বেলা অবধি ঘুমোলেই হয়েছে আর কি।" ওপাশে মিস্টার সেনের গলা, "এদিকে আমার ধারণা ছিল রিপোর্টারদের আমাদেরই মত দিনরাত ডিউটি।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেদাত্রয়ী দেখল বেলা প্রায় দশটা বাজে, ইস্ সত্যি অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে; লজ্জিত হয়ে বলল, "না না আসলে কাল রাতে একেবারেই ঘুমোতে পারিনি... ভোরের দিকে তাই একটু চোখ লেগে গেছিল.."

"আমার কথা ভাবছিলেন বুঝি?" চিরকালই উচ্ছল স্বভাবের ছেলে মৈনাক, পুলিশ অফিসার হয়েও সেই স্বভাব ছাড়তে পারেনি। থানার কনস্টেবল থেকে শুরু করে চা দিয়ে যায় যে ছেলেটা সবাই ওর ইয়ার্কির ঠেলায় অস্থির হয়ে থাকে। অথচ রেগে গেলে সেই মানুষটাকেই যমের মত ভয় পায় সকলে। বেদাত্রয়ীর সঙ্গে ফাজলামি করার সুযোগ ছাড়ল না মৈনাক।

"মোটেই না, ভাবছিলাম রিপোর্ট কিভাবে লিখব। তা আপনি কি এটা জানতেই ফোন করলেন?"

"চলে আসুন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে গেছে... বাকিটা সাক্ষাতে বলব।"

"Cause of death drowning... রক্তে অ্যালকোহল এবং বারবিটুরেটস পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ মীরাকে স্লীপিং পিল বা ওই জাতীয় কিছু খাওয়ানো হয়েছিল।" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন মৈনাক, "তারপরে কোনোভাবে উনি সমুদ্রে যান বা ওঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই কোনোভাবে উনি জলে ডুবে মারা যান।" সামনের টেবিলে মীরার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল মৈনাক।

"এগুলো মীরার জিনিস? একবার দেখতে পারি?" একটা মোবাইল, একটা ঘড়ি আর কিছু গয়না... এছাড়া আর তেমন কিছুই নেই, গয়নাগুলো আর ঘড়িটা দেখল বেদাত্রয়ী। আজকালকার ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি, মালকিনের হৃদস্পন্দন

থেমে গেলেও ঘড়ি ঠিকই চলছে। মীরার গলার সোনার হারটা নিয়ে দেখতে দেখতে বেদাত্রয়ী জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা কটা নাগাদ মারা গেছেন উনি?"

"ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে বারোটা থেকে একটার মধ্যে।"

"ওঁর স্বামীকে কেমন বুঝলেন?"

"ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধার নন নেশাখোর মাতাল, তার ওপর বাজারে বেশ কিছু ধারদেনা আছে এদিকে হোটেলের অবস্থাও তথৈবচ!"

"আচ্ছা মীরার আর কোনও আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?"

"স্যার একটা কথা ছিল", বেদাত্রয়ী দেখল একজন মধ্যবয়স্ক কনস্টেবল কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার নিবারণবাবু?"

"ইয়ে মানে, স্যার কাল ওই শুটিং-এর ডিউটিটা আমায় দেবেন? আসলে আমার স্ত্রী স্যার কুমারের খুব ফ্যান... কি বলব স্যার আমার মেয়েটা পর্যন্ত... খুব বায়না ধরেছে একটা অটোগ্রাফ এনে দিতে হবে।"

"এই এক হয়েছে। এদিকে খুনের কেস আর আপনারা সব ওই শুটিং-এ গিয়েই বসে থাকুন আর থানাটা আমি একাই চালাই... ঠিক আছে যান। কিন্তু শুধু কাল..." ছদ্ম ধমক দিয়ে বলল মৈনাক।

"এখানে কুমারের সিনেমার শুটিং চলছে না? ওঁর যদি একটা ইন্টারভিউ নেয়া যেত... বললে দেখা করবেন কি বলুন?" বলে বেদাত্রয়ী, "এই অজুহাতে ওকে কাছ থেকে দেখাও হয়ে যেত..."। এমনিতে বেদাত্রয়ী খুব একটা কুমারকে পছন্দ করে না, কিন্তু একটা ইন্টারভিউ জোগাড় করতে পারলে ওর বঙ্গবার্তার এডিটর খুশিই হবেন।

"বেশ তো যান না নায়কের ইন্টারভিউ নিন গিয়ে...", মৈনাক আরও কিসব বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বেদাত্রয়ীর মুখে একটা ফাজিল হাসি দেখে থমকে গেল, "হাসছেন যে?"

"কিছু না," বলল বেদাত্রয়ী, "বললেন না তো মীরার আর কেউ আছেন কিনা?"

"না। মীরার মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন বেশ কিছুদিন আগে, যদিও যাবার আগে মেয়েকে প্রচুর সম্পত্তির মালিক করে দিয়ে গিয়েছেন। আর সেটাই হয়েছে অশান্তির কারণ।"

"আচ্ছা মীরার স্বামী... কি যেন নাম?"

"বিজন।"

"আচ্ছা ওঁর হোটেলটা কেমন চলে?"

"খুব ভালো না... চলুন..."

"কোথায়?"

"সকাল থেকে এক কাপ চা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি, শুনেছি বিজনবাবুর হোটেলে ভালো ব্রেড অমলেট পাওয়া যায়... খাওয়াও হবে আর হোটেলের লোকজনকে একটু বাজিয়েও দেখা যাবে।"

।। ৩ ।।

সন্ধেবেলা বাড়ির বারন্দায় বসে নিজের মনে কেসটা একটু সাজিয়ে নিছিল মৈনাক। সকালে বিজনের হোটেলে গিয়ে অনেকগুলো খবর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলোই মনের মধ্যে একটু গুছিয়ে নিচ্ছিল। হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেল সব সন্দেহের তীর যাচ্ছে বিজনের দিকে। বিজনের সঙ্গে মীরার সম্পর্ক ভালো ছিল না, রিসেপসনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে বিজনের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটাও অনেকেই জানে, তার ওপর কাল দুপুরে হোটেলেই দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়; সম্ভবত রিনা বলে ওই রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে নিয়েই, মীরা রেগে চলে যায় তার বুটিকে। আর বুটিক থেকেও বেরিয়ে যায় অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে, তারপর যে মীরা কোথায় যায় সে ব্যাপারে এখনো মৈনাক অন্ধকারে। এদিকে মীরার বুটিকের লোকজন বলছে মীরা নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু একটা নিয়ে ডিস্টার্ব ছিল। যেদিন মারা গেছে শুধু সেদিনই না তার আগেও কয়েকদিন মীরা বুটিক বন্ধ হবার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে; অথচ ওর ধ্যানজ্ঞান ছিল ওই বুটিক। কেন কে জানে মৈনাকের মন বলছিল কেসটা আরও জটিল হতে চলেছে। এইসব ভাবনাচিন্তার মাঝে ওর ফোনটা বেজে উঠলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে- বেদাত্রয়ী, সকালে মেয়েটা কুমারের ইন্টারভিউ নিতে যাবে বলায় হঠাৎ কেমন একটা রাগ হয়েছিল; কেন সেটা নিজেও বুঝতে পারেনি তবে খুব জোর সামলে নিয়েছে।

"আপনার বাড়িতে টিভি আছে?" সে হ্যালো বলার আগেই উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন ধেয়ে এলো ফোনের উল্টোদিক থেকে।

"কেন বলুন তো?" অবাক গলায় প্রশ্ন করলো মৈনাক।

"উফ্! আছে কিনা বলুন না।"

"হ্যাঁ আছে... কি দেখবেন? কুমারের সিনেমা? আপনার হোটেলে টিভি নেই বুঝি?" ফাজিল গলায় বলল মৈনাক।

"হ্যাঁ কুমারকে দেখব তবে সিনেমা নয়, ইন্টারভিউ। আমিও দেখব আর আপনিও দেখবেন। যান, গিয়ে টিভিটা খুলুন..."

"আরে আমি কুমারকে দেখে কি করব... আপনার স্বপ্নের নায়ক আপনিই দেখুন গিয়ে..." বলতে বলতেই টিভির রিমোট তুলে টিভি চালালো মৈনাক। চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে পেয়েও গেল কুমারের ইন্টারভিউ।

"দেখছেন?" ওদিক থেকে চাপা উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞাশা করল বেদাত্রয়ী।

"হুম... যেখানেই দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই... কাল যাবেন নাকি ছাই উড়িয়ে হিরোর খোঁজে?"

"নিয়ে যাবেন আমায়?"

"চলুন... আপনার হিরোর সাক্ষাৎকার নেবার সখ পূর্ণ হয়ে যাবে।" একজন সাংবাদিককে নিয়ে খুনের তদন্ত করতে যাবে এটা মৈনাক স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজের ব্যাপারে সে খুবই সিরিয়াস কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে থেকে ওর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী বলা যায় কি ওকে? বোধহয় না, কিন্তু ওই কালো ছিপছিপে চেহারার মধ্যে কোথাও একটা আভিজাত্য লুকিয়ে আছে, কথাবার্তায় অদ্ভুত সাবলীল বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি। মৈনাক কিছুতেই হালকাভাবে নিতে পারছিল না মেয়েটাকে। "সকালে বিজন আর রীনাকে জেরা করতে হবে... বিকেলে আমি আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নেব। এই ধরুন পাঁচটা নাগাদ?"

সকালটা যেন কাটতেই চাইছিল না বেদাত্রয়ীর, একবার ভাবলো থানায় চলে যাবে; কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভেবে আর গেল না। সময় কাটানোর জন্য বেরিয়ে পড়ল একটু কেনাকাটা করতে। বেদাত্রয়ীর বাড়ির লোক বলতে দাদু আর কাকা। মা মারা গেছেন খুব ছোটবেলায় আর তারপরেই ওর বাবাও নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মা বাবা কাউকেই ওর মনে নেই। দাদু আর কাকাই ওর সব। ওদের জন্য উদয়পুর থেকে কি নিয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে চলে এলো বাজারে। উদয়পুর ছোট যায়গা, আলোচনা করার মত ঘটনা এখানে খুবই কম, অথচ এখন একই সঙ্গে দু'দুটো ঘটনা; একদিকে খুন অন্যদিকে কুমারের শুটিং। বাজার এই দুইয়ের আলোচনাতেই গরম। একটা ওষুধের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুনল মীরাকে নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে, ওষুধ কেনার ছল করে দোকানটায় ঢুকে পড়ল বেদাত্রয়ী।

"আরে দাদা আমার দোকান থেকে ওষুধ নিতে আসতো আর আমি জানবো না? নার্ভের অসুখ ছিল মহিলার, কড়া ঘুমের ওষুধ নিয়ে যেতেন মাঝে মাঝেই।"

"আপনি চিনতেন বুঝি?" মামুলি কিছু ওষুধ কেনার ফাঁকে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো বেদাত্রয়ী।

"হ্যাঁ দিদি, এই তো দুটো দোকান পরেই ওঁর বুটিক ছিল। যেমন সুন্দরী দেখতে, তেমনি ব্যবহার। শুনেছি তো উনি নাকি আগে কলকাতায় অভিনয়ও করতেন।"

"অভিনয় করতেন? মানে সিনেমা করতেন?"

"না না। আমার বউ বলছিল, কিসব সিরিয়ালে নাকি কিছুদিন অভিনয় করেছিল।"

দোকান থেকে বেরিয়ে দাদুর জন্য একটা বাহারে লাঠি কিনলো আর কাকার জন্য একটা পেপারওয়েট। তারপর কি ভেবে ওর প্রিয় শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীতের একটা সিডি কিনে ফেলল। পুলিশ ইন্সপেক্টরের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত! কিনে ফেলে একটু আফসোস হচ্ছিল বেদাত্রয়ীর, কি জানি হয়ত উপহারটা একটু বেমানান হল। তবে মৈনাককে দেখে ঠিক জাঁদরেল বেরসিক পুলিশ বলে মনে হয় না।

#

।। ৪ ।।

“বিজনবাবু, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীয়ের সম্পর্ক কিরকম ছিল?”

“ভালো না।”

“কেন ?”

“ওর প্রচুর টাকার গরম ছিল তার ওপর সন্দেহ বাতিক, আমার শ্বশুর মেয়ের নার্ভের রোগ লুকিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়।”

“সেই নিয়েই কি মারা যাবার দিন সকালে আপনাদের মধ্যে ঝামেলা হয়?”

“না! আমি কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম। দেয়নি, তাই...”

“আপনি আপনার স্ত্রীয়ের থেকে টাকা কেন চেয়েছিলেন বিজনবাবু? আপনার তো নিজের হোটেল আছে।”

“চলে না, আগে যাও বা চলত ইদানিং আশেপাশে আরও দুটো বড় হোটেল খোলায় আর চলে না; আর তাছাড়া আমার টাকাটা তাড়াতাড়ি দরকার ছিল।”

“আচ্ছা সেদিন আপনার মিসেস আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে বুটিক চলে যান। তারপর উনি কখন বাড়ি ফেরেন?”

“জানি না, আমি সেদিন বাড়ি ফিরিনি; হোটেলেই ছিলাম।”

“বাহ! আপনার স্ত্রী কোথায় গেল বাড়ি ফিরলো কি ফিরল না, এই ব্যাপারে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই?”

“বললাম তো আমি জানি না, সকালের ঝামেলার পর আমার মেজাজ বিগড়ে ছিল তাই আমি বাড়ি ফিরিনি।”

“আপনি কি মাঝেমাঝেই এরকম বাড়ি ফেরেন না বিজনবাবু?”

“হোটেলে কাজের চাপ থাকলে রাতে থাকতে হয় মাঝেমাঝে...”

“তাই নাকি? হোটেলে কাজের চাপ নাকি... আপনি কাল রাত বারোটার সময় কোথায় ছিলেন?”

“হোটেলে।”

“মিথ্যে কথা।” হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে মৈনাক, “আপনার হোটেলের কর্মচারীরা আপনাকে রাত এগারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে... কোথায় গেছিলেন আপনি সেই সময়?”

#

"বিশ্বাস করুন স্যার আমি কিছু জানি না। আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে বাড়িই যাচ্ছিলাম, তারপর মনে হলো বাড়ি গেলেই শালা আবার অশান্তি। এই ভেবে রিনার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। রিনা সাক্ষী স্যার, আমি সারা রাত ওখানেই ছিলাম।"

"আচ্ছা বিজনবাবু আপনার স্ত্রীয়ের মৃতুর পর ওঁর বাবার সব সম্পত্তিই তো আপনি পাবেন তাই না?"

"বিশ্বাস করুন স্যার আমি খুন করিনি। মীরার সঙ্গে প্রতিদিনের ঝামেলায় বিরক্ত হয়েই আমি রিনার সঙ্গে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি, কিন্তু মা কালির দিব্বি আমি খুন করিনি স্যার।"

"আর আমি যদি বলি টাকার লোভেই আপনি আর রিনা মিলে আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন? বাজারে আপনার প্রায় হাজার দশেক টাকা ধার। সেই টাকা শোধ করতেই আপনার টাকার দরকার পড়েছিল?"

বিকেলে যখন মৈনাক বেদাত্রয়ীকে তুলতে গেল তখন ওকে দেখে মৈনাকের মনে হলো সমুদ্রটা বুঝি ওর বুকের ভিতরেই ঢুকে পড়েছে, এই কদিনে যতবার ওকে দেখেছে প্রতিবারই দেখেছে জিন্স আর টপ বা কুর্তি পরে। আজ পরেছে হালকা সবুজ শাড়ি। মৈনাক বুঝতে পারল আজকের এই সাজ নায়কের জন্য; আর বুঝতেই মেজাজ বেসুরো বেজে উঠলো।

"বাব্বা এত দেরী করলেন! আমি সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি..."

"পুলিশের কাজ ম্যাডাম।"

"একেবারে ম্যাডাম!" উত্তেজনার চোটে মৈনাকের গম্ভীর মুখটা লক্ষ্যই করলো না বেদাত্রয়ী, "জানেন আমি কি খবর যোগাড় করেছি?"

"কি?"

"মীরা বিয়ের আগে অভিনয় করত। একটা দুটো সিরিয়ালে কাজ করেছে; তারপর নার্ভের অসুখের জন্য ছেড়ে দেয় বা আর কাজ পায়না তেমন।"

"মীরা অভিনয় করত?" অবাক হয়ে গেল মৈনাক সে পালিশ অফিসার হয়ে যে খবরটা এখনো পায়নি সেটা এই মেয়েটা জোগাড় করে ফেলেছে? টের পেল একটু আগের সমুদ্রটা আবার ফিরে এসেছে বুকের ভিতর।

"হ্যাঁ, আমি তো ইন্টারনেট ঘেঁটে ওর কতগুলো পুরনো ছবিও পেলাম, দাঁড়ান আপনাকে ওয়াটস্ অ্যাপ করছি। আচ্ছা বিজন, রিনা এদের জেরা করে কিছু হল?"

"দুজনেরই স্ট্রং আলিবাই, দুজনেই রিনার ফ্ল্যাটে ছিল সারারাত, আর ওদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে যায়ে সাড়ে এগারটায়; খোলে পরের দিন ভোর ছটায়। গেটের চাবি থাকে কেয়ারটেকারের কাছে, সে কনফার্ম করেছে ওই রাতে বিজন রিনার ফ্ল্যাটে গেছিল নটা নাগাদ, আর বেরোয়নি।"

কথা বলতে বলতে গাড়ি ঢুকে পড়ল শুটিং এরিয়ায়। বিচের একদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে শুটিং চলছে ওরা ঢুকতে যেতেই নিবারণবাবু লম্বা স্যালুট ঠুকলো।

"আসুন অফিসার আসুন ম্যাডাম, আমি সুবীর... স্যারের একটা শুট চলছে, এখনি এসে পড়বেন। আপনাদের একটু ওঁর মেকআপ ভ্যানে একটু ওয়েট করতে বললেন।"

"আপনি কি ওঁর ম্যানেজার?" জিজ্ঞেশ করলো মৈনাক।

"ওই আরকি।"

"কতদিন কাজ করছেন ওঁর সঙ্গে?"

"তা প্রায়ে পাঁচ বছর হল। বলতে পারেন আমিই ওর ম্যানেজার কাম সেক্রেটারি কাম ড্রাইভার, সেই প্রথম থেকেই আছি।"

"তাহলে তো ওঁর সঙ্গে কে কখন দেখা করে না করে সবই আপনি জানেন?"

"নিশ্চই, স্যারের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমিই দেখি।"

"আচ্ছা এই কদিনে কি কেউ, কোন মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?"

"ও বাবা সে তো রোজ দিনই কাঁড়ি কাঁড়ি মেয়ে দেখা করতে আসছে, সবারই বায়না একবার দেখা করিয়ে দিন... তাই কি হয় বলুন?"

"দেখুন তো এই মহিলা কি কোনদিন এসেছিলেন?" পকেট থেকে মীরার ছবি বের করে দেখালো মৈনাক।

"হ্যাঁ ইনি এসেছিলেন তো, আগের সোমবার... না মঙ্গলবার এসেছিলেন, বললেন নাকি স্যারকে চেনেন, কি যেন একটা নামও বলেছিলেন... মীরা... মীরা বসু। আমি তো স্যারকে জানাতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই উনি কেমন যেন তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন।"

কথাবার্তার মাঝেই চলে এলেন কুমার আর তার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা লেগে গেলেন ওর মেকআপ ঠিক করতে।

"নমস্কার, সরি অফিসার আপনাকে একটু অপেক্ষা করালাম, বলুন।"

"নমস্কার। আমি ইন্সপেক্টর মৈনাক দত্ত আর ইনি বেদাত্রয়ী মিত্র, আপনার খুব ফ্যান। আর আমি এসেছি একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে।" বেদাত্রয়ীকে ফ্যান বলে খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারল না মৈনাক।

"কেসের ব্যাপারে? কি কেস বলুন তো? আমি তো ঠিক..."

#

"আচ্ছা আপনি তো সবসময় একটা লকেট পরে থাকেন। একটা ত্রিশুল আর সেটাকে জড়িয়ে একটা সাপ।" ফট করে জিজ্ঞেশ করে ফেলল বেদাত্রয়ী, "আমি আপনার খুব বড় ফ্যান তো তাই লক্ষ্য করেছি আর কি..." আড়চোখে মৈনাকের দিকে তাকিয়ে খোঁচাটা চোখ দিয়ে ফিরত দিল ও।

"হ্যাঁ পরে থাকি। ছোটবেলায় মা পরিয়ে দিয়েছিলেন সেই থেকেই আছে।"

"তাহলে এখন পরেননি কেন?"

"আসলে শুটিং করতে হলে অনেকসময় ওটা খুলে রাখতে হয়, কদিন আগেও আমি শুটিং-এ যাবার আগে ওটা খুলেছিলাম তারপর থেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না... এখানেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই..." "তুমি ওটা আর খুঁজেছিলে নেত্রা?" মেকআপ করছিল যে মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কুমার।

"খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাইনি।"

মেয়েটার মুখের দিকে এতক্ষণ খেয়াল করেনি মৈনাক এখন তাকাতেই সে চমকে উঠলো, মেয়েটার মুখের একদিকে একটা বিভৎস কাটা দাগ মেয়েটি সুশ্রী চেহারাটাকে এক আঁচড়ে ভয়ানক করে তুলেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করলো, "দেখুন তো এটাই সেই হার কিনা।"

হারটা উল্টে পাল্টে দেখে কুমার বললেন, "হ্যাঁ এটাই তো আমার হার! এই তো লকেটের পিছনে ওম্ লেখা আছে, এটাকে আপনারা কোথায় পেলেন?"

"আমি কি আপনার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে পারি কুমারবাবু?" গম্ভীরস্বরে বলল মৈনাক।

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই... নেত্রা তুমি একটু বাইরে যাও তো; আর দেখো যেন এখন আর কেউ ভিতরে না আসে। বলুন ইন্সপেক্টর কি ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কুমারবাবু আপনার মীরা বসু নাম কাউকে চেনেন?"

"মীরা বসু? না ওই নামে তো আমি কাউকে..."

"এই ছবিটা দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা? ওঁর বিয়ের আগের নাম ছিল মীরা ঘোষ।" পকেট থেকে মীরার একটা ছবি বের করে দেখায় মৈনাক।

"এটা তো মীরা! আমরা একই সঙ্গে আমাদের কেরিয়ার শুরু করেছিলাম, কিন্তু এর সঙ্গে আমার হারের কি সম্পর্ক?"

"কুমারবাবু আপনার হারটা কয়েকদিন আগে এরই বডির সঙ্গে পাওয়া গেছে। উদয়পুর বিচে আমরা যখন ওঁর বডি পাই তখন ওঁর গলায় এই হারটা ছিল।"

"ওহ্ মাই গড! কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মীরার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই বহু দিন। শুনেছিলাম কি একটা অসুখের জন্য ও অভিনয় ছেড়ে দেয়, তারপর আর আমি কিছুই জানি না।"

"আপনাদের কি অভিনয় সূত্রেই আলাপ?"

"বলতে পারেন। আমরা একই সঙ্গে একটা মডেলিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছিলাম, জিতেও ছিলাম দুজনে একসঙ্গে। তারপর আমি ফিল্মে চান্স পেয়ে যাই আর ও সিরিয়ালে; ব্যাস তারপর থেকেই আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই।"

"আপনি গত মঙ্গলবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা অবধি কোথায় ছিলেন?"

"অ্যালিবাই চাইছেন?" হেসে উঠলেন কুমার, "গত মঙ্গলবার আমার সারারাত শুটিং চলেছে... যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে নিন।"

"মীরা বসু মারা যাবার ঠিক আগেরদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তারপর কোনো কারণে দেখা না করেই চলে যান; কেন কুমারবাবু?"

"তার আমি কি জানি? আমি বললাম তো মীরার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ও কেন এসেছিল, কেন দেখা না করে চলে গেছে, আর কি করেই বা আমার লকেট ওর কাছে গেছে; আমি কিছুই জানি না। আমার শুটিং-এর দেরী হয়ে যাচ্ছে আপনারা আসুন।"

।। ৫ ।।

"স্যার আপনি রিনা মল্লিকের খোঁজ নিতে বলেছিলেন। নিয়েছি স্যার।"

"কি পেলেন?"

"রিনা মল্লিকও খুব একটা সুবিধার মেয়ে নয় স্যার। সবাই জানে ও আইবুড়ো; কিন্তু স্যার ও আসলে বিধবা। বিয়ের একমাসের মধ্যেই ওর বর মরে যায়। অফিসে কী একটা গোলমাল করে সুইসাইড করেছিল।"

"ওর এখানকার ফ্ল্যাটের খবর নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার। ফ্ল্যাটের দরজায় এগারোটার পর চাবি পড়ে যায় এটা সত্যি, কিন্তু ফ্ল্যাটের পিছনদিকে একটা ভাঙা গেট আছে সেটা দিয়ে অনেক সময়েই লোকে যাতায়াত করে।"

"হুম! আর কিছু?"

"আর স্যার ওই যে মোবাইলটা কলকাতা পাঠিয়েছিলেন সেটা সরানো যায়নি, তবে স্যার আপনার কথা মত কললিস্টটা আনিয়ে নিয়েছি।"

"কই? দিন দেখি।" মৈনাক একমনে কললিস্ট দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে ওর চোখ আটকে গেল একটা নম্বরের ওপর, ওই একটি নম্বরে মীরা মঝেমাঝেই ফোন করেছে, নম্বরটা ডায়াল করল মৈনাক।

"হ্যালো, কে বলছেন?"

গলাটা খুব চেনা লাগল মৈনাকের, "আমি ইন্সপেক্টর মৈনাক দত্ত বলছি, আপনি সুবীরবাবু না?"

"হ্যাঁ স্যার আমি, কুমারস্যার তো এখন শুটিং-এ আছেন। ডেকে দেব?"

"এটা কুমারের ফোন?"

"হ্যাঁ স্যার। এটা ওঁর পার্সোনাল নম্বর।"

মীরা হত্যা রহস্য ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল মৈনাক, তারপর কখন হাঁটতে হাঁটতে সে বেদাত্রয়ীর হোটেল রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই টের পায়নি।

"আরে আপনি?"

"বিরক্ত করলাম?", একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল মৈনাক, "সরি আমার ফোন করে আসা উচিত ছিল। আসলে..."

"আরে না না ঠিক আছে, আসুন। আমি ওই কেসটারই নোটস তৈরী করছিলাম।" বলে টেবিলে রাখা নোটপ্যাড দেখাল বেদাত্রয়ী। মৈনাক দেখলো যে প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে সে হাঁটা শুরু করেছিল সেগুলোই পরপর প্যাডে লেখা।

১. মঙ্গলবার বুটিক থেকে বেরিয়ে মীরা কোথায় গেছিল?

২. মীরার শরীরে অ্যালকোহল কি করে এলো?

৩. কুমারের সঙ্গে মীরা কেন দেখা করতে গিয়েও দেখা করলো না?

৪. কুমারের লকেট মীরার গলায় এলো কি করে?

"আপনার ডিনার হয়েছে?" বেদাত্রয়ী জিজ্ঞেস করলো।

"না, আপনার?"

"না, এই করব ভাবছিলাম।"

"চলুন তাহলে আপনাকে আমার ফেভারিট রেস্তঁরায় নিয়ে যাই। খেতে খেতে কেস নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

"চলুন, আপনি খাওয়াচ্ছেন কিন্তু।"

"আপনি এখানে একা থাকেন?" খাওয়া সেরে ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল উদয়পুর বিচে।

"হ্যাঁ, মা কলকাতায় থাকেন। স্কুল আর ছাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত। স্কুল ছুটি পড়লে আমার কাছে চলে আসেন।"

"আপনার মা স্কুলে পড়ান?"

"না গান শেখান, মায়ের একটা গানের স্কুল আছে, মালঞ্চ।"

"মালঞ্চ! আমি তো মালঞ্চতে গেছি বহুবার। সুস্মিতা আমার বান্ধবী, ওখানে গান শিখত।"

"সুস্মিতা? কি জানি মনে পড়ছে না, মায়ের কাছে আসলে চিনতাম নিশ্চয়ই।"

"ও! আপনি বুঝি আপনার মায়ের সব ছাত্রীদের চিনতেন?"

"নাঃ। সবাইকে নয়, ওই ওদেরই মধ্যে যারা সুন্দরী শুধু তাদের কে..."

"তাই নাকি? দাঁড়ান দেখুন তো এই সুন্দরীকে চিনতেন কিনা..." বলতে বলতে মোবাইল খুলে গ্যালারী খুঁজতে থাকে বেদাত্রয়ী, তারপর হঠাৎ একটা ছবিতে গিয়ে আটকে যায়। একটা ছবি বের করে একজনের মুখে জুম করে দ্যাখে... একি! এটা তো... বলে মৈনাকের দিকে ফোনটা এগিয়ে দেয়, "মৈনাক এই মেয়েটার ছবি ভালো করে দেখুন তো? চিনতে পারছেন?"

"আরে এটা তো কোনো একটা ফ্যাশন কম্পিটিশনের ছবি মনে হচ্ছে... আপনার বান্ধবী কি..." বলতে বলতে ছবির মুখ দেখে চমকে ওঠে মৈনাক। ছবিটা সকালে বেদাত্রয়ীর ডাউনলোড করা মীরার অভিনয় জীবনের ছবিগুলোর একটা, সুস্মিতার ছবি খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর সেখানে মীরা আর কুমার ছাড়াও একজনের মুখ ওদের খুব চেনা।

।। ৬ ।।

প্রথমদিন হোটেল রিসেপশনে চড়া মেকআপ করা মেয়েটার সঙ্গে মৈনাক আজকের সাদামাটা মেয়েটাকে ঠিক মেলাতে পারছিল না। ওর মনে হল রিনাকে এই সহজ সাদামাটা পোশাকেই মানিয়েছে বেশী। রিনার সঙ্গে আরেকবার কথা বলার জন্য ওকে থানায় না ডেকে মৈনাক নিজেই এসেছে ওর ফ্ল্যাটে। মৈনাকের মতে থানায় জেরা করার তুলনায় এই ভাবে কথা বললে বেশি লাভ হয়।

"রিনা আপনার বাড়ি তো কলকাতায়?"

"হ্যাঁ।"

"কে কে আছেন সেখানে?"

"মা আর ভাই।"

#

"এখানে সবাই জানে আপনি অবিবাহিতা কিন্তু আপনার তো বিয়ে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, আমি তো কাউকে নিজের থেকে বলতে যাইনি আমি কুমারী, বিবাহিত বা বিধবা কিনা। লোকের যা ইচ্ছে হয়েছে ভেবেছে, তাতে আমি কি করতে পারি? বিজন জানে আমি বিধবা, মীরা ম্যাডামও জানতেন।"

"আচ্ছা মানুষ হিসেবে মীরা কেমন ছিলেন?"

"আমায় পছন্দ করতেন না। তবে সেটা তো খুব স্বাভাবিক, কিন্তু এমনিতে খুব খারাপ ছিলেন না। একটু রাগী আর খিটখিটে ছিলেন। শুনেছি, বিজনকে ও কোনদিনই নাকি সহ্য করতে পারতেন না।"

"সেদিন ওদের মধ্যে কি নিয়ে অশান্তি হয়েছিল আপনি জানেন?"

"বিজন টাকা চেয়েছিল।"

"কেন?"

"আমি জানি না।"

"জানেন রিনা, আপনি জানেন। আপনার মায়ের অপারেশনের জন্যই তো আপনি টাকাটা বিজনকে জোগাড় করে দিতে বলেছিলেন, তাই না?"

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রিনা।

"সেদিন বিজন সারারাত কি এখনই ছিলেন, রিনা?"

আবার মাথা নাড়লো রিনা, "মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি বিজন নেই, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ও বারান্দাতে বা বাথরুমে আছে। কিন্তু খুঁজে পেলাম না যখন তখন ওকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, তখনি ও ফিরে এলো সঙ্গে কিছু টাকা। ওগুলো মীরার বুটিকের টাকা। মীরা বাড়ি নেই দেখে ও আলমারি থেকে বের করে নেয়। ভেবেছিল পরে যা হয় হবে। আমাদের কিছু করার ছিল না টাকাটা আমার খুব দরকার ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন বিজন মীরাকে মারেনি, ও খুন করতে পারে না।" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল রিনা।

গত দুদিন কাজের চাপে বেদাত্রয়ীর সঙ্গে দেখা করা হয়েনি মৈনাকের। আজ কুমারের শুটিং স্পটে ওকে আসতে বলেছে। রিনা আর বিজনকেও ওখানেই ডেকেছে। যদি ওর হিসেবে খুব ভুল না হয় তাহলে আজিই পাখি ধরা পড়বে, ইচ্ছে করেই কুমারকে কোন খবর না দিয়েই এসেছে। আসামিকে এতটুকু আভাস দিতে মৈনাক চায় না তাই এই ব্যবস্থা। সুবীরবাবু ওদের নিয়ে কুমারের ভ্যানে গেলেন। আজও ওর ভ্যানে বসে মেকআপ করছিল কুমার, মৈনাক আর বেদাত্রয়ীকে ঢুকতে দেখে বিরক্তই হল, বলল, "আমার এখন কথা বলবার সময় নেই ইন্সপেক্টর। আমার শুট আছে। আপনারা পরে আসুন, আর হ্যাঁ আমার লকেটটা ফেরত পেলে ভাল হয়।"

"সময় আমাকে খানিকটা সময় তো দিতেই হবে কুমারবাবু। আপনি মেকআপ করুন তার ফাঁকেই না হয় আমি যা জিজ্ঞাসা করার করে নেব।"

"বেশ বলুন", নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বলল কুমার।

"আপনি বলেছিলেন সেদিন রাতে আপনার শুটিং চলছিল কিন্তু মাঝে বেশ খানিকটা সময় আপনার ব্রেক ছিল। সেই সময়টা আপনি কী করছিলেন কুমার?"

"এখানেই ছিলাম। ঐদিন আমার একটা স্পেশাল মেকআপের দরকার ছিল, সেটায় অনেক্ষণ সময় লাগে তাই আমি ভ্যানে রেডি হচ্ছিলাম। দরকার হলে সুবীরকে বা অন্য যেকোনো কাউকে জিজ্ঞেস করে নিন।"

"আর কেউ কেন, আপনার মেকআপ আর্টিস্টই তো সবচেয়ে ভালো অ্যালিবাই দিতে পারবেন তাই না?"

"না। সেদিনের জন্য কলকাতা থেকে অন্য লোক এসেছিল, নেত্রা ঐদিন ছিল না।"

"আপনি ঐদিন কোথায় ছিলেন নেত্রা?" আচমকা নেত্রাকে জিজ্ঞেস করল মৈনাক। বেদাত্রয়ী বেশ কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল যে মেয়েটি মেকআপ থামিয়ে অস্থির হাতে এটা সেটা ঘাঁটছে। মৈনাকের প্রশ্নে চমকে উঠল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল "আমি কোথায় ছিলাম তাতে কি আসে যায়? আমি স্যারের সঙ্গে সেদিন ছিলাম না, কাজেই উনি কোথায় ছিলেন সেটাও আমি জানি না।"

"আমি আপনি কোথায় ছিলেন জিজ্ঞেস করেছি নেত্রা। আপনার স্যার কোথায় ছিলেন সেটা জিজ্ঞেস করিনি।"

"আমি হোটেলে ছিলাম।"

"আর সুবীর বাবু আপনি? আপনি ও কি হোটেলেই ছিলেন?", সুবীর মৈনাকের কথার উত্তর দেবার আগেই উঠে দাঁড়াল কুমার, "আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো ইন্সপেক্টর? সুবীর, নেত্রা এরা সেদিন কোথায় ছিল তার সঙ্গে মীরার খুনের কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আছে কুমার", কুমারের মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল মৈনাক। সিনেমার নকল নায়কের মেকআপ করা মুখের সামনে ফর্সা টকটকে মৈনাকের মুখটাই বেশী উজ্বল লাগছিল। "আপনার সঙ্গে মীরার যোগাযোগ ছিল সে কথা আপনি গোপন করে গেছেন প্রথম থেকে, আপনাকে মীরা নিয়মিত ফোন করত না?"

মৈনাকের কথায় যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। আবার বসে পড়ল কুমার, "হ্যাঁ করত। মাসখানেক আগে মীরা আমাকে প্রথম ফোন করে বলে ওকে কিছু রোল পাইয়ে দিতে, ও ইন্ডাস্ট্রিতে আবার ফিরত আসতে চাইছিল। আমরা আমাদের কেরিয়ার একসঙ্গে শুরু করেছিলাম, ওর মধ্যে প্রতিভাও ছিল; কিন্তু আমাদের লাইনে প্রতিভা আর ভাগ্য দুটোই সমান জরুরী। ওর শুরুটা ভালো হলেও শেষ রক্ষা হয়েনি। ওর ছেলেবেলা থেকেই নার্ভের সমস্যা ছিল পরে সেটা ক্রমশ আরও বাড়তে থাকায় ওর পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যায়। তাই ও যখন ফোন করল আমি ভেবেছিলাম আমার

চেনাজানা ডিরেক্টরদের বলব ওকে কিছু কাজ দিতে। তারপর ঘটনাচক্রে আমার এখানে শুটিং পড়ল। আমি সেটা মীরাকে বলতে ও দেখা করতে আসবে বলেছিল। আমি সুবীরকে বলেও রেখেছিলাম, কিন্তু ও এসেও কেন সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি আমি জানি না। এরমধ্যে আমার হার ওর বডিতে কি করে পাওয়া গেল আমি তাও জানি না। তাই সেদিন সুবীর এসে যখন বলল মীরা মারা গেছে তখনি আমি ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথাটা কাউকে বলা ঠিক হবে না। মিডিয়া একবার জানতে পারলে আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে যেত। সুবীরকে বারণ করে দিলাম কাউকে কিছু বলতে। তার ওপর ওর গলায় আমার হার পাওয়া যাওয়াতে আমি আরও ভয় পেয়ে গেছিলাম। কিন্তু মীরার সঙ্গে আমার আদৌ দেখা হয়নি, আমি মিথ্যে বলছি না ইন্সপেক্টর।"

"আমি জানি আপনি মিথ্যে বলছেন না কুমার। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন মীরার আসার কথা আপনি আর সুবীরবাবু ছাড়া আরেকজনও জানত।"

"হ্যাঁ নেত্রা জানত তো... আমরা তো..."

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই সুবীর আচমকা নেত্রার হাত ধরে এক টানে নেত্রাকে নিয়ে ভ্যানের দরজা খুলে বাইরে লাফ দিল দুজনে, কিন্তু বেরোনোর আগেই বিজন দরজার বাইরে ধরে ফেলল সুবীরকে আর দরজার পাশেই বসে থাকা বেদাত্রয়ী ধরে ফেলল নেত্রাকে। রাগে ফুঁসছিল নেত্রা আর ওর কেটে যাওয়া বিভৎস মুখটা আরও ভয়ঙ্কর লাগছিল।

।। ৭ ।।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এই নেত্রা, সুবীর এদের সঙ্গে মীরার কি সম্পর্ক? এরা কেন মীরাকে খুন করল?" বিজন সুবীরকে ঐভাবে পালাতে দেখে কিছু একটা গোলমাল আন্দাজ করে ধরে ফেলেছিল কিন্তু কুমার বেদাত্রয়ীর মত সেও কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছিল না। কুমারের ভ্যানে সবার জায়গা না হওয়ায় ওরা এসে বসেছিল কুমারের হোটেলের রুমে। বেদাত্রয়ী, মৈনাক, কুমার, বিজন ছাড়াও ছিল রিনা। সুবীর আর নেত্রাকে আটকে রেখেছিল নিবারণবাবু ও একজন মহিলা কনস্টেবল।

"নেত্রা মীরাকে আগে থেকে চিনত, কুমার মীরা যে কম্পিটিসান থেকে শুরু করেছিল নেত্রাও সেখানে পার্টিসিপেন্ট ছিল, সেটা আমি ইন্টারনেট ঘেঁটে মীরার পুরনো দিনের ছবি খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু ওর সঙ্গে মীরার কি ব্যাপারে শত্রুতা সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না" বলল বেদাত্রয়ী।

"পুরো ব্যাপারটা বুঝতে গেলে আমাদের একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হবে। সব সমস্যার শুরু ওই মডেলিং কম্পিটিশন থেকে যেখানে মীরা, কুমার ও নেত্রা তিনজনেই পার্টিসিপেন্ট ছিলেন। খান কুড়ি যুবকযুবতীদের নিয়ে কম্পিটিশন, প্রতিযোগীদের একসঙ্গে থেকে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপের জন্য তৈরী হতে হবে এবং সবশেষে একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে তাদের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হবে বিজয়ী হিসেবে। সবই ঠিক ছিল কিন্তু গন্ডগোলটা হল ফাইনালের কিছুদিন আগে। ফাইনালে পৌঁছনো ২টি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎই মাথা ঘুরে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় এবং..."

"আমি মাথা ঘুরে এমনি এমনি পড়ে যাইনি।" হিসহিসে গলায় বলে উঠলো নেত্রা, "আমাকে ওষুধ খাইয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। মীরা ওর নার্ভের ওষুধ আমায় খাইয়ে দেয় আর তাতেই আমি মাথা ঘুরে সিঁড়ি পড়ে যাই। সিঁড়ির লোহার রেলিঙে লেগে আমার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। আমার স্বপ্ন, আমার কেরিয়ার সব শেষ হয়ে গেল। আমি আমার মা বাবা সবার বিরুদ্ধে গিয়ে ওই কম্পিটিশন পার্টিসিপেট করেছিলাম, কিন্তু ওই একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমার সব শেষ করে দিল। তখন সবার মত আমি নিজেও ভেবেছিলাম ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, কম্পিটিশনের প্রেসারে আর অনিয়মে মাথা ঘুরে গেছে। কিন্তু সেদিন যখন মীরা নিজেই সব স্বীকার করলো তখনি আমি ঠিক করেছিলাম এর প্রতিশোধ আমি নেবই।" এইটুকু বলে নেত্রা হাঁপাতে থাকে।

"নেত্রার অ্যাক্সিডেন্টের পর মীরা খুব সহজেই জিতে গেছিল, কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি মীরাই নেত্রাকে এইভাবে সরিয়ে দিয়েছিল।" বলল কুমার, "কয়েকবছর আগে যখন নেত্রা আমার কাছে এলো আমি তখন সবে একটু নাম করতে শুরু করেছি। ও এসে বলল মেকআপ আর্টিস্টের ট্রেনিং নিয়েছে, আমারও একজন পার্সোনাল মেকআপ আর্টিস্টের দরকার ছিল তাই ভাবলাম ওই থাক। ও আর সুবীর দুজনেই সেই প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে আছে, ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছে তাও জানতাম। মীরা যখন প্রথম ফোন করলো, তখনি আমি নেত্রাকে বলেছিলাম মীরার কথা। সেদিন যে মীরা আসবে বলেছে আমি তাও বলেছিলাম নেত্রাকে।"

"এরপরটা আমি বলছি, এর অনেকটাই আমার অনুমান কিন্তু সেটা ঠিক না ভুল জানার উপায় নেই।" আবার শুরু করল মৈনাক, "সেদিন মীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেই দেখতে পায় নেত্রাকে আর ওকে দেখেই আপনার সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে যায়। আসলে মীরা ভাবতেই পারেনি এখানে এসে ও নেত্রাকে দেখতে পাবে। তারপর খুব সুবীরবাবুর মুখে মীরার কথা শুনে হয় নেত্রা নিজে থেকে মীরার সঙ্গে যোগাযোগ করে বা মীরাই নেত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমার ধারণা মীরাই নেত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করে, কারণ ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই ক্রমশ মীরার নার্ভের সমস্যা বাড়তে থাকে। মীরা ঝোঁকের মাথায় নেত্রাকে ওষুধ খাইয়ে ছিল। খুব সম্ভব ও ভেবেছিল নেত্রা অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে। ও হয়ত ভাবতেও পারেনি নেত্রার এতবড় ক্ষতি হয়ে যাবে। কাজেই, তারপর থেকেই মীরা আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করে। ক্রমশ আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে, অভিনয় জগতে থেকেও সরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনুশোচনাটা সম্ভবত ওর ভিতরে রয়েই গেছিল। তাই সেদিন নেত্রাকে দেখার পর ও ঠিক করে নেত্রাকে সব সত্যি কথা বলে ভার মুক্ত হবে। নেত্রার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে। আর তখন থেকেই নেত্রা প্রতিশোধ নেবার প্ল্যান করতে থাকে। সুযোগ এসে যায় সেদিন যেদিন কুমারের স্পেশাল মেকআপের জন্য কলকাতা থেকে লোক আসে, সেদিন সারা রাত শুটিং ছিল আর কুমার ব্যস্ত বলে নেত্রা আর সুবীরেরও ছুটি। বেশিরভাগ লোকজনও শুটিং-এ থাকবে, হোটেলও প্রায় ফাঁকা, এই সুযোগটাই কাজে লাগায় নেত্রা। মীরাকে হোটেলে ডাকে, কি বলে সেদিন মীরাকে ডেকেছিলেন নেত্রা? ওকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে?" নেত্রা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, সুবীরও চুপ, মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যের এত কথা আলোচনা কিছুই ওদের স্পর্শ করছে না।

"মীরা নেত্রাকে বিশ্বাস করেছিল। ও ভেবেছিল নেত্রা ওকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তাই সেদিন নির্দ্বিধায় নেত্রার হোটেলে এসেছিল। তারপরটা খুব সহজ, পুরনো সব দ্বেষ মিটে যাবার আনন্দে মদ্যপান, সেলিব্রেশান। সেই সময়েই

মীরার পানীয়তে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়, সব শেষে কুমার বাবুর গাড়িতে করে অন্ধকার সমুদ্রসৈকতে গিয়ে ওকে ফেলে দেয় দুজনে মিলে।"

"কিন্তু তাহলে এসবের মধ্যে কুমারের হার কেমন করে মীরার গলায় গেল?" সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত মৈনাকের কথা শুনছিল, বেদাত্রয়ীর প্রশ্নে চমকে উঠল কুমার।

"নেত্রা বুঝেছিল মীরার মৃত্যুটা সুইসাইড বলে চালানো যাবে না, কোনো না কোনো ভাবে ধরা পড়বেই যে এটা খুন। তাই ও কুমারের দিকে সন্দেহর তীর ঘোরানোর জন্য লকেটটা চুরি করে মীরার গলায়ে পরিয়ে দেয় আর মীরাকে বিচে নিয়েও যায় কুমারের গাড়ি করে। কিন্তু সেটাই ওদের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে। হারটা গলায় না পাওয়া গেলে আমাদের নজর কুমারের দিকেও পড়ত না, আর নেত্রাকেও চিনে নেয়া দুঃসাধ্য হয়ে যেত। আমরা হয়ত প্রমাণের অভাবে ধরে নিতাম মীরা নিজেই সাংসারিক অশান্তির জন্য সুইসাইড করেছেন।"

কাল বেদাত্রীর কলকাতা ফিরে যাওয়া। আজ রিনা আর বিজন ওদের ডিনারে ডেকেছিল। মীরার মৃত্যুর পর ওর সব সম্পত্তি এখন বিজনের আর সেখান থেকে খানিকটা যদি বিজন রিনার মায়ের অপারেশনের জন্য নিয়ে থাকে তাহলে সে নিয়ে কারুর কিছু বলার থাকতে পারেনা। সেদিন রাতে যে বিজন বাড়ি ফিরে গেছিল সেটা মৈনাক আর বেদাত্রয়ী ছাড়া আর কেউ জানে না। বিজন আর রিনা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে, হোটেলটাও আরও বড় করবে। ডিনার শেষে মৈনাক আর বেদাত্রয়ী হাঁটতে হাঁটতে আবার সেদিনের মত সমুদ্রের ধারে এসেছে। আজ পুলিশ ইন্সপেক্টরের পরণে হলুদ পাঞ্জাবি আর বেদাত্রয়ী পরেছে কালো জামদানি। চাঁদের আলোয় ওর নাকের হিরেটা ঝিকমিক করছে।

অলঙ্করণঃ সৌরভ দে

লেখক পরিচিতি

অমৃতা ভালোবাসে ঘুরে বেড়াতে আর বই পড়তে। কথকতার জন্য গল্প বানানোটা নেশা বা পেশার চেয়ে অনেক বেশি। পড়াশোনা সাংবাদিকতা নিয়ে, দেশে থাকতে শ্রীরামপুর কলেজের ঐ বিভাগের শিক্ষিকার কাজটিও বড় প্রিয় ছিল।



প্রথমেই বলে রাখি যে বিষয় নিয়ে আজ লিখতে চলেছি, তাতে আমি পারদর্শী নই। আর্ট মিউজিয়ামের ছবি দেখা ও সেই ছবি বিশ্লেষণ করা বা তার ইতিহাস খুঁজে বের করার মধ্যে এক বিস্তর পার্থক্য আছে। কিন্তু গেন্ট অল্টারপিসের ইতিহাস আমাদের এতটাই আকৃষ্ট করে যে, বেলজিয়ামে আসার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই তৈলচিত্রটি চর্মচক্ষে একবার দেখা।

সবুজে ঘেরা গেন্ট এক ছোট্ট শান্ত গঞ্জ। সেখানেই আছে সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রাল। ক্যাথিড্রালের এক কোণে কাচের ঘেরাটোপে রয়েছে ফ্লেমিশ আর্টের ও রেনেসাঁসের অন্যতম জনপ্রিয় তৈলচিত্র "দি অ্যাডোরেশন অফ মিস্টিক্ ল্যাম্" বা "দ্য গেন্ট অল্টারপিস"। ক্রিশ্চানিটিতে ল্যাম্ বা মেষশাবকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার "অল্টারপিস" (altarpiece) সম্পর্কে। প্রত্যেক চার্চে একটা করে টেবল বা অল্টার থাকে, যেখানে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে হোলি ওয়াইন এবং ব্রেড রাখা হয় - এই ব্রেড ও রেড ওয়াইন জেসাসের শরীরের রক্ত ও মাংসের প্রতীক, যা চার্চে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই টেবল বা অল্টারের পাশে ধর্মীয় ও পুরাণের হরেকরকম ছবি সাজানো থাকে, যেগুলিকে অল্টারপিস বলা হয়।

#



গেন্ট অল্টারপিস - খোলা অবস্থায় সামনের দিক (ছবি: গুগল ইমেজ)

১৪৩২ সালে সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রালের ভিয়ড চ্যাপেলে হুবার্ট ফন আইক ও তাঁর ছোট ভাই ইয়ান ফন আইক (Hubert/ Hubrecht van Eyck and Jan van Eyck) এক সুবিশাল তৈলচিত্র অঙ্কন করেন - উচ্চতায় ১৩৭.৮০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৮১.৫০ ইঞ্চি। পরবর্তীকালে হুবার্টের অঙ্কিত আর কোন তৈলচিত্র পাওয়া না গেলেও ইয়ানের বেশ কিছু কাজ ইতিহাসে আজও সমাদৃত, যদিও অনেক তৈলচিত্রই কালের করাল হস্তে নষ্ট হয়ে গেছে। ঐতিহাসিকদের মতে হুবার্ট এই তৈলচিত্রটির কাজ অসমাপ্ত রেখে মারা যান, তখন তাঁর ভাই এটি সমাপ্ত করেন। ইয়ান ফন আইক ছিলেন জন অফ্ বাভেরিয়ার (কাউন্ট অফ্ হল্যান্ড) সভা শিল্পী। ঐতিহাসিকদের মতে, কাউন্ট অফ্ হল্যান্ড হুবার্টকে এই তৈলচিত্রটির কার্যভার সমর্পণ করলেও সিংহভাগ অঙ্কন করেছেন তাঁর ভাই ইয়ান। ২৪টি প্যানেলে ওক কাঠের ওপর অঙ্কিত এই পলিপ্টিক (polyptych) তৈলচিত্রটি বিভিন্ন সময় লুণ্ঠিত হয়েছে, অবহেলিত হয়েছে এবং আজও তার কয়েকটি ছবি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বারবার লুণ্ঠিত হলেও প্রতিবারই ছবিটি ফিরে এসেছে গেন্টের এই ক্যাথিড্রালে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

একসময় রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছবিটি ক্রয় করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে থাকলেও তিনি কৃতকার্য হয়ে উঠতে পারেননি। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে চড়া মূল্যের বিনিময়ে সভা শিল্পী মিশীল কোক্সীকে তিনি এই অল্টারপিসের অনুকরণে একটি রেপ্লিকা আঁকতে অনুরোধ করেন। মাদ্রিদে এই রেপ্লিকাটি থাকলেও, পরবর্তীকালে ছবিগুলি আলাদা আলাদা হয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে যায়।



গেন্ট অল্টারপিস - ছবিটি বন্ধ অবস্থায়, বাইরের দিক থেকে (ছবি: গুগল ইমেজ)

১৫৬৬ সালে প্রোটেস্টান্ট মিলিটান্ট গ্রুপ সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রালটি দখল করে ছবিটি পুড়িয়ে দিতে আসে। কিন্তু আগের থেকে খবরটি জানতে পেরে প্যানেল থেকে ছবিগুলি খুলে চার্চের টাওয়ারে লুকিয়ে রাখা হয়। ফলে, সে যাত্রায় এই দুর্মুল্য ছবিটি আর্ট ভ্যান্ডালিজমের হাত থেকে বেঁচে যায়।

ক্যালভিনিস্ট (প্রোটেস্টান্ট গ্রুপ) সিটি কাউন্সিল থেকে একসময় ছবিটি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথকে উপহার হিসাবে দেওয়ার কথা ভাবা হয়, কিন্তু ছবিটির পৃষ্ঠপোষক জুস্ত ভিজ্‌ৎ (Joost Vijdt) -এর উত্তরাধিকারীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় ছবিটি গেন্টের টাউন হলে কিছুদিন রাখার পর ১৫৮৪ সালে ক্যাথিড্রালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৬৬২-১৬৬৩ সালে ছবিটি অ্যান্টোয়ার্পের বারোক পোর্টিকোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ সেইসময় ফ্লেমিশ আর্টের খুব বেশী কদর ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছবিগুলো প্যানেল থেকে খুলে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়।

১৭৯৪ সালের অগস্ট মাসে ফ্রেঞ্চ জেনারেল চার্লস পিশেগ্রু ছবিটির মাঝের চারটে প্যানেল লুঠ করে ফ্রান্সের লুভারে পাঠিয়ে দেন; কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর লুই দ্য এইটটিন্থ (Louis XVIII) সিংহাসনে বসার পর ১৮১৪ সালে এটি পুনর্বার গেন্টে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

#

১৮১৭ সালে অ্যাডম ও ইভের ছবি বাদ দিয়ে, গেন্ট অল্টারপিসের ধারের ছয়টি প্যানেল ব্রাসেলসের এক আর্টডীলার কিনে একজন আর্ট কালেক্টরকে বিক্রী করে দেন। অবশেষে প্রুশিয়ার রাজা বার্লিন মিউজিয়ামের জন্য ছবিগুলি হস্তগত করেন।

১৮২২ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে গেন্ট অল্টারপিসের মাঝের প্যানেলটি পুড়ে যায়, পরে সেটি সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়।

১৮৬১ সালে রয়্যাল মিউজিয়ম অফ্ ব্রাসেলস্ অ্যাডাম ও ইভের প্যানেল দু'টি কিনে নেয়।

উনবিংশ শতকে (19th century) সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রালে গেন্ট অল্টারপিসের ছবিগুলি একটু ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল- মাঝের চারটি প্যানেল আসল হলেও ধারের প্যানেলগুলো মিশীল কোক্সীর আঁকা ছবি দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। অ্যাডাম ও ইভকেও তৎকালীন সাজপোষাকে সজ্জিত করা হয়েছিল। এই অ্যাডাম ও ইভের প্যানেল দু'টি বর্তমানে ক্যাথিড্রালে আলাদা করে রাখা আছে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) ছবিটি জঞ্জালের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। কিন্তু, ভার্সেইয়ের ট্রীটি অনুসারে পুনরায় ছবিটি পুনরাবস্থায় এনে সেই গেন্টেই সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩৪ সালের এপ্রিলের এক রাতে ছবিটির বাঁ দিকের নীচের প্যানেলটি চুরি হয়ে যায় - দ্য রাইটিউস জাজেস ও জন দ্য ব্যাপটিস্ট। জন দ্য ব্যাপটিস্টের প্যানেলটি খুঁজে পাওয়া গেলেও অপর প্যানেলটি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় উক্ত প্যানেলটির রেপ্লিকা বানানো হয়, যা এখনও এই অল্টারপিসের সঙ্গে রয়ে গেছে।

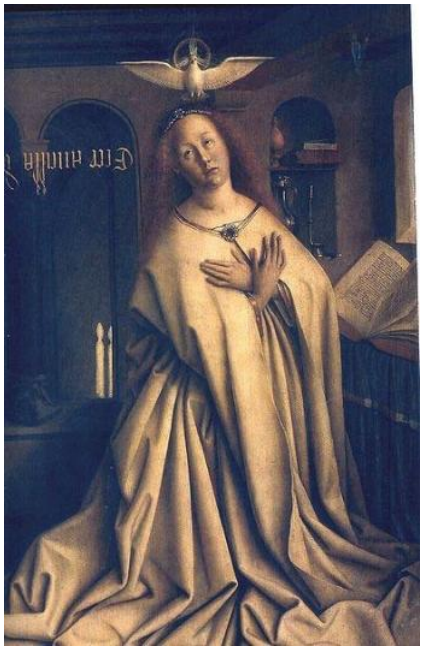
১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় "দ্য মিস্টিক ল্যাম্"-কে ফ্রান্সের পাওয়ের এক কাসলে লুকিয়ে রাখা হয়। ১৯৪২ সালে নাৎসী জেনারেল গোরিং এই গেন্ট অল্টারপিসটি হস্তগত করেন। কারণ, হিটলার এই অল্টারপিসের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং এই ছবিটির ঐশ্বরিক শক্তি সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল। সেই সময়, অল্টারপিসের হারিয়ে যাওয়া কাঠের প্যানেলটি নিয়েও অনেক অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু সেটি আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে, এই অল্টারপিসটি অস্ট্রিয়ার এক নুনের খনির মধ্যে অনেক ছবি ও মূর্তির সঙ্গে লুকোনো অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়। আবার, দ্য মিস্টিক ল্যাম্ ফিরে আসে গেন্টের ক্যাথিড্রালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৫০-৫১ সালে এবং ২০১০ সালে এই তৈলচিত্রটি পুনরায় নিরীক্ষণ করা হয়; অনেক মেরামতির ও পুনরুদ্ধারের কাজ করা হয়। ১৯৮৬ সালে এটি পুনরায় টাওয়ারের পার্শ্ববর্তী ব্যাপেস্ট্রিতে ফিরে আসে।

"দ্য রাইটিউস জাজেস"-এর আসল প্যানেলটি চুরি হয়ে যাবার দরুণ রেস্টোরার বা অঙ্কন পুনরুদ্ধারকারী ডেয়ার ভেনকেন দ্বারা অঙ্কিত রেপ্লিকা দিয়েই "দ্য রাইটিউস জাজেস"-এর প্যানেলটি পূর্ণ করা হয়েছে। অল্টারপিসে নীচে একটি লম্বা প্যানেল ছিল (দ্য প্রেডেলা), যেটি বহুদিন আগেই চিরতরের মতো হারিয়ে যায়। এই প্রেডেলাতে আইক ভ্রাতৃদ্বয়ের জলরঙে অঙ্কিত একটি ছবির প্যানেল ছিল - যেখানে মৃত্যুর পর আত্মা শাস্তি ভোগ করছে মুক্তির উদ্দেশ্যে।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণঃ

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই তৈলচিত্রটি ক্রিশ্চানিটির (ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট) আধারে অঙ্কিত, কিন্তু ফ্লেমিশ আর্ট ও রেনেসাঁস আর্টের এক প্রাচীন নিদর্শন। ২৪ টি ওক কাঠের প্যানেলে অঙ্কিত বলে এটিকে টেকনিকালি পলিপ্টিক আর্ট বলা হয়; যেমন ৩ টি প্যানেল থাকলে ট্রিপ্টিক আর্ট বলা হয়। অল্টারপিসের প্যানেলে ল্যাটিনে বাইবেলের অনেক উদ্ধৃতি আছে; কিছু লেখা দর্শকের কাছে উল্টোভাবে লেখা মনে হবে, শিল্পী লেখাগুলিকে "ঈশ্বরের প্রতি মেরীর প্রেরিত উত্তর" হিসাবে তার চিত্রে প্রস্ফুটিত করেছেন।



অল্টারপিসের বাইরের দিকঃ

"দি অ্যাডোরেশন অব মিস্টিক ল্যাম্" -এর বাইরের দিক সবসময় ক্যাথিড্রালে দেখানো হয় না। একমাত্র রবিবার বা পার্বণের দিন বাইরের দিক দেখার সুযোগ হয়।

অল্টারপিসের বাইরের দিকে তিনটি সারি (row) রয়েছে। সবথেকে উপরের সারিতে দুই দিকে ওল্ড টেস্টামেন্টের দু'জন প্রোফেট (জাকারিয়াস বা জাকারিয়াহ্ এবং মিকায়েস বা মিকাহ্) ও মাঝে দু'জন সিবিল (এরিথ্রায়েয়া এবং কুমা) রয়েছেন, যাঁরা ঈশ্বরের মানবরূপে আগমন বার্তা পুঁথিভুক্ত করে রাখছেন। গ্রীক ও রোমান পুরাণে দশ জন মহিলা প্রফেট বা সিবিলের (sibyl) কথা বলা আছে। ক্রিশ্চিয়ান থিয়োলজি অনুসারে যে সকল মহিলাগণ স্বর্গীয় জ্ঞান (divine knowledge) এবং দিব্যদৃষ্টির (ভবিষ্যদ্বক্তা) ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন, তাঁদের সিবিল বলা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে সিবিল চরিত্রটির প্রথম দর্শন মেলে গ্রীক সাহিত্যে। সেখানে ঐশ্বরিক জ্ঞানের থেকে জাদুকরী বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে সিবিলকে পেশ করা হয়। অল্টারপিসের ডানদিকে আছেন কুমায়েয়ান সিবিল ও বামদিকে আছেন এরিথ্রায়েন সিবিল। কুমায়েয়ান সিবিলকে নিয়ে বহু মনোরম কাহিনী রচিত আছে। ওক পাতায় ভবিষ্যৎ বাণী লিখে নিজের গুহাতে রেখে দিতেন কারণ, পাতাগুলি ঝড়ে উড়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে তিনি আর তার লেখাগুলি মিলিয়ে নিতে পারবেন না। নেপলসের কাছের "কুমা" নামক একটি অঞ্চলে ইনি বসবাস করতেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। একবার গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো কুমায়েয়ান সিবিলকে বলেন, তাঁর যে কোন একটি ইচ্ছের কথা জানাতে, যেটি অ্যাপোলো পূরণ করে দেবেন। কুমায়েয়ান তখন এক মুঠো বালি নিয়ে দেবতাকে বলেন, এতে যতগুলি দানা আছে, আমি তত বছর বাঁচতে চাই। দেবতা সেই বর দান করলে, কুমায়েয়ান তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে কুমায়েয়ানকে অভিশাপ দেন, যে কুমায়েয়ান অমর থাকবে, কিন্তু তাঁর যৌবন চিরস্থায়ী থাকবে না। অভিশাপের ফলশ্রুতি হিসাবে, বয়সের ভারে নুব্জ্য হয়ে তাঁর দেহ ক্রমশ শুকিয়ে যেতে লাগল। একসময়, এমন শীর্ণ হয়ে গেলেন যে তিনি একটি বোতলের ভেতরে

#

থাকতেন। যখন কেউ কুমায়েয়ান সিবিলকে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি কি চান? কুমায়েয়ানের উত্তর ছিল "মৃত্যু"। সমস্ত সিবিলদের মধ্যে কুমায়েয়ান হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্রাইস্টের জন্মের সময় কুমায়েন সিবিল তাঁর আগমন বার্তা জানান।

এরিথ্রায়েয়ান ছিলেন এরিথ্রা নামক এক ছোট শহরের ভবিষ্যদ্রষ্টা। মনে করা হয় ঐ শহরে একাধিক মহিলা ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেহেতু তাঁরা সকলে একই শহরের অধিবাসী, তাই এঁদের সকলকেই এরিথ্রায়েয়ান সিবিল বলা হয়। এঁদের সকলের মধ্যে হেরোফিলের নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, এরিথ্রায়েয়ান সিবিল ট্রোজান ওয়ার ও তার পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অল্টারপিসে এরিথ্রায়েয়ান সিবিলকে দেখা যায় রেডেম্পশান বা জীব জগতকে পাপ-দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য পরিত্রাতার আগমনের সুখবর শোনাতে।

মাঝের সারিতে এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল (বাম দিকে) মেরীকে জেসাসের আগমনের কথা (সুসংবাদ) জানাচ্ছেন, যিনি



পাপের থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করবেন (salvation)। এই এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েলকে অনেকে আর্ক এঞ্জেল বলেন, কারণ দেবদূত বা এঞ্জেলদের মধ্যে যে র‍্যাংকিং সিস্টেম আছে, সেখানে গ্যাব্রিয়েলের স্থান সবথেকে উপরে। এঁর স্থান ঈশ্বরের নিচেই। কারণ ঈশ্বরের থেকে প্রেরিত সংবাদ এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল বহন করে পৌঁছে দেন মানুষের কাছে (Messenger of God)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই এঞ্জেল বা দেবদূতের মধ্যে নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই। তাই এদের মধ্যে বিবাহ বা সন্তানাদির কোন রকম সম্ভাবনাও থাকে না। এঁদের মুখমণ্ডলে এক শিশুসুলভ ভাব দেখা যায়, যা পার্থিব জগতের সকল আবেগ থেকে এঁদের মানসিক দূরত্বের এক সাক্ষ্য বহন করে, যদিও বাইবেল বা সমগ্র জুডাইজম (Judaism) অনুযায়ী, পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে এই দেবদূতগণকেই যোগাযোগের এক বিশেষ মাধ্যম হিসাবে দেখানো হয়েছে। আমাদের পরী ও এঞ্জেল সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেমন এঁরা দেখতে অতীব সুন্দর। চিত্রশিল্পীদের অঙ্কনে পরীরা (fairy/nymph) নান্দনিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হলেও, এঞ্জেলরা সকলেই আমাদের পার্থিব চোখে স্বাভাবিক নয়। অনেক দেবদূত দেখতে এমন ভয়ানক ছিলেন যে তাদের আগমনে অনেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। পরীর মতো এঁরা সকলেই যে পার্থিব জীবন ও স্বর্গের সুকোমল বা আনন্দময় দিকগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তা নয়। দেবদূতরা যুদ্ধের সময় ঈশ্বরের প্রেরিত আদেশ বহন করতেন ও যুদ্ধ সেইভাবে চালাবার নির্দেশও দিতেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে কোন শিশু দেবদূতের কথা বলা নেই।

মেরীর শ্বেত শুভ্র পোষাক ও বামদিকে রাখা তোয়ালে ও বেসিনের যে ছবিটি দেখা যায়, তার থেকে অনেকে মনে করেন এটি কুমারীত্বের ও পবিত্রতার প্রতীক।

অল্টারপিসের বাইরের দিকের একেবারে নিচের সারিতে দেখা যায় এই অল্টারপিসের পৃষ্ঠপোষণকারী (donor) ও তাঁর স্ত্রী (উভয়েই লাল বস্ত্র পরিহিত) সবিনয়ে করজোড়ে সেইন্ট জন (একটি ভেড়ার শিশুকে কোলে নিয়ে যিনি আছেন) এবং জন দ্য এভানগেলিস্টের (যিনি একখানি চ্যালিস ধরে আছেন) প্রতি প্রার্থনারত। জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট এবং জন দ্য

এভানগেলিস্ট - দু'জনের তৈলচিত্রে গ্রীজেইল (*Grisaille*) বা শুধুমাত্র ছাই রঙের বিভিন্ন শেড ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভাস্কর্যের শৈলীতে অঙ্কিত।

এভানগেলিস্টের অর্থ হলো, যিনি গসপেলের লেখক; অর্থাৎ ক্রাইস্টের শিক্ষা বা নিয়মগুলি যাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের এভানগেলিস্ট (Evangelist) আখ্যা দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এভানগেলিস্টের সন্ধান নিউ টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়। প্রধান চারজন এভানগেলিস্ট হলেন - ম্যাথিউ দ্য এভানগেলিস্ট, মার্ক দ্য এভানগেলিস্ট, লুক দ্য এভানগেলিস্ট ও জন দ্য এভানগেলিস্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই চারজন গসপেল রাইটার বা এভানগেলিস্ট ছিলেন ক্রাইস্টের ১২ জন অ্যাপাসালস বা প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। বাকি আটজন অ্যাপাসালস হলেন - সাইমন (গসপেল অনুযায়ী এঁর আরও দু'টি নাম হলো পিটার ও সেপাস), অ্যাণ্ড্রিউ (সাইমনের ভাই), জেমস (জেবিদীর পুত্র ও জনের ভাই), ফিলিপ, বার্থোলোমিউ, টমাস, জেমস (আলফায়েসের পুত্র ও ম্যাথিউয়ের ভাই), থাডায়েয়াস (জুড), সাইমন (জীলোট), জুডাস ইসকারিয়োট। গসপেল অফ্ ম্যাথিউ অনুসারে, লাস্ট সাপারের পূর্বে এই জুডাস ইসকারিয়োট জেসাসকে ৩০ টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তৎকালীন প্রধান পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করেন। পরে তাঁর অনুশোচনা হয় এবং রৌপ্যমুদ্রাগুলি ফিরিয়ে দেন।

অল্টারপিসের ভেতরের দিকঃ

অল্টারপিসের অন্তর্বর্তী চিত্র সমূহে সেন্ট জন দ্য এভানগেলিস্টের লেখা অ্যাপোক্যালিপ্স বা বুক অভ রেভেলেশনের (Apocalypse or Book of Revelation) প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত। রেনেসাঁসের এক বিখ্যাত থিম "দ্য রেডেম্পশন অফ্ ম্যান" (মানব জাতির পাপের থেকে মুক্তি) এখানে পর্যায়ক্রমে চিত্রিত রয়েছে। মূলত নিউ টেস্টামেন্টের ওপর ভিত্তি করেই এখানে তৈল চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে, যেগুলি নবজন্ম বা রেসারেকশনের নানান প্রতীকী বহন করে।



এখানে অল্টারপিসের দু'টি সারি রয়েছে। প্রথম সারিতে প্রথমেই অল্টারপিসের দু'দিকে অ্যাডাম ও ইভকে দেখা যায়, আদি-মানুষের স্বর্গ থেকে পতন ও মর্ত্যে অবতরণের কাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে এই চিত্র আলেখ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অ্যাডামের পায়ের পাতা এমনভাবে উঠে আছে যা পৃথিবীর মাটিতে স্পর্শ করতে চলেছে। অ্যাডাম ও ইভ উভয়ের মুখই বিষণ্ন এবং ইভের হাতে ধরা আছে সেই জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল। বিতর্কিত বিষয় হল এখানে নিষিদ্ধ ফল হিসেবে "আপেল" দেখানো হয়নি, বরং লেবু জাতীয় কোন ফল দেখানো হয়েছে। অনেকে মনে করেন এই "সিট্রোন" বা "সিট্রাস" ফলটি মিথ্যাচার বা ছদ্মবেশের প্রতীক। অনেকে মনে করেন পুরো অল্টারপিসের বিষয়বস্তু প্রতীকী, তাই সেইটা বোঝাবার জন্যই আপেলের বদলে এই সিট্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।

অ্যাডাম ও ইভ – দু'জনের অবয়ব দেখে অনুমান করা যায় শিল্পী মানব শরীরের গঠন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন - শিরা-উপশিরা, মাংসপেশী নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু, এখানে আর একটি বিতর্কিত বিষয় হলো অ্যাডাম ও ইভের নাভিকুণ্ডল। অ্যাডামের জন্ম হয়েছিল ঐশ্বরিক শক্তিতে ও অ্যাডামের পাঁজর থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ইভকে। ক্রিশ্চিয়ান মতে এখানে নাভিকুণ্ডলের কোন প্রশ্নই আসে না, কিন্তু ছবিতে তা সুস্পষ্ট। বহুবিতর্ক ও বহুমুখী তত্ত্ব এই চিত্র দু'টিকে ঘিরে রয়েছে। সমালোচক ও গবেষণার জন্য সেই বিতর্ক তুলে রেখে ঐতিহাসিকদের বিচারে নগ্ন চিত্রে এটি ফ্লেমিশ আর্টের সর্বপ্রথম উদাহরণ। আর একটি কথা সকলেরই জানা, অ্যাডাম ও ইভের যৌনাঙ্গ ফিগ লিফে ঢাকা। এই ফিগ লিফ হলো জীবনের প্রতীক এবং ভালো-মন্দ বিচারের সম্যক জ্ঞানের প্রতীক। স্বর্গ হতে পতনের পরে, অ্যাডাম ও ইভ পৃথিবীতে নেমে আসে ও ঈশ্বর প্রদত্ত অমরত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখা যায় সেই সময় মানুষ ৩০০-৪০০ বছর বাঁচত। কিন্তু মৃত্যু ছিল অবধারিত। পৃথিবীতে আসার পর তাঁদের ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করতে শুরু করতে হলো, স্বর্গে যে দায়িত্ব ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের। উল্লেখ্য বিষয় হল, এতসব সত্ত্বেও অল্টারপিসের ভেতরে বা বাইরে শয়তান বা সাপের কোন চিহ্নই নেই। খুব সম্ভব শিল্পী চিত্রলেখ্যটির মধ্যে এক ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

অ্যাডাম ও ইভের ছবি দু'টির ঠিক উপরেই আছে কেইন ও আবেলের ছবি। ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী অনুযায়ী (জেনেসিস ৪) অ্যাডাম ও ইভের দু'টি পুত্র সন্তান হয়। প্রথমজনের নাম কেইন ও তার ভাইয়ের নাম ছিল আবেল। কেইন ও আবেল বড় হতে, কেইনের কাজ হল কৃষিকর্ম দেখা এবং আবেলের কাজ হল ভেড়াদের দেখাশুনো করা। একদিন কেইন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তার খামারের কিছু ফল উৎসর্গ করলো, আবেলও তার ভেড়াগুলির মধ্যে প্রথম প্রসবিত কয়েকটি ভেড়ার শিশুর চর্বি উৎসর্গ করলো। কেইনের থেকে আবেলের উৎসর্গ ঈশ্বরকে খুশী করে। এতে কেইন ভীষণ হতাশ হয়ে যায় ও আবেলের উপর প্রচণ্ড রেগে যায়। ঈশ্বর কেইনকে প্রশ্ন করেন, "তুমি এতো রেগে গেছ কেন? মুখ নীচু করে আছো কেন? তুমি যদি সঠিক কাজ করে থাকো, তবে তা কি আমার কাছে গ্রাহ্য হবে না? কিন্তু তুমি সঠিক কাজ করনি, তোমাকে পাপ অধিগ্রহণ করতে তৎপর হয়ে আছে... পাপের উস্কানিকে আমল দিও না, এড়িয়ে যাও।"



কিন্তু কেইন পাপের হাতছানিকে এড়াতে পারলো না। একদিন তার ভাই আবেলকে বলল, চলো আমরা ক্ষেতে যাই। আবেল ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করে তার সঙ্গে ক্ষেতে গেল। সেখানে কেইন আবেলকে হত্যা করল।

ঈশ্বর প্রশ্ন করলেন কেইনকে, "তোমার ভাই আবেল কোথায়?"

কেইন উদ্ধতভাবে জবাব দিলো, "আমি কি আমার ভাইয়ের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে আছি? আমি জানি না।"

ঈশ্বর আবার প্রশ্ন করলেন, "কি করেছো তোমার ভাইকে? শোন! মাটিতে তোমার ভাইয়ের রক্ত কাঁদছে। তুমি পাপী। তোমার হাত দিয়ে তোমার ভাইয়ের শরীরে রক্ত ঝরেছে,

#

সেই রক্ত মাটি শুষে খেয়েছে। আর এই মাটিতে তোমার কোনো ফসল ফলবে না। তুমি জীবনে শান্তি পাবে না, সারা জীবন তোমাকে ভবঘুরে হয়েই কাটাতে হবে।"

কেইন প্রত্যুত্তরে বলে, "এ শাস্তির ভার আমি বইতে পারব না। আজ আপনি আমাকে এখান থেকে বিতাড়িত করলে আমি এমন এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেব, যে সেখানে আপনি আমাকে দেখতেই পাবেন না। আমি ভবঘুরে হয়েই জীবন কাটাবো, কিন্তু যদি আমাকে কেউ দেখতে পায়, তবে সে আমাকে হত্যা করবে।"

ঈশ্বর বললনে, "না। যে তোমাকে হত্যা করবে, সে তোমার সাত গুণ বেশী শাস্তি ভোগ করবে।"

এই বলে ঈশ্বর কেইনের ওপর একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন, যাতে কেইনকে কেউ হত্যা না করে। এরপর, ঈশ্বরের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কেইন অন্যত্র চলে গেল। ইডেনের পূর্ব দিকে নড্ নামক এক স্থানে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু স্থায়ীভাবে সে আর জীবন যাপন করতে পারেনি।

প্রথম সারির মাঝে রয়েছেন জেসাস ক্রাইস্ট - মানবজাতির পিতা, স্বর্গের অধিপতি, সুসজ্জিত, দীপ্তিময়, আনন্দময়। কালের আগ্রাসন তাঁর বয়সকে ছুঁতে পারেনি। তাঁর মাথায় রত্নখচিত মুকুট, পায়ের কাছে ঠিক একধাপ নীচে পড়ে রয়েছে আরেকটি রাজমুকুট (সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতীকী), বাম হস্তে রয়েছে রত্নখচিত সোনার রাজদণ্ড (সার্বভৌমত্বের প্রতীক) ও ডান হস্তে তিনি সকলকে আশর্বাদ করছেন।

তাঁর ডানদিকে দেবীরূপে অধিষ্ঠান করছেন ভার্জিন মেরী বা মারিয়া (রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট লক্ষ্যণীয়; জেসাস ও মারিয়া ব্যতীত অন্য কারুর মুকুট পরিলক্ষিত হয় না) এবং বামদিকে সবুজ বস্ত্রে সজ্জিত রয়েছেন জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট। সমগ্র মানবজাতির হয়ে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন। এই সমস্ত বক্তব্য ল্যাটিনে লিপিবদ্ধ রয়েছে অল্টারপিসে। জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট জেসাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছেন, এর অর্থ ইনি সেই ল্যাম্ অফ্ গড। এই জন দ্য ব্যাপটিস্ট ও অল্টারপিসের বাইরের দিকের সেইন্ট জন (যিনি একটি ভেড়ার শিশু কোলে নিয়ে আছেন) ভিন্ন ব্যক্তি।

জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট ছিলন জেসাসের পূর্বসূরী। জেসাসের আগমন বার্তা ইনি জানতে পারেন এবং পরবর্তীকালে পবিত্র জর্ডন নদীর জলে জেসাসের ব্যাপ্টিজম সম্পন্ন করেন। জন ছিলেন জাকারিয়াহ ও এলিজাবেথের ঈশ্বর দত্তক সন্তান। কথিত আছে, এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল এলিজাবেথের কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত এক শুভবার্তা নিয়ে আসেন - ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এলিজাবেথ শীঘ্রই এক পুত্রসন্তানের মা হতে চলেছেন এবং সেই সন্তানের নাম হবে "জন"। জাকারিয়াহ প্রথমে এই ঘটনা বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ বয়স অনুসারে তাঁর স্ত্রীর সন্তানধারণের ক্ষমতা আর ছিলনা। কিন্তু, যথাসময়ে এলিজাবেথ এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন ও তার নাম রাখেন জন। এলিজাবেথ যখন অন্তঃসত্ত্বা, মেরী দেখা করতে আসেন এলিজাবেথের সঙ্গে, মাতৃগর্ভেই জন অস্থির হয়ে ওঠে; মেরীও তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদে এক শিশুপুত্রের জন্মদাত্রী হতে চলেছেন। এলিজাবেথ বুঝতে পারেন মেরীর শরীরে যে শিশু বেড়ে উঠছে, সে সামান্য কেউ নয়, ঈশ্বরের পুত্র।

#

জেসাসের ব্যাপ্টিজমের পর, জন তাঁর সমগ্র ভক্তবৃন্দদের বলেন, এখন থেকে তাঁরা যেন জেসাসের নির্দেশেই চলেন। অন্যদিকে জেসাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে গ্যালিলি ও পেরেরার রাজা হেরোড অ্যান্টিপাস ভয় পেয়ে যান; জেসাসকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দেন। জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের সঙ্গে রাজা হেরোডের মাঝেমাঝেই দেখা হয়। হেরোডের বিবাহ জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট সুনজরে দেখেননি। কারণ হেরোড বিবাহ করেছিলেন তার সৎ ভাইয়ের প্রাক্তন স্ত্রীকে; আর এই বিবাহের জন্য রাজপরিবার দেশের মানুষের মধ্যে এক মুখোরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। জন দ্য ব্যাপটিস্ট ঠিক এই কারণেই হেরোডকে ভর্ৎসনা করতেন। হেরোড যদিও জনকে সম্মান করতেন ও কিছুটা ভয়ও পেতেন। কিন্তু, হেরোডিয়াসের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত প্রতিশোধ পরায়ণা। একবার কন্যা হেরোডিয়াসের (অনেকের মতে, হেরোডের কন্যা বলে নাম হয়েছে "হেরোডিয়াস", আবার অনেকে বলেন হেরোডের কন্যার নাম সালোমী) নৃত্য প্রদর্শনে মুগ্ধ হয়ে হেরোড জানতে চান তাঁর কন্যা কি উপহার চায়। হেরোডিয়াস জানায় তার মা যা চায়, সেটাই তার উপহার। হেরোডিয়াস কিছুমাত্র দেরী না করে নিজের প্রতিশোধ পরায়ণতা চরিতার্থ করতে বলে দেন জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের মাথা চাই। অগত্যা, হেরোড নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য জন দ্য ব্যাপটিস্টকে ২৯শে অগস্ট হত্যা করেন। ২৪শে জুন জন দ্য ব্যাপটিস্ট ফিস্ট ডে হিসেবে পালন করা হয়। পৃথিবীর নানান দেশে জন দ্য ব্যাপটিস্টকে প্যাট্রন সেইন্ট হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়।

মাদার মেরী ও জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের পাশে রয়েছেন সুসজ্জিত এঞ্জেলরা, যাঁরা অনন্তকাল ধরে গেয়ে আসছেন ঈশ্বরের প্রশস্তি সঙ্গীত। লক্ষ্যণীয়, জন দ্য ব্যাপটিস্টের পাশেই রয়েছেন প্রধান গায়িকা সেইন্ট সিসিলিয়া, তাঁর অর্গ্যান নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা সেইন্ট ও এঞ্জেলদের মুখের অভিব্যক্তি ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের ভাব দেখে বলে দিতে পারেন এঁরা কী সঙ্গীত গাইছেন। এখানে সেইন্ট সিসিলিয়ার যে অর্গ্যানটি অঙ্কিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি অঙ্কনের পূর্বে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় সারির তৈলচিত্রগুলিকে একত্রে বলা হয় "হেভেনলি রেজিস্টার"। উপরের সারির ছবিগুলির মধ্যে আরও একটি বৈচিত্র্য দেখা যায় - অ্যাডাম ও ইভ এখানে বিনা বস্ত্রে রয়েছে, কিন্তু জেসাস, মারিয়া, সেন্ট ও দেবদূতগণ বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত। মেরী, জেসাস (ঈশ্বর) ও জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের একসঙ্গে পাশাপাশি অঙ্কিত চিত্রত্রয় বাইজান্টাইন আর্টের অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত দেয়।

সেইন্ট সিসিলিয়ার কথা প্রথমে জানা যায় এক গ্রীক রিলিজিয়স রোমান্সে, "লাভস্ অফ সিসিলিয়া অ্যান্ড ভ্যালেরিয়ন" জেসাসের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পরে। এরপর পোপ গ্যালাসিয়াস তাঁর স্যাক্রেমেন্টারিতে কুমারী সিসিলিয়ার কথা উল্লেখ করেন। সেইন্ট সিসিলিয়া ছিলেন রোমের এক অত্যন্ত ধনী পরিবারের ধর্মপ্রাণা কন্যা। জেসাসের জন্মের দুই শতবর্ষ পরে সিসিলিয়ার জন্ম হয়। ভ্যালেরিয়ান নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সিসিলিয়ার বিবাহ হয়। কিন্তু, বিবাহের পরেও তিনি তার কৌমার্য্য রক্ষার্থে সমস্ত শরীরে মোটা কাপড় আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখতেন এবং ঈশ্বর ও দেবদূতগণের কাছে প্রার্থনা করতেন। বিবাহের পর তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন যে তিনি চিরকুমারী হয়ে থাকার শপথ নিয়েছেন এবং একজন দেবদূত তাঁকে রক্ষা করছেন। ভ্যালেরিয়ান সেই দেবদূতকে প্রত্যক্ষ করতে চাইলে সিসিলিয়া জানান ভ্যালেরিয়ানকে আপিয়ানের রাস্তা ধরে তৃতীয় মাইলস্টোন অবধি যেতে হবে এবং পোপ উরবানুসের (উরবান) কাছে ব্যাপটাইজড হতে হবে। তবেই তিনি সেই দেবদূতকে দেখতে পাবেন। সিসিলিয়ার কথায় রাজী হয়ে ভ্যালেরিয়ান ব্যাপটাইজড হয়ে যান ও সিসিলিয়ার পাশে একজন দেবদূতকে দেখতে পান যিনি সিসিলিয়াকে গোলাপ ও লিলির মুকুট (chaplet) পরিয়ে দিচ্ছেন। ভ্যালেরিয়ানের ভাই টিবারটিয়াস এসব কথা জানতে পেরে তিনি নিজেও ব্যাপটাইজড হয়ে

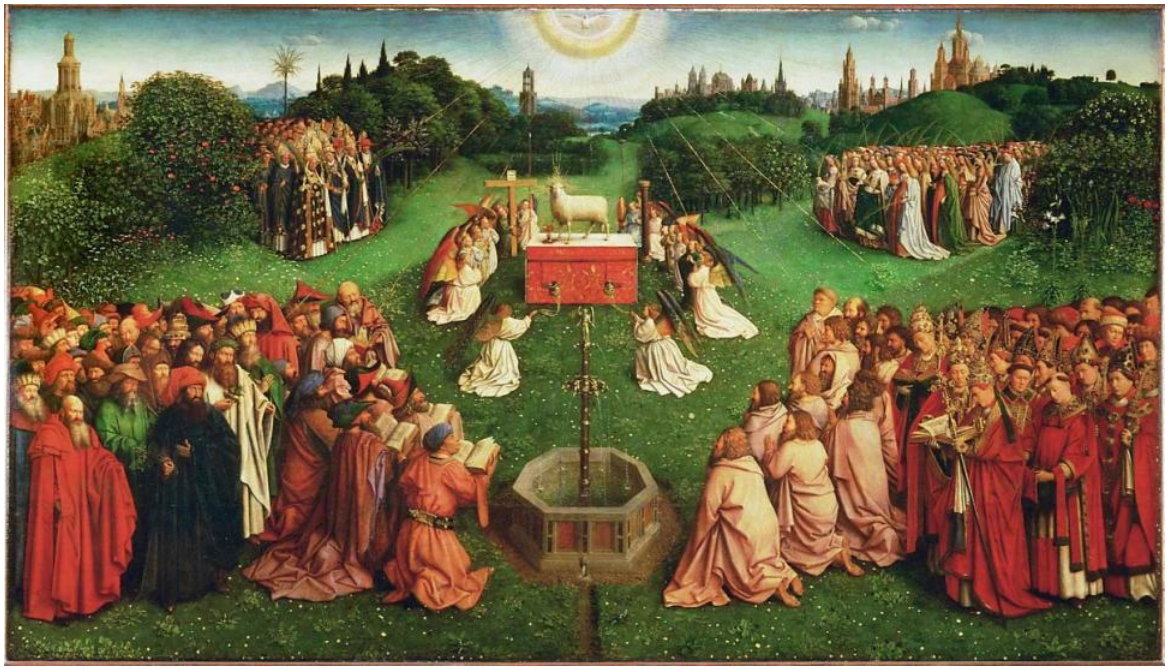
যান। এরপর ভ্যালেরিয়ান ও তাঁর ভাই টিবারটিয়াস একত্রে টার্সিয়াস অ্যালমাকহিয়াস নামক অত্যাচারী অঞ্চলপ্রধানের (prefect) বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেন। টর্সিয়াস দিনের পর দিন নির্বিচারে সেইন্টসদের হত্যা করতেন, ভ্যালেরিয়ান ও টিবারটিয়াস সেই সেইন্টসদের মৃতদেহ সঠিকভাবে সমাধিস্থ করার বন্দোবস্ত করতেন। টার্সিয়াসের কাছে একথা যেতেই তিনি ভ্যালেরিয়ান ও টিবারটিয়াসকে ধরে আনার হুকুম জারি করেন। পরে তাঁদের দু'জনকেই হত্যা করা হয়। ভ্যালেরিয়ান ও টিবারটিয়াসের মৃত্যুর পর সিসিলিয়া ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন ও পোপ উরবানুসের কাছে অনেক মানুষকে ব্যাপটাইজড করেন। এরপর টার্সিয়াসের রোষানলে সিসিলিয়াকে ধরে আনা হয় ও একটি চৌবাচ্চায় (bath) তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়। একরাত ও একদিন তাঁকে চৌবাচ্চায় বন্ধ করে রেখে তারপর আগুন জ্বালিয়ে যখন শ্বাসরোধের জন্য প্রচণ্ড গরম ধোঁয়ায় চৌবাচ্চা ভর্তি করে দেওয়া হয়, দেখা যায় সেখানে সিসিলিয়ার একবিন্দু ঘামও ঝরেনি। টার্সিয়াসের কানে এই কথা যেতে তিনি জহ্লাদ পাঠান সিসিলিয়ার মুণ্ডচ্ছেদের জন্য। জহ্লাদ তিনবার সিসিলিয়ার মুণ্ডচ্ছেদের চেষ্টা করলেও অকৃতকার্য হয়ে সে রক্তাক্ত সিসিলিয়াকে চৌবাচ্চায় রেখেই চলে আসে। এর তিনদিন পর সিসিলিয়া মারা যান। কথিত আছে সেই অবস্থাতেও সিসিলিয়া ধর্মের বাণী প্রচার করতেন বা প্রার্থনা করতেন। লোকজন এসে তাঁর পবিত্র রক্ত নিয়ে যেত। তৃতীয় দিনে সিসিলিয়ার মৃত্যু হয় ও পোপ উরবানুস এবং অন্যান্য ডেকানরা তাঁকে সমাধিস্থ করেন। সিসিলিয়াকে স্বর্গীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলা হয়, কারণ তিনি তাঁর অন্তরে স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে পেতেন। তাই তাঁর ছবিতে সর্বদা তাঁকে অর্গ্যান বা অর্গ্যান পাইপ হাতে নিয়ে থাকতে দেখা যায়।



দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে সেই বহু-চর্চিত, জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র "ল্যাম্ অফ্ গড"। দ্বিতীয় সারিতে মোট পাঁচটি তৈলচিত্র আছে যার মধ্যে মাঝের ছবিটি সবথেকে বেশী প্রতীকীপূর্ণ। ছবিতে যে ল্যাম্ বা সাদা ভেড়ার ছবিটি দেখা যাচ্ছে, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার বুক থেকে রক্ত ধারা এসে একটা চ্যালিস বা পানপাত্রে (ওয়াইনের গ্লাসের মতো দেখতে পাত্র বিশেষ) পড়ছে। এই ছবিটিতে প্রতীকী - ল্যাম্ বা ভেড়াকে জেসাসের প্রতিভূ হিসেবে ধরা হয়েছে, যিনি নির্মল ও সুন্দর; যাঁর আত্মত্যাগ পৃথিবীর মানুষকে তাদের পাপের থেকে মুক্তি দিয়েছে। রক্ত ভরা চ্যালিসকে রেড ওয়াইনের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় - ক্রিশ্চানিটিতে রেড ওয়াইন পবিত্র পানীয় হিসেবে ধরা হয়। সাদা ভেড়াটি এখানে মৃত্যুভয়ে ভীত নয় – সে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে সমস্ত মানুষের দিকে, প্রতিবাদহীন কিন্তু রক্তাক্ত - জগতের পাপের মাঝে নিষ্পাপ জীবনের যেন এক শাশ্বত প্রতিভূ।

#

ছোট্ট সাদা ভেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে ভরা এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। অলৌকিক স্বর্গীয় আলোয় ভরে গেছে সেই সবুজ ক্ষেত্র। অসংখ্য ছোট ছোট ফুল ও গাছে ভরে আছে সেই সবুজ মাঠ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর ইউরোপের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে মিল আছে এই ঘাসে ভরা সবুজ মাঠের। মাঠের মধ্যে যে ছোট ছোট ফুলগুলি রয়েছে, তার মধ্যে মোট ত্রিশ রকমের ফুলকে এযাবৎ চিহ্নিত করা গেছে।



চিত্রটির একেবারে শেষের দিকে যে নদী বা জলধারাটি বয়ে গেছে, অনেকের মতে নতুন জীবনের উৎস হিসেবে এটি পবিত্র জর্ডন নদীকে দেখানো হয়েছে। সামনের অষ্টমুখী ফোয়ারাটি অনন্ত জীবনের প্রতীক - আট সংখ্যাটি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে নবজন্মের (resurrection) প্রতীক। ফোয়ারার বারোটি মুখ - বারো সংখ্যাটি বারো জন অ্যাপাসালসের (Apostle) ও ইজরায়েলের বারোটি উপজাতির কথা বোঝায়; বারো সংখ্যাটি ক্রিশ্চিয়ানিটিতে পূর্ণতার প্রতীক। ফোয়ারার আধারটি অষ্টমুখী - নিউ টেস্টামেন্টের আটটি জেসাস প্রদত্ত আশীর্বাদবাণীর (Eight Beatitudes) প্রতীকীঃ

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of Heaven.

Blessed are those who mourn: for they will be comforted.

Blessed are the meek: for they will inherit the earth.

Blessed are those who hunger and thirst for righteousness: for they will be filled.

Blessed are the merciful: for they will be shown mercy.

Blessed are the pure in heart: for they will see God.

#

Blessed are the peacemakers: for they will be called children of God.

Blessed are those who are persecuted for righteousness sake: for theirs is the kingdom of heaven.



ফোয়ারা থেকে একটি সরু নালা বা চ্যানেল চিত্রের সামনে অবধি (মনে হবে, ছবির দ্রষ্টার জন্যই এই নালাটি কাটা হয়েছে) কাটা আছে, এই চ্যানেলটির শেষ দিক দর্শকের অগোচরেই রয়ে গেছে। এই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে পবিত্র ফোয়ারার জল, যা সকল দর্শক তথা সমগ্র পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখবে : "river of life-giving water, sparkling like crystal," will flow "from the throne of God and of the Lamb" (Revelation 22:1).

জলধারা বা নদীর সামনেই বামদিকে একটি খেজুর গাছের প্রতিকৃতি দেখে অনুমান করা যায়, এটি জেরুজালেমের কোনো এক স্থান চিত্রে বর্নিত হয়েছে।

উৎসর্গের জন্য রাখা ভেড়াটির বেদীর পাশে জমায়েত হয়েছেন অনেক মানুষ। তাঁদের পবিত্রতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য তাঁরাও স্বর্গে নবজীবন (reborn) লাভ করেছেন। এঁদের পুণ্যাত্মা বা রাইটিউস সোল (righteous souls) বলা হয়। ফোয়ারার বামদিকে রয়েছেন পেট্রিআর্কস (ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী এঁরা বর্তমান মানব জাতির পিতা, যেমন - আব্রাহাম/ইব্রাহিম, ইসাক/আইজ্যাক, জেকোব প্রমুখ) এবং প্রফেট, যাঁরা জেসাসের আগমন বার্তা জানিয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন পেগান ও ধর্মযাজকগণ।

ভেড়াটির ডান দিকে হাঁটু মুড়ে রয়েছেন অ্যাপাসালস্ (জেসাসের ১২ জন প্রধান শিষ্য), তাঁদের পেছনে রয়েছেন



ধর্মপুস্তক হাতে চার্চের যাজকগণ (ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রধান চারজন যাজক - ইসাইয়াহ্, জেরেমিয়াহ্, এজেকীল্ ও ড্যানিয়েল/দানিয়েল; তিন জন পোপ, ছয় জন বিশপ ও দু'জন ডেকান), মহিলা ও পুরুষ ধার্মিকগণ (যাঁদের ধর্মরক্ষার কারণে হত্যা করা হয়েছিল), সন্ন্যাসীগণ ও তীর্থযাত্রী। মহিলাগণ হাতে খেজুরপাতা ধরে আছেন, যা বিজয়ের প্রতীক - অধর্ম বা পাপ থেকে ধর্ম বা পরিত্রাতার জয়। অনেক মহিলা মাথায় লরেল পাতার চ্যাপলেট দেখা যায়, এই লরেল পাতা আজও বিজয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে সকলের পোষাক কিন্তু লাল নয়, যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, কেবলমাত্র তাঁদেরই পোষাক লাল। অ্যাপাসালসদের পায়ের পাতার নীচের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁদের পায়ের পাতা অপরিষ্কার, তবু তাঁরা স্বর্গে তাঁদের স্থান করে নিয়েছেন - পার্থিব জগতে পাপের সঙ্গে সহাবস্থান করেও তাঁদের অন্তর অমলিন ও ভক্তিপূর্ণ। খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এঁদের পোষাক বিভিন্ন প্রকার কাপড় দিয়ে তৈরী - এক

#

এক গোষ্ঠীর মানুষের জন্য এক এক মানের পোষাক - কারণ সমাজে সকলে একই প্রকার বা একই মানের বস্ত্র পরিধান করতে পারেন না - কিন্তু সকলের স্থান বেদীর উপর রাখা ছোট্ট ভেড়াটির নীচে। একমাত্র হোলি স্পিরিট হিসেবে আকাশ থেকে সাদা পায়রাটি (Dove) তার জ্যোতির্ময় দীপ্তি সকলের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। সাদা পায়রাটির চারিধারে রয়েছে রামধনুর বলয়, যা জগতের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও স্বর্গের গরিমার প্রতিভূ।

সাদা পায়রার ছবিটি ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, তার অর্ধেক কেবল দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্ধেক যেন আপার রেজিস্টারের ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে। বাইবেল ও ধর্মীয় কাহিনী অনুযায়ী এই সাদা পায়রার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। ১৯৪৯ থেকে সাদা পায়রাকে শান্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, কারণ বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোর অঙ্কিত একটি পোস্টার "ওয়ার্লড পীস কংগ্রেসের" জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সেইখান থেকে সাদা পায়রাকে শান্তির প্রতীক বলে মনে করার মিথটি আরম্ভ হয়। কিন্তু সাদা পায়রা প্রকৃতপক্ষে কিসের অর্থ বহন করে তা জানতে গেলে ইতিহাসের পাতা ধরে অনেক পিছিয়ে যেতে হবে। জেসাসের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকেই গ্রীক দেবী আইরিনকে শান্তির দেবী হিসেব পূজা করা হতো এবং দেবী আইরিনের খুব প্রিয় একটি বস্তু ছিল অলিভ ও অলিভ গাছ। ওল্ড টেস্টামেন্টে নোয়াহ'স আর্ক গল্পেও বলা হয়েছে সাদা পায়রার কথা। কিন্তু সেখানে সাদা পায়রাকে কখনোই শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়নি। ঈশ্বরের অভিশাপে যখন সমস্ত পৃথিবী ক্রমাগত চল্লিশ দিন - চল্লিশ রাতের বর্ষণে বন্যায় ডুবে যায়, সকল জীবকুলের যখন বিনাশ হয়, একমাত্র নোয়াহ ও তাঁর নৌকায় বন্ধ থাকা জীবেরাই বেঁচে থাকে। ১৫০ দিন পর, বন্যার প্রবলতা কমে যেতে নোয়াহ প্রথমে একটি দাঁড়কাককে নৌকা থেকে ছেড়ে দেন। পরে একটি সাদা পায়রাকে তাঁর নৌকা থেকে মুক্ত করে, কারণ যদি সে মাটি না খুঁজে পায়, তাহলে আবার নৌকোয় ফিরে আসবে। কিন্তু, সাদা পায়রাটি প্রথমে বসার কোনো জায়গা না পেয়ে আবার উড়ে নৌকোয় চলে আসে। নোয়াহ তাকে নৌকোর মধ্যে আবার আশ্রয় দেন। সাত দিন পর, নোয়াহ আবার সেই সাদা পায়রাটিকে ছেড়ে দেন, এইবার পায়রাটি উড়ে গিয়ে একটি অলিভ গাছের ডাল মুখে করে ফিরে আসে। নোয়াহ বুঝতে পারেন জল নেমে গিয়ে আবার পৃথিবীতে আগের মতো প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করেছে। পায়রাটিকে নোয়াহ নিজের কাছে নৌকোয় রেখে দেন। আরও সাত দিন পর পায়রাটিকে ছেড়ে দিলে সেটি আর ফিরে আসে না।

এই কাহিনীতেও, অলিভ গাছের ডাল শান্তির প্রতীক বহন করে; কারণ তখন সেই ভয়াবহ বৃষ্টি শেষ হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসছে। সাদা পায়রা হলো মুক্তির প্রতীক। পৌরাণিক কাহিনীতে সাদা পায়রার সম্পর্কে বলা হয়, যে ডেভিল যেকোনো পাখির রূপ ধারণ করতে পারলেও, সাদা পায়রার রূপ ধারণ করতে পারে না।

সাদা পায়রা নিউ টেস্টামেন্টে দেখা যায়, জেসাসের ব্যাপ্টিজমের সময়। জেসাস ব্যাপটাইজড হতে গ্যালীলি থেকে জর্ডনে আসেন। জন দ্য ব্যাপটিস্ট জেসাসকে দেখে বলেন আপনার কাছেই আমার ব্যাপটাইজড হওয়া উচিৎ, আর আপনি আমার কাছে ব্যাপটাইজড হতে এসেছেন! কিন্তু, জেসাস বলেন, যা হচ্ছে তা হতে দিন, আমাদের সঠিক কর্ম করে যাওয়াই উচিৎ। অতঃপর, জন দ্য ব্যাপটাইজড জেসাসকে ব্যাপটাইজড করেন। জর্ডান নদীতে স্নান করে জেসাস যখন উঠে আসছেন, তখন আকাশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। জেসাস দেখেন সাদা পায়রার রূপ ধরে ঈশ্বর নেমে আসছেন ও তাঁর

দীপ্তি জেসাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সময় দৈববাণী হয়ঃ এই আমার পুত্র, যাকে আমি ভালোবাসি। যার প্রতি আমি অত্যন্ত তৃপ্ত।

এখানেও কিন্তু সাদা পায়রা মুক্তির প্রতীভূ, কারণ জেসাস এসেছিলেন মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করতে। নিউ টেস্টামেন্টে জেসাসের বাণীগুলি পড়লে দেখা যায়, শান্তির বাণীর পাশাপাশি তিনি বেশী করে মানব জাতিকে পাপ মুক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন।

নিউ টেস্টামেন্টে (ম্যাথিউ ১০:১৬) জেসাস সাদা পায়রাকে অহিংস বোধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ম্যাথিউয়ের লেখা গসপেলের ১০:১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনেই লেখা আছে; তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন : "Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves."

ক্ল্যাসিকাল আইকোনোগ্রাফি অনুযায়ী, এই শিল্পশৈলীর ভাবধারাকে locus amoenus বলা হয় - পবিত্র জীবন যাপন থেকে স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ। অ্যাডাম ও ইভের পৃথিবীতে আগমন নেতিবাচক সূচনা হলেও, সম্পূর্ণ ছবিটি ভাল করে দেখলে এর মধ্যে ইতিবাচক ভাব অনেক বেশী।







ছবির প্রেক্ষাপট নিয়ে দ্বিমত আছে - অনেকের মতে ছবিটিতে জেরুজালেমকে দেখানো হয়েছে, কারণ খেজুর গাছ, জর্ডন নদী, চার্চ তারই সাক্ষ্য বহন করে। অন্যদিকে, মনে করা হয় এটি স্বর্গের এই দৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে, কারণ ফোয়ারার সামনে যে দামী পাথর পড়ে আছে বা এঞ্জেলদের আগমন, তা জেরুজালেমের সাক্ষ্য বহন করে না। অনেকে এই দুই মত মিশিয়ে এক নতুন ভাবাদর্শকে তুলে ধরেছেন, ভেড়াটির বলিদানে বা জেসাসের ক্রুসিফিকশানে মর্ত্যলোকের সমস্ত পাপ ধুয়ে তা স্বর্গধামে পরিণত হয়েছে।

#

স্বর্গধাম ও পার্থিব জগতের মেলবন্ধনে অঙ্কিত দ্য মিস্টিক ল্যামের নীচের পাঁচটি প্যানেল আলাদা আলাদা হলেও এগুলি একটি সম্পূর্ণ ছবি ও বিষয়বস্তুর উপসংহার। এই ছবিটির আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একই সঙ্গে একই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত করে দেখানো - এখানে রাইটিউস জাজ, ক্রুসেডার (Christi Milites), অতি সাধারণ মানুষ সকলেই এসেছেন সর্বশক্তিমান দেবতার কাছে তাঁদের মুক্তির জন্য।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে সব পশু থাকতে কেবলমাত্র ল্যাম্ বা ভেড়াটিকে কেন জেসাসের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে? এর মূল প্রোথিত আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। এক্সোডাসের কাহিনী অনুসারে, ঈজিপ্টে বসবাসকারী ইজরায়েলীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে ও তাঁদের প্রতিশ্রুত জমি (Promised Land) দিতে ঈশ্বর ঈজিপশিয়ানদের পরিবারের সকল নবজাতকদের হত্যা করেন। ইজরায়েলী পরিবারগুলি ঈশ্বরের এই ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে যায়, কারণ ঈশ্বর তাদের আদেশ করেন যে একটি অক্ষত ভেড়াকে হাড় না ভেঙে হত্যা করে তাদের বাড়ীর বাইরের দরজার সামনে সেই ভেড়ার রক্ত মাখিয়ে রাখলে সেখানে মৃত্যুদূত এসে তাদের নবজাতকদের হত্যা করবে না। যেদিন ইজরায়েলীরা ঈশ্বরের নেতৃত্বে তাদের সেই প্রমিসড্ ল্যান্ডের দিকে যাত্রা শুরু করে, তার আগের রাত্রে তারা সেই মৃত ভেড়ার মাংস রান্না করে খায়। এই দিনটি আজও জ্যু (Jewish) সম্প্রদায় "ফিস্ট অফ পাসওভার" নামে উদযাপন করেন এবং এই উৎসবে ভেড়ার মাংস খাওয়া একটি প্রথা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ভেড়াটির মৃত্যু যেমন ইজরায়েলীদের দাসত্ব ও মৃত্যু থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তারা প্রমিসড ল্যান্ডে স্থান লাভ করেছিলেন, তেমনি জেসাসের ক্রুসিফিকশান সমগ্র মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিল এবং স্বর্গরাজ্যে স্থানের অধিকার দিয়েছিল। গসপেল অফ জনে পরিষ্কারভাবেই লেখা আছে, যেদিন জেসাসকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, সেই একই দিনে ইজরায়েলীরা মন্দিরে ভেড়া বলি দিয়েছিলেন (John 19:31)।

অল্টারপিসের খোলা দিকটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম সারির ছবিগুলিকে আপার রেজিস্টার (Upper Register) বলা হয় ও দ্বিতীয় সারির ছবিগুলিকে লোয়ার রেজিস্টার (Lower Register) বলা হয়। প্রথম সারির ছবিগুলি সমস্তই স্বর্গধামের ছবি – অ্যাডম ও ইভের ছবি দু'টি পৃথিবীতে তাদের পদার্পণের পূর্বমূহুর্তের ছবি; ক্রাইস্ট, মেরী, জন দ্য ব্যাপটিস্ট, এঞ্জেল, সেইন্ট - সকলেই একত্রিতভাবে স্বর্গে বিরাজ করছেন। যদিও অনেকের মতে মাঝের ছবিটি ক্রাইস্টের নয়, বিতর্কে না গিয়ে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলাই শ্রেয়। কিন্তু লোয়ার রেজিস্টারের ছবিগুলি মর্ত্যের বা আমাদের পৃথিবীর ছবি। ঈশ্বরের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের ছবি।

আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হল, ধর্মীয় চিত্রাঙ্কনে নানান কোড ব্যবহার হয় - রং, সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে সেই কোড তৈরী হয়। এই কোডগুলি একটু জানা থাকলে ছবিগুলি বুঝতে সুবিধে হয়। আমরা এখানে অনেকের অনেকরকম রঙয়ের পোষাক দেখেছি, কোন কোন ছবি আঁকা হয়েছে সম্পূর্ণ ছাই-ছাই রঙয়ের বিভিন্ন শেডে। এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবে এক এক জায়গায় এক এক রকম রঙের গুরুত্ব। যেমন - লোহার গায়ে মরচে পড়ার অর্থ হলো দুর্নীতি; সাদা পবিত্রতার চিহ্ন হলেও সাদা দাঁত ভয়ের প্রতীক ও সাদা দুধ দুঃখের প্রতীক।

নীচে এগুলি সংক্ষেপে লিখে দিলামঃ

- কালো : মৃত্যু, পাপ, রোগ, খরা, দুঃখ, ধ্রুবত্ব/অপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, গর্ভ, ভয়।

- সাদা : নির্মলতা, পবিত্রতা, কুমারীত্ব; কখনও রূপার রং বোঝাতেও সাদা ব্যবহৃত হয়।

- লাল : আধ্যাত্মিকতার জাগরণ, আনন্দ, ভালবাসা, দান, রক্ত, শহীদ, চামড়ার রং, লাল ওয়াইন, ঘা বা প্লেগ, বীরত্ব, শয়তান, যুদ্ধ, লোভ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি।

- ক্রীমসন : পার্থিব বস্তু, পাপ, রক্ত, বলি, যুদ্ধ ইত্যাদি।

- স্কারলেট : মহিয়সী মহিলা, অজ্ঞতা, পাশবিক, ধ্বংসাত্মক, নিষ্ঠুর ইত্যাদি।

- অ্যাম্বার : ঈশ্বরের দীপ্তি, ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।

- কমলা : শক্তি, আবেগ, জ্ঞান, সূর্য।

- পার্পল : রাজকীয়তা, সার্বভৌমত্ব, প্রাচুর্য, অসদুপায়ে ধনী; পার্পল রোব পরিহিত সৎ ব্যক্তি, পার্পল পর্দা বিভাজনের চিহ্ন। বিশ্বাস, উপোস, ধৈর্যেরও প্রতীক।

- সবুজ: স্বাধীনতা, আশা, জয়, সজীবতা, প্রাণ, বাহুল্য, মৃত্যুর উপর জীবনের জয়, মাংসাদি উৎসর্গ, পরিপূর্ণতা ইত্যাদি।

- গ্রে : অনুশোচনা, বার্ধক্য, বার্ধক্যের সৌন্দর্য, দুর্বলতা, পরিশ্রুত হওয়া ইত্যাদি

- হলুদ : স্বর্ণ, স্বর্গীয়, পবিত্রতা, আনন্দ, যৌবন, আতিথেয়তা, প্রেম, উদারতা; আলোর ক্ষেত্রে হলুদ হলে দুর্নীতি, দুরাচার।

- নীল : স্বর্গ, সত্য, কোন বিশেষ মানুষ/জীব/বস্তুর আগমনের কারণে উৎসবের আভাস, ভালো কাজ, নিরীহ, আশা, সুস্বাস্থ্য।

- খয়েরী : আধ্যাত্মিক কারণে মৃত্যু, অধঃপতন, পৃথিবী, পৃথিবীর সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ।

আমাদের কথাঃ

আমি খুব সাধারণ মানের দর্শক, তাই ছবি বা মূর্তি সম্পর্কে আমার জ্ঞানও সীমিত। "মনুমেন্ট মেন" ছায়াছবিটি দেখার পর এই ছবিটি সম্পর্কে আমরা বিশেষ আগ্রহী হয়ে বেলজিয়ামের গেন্টে যাই ও সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রালে ছবিটি খোলা অবস্থায় দেখি। সেদিন রবিবার বা ছুটির দিন ছিল না বলে অল্টারপিসের পশ্চাৎদিক দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ব্রাসেলস নর্ড থেকে ট্রেনে গেন্ট অবধি যেতে হবে। গেন্টে ১ নং ট্রাম ধরে ট্রামওয়ালা বা কো-প্যাসেঞ্জারদের কাউকে

বলতে হবে সেন্ট বাভো'স ক্যাথিড্রালে (Sint-Baafskathedraal / St. Bavo's Cathedral) নামতে চাই। ঐ অনেকটা কলকাতার স্টাইল - দাদা ক্যাথিড্রালটা এলে বলে দেবেন তো! ওরাই বলে দেবে। ট্রামওয়ালাকে যদি দেখেন ট্রামের ট্র্যাকে কেউ গাড়ি তুলেছে বলে চিৎকার করছে, ঘাবড়াবেন না - এটা সর্বত্র হয়। ট্রাম স্টপে নেমে একটু হেঁটে সোজা গেলেই বিশাল চত্বর। আসল ক্যাথিড্রাল এবং ক্যাথিড্রালের বেল টাওয়ার আলাদা - প্রথমে টাওয়ার আসে, তারপর আসল ক্যাথিড্রাল। ক্যাথিড্রালে কোন বয়স্ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে তিনি দেখিয়ে দেবেন অল্টারপিসটি কোথায় আছে। বুলেটপ্রুফ কাচে ঘেরা, ছবি তোলা বারণ।





আজকাল মিউজিয়াম বা চার্চ কোথাও ছবি তুলতে দেয় না - সিকিওরিটির জন্য ও ফ্ল্যাশে ছবি খারাপ হয়ে যাবে এই ভয়; এখন আরও একটি নয়া উৎপাত হল সেলফি - ডাণ্ডা ও মোবাইল সহযোগে ছবি তোলা হয়। তাই মূলছবির জন্য অগত্যা গুগল ভরসা। তবে শেষের তিনটি ছবি আমরা তুলেছি। চার্চের ভেতরে ছোট একটি কিয়স্ক আছে। অনেক ছবি পাওয়া যায়। বইও অনেক আছে, তবে বেশীরভাগ লেখা ডাচ বা ফ্রেঞ্চে। আমরা আমাদের পছন্দের বইটা কিনলুম - বেশ ভাল বই, চার্চের ইতিহাস, অনেক ছবি এবং তার সঙ্গে এই অল্টারপিসের বর্ণনা। বইটির থেকেই অনুবাদ করে লিখলাম। লেখাটা পড়ে ভাল লাগলে, আমাদেরও ভাল লাগবে। তবে কি, দুধের স্বাদ ঘোলে তো মেটে না, যারা যারা পারবে একবার নিজেরা দেখে এসো, নিজে চোখে না দেখলে অনুভব করতে পারবে না। আর অনুভব না করলে এসব জিনিসে আনন্দ নেই।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

স্বাগতা ঘোষের নানান রকমের শখ আছে। প্রকৃতি ও জীবনের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য নিয়ে ভাবতে ভাললাগে তার। পশু-পাখি, গাছ-পালা নিয়ে থাকতে ভালবাসে স্বাগতা।

লাকি লুক

বাউণ্ডুলে

গস্‌কিনি রচিত ❐ মরিস্‌ চিত্রিত

অনুবাদ ঃ সুব্রত চক্রবর্ত্তী



#

বাউন্ডুলে

এই নামই দেওয়া হত গোচারণভূমিতে জন্মানো নামহীন পশুদের, আর তারা পালিয়ে যেত স্বাধীনতার সন্ধানে। তেমনই এক বাউন্ডুলে বাছুরের ভাগ্যে ঘটেছিল এক অদ্ভুত ঘটনা।
এ গল্প তারই...





#


অ্যাই! তুমি কি পাগল না পেট খারাপ? তোমার ওই বাছুরটাকে ধরার কথা!
বোকার মতো কথা বোলো না! আমি জাস্ট তোমার জীবনটা বাঁচিয়ে দিলুম...
তোমার বাছুর অ্যাপাচেদের এলাকায় ঢুকেছে... আর ইদানিং অ্যাপাচেরা খুব ক্ষেপে আছে...
আমাকে ওই বাছুরটাকে ধরতেই হবে! ওটা আমার গোশালা থেকে পালিয়েছে! অ্যাপাচে থাক বা না থাক, আমি ওকে ধরবোই!
তোমার জন্য আমার ঘোড়াটা হারিয়েছে, কুছ পরোয়া নেহি, সময় একটু বেশি লাগবে, কিন্তু বাছুরটাকে আমি ধরেই ছাড়ব।
দাঁড়াও দাঁড়াও!!
ঠিক আছে। ওই বাছুরটা যদি তোমার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আমিই ওটাকে ধরে আনবো। কিন্তু তুমি এখানেই থাকো।
বাছুরটার গন্ধ পাচ্ছিস, টরটরে টাট্টু?
অ্যাপাচেদের গন্ধই বেশি, কাউবয়...
ওই তো!
হা-ম-ম-বা-বা-আ-আ-আ!...

#


শক্ত করে ধর, টরটরে টাট্টু!
আবার শেখাতে আসছ তো!
গঁঅঅঅগ!
অ্যাপাচেরা দেখার আগেই ঝড়াক্‌সে কেটে পড়ি চল, চুপচাপ, ঝামেলা না করে...
হাত তোল, ব্যাটা চোরাচালানকারী!
তুমি যেই হও, চেঁচিও না। এখানে চারদিকে অ্যাপাচে গিজগিজ করছে।
এই বাছুরটা আমার। তুমি কি জানো এই অঞ্চলে আমরা গরুচোরদের কি করি?
গুড়ুম!
এতো আওয়াজ করা বন্ধ কর!
রশন !
তোমার ঘোড়া থেকে নামো মারডক!
তোমার স্বভাব গেল না। ওই বাছুরটা যে আমার, সেটা তুমি ভাল করেই জানো মারজক!
ঘোড়ার ডিম! ওটা আমার গোশালার বাছুর! আমি আজই ওটার গায়ে ছাপ মারব ভেবেছিলাম!!
আমরা এখানে আর থাকতে পারি না। তোমাদের চিৎকার আর গুলির শব্দ অ্যাপাচেদের সতর্ক করে দিয়েছে!

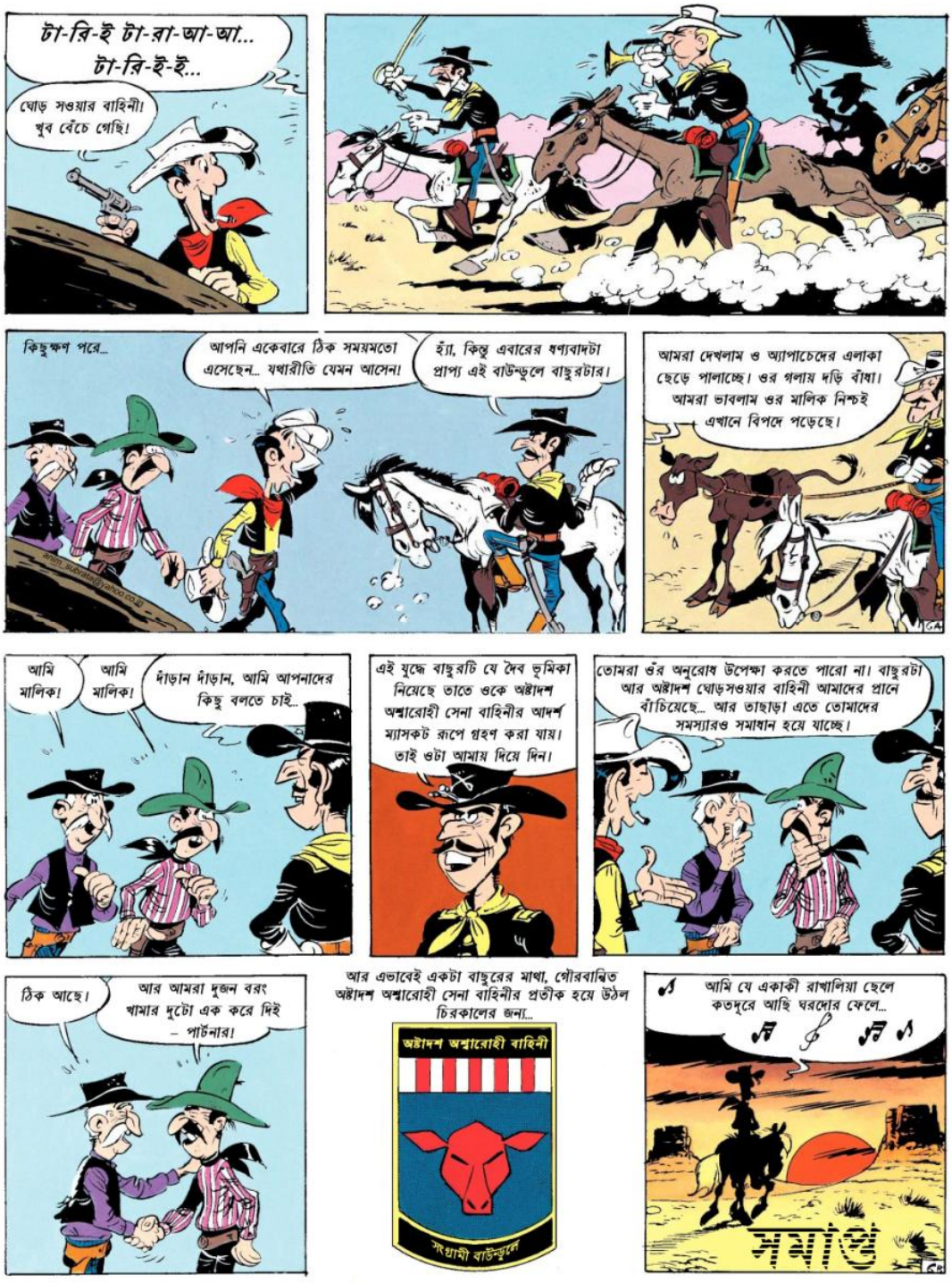
#


এর থেকে দূরে থাক চেরাচালানকারী!
আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না আগন্তুক!
যথেষ্ট হয়েছে মারডক! তুমি সবসময় আমার বাছুর চুরি কর!
সাহস থাকলে বন্দুকটা নামিয়ে আরেকবার কথাটা বলো দিকি!
যথেষ্ট হয়েছে মারডক! তুমি সবসময় আমার বাছুর চুরি কর!
তোমাদের কি শেষ হয়েছে? আমাদের এক্ষুনি কেটে পড়া উচিত!
গুড়ুম!
আমি যখন কিছু বলবো, চুপচাপ শুনবে!
গুড়ুম!
আমার বাছুর!
না, আমার বাছুর!
লুকিয়ে পড়ো। অ্যাপাচেরা আসছে।

#


গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম! গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
গুড়ুম!
আর সবার উপরে, একমাত্র আমার কাছেই এই ছ-ঘরা বন্দুকটা আছে!
আমি ওখানে যাচ্ছি!
ওখানে? পাগল নাকি?
আমাকে আমার বাছুরটাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে!
ওটা আমার বাছুর। আমিই যাবো।
কেউ কোথাও যাচ্ছে না! বাছুর বাছুর করে অনেক হয়েছে! বাছুরটা কি এমন অসাধারণ জিনিস ?!...
মারডক হলো আমার প্রতিবেশী। আমরা দুজনেই খামারের মালিক...
আর রসন আমাকে হিংসে করে। ও সব সময় আমার থেকে গরু-বাছুর চুরি করতে থাকে, যাতে ওর কাছে আমার থেকে কটা বেশি থাকে।
তুমি কিন্তু একবার নয়, অনেকবার আমায় চোর বল্লে, মারডক!
ঝগড়া-ঝাঁটি বন্ধ করে প্রার্থনা করো এবার! আমার গুলি সব শেষ আর অ্যাপাচেরা আক্রমন করতে আসছে!
অ্যা-অ্যা - ই-ই-ই! হুকা - হুকা- হ্যেঃ!

#



লেখক পরিচিতি

সুব্রত ছোটবেলা থেকেই গল্পের বই পড়তে ভালবাসেন। আগে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং নিয়মিত লেখার অভ্যাস থাকলেও বর্তমানে কাজের চাপে আর কিছুই হয়ে ওঠে না। ইদানীং কিছু কমিকস অনুবাদে হাত দিয়েছেন।

#



লাভ ডিটেকটেড

স্বাতী রায়

দুপুর থেকে আকাশ ঝুঁকে শহরের বুকে নেমে এসেছে। এক'শ ষাট তলার জানালা দিয়ে মেঘ ঢুকে আসছে, সঙ্গে প্রবল হাওয়া। জানালার কাচগুলো ঝনঝন করে উঠছে থেকে থেকেই। আজকাল যখন তখন খুব শরীর জেগে ওঠে সায়ন্তনের, কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পাগল পাগল লাগে। ল্যাবে কাজ করতে করতে মাইক্রোস্কোপের তলায় কিছু বিশেষ কোষ দেখেও জাগতে থাকে। অসহায় লাগে খুব, মাথার ভিতর যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। মনে হয় হাতের সামনে যা পায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। নাঃ, সহ্য করা যাচ্ছে না আর।

এই ২০৯৬ সালে রাস্তায় বেরোলে মেয়ে দেখা যায়ই না প্রায়। গত শতকের যথেচ্ছ কন্যা ভ্রূণ হত্যা, জন্মের পর কন্যাসন্তান হত্যায় এমনিতেই মেয়েদের অনুপাত কমে এসেছিলো, তার উপরে তৎকালীন এক মহিলামন্ত্রীর মহিলাদের প্রতি কুরুচিকর ভাবনা, বিচার ও ভাষায় বিরক্ত হয়ে একদল বিজ্ঞানী একটি গোপন রিসার্চ চালান। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিজ্ঞানী রাজিয়া সুলতানা। এই দলটির ভাবনা ছিল যে সমাজে মেয়েদের এত অবমাননা সেখানে মেয়েদের জন্ম না হলে কি দাঁড়ায় তা দেখা। সমস্ত উন্নত শহরের হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ওষুধের দোকানে এঁরা ছড়িয়ে দেন এমন এক ওষুধ যা পুরুষ শরীরে ইনজেক্ট করলে তাদের স্পার্মের X ক্রোমোজোম কে Y ক্রোমোজোমে পরিবর্তিত করে দেবে, ফলত XX ক্রোমোজম হবেই না, সবই XY। পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়ে একশো শতাংশ সাফল্য পাওয়ার পর শহরগুলির কোনো হাসপাতাল বা নার্সিংহোমেই কোনো কন্যাসন্তানের আগমনের হদিস পাওয়া যায়নি। গ্রামাঞ্চলেও এই ওষুধ ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি, ৮০-৯০% পিতা মাতাই চাইতেন যেন পুত্রসন্তান হয়। কিছু স্বপ্ন দেখা পিতা মাতা যাঁরা মনেপ্রানে কন্যা চাইতেন, তাদের অজান্তে পরিস্থিতির শিকার হতে হল, বিজ্ঞানের উন্নতির ভাষায় একে বলে কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ। কয়েক দশকের ভিতর দেশে সাধারণ ভাবে জন্মদানের জন্য নারী খুঁজে পাওয়া গেল না আর। পুরুষ সন্তানের বিয়ে দেবে কার সঙ্গে মা বাবা? বংশ এগিয়ে নিয়ে যেতে যে পুরুষের এত চাহিদা তাঁরা পড়লেন বিষম ফাঁপরে। এত দিনে বিজ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে। জন্ম দিতে আর নারীশরীর, মাতৃগর্ভ প্রয়োজন নেই। কৃত্রিমভাবে ল্যাবে শিশু উৎপাদন করা যাচ্ছে। এখানেও সেই ওষুধের প্রভাবে শুধুমাত্র পুরুষশিশুই উৎপাদন করা যায়।

#

নারীবর্জিত দেশ। পুরুষ এখন জানেই না প্রেম কী জিনিস? নারীসৌন্দর্য কী? মায়ের হাতের স্নেহের স্পর্শ, বোনের আদর, আবদার, খুনশুটি সব কিছু থেকে বঞ্চিত প্রজন্ম। শরীর শান্ত করার জন্য এরিয়া নির্ধারণ করা আছে। 'এরিয়া সিক্সটি নাইন'- সেখানে রোবট যৌনকর্মীরা থাকেন। স্লট মেশিনে নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে ইচ্ছেমত সময়ের জন্য পরিসেবা পাওয়া যায়। সায়ন্তন বার কয়েক গেছে সেখানে। ঠিক কি যেন একটা অসুবিধা হয়, পরিতৃপ্তি আসে না। সাময়িক একটা আরাম হয় ঠিকই কিন্তু কি যেন নেই।

শহরে কৃত্রিম আবহাওয়া সেট করা আছে। গরমে কালবৈশাখী, শীতে স্নো-ফল, বর্ষায় বৃষ্টি সব মেপে মেপে তৈরি করা হয়। শুধু শরৎ আর বসন্ত নেই। শহরে সব গাছ কেটে ফেলে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল। এখন কোথাও কোনো গাছ নেই। শিউলি, কাশ ফুলের গাছ না থাকলে শরৎ আসবে কোত্থেকে? গাছ নেই তাই বসন্তে কোকিল ও ডাকে না। কোকিল কেন, কোনো পাখিই নেই শহরে। এ প্রজন্ম কোকিল বা কামিনী কিছুই জানে না। আজ এরিয়া সিক্সটি নাইন থেকে ঘুরে এসে অনেকক্ষণ শূন্য মাথায় বসে ছিল সায়ন্তন। হঠাৎ কি মনে পড়ল, স্টোর রুমে যেতে হবে। বহু পুরনো জিনিষপত্র ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, পরিষ্কার করা দরকার। ভ্যাপসা গন্ধ স্টোর রুমে, এত উপরে ধুলো আসে না এই বাঁচোয়া। প্রচুর আবর্জনা বের করে গারবেজ চ্যানেলে ফেলে আসার পর ঘর খালি হতে সায়ন্তন দেখতে পেলো এক কোণে একটা অদ্ভুতদর্শন বাক্স পড়ে আছে। গায়ে হিজিবিজি দাগ। এরকম আজব জিনিস এখন তো আর দেখা যায় না। এদিক ওদিক দেখে ডালা খুলে দেখলো ভিতরে থরেথরে কি যেন সাজানো। তাই তো, মিউজিয়ামে দেখেছে - এগুলোকে বই বলে। সংরক্ষণ করা হয়, এখন তো সবই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়। কাগজ তৈরির বেকার ঝামেলাই নেই। সাবধানে একটা বই হাতে নিল সায়ন্তন। এটা কি ভাষা? হাতের ঘড়ির মত যন্ত্রটা চালু করে তার থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মি দিয়ে স্ক্যান করে নিল। যন্ত্র ঘড়ি জানালো এটা বাংলা ভাষা, লেখকের নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দেখল তার তলায় আরও কিছু বই। লেখার সঙ্গে বেশ কিছু ছবি। আবার যন্ত্র ঘড়ি ও স্ক্যান - বইয়ের নাম রাজা রবি বর্মা, ভাষা মালায়ালাম, লেখক রঞ্জিত দেশাই। পাগলের মত একটার পর একটা বই দেখতে লাগলো সায়ন্তন। কোনো বইয়ের ভাষা বাংলা, কোনোটির হিন্দি, কিছু উর্দু, খান কয়েক ইংরেজিও আছে। উর্দু ভাষায় লেখা একটি বই পেলো সায়ন্তন। লেখকের নাম গালিব। ঝাড়াই বাছাই করে এই তিনটি বই নিয়ে নিজের স্টাডিতে এলো। প্রথমেই খুলে বসলো গালিব - একটার পর একটা পড়ে যেতে থাকলো যন্ত্রঘড়ির সাহায্য নিয়ে।

"ইশক নে গালিব নিকম্মা কর দিয়া,

ওয়ারনা হামভি আদমি থে কাম কে"

- ইশক আবার কি জিনিস রে বাবা, উফ, কি যে লিখতো লোকগুলো কে জানে?

এর পর রবি বর্মাকে নিয়ে লেখা বইটি। মন দিয়ে ছবিগুলি দেখতে থাকে। সামনে এক সাদা কাপড় জড়ানো অসামান্য সুন্দরী মহিলা, ভেজা গা, ভেজা কাপড়। কাপড় সরে গিয়ে একফালি খোলা স্তন দেখা যাচ্ছে, লম্বা লম্বা কালো ভেজা চুল। কিছুই মিল নেই 'এরিয়া সিক্সটি নাইন'-এর রোবোদের সঙ্গে। কেমন একটা করতে থাকে সায়ন্তন। না শুধু সেই পাগল করা শরীরের টান নয়। অদ্ভুত একটা অন্য রকম অনুভূতি, বুকের কাছটা চিনচিন করছে কি? কী মনে হতে

গুগল ডিভাইসটা টেনে নিয়ে টাইপ করল গালিব, অপশন দেখালো 'শায়েরী বাই গালিব'। বোতাম টিপতেই একটা সুর ভেসে এলো ডিভাইস থেকে, কী মোলায়েম একটা স্বর।

বুকের ব্যাথা কি বাড়ছে? যন্ত্রঘড়ি নিজের বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল সায়ন্তন, এ যন্ত্র শারীরিক সমস্যাও ধরতে পারে। যন্ত্র বলছে 'এরর ফাউন্ড', মানে এমন কোনো সমস্যা যা শারীরিক নয়, হয়ত মানসিক। নিয়ম করে প্রতি মাসে সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং-এ সবাইকে যেতে হয় সায়ন্তনদের, মানে এই প্রজন্মকে। এ মাসে ঘুরে এসেছে, সব ঠিক ছিল। 'এরর' বলছে কেন যন্ত্র? সাইকোলজিকাল কাউন্সেলরের ঘরে এসে মেশিনে টান টান শুয়ে পড়লো সায়ন্তন। রিনরিনে একটি যান্ত্রিক আওয়াজ বলল চোখ বন্ধ করতে। বন্ধ করলো সায়ন্তন। চোখে ভেসে এলো সেই কমনীয় ছবি, কানে বাজছে – "দিল হি তো হ্যায় না সঙ্গ ও খিস্ত, দর্দ সে ভর আয়ে কিয়ুঁ? রোয়েঙ্গে হাম হাজার বার কোই হামে সাতায়ে কিয়ুঁ..."

যান্ত্রিক কাউনসেলর এবার গমগমে আওয়াজে ঘোষণা করল-

শরীরে তীব্র কোনো অস্থিরতা নেই, শুধু বুকটা এখনো...

লেখক পরিচিতি

স্বাতীর নেশা ছবি তোলা, আঁকা আর বেড়ানো। ভালোবাসেন বই, দেশ-বিদেশের সিনেমা আর গান। মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা তার শখ।



ছবি

দিব্যেন্দু সিংহ রায়

আঁকাবাঁকা ছোট্ট একটা নদী, টলটলে আকাশী রঙের জল তার। নদীটার উপরে একটা নৌকা ভাসে। কখনো কখনো পাল তুলে কখনো এমনিই। নদীর পারে গাছের ছায়ায় একটা কুঁড়েঘর। সেই ঘর থেকে একটা সরু পথ মিশেছে নদীতে আর দূরে আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে সার দিয়ে। অথবা দুটো পাহাড়, পাহাড় দুটোর আড়ালে সূর্য ডুবছে। পাহাড় দুটোর সবুজ বিছানো উপত্যকায় কয়েকটা গাছপালা নিয়ে একটা বাড়ি আর বাড়িটার ঠিক দরজা থেকে একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে চওড়া হতে হতে আঁকার খাতার কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এই ছিল ছবি। এই ছবিই বারবার এঁকেছি। আঁকার পরীক্ষা থেকে প্রতিযোগিতা যেটুকু ছবি আঁকা জানতাম তার দৌড় শেষ হতো এই দুই ছবিতেই। একবার এক প্রতিযোগিতায় ছবির বিষয় হল বন্যা। আঁকার স্কুলের সবার সঙ্গে আমারও নাম ছিল। সেদিন আমার ছবির ছোট্ট নদী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো , ফুঁসে উঠলো জল। তার সে আকাশী রং আর রইলো না। গাছপালার ছায়ায় থাকা কুঁড়েঘরটা ডুবুডুবু হলো সেই পাগলা নদীর ঘোলাটে জলে। পাখিগুলো উড়লো না আকাশে। কিন্তু এতদিন যাদের দেখা যায়নি, যাদের আমি ঘরের চার দেওয়ালের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আড়াল করে রেখেছিলাম তারা দুজন উঠে এলো কুঁড়েঘরের চালায়। চোখ আঁকতে আমি জানিনা ভাগ্যিস। জানলে ওদের অসহায় , করুণ দৃষ্টিকে সহ্য করতে পারতাম না। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নাম দিইনি আর। আঁকার স্কুল ছেড়ে ছিলাম কিছুদিন পরেই। তারপর নিশ্চয় জল নেমে গিয়েছে। আমার আঁকা ছোট্ট নদী আবার শান্ত হয়েছে, মানুষ দুটো আবার ফিরেছে ঘরের ভিতরে। পাখিগুলোও নিশ্চয় আবার উড়েছে আগের মতো। সে ছবি আমি আঁকিনি কিন্তু জানি দুই পাহাড়ের আড়ালে এখনো সূর্য ডোবে। পাকদণ্ডী ধরে হেঁটেহেঁটে কেউ ঠিক পৌঁছে যায় বাড়ির দরজায়।

লেখক পরিচিতি

কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে স্নাতকোত্তরের পর দিব্যেন্দু এখন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। নেশা ছবি তোলা, বই পড়া এবং পড়ানো, তবে অবসরে কখনো লেখালিখিও করে থাকেন দিব্যেন্দু।

#



সেই মেয়েটি

অরূপ পাল

পুজো আর মাত্র দুদিন বাকি। চারদিকে সাজো সাজো রব। বকুলপুর গ্রামেও পুজোর ব্যস্ততা তুঙ্গে। শোনা যায় অনেককাল আগে নাকি এখানে একটি মাত্রই বারোয়ারি দূর্গাপূজা হত। কিন্তু কালের নিয়মে গ্রামে কয়েকটি ক্লাব গজিয়ে উঠল, পুজোয় থিম এল। এখন সর্বমোট দশটি পুজো হয়। এই গ্রামের সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে বকুল নদী। নদীর পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে বাস করে কয়েকটি আদিবাসী পরিবার। এদের কেউ বা স্টেশনে কুলির কাজ করে, কেউ বা দিনমজুরি করে সংসার চালায়। এদের ছেলেমেয়েদের জীবনেও পুজো আসে, তবে নতুন জামাকাপড় পাবার আনন্দ নিয়ে নয়। এরা তো দুবেলা পেট ভরেই খেতে পায় না, এদের আবার নতুন জামা। তবে হ্যাঁ, পুজোয় এদের একটি দিন খুব আনন্দে কাটে- অষ্টমীর দিন। সেদিন ওরা অন্তত পেটভরে খেতে পায়।

এবছর এই দশটি পুজোর মধ্যে যে পুজোর প্রতিমা শ্রেষ্ঠ হবে সেই পুজোকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তিন জনের একটি দল মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে শ্রেষ্ঠ প্রতিমাটি নির্বাচন করবেন এবং দশমীর দিন তাঁরা ফল ঘোষণা করবেন। এই জন্য কলকাতার একজন নামকরা আর্টিস্ট মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান বিচারপতি করে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি হয়তো কলকাতা থেকে রওনাও দিয়ে দিয়েছেন।

মৃন্ময়বাবু এখন ট্রেনে। জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দৃশ্য দেখছেন। চারদিকে শুধু কাশফুল আর কাশফুল । মৃন্ময়বাবুর মন মাঝে মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছে ওই কাশবনে। তাঁর আজ যে কী হয়েছে - মন আর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। এরকম এক শরতের দিনে গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে হাওয়ায় আন্দোলিত কাশবন তাঁকে ডাকছে – তিনি চেষ্টা করেও সে ডাক উপেক্ষা করতে পারছেন কই?

কাশফুলের সঙ্গে মা দূর্গার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মৃন্ময়বাবু এবছর একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের মহালয়ার দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে মৃদু হাওয়াতে কাশফুল দুলছে আর সেখান থেকে ভেসে

#

উঠছে মা দূর্গার ত্রিনয়ন। আচ্ছা, মা দূর্গা কাকে বেশী ভালোবাসেন? কাশফুলকে নাকি শিউলিফুলকে? দুটোই শ্বেতশুভ্র, কিন্তু কাশফুল মায়ের আগমনীকে যেভাবে ব্যক্ত করে, শিউলি কি তা করতে পারে? তবুও শরতের সকালে গাছের নীচে সাদা চাদরের মত ঝরে পড়া শিউলি ফুলেই যেন বাঙালীর ঘরে দূর্গার আনন্দঘন আগমনী বার্তা প্রচারিত হয়ে পড়ে। এসব ভাবতে ভাবতেই মৃন্ময়বাবু যখন বকুলপুর স্টেশন পৌঁছলেন, তখন বিকেল। কমিটি থেকে স্টেশনে গাড়ি পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু গাড়ি তো দুর অস্ত একটা রিকশা পর্যন্ত নেই! কোথাও কি একটা ভুল হচ্ছে তার। তিনি চিঠিটা আবার বের করলেন। এই তো শেষে লেখা রয়েছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠানো হবে। মৃন্ময়বাবু একটু বিরক্তই হলেন।

তিনি স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে তাঁর চোখ চলে গেল স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে। এখানেও কাশফুল – আর সেই বড় বড় সাদা পালকের কাশের বনে আদিবাসী পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খেলা করছে। বিকেলের পড়ন্ত আলো এসে পড়েছে ওদের ওপরে। হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। চশমাটি খুলে মুছে আবার পরলেন। না তিনি ঠিকই দেখছেন। একটি ছোট্ট ছেলে তার দিদির হাত ধরে কাশবনের মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছে...আর কাশফুলগুলো যেন তাদেরকে রাস্তা করে দিচ্ছে। আরে! এতো পুরো "পথের পাঁচালী"- রিভিজিটেড! মনে হচ্ছে যেন অপু আর দূর্গা ছুটছে। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা গাড়ির হর্নের শব্দে তাঁর চটকা ভেঙে গেল। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য কমিটির গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে। মৃন্ময়বাবু গাড়িতে বসেও জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেইদিকে – যেখানে সেই পড়ন্ত বিকেলের আলোয় কাশ বনের ফাঁক দিয়ে দুটি বাচ্চা ছেলে মেয়ে দৌড়ে চলেছে এখনও। কিছুতেই এই দৃশ্য ছেড়ে তাঁর যেতে ইচ্ছে করছে না। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল। ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকল দৃশ্যটি। এমন সময় কোথা থেকে যেন ভেসে এল সেই অসাধারণ মাতৃবন্দনা-

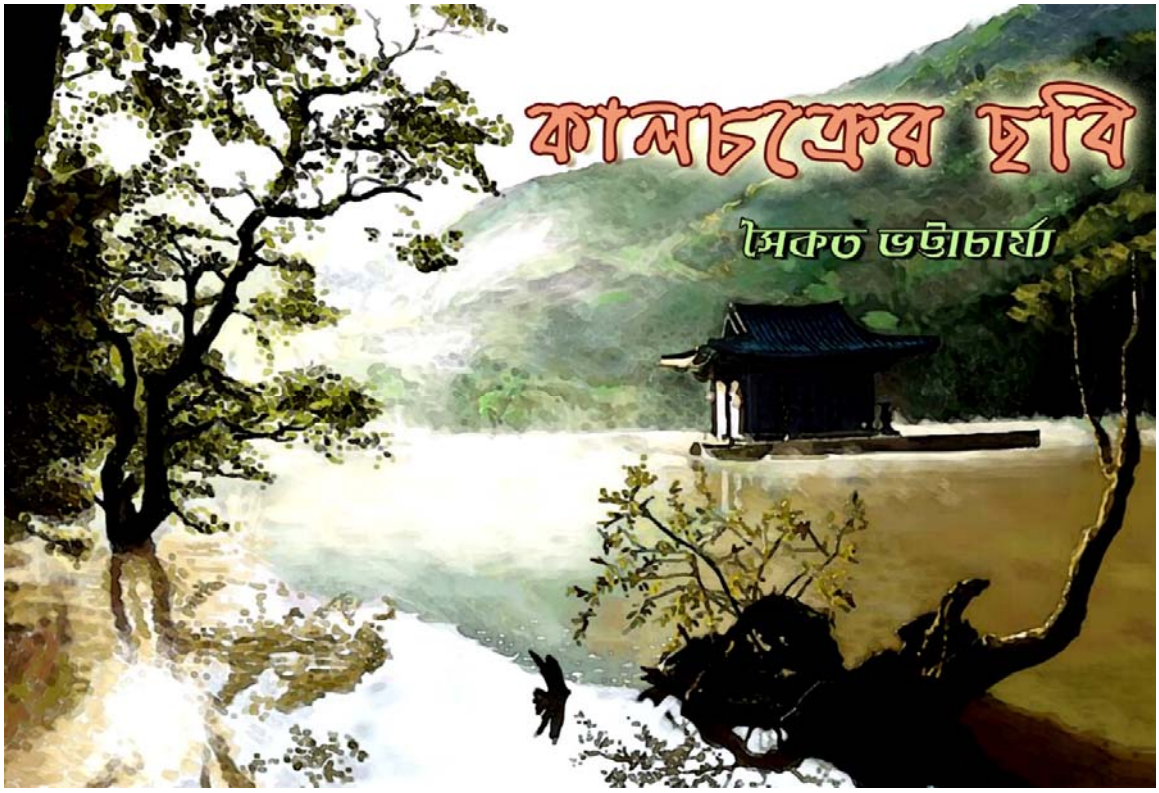
"আজ সেই শ্যামনিমাদ্রিতা চিন্ময়ীকে – মৃন্ময়ীতে আবাহন

....."

মৃন্ময়বাবু ড্রাইভারকে বললেন "গাড়ি ঘোরাও", কারণ তিনি আর মাটির প্রতিমা নির্বাচন করতে যাবেন না। তিনি যে জ্যান্ত দূর্গা প্রতিমা দেখছেন। হ্যাঁ, বিভূতিভূষণের মানসকন্যাকে দেখেছেন, আর সেই বাচ্চা মেয়েটির মধ্যে তিনি চিন্ময়ী মা'কে প্রত্যক্ষ করেছেন – তাঁর আর মৃন্ময়ীরূপ দর্শনে কোন আকর্ষণ নেই।

লেখক পরিচিতি

অরূপ বই পড়তে খুব ভালোবাসে। থ্রীলার খুব প্রিয়। সময় ও সুযোগ পেলেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে চলে যায়। আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক পাশ।



বৃষ্টিটা নামছি নামছি করছিল অনেকক্ষণ ধরে। শেষমেশ নেমেই পড়ল ঝাঁপিয়ে। ক্লাশের শেষ ঘন্টা। পি এল টি ওয়ানের বিশালাকৃতির জানলার বাইরে ধোঁয়াটে সব কিছু। মেন বিল্ডিং-এর মাথার ওপরের ঘড়িটা আবছা হয়ে গেছে। সব্যসাচী কনুই দিয়ে ঠেলা মারল, মুখে উদ্বেগ। আমারও যে চিন্তা হচ্ছিল না, তা নয়। না না, বাড়ি যাওয়ার জন্য মোটেই চিন্তিত আমরা কেউ নই। চিন্তা এই বৃষ্টিতে সিনেমা হবে তো? কলেজের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে। ছাত্র-সংসদ থেকে প্রতিবার হয় যেমন। এবারও নানা দেশ-বিদেশী ছবির মধ্যে চোখ আটকে গেছিল একটা নামে– 'কিম-কি-দুক'।

ভদ্রলোকের নাম শুনেছিলাম আমার এক বন্ধুর মুখে। সে যাদবপুরের ছাত্র। ওদের একটা ফিল্ম বিষয়ক আলোচনাসভায় নাকি কেউ কোন প্রসঙ্গে তুলেছিলেন এঁর নাম। ও বলেছিল আমায়। তাই ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালের লিস্টে নাম দেখেই ঠিক করে ফেলি এ ছবি দেখতেই হবে। যে ছবিটা দেখানো হবে, নাম– "স্প্রিং সামার ফল উইন্টার এন্ড স্প্রিং"।

জীবনের কিছু কিছু দিনের কথা বা মুহূর্তের কথা খুব যত্ন করে রয়ে যায় আমাদের বুকের ভিতরকার খুপরি ঘরে। ভালোবাসা, খারাপ-বাসা, রোজকার রোজনামচার থেকে বেশ কিছু ভালো লাগা সঞ্চিত হয়ে থাকে ওইখানে– ঠিক যেমনটা দেখিয়েছে 'ইন্সাইড আউট' ছবিতে, ঠিক তেমনি। এক একটা সোনালি বল টুক করে ঢুকে পড়ে মনের মধ্যিখানে আর 'লং টার্ম মেমরি' হয়ে থেকেও যায় দিব্যি। এ দিনের ব্যাপারটাও ঠিক সেরকম ছিল। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে ডিরোজিও হলের পাখার তলায় ঠাণ্ডা লাগাতে লাগাতে যা দেখেছিলাম সে আজ অবধি মনের গভীরে রয়ে গেছে একটা সোনালি বল হয়ে। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় শুনি এক একটা ছবি কিভাবে কবিতা হয়ে ওঠে। এই যেমন সত্যজিতের

#

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। হিমালয়কে সাক্ষী রেখে এক সকাল ঘটনার মধ্যে দিয়ে জীবনের নানা ভাষা কবিতা হয়ে ওঠে। কিমের এই ছবিটিও ঠিক তেমনি।

এ এক জলে ভাসমান বৌদ্ধ মঠের কবিতা। নিবিড় বনানীর মধ্যে এক ছোট্ট হ্রদ, তার মধ্যে একটা কাঠের পাটাতনের উপর এই ছোট্ট সাধনগৃহ। সেখানেই আবর্তিত হয় এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আর এক ছোট্ট ছেলের জীবন। বৃদ্ধ বৌদ্ধ ছোট ছেলেটির আচার্য্য। এই ছেলেটিই এই ছবির 'প্রোটাগনিস্ট' যার জীবনের এক একটি অধ্যায়ের সঙ্গে সমীকরণে বাঁধা পড়ে প্রকৃতির ঋতু সম্ভার। এই ছবিটি যখন দেখি, তার আশে-পাশেই কোন এক সময় আমার পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীত শোনা শুরু। ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক্যাল বললেই যে কটা নাম চোখের সামনে ভেসে ওঠে– বিঠোফেন, মোৎজার্ট, বাখ– এঁদের সবার পাশাপাশি আমার পরিচয় হয় আর একজনের সঙ্গে, যাঁর নাম ভিভালডি। সব্যসাচীই আমাকে একটা সিডিতে কিছু ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক দেয়। রাতের বেলা আমার ঘরের আকাশ-বাতাস জুড়ে তারপর থেকে প্রায়ই ভেসে বেড়াতে থাকে লেগ্রো, আলেগ্রো, অপেরা, কনচের্তো, সিম্ফনি। এমনই এক রাতে ইন্টিগ্রেশনের ফাঁক দিয়ে বুক জুড়ে বাসা বাঁধে জুলিয়া ফিশারের ভায়োলিনে ভিভালডির বসন্ত। তারপর একে একে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, আবার বসন্ত। কিমের ছবির মতোই পরতে পরতে ছবি এঁকে চলেছিল ভায়োলিনের ছড়। চলচ্চিত্র দৃশ্য মাধ্যম হওয়ায় এখানে রঙ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়– বিশেষ করে আমাদের এই রঙিন ছবির যুগে। কিমের এই ছবিতে তাই এক একটা ঋতু উপস্থিত হয়েছে তার কালার টোন নিয়ে। ঝলমলে বসন্ত, রোদ জ্বলা গ্রীষ্ম, ফুলেফলে ভরা শরৎ বা রুক্ষ সাদা শীত। ভিভালডির নোটেশনও সুরের ছন্দ দিয়ে করেছিল ঋতুর চরিত্রায়ণ – তাই আজ এই ছবির কথায় বার বার মনে পড়ছে সেকথা।

কিমের ছবির মজাই হল– কথা কম, কাজ বেশী। প্রধান চরিত্রের মুখের সংলাপ প্রায় নেই বললেই চলে। যেমন 'থ্রি আয়রন' ছবিতে দেখেছিলাম– প্রোটাগনিস্ট 'তাই-সুক'কে। গোটা ছবিতে একটাও সংলাপ না বলিয়ে শুধু মাত্র অভিনয় আর অভিব্যক্তি নির্ভর করে ছবিকে এগিয়ে গেছেন কিম। 'টাইম' ছবি আবার ঠিক উলটো– সংলাপের সঙ্গে গল্প এগিয়েছে ধীরে সুস্থে। আর চরিত্রদের অস্বাভাবিকতাই কিমের তুরুপের তাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্র বাস করে চিরাচরিত চলমান আমাদের চারপাশের পৃথিবীর থেকে অন্যরকম ভাবে। ছবি দেখতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা 'ফ্রেম অফ রেফেরেন্স' বদলে ঢুকে পড়ি তাদের জগতে– তখন রোজকার স্বাভাবিকতাকেই মনে হয় অস্বাভাবিক, আর মন জুড়ে থাকে চরিত্রের মায়াময় জগত। যেমন, আবার থ্রি আয়রণের কথাই বলি– 'তাই-সুক'এর কাজ হল যে সমস্ত বাড়িতে কেউ নেই, মানে হয়ত কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গেছে কোথাও, সেখানে ঢুকে তাদের গৃহস্থালি কাজকর্ম করে দেওয়া– কাপড় কাচা, বাসন মাজা। কি অদ্ভুত না? কিন্তু ছবিটা দেখতে শুরু করলে মনে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক– অদ্ভুত তো আমাদের রোজকার অপরিষ্কার জগত। এরকম অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতা আমাদেরকে নিজেদের জগতে বিচরণ করিয়ে আনে 'ব্রিদ'এর 'ইয়েওন', 'ড্রিম'এর 'জিন'এর সঙ্গেও।

যে কথা দিয়ে এই শিবের গীত শুরু করেছিলাম– সেই বর্ষার দিনে দেখে ফেলা 'স্প্রিং সামার ফল উইন্টার এন্ড স্প্রিং'। ভাসমান বৌদ্ধ মঠের রোজনামচা। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী প্রতিদিন বাচ্চা ছেলেটিকে নানারকম শিক্ষা দেন, পাঠান হ্রদের তীরের থেকে গাছ-গাছালি সংগ্রহের জন্য। একটিই নৌকা আছে– তীরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। ছেলেটি একদিন নৌকা করে গাছ-গাছালি সংগ্রহ করতে গিয়ে পৌঁছায় একটা ছোট জলাশয়ের কাছে। সেখানে দুষ্টুমি করে একটি মাছের পাখনায়

একটি পাথর বেঁধে দেয়। একই জিনিস একটি নির্বিষ সাপ আর ব্যাঙের সঙ্গে করে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আড়াল থেকে লক্ষ্য করেন। এখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জন্ম নেয় যে, সন্ন্যাসী ওইখানে পৌঁছলেন কিভাবে? কারণ একমাত্র নৌকাটি তো ছেলেটি একাই চালিয়ে এসেছে। পরে যদিও একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে সন্ন্যাসী হাতছানি দিলেই তাঁর 'পারের তরী' এসে হাজির হয় তাঁর কাছে। ওই যে বললাম না, এক মায়ার আবেশ ছড়িয়ে থাকে কিমের ছবির মধ্যে দিয়ে! এবং সেগুলো খুব খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তার মত করে। যাই হোক, সন্ন্যাসী ছেলেটিকে কিছু না বলে চলে যান নীরবে। ছেলেটিও ফিরে আসে মঠে। পরদিন সকালে ছেলেটি ঘুম ভেঙে দেখে, তার পিঠে একটি পাথর বেঁধে দিয়েছেন বৃদ্ধ। ছেলেটিকে তিনি বলেন, কাল সে যা করেছে, তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই পাথর পিঠ থেকে সে খুলতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে ওই যায়গায় ফিরে গিয়ে প্রাণীগুলিকে মুক্ত করে। আর যদি তারা ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে এই পাথর তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বইতে হবে সারা জীবন। ছেলেটি সেখানে ফিরে যায় এবং দেখে মাছটি এবং সাপটি মৃত– ব্যাঙটি তখনও বেঁচে আছে আর চেষ্টা করে যাচ্ছে বেঁচে থাকার। ছেলেটি কাঁদতে শুরু করে। সন্ন্যাসী আবার আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করেন। বসন্ত চলে যায়।

বসন্তের সঙ্গে চলে যায় শৈশব। গ্রীষ্ম যখন আসে, ছেলেটি যুবক। বসন্তের মতই গ্রীষ্মের শুরু হ্রদের প্রবেশ পথ দেখিয়ে। মঠে এক মা তার কিশোরী মেয়েকে নিয়ে আসেন। মেয়েটি অসুস্থ। মেয়েটিকে সন্ন্যাসীর কাছে কিছুদিন রেখে সারিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। মা চলে যান। ধীরে ধীরে প্রকৃতির নিয়মে ছেলেটি মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা গোপনে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। একদিন যখন তারা রতিক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভাসমান নৌকাটির মধ্যে, সন্ন্যাসী তাদের দেখতে পান। না জাগিয়ে শুধু নৌকার স্টপককটি খুলে দেন তিনি। ভিতরে উঠে আসা জল ঘুম ভাঙায় তাদের। মেয়েটি চলে যায় মঠ ছেড়ে। ছেলেটিও রাতের বেলা মেয়েটির খোঁজে মঠের থেকে পালিয়ে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় পোষা মোরগ এবং ভগবন্ বুদ্ধের মূর্তি – বৌদ্ধ শিল্পে মোরগ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর বুদ্ধের মূর্তি দ্যোতনা করে ছেলেটির এত বছরের সব শিক্ষাকে।

শুধু এভাবে গল্প বলে গেলে হয়ত ছবির কাব্যিক রূপটা কিছুটা বোঝানো যেতে পারে– কিন্তু সবটা নয়। কবিতার মধ্যে যেমন একটা নিগূঢ় ছন্দ থাকে, এ ছবির চলনের মধ্যেও অনুরূপ। চরিত্রগুলির চলন–বলন, তাদের কাজ– সব কিছু একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধা পড়ে। তার সঙ্গে মেদহীন রূপকের ব্যবহার বারে বারে প্রমাণ করে দিয়ে যায় এই মহাকাব্যিকতাকে।

শরৎ ফিরিয়ে আনে চলে যাওয়া যুবককে। সে এখন ফেরারী আসামী। আইনের হাত থেকে পালাতে আশ্রয় নেয় তার ফেলে যাওয়া মঠে, তার আচার্য্যের কাছে। আচার্য্য তাকে মারেন, শাস্তি দেন, পরিশেষে বলেন মঠের কাঠের পাটাতনের উপর একটি বৌদ্ধ সুত্র লিখতে বারবার। এর মধ্যে দুজন পুলিশ ছেলেটির খোঁজে এসে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাদের অপেক্ষা করতে বলেন– যতক্ষণ না ছেলেটির লেখা শেষ হয়। তারা অপেক্ষা করে। এক সময় লিখতে লিখতে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হাত লাগায় লেখা শেষ করার জন্য। বৌদ্ধসূত্র একজন আইন ভঙ্গকারী আর আইনের রক্ষককে একাসনে বসিয়ে দেয়, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে। শরৎ শেষ হয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছামৃত্যু দিয়ে। তিনি বোঝেন এ পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নিজের চোখ, নাক, মুখ কাগজ দিয়ে বন্ধ করে ধীরে ধীরে

#

মৃত্যুর কাছে নিবেদন করেন নিজেকে। শুধু একটুখানির জন্য চোখের কাগজটি ভিজে ওঠে– ব্যথায় না নির্বাণের আনন্দে, তা অধরাই থেকে যায় আমাদের কাছে।

শীত আসে। সম্পূর্ণ হ্রদটি বরফ জমাট। আমাদের ছেলেটি এখন পূর্ণ বয়স্ক। এই মঠের ভার এখন তার। একটি মহিলা একদিন এসে একটি শিশুকে রেখে চলে যায়। যাওয়ার সময় বরফ জমা হ্রদের ফাটলে পড়ে তার মৃত্যু হয়। শিশুটি মঠেই থেকে যায়। আমাদের প্রোটাগনিস্ট মঠাধ্যক্ষ তার সব প্রায়শ্চিত্ত পূরণের জন্য একটি পাথরের বৌদ্ধ চক্র, যা কিনা জীবন-মৃত্যুর দ্যোতক, তাকে পিঠে বেঁধে একটি মৈত্রেয়র মূর্তি নিয়ে যাত্রা করে পাহাড়ের পথে। ভারী পাথরটা টেনে এই পথে উঠতে উঠতে তার সে মাছ বা সাপটির সঙ্গে করা দোষ স্খলিত হয়। অনেক কষ্টের পর পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে মৈত্রেয়র মূর্তিটি সেখানে স্থাপণ করে সে। নীচে তখন হ্রদের মাঝে মঠ দৃশ্যমান।

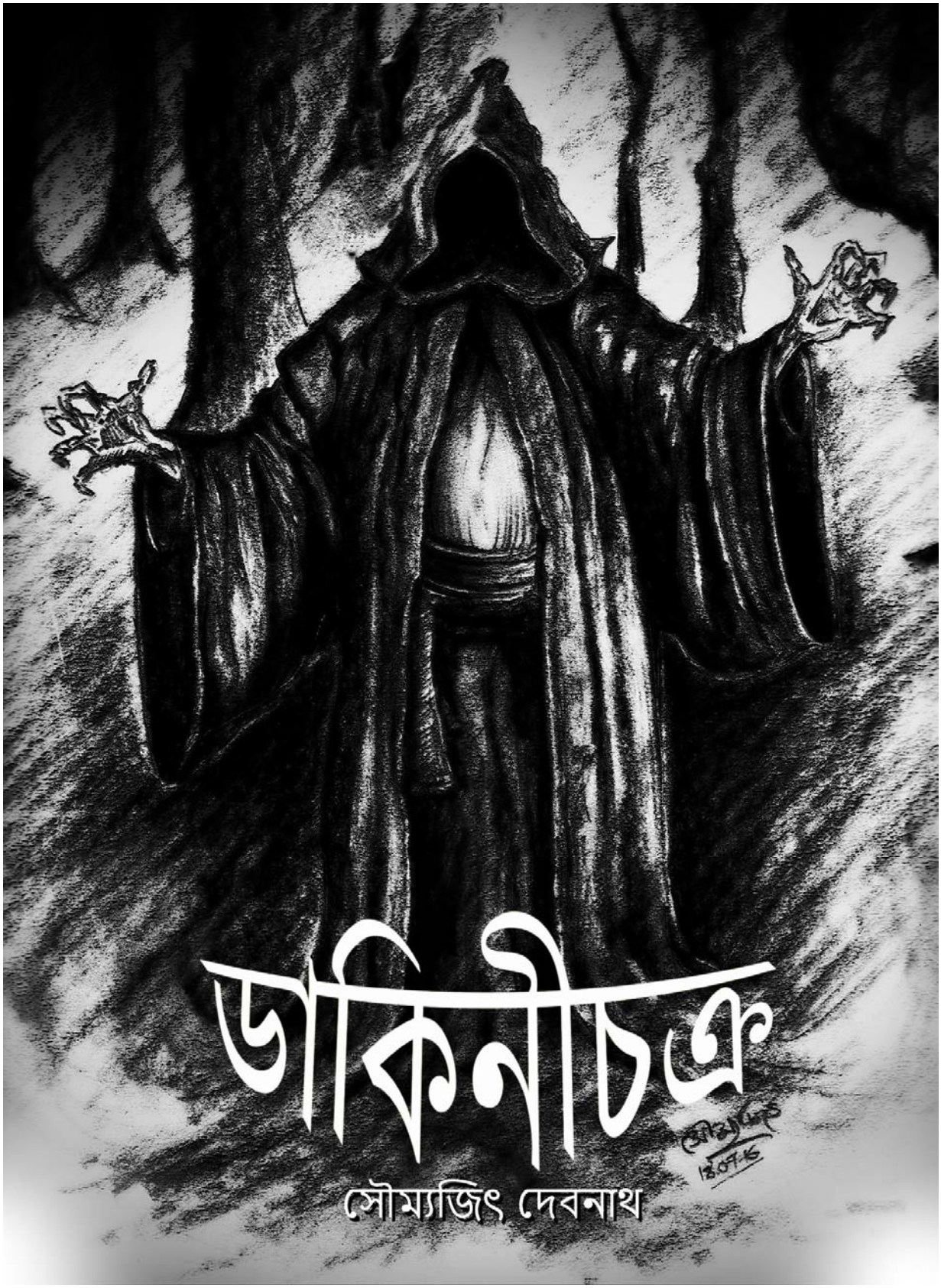
একটা ছবি তো শুধু তার কাহিনীগুণে অনন্য হয়ে ওঠে না, যেহেতু এ এক দৃশ্য-মাধ্যম, এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে থাকে সিনেমাটোগ্রাফি। যে কবিতার কথা বলছিলাম, ক্যামেরার গুণে তা যেন সত্যিই মহাকাব্যিক হয়ে ওঠে। পাহাড়চূড়া থেকে সম্পূর্ণ উপত্যকা, তারমধ্যে হ্রদ, তারমাঝে ভাসমান মঠ– এ দৃশ্য যেন আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় নিজের ফেলে আসা জীবনকে ফিরে দেখার জন্য একটি অনুরূপ পর্বতপ্রান্তের উপর, যেখানে অনাগত মৈত্রেয় জন্ম নেয় নিজের অনাগত বোধির প্রতিভূ হয়ে। নেপথ্যে বেজে চলে কোরীয়ান লোকসঙ্গীত। দৃশ্য, শব্দ মিলে জন্ম নেয় এক প্যাস্টোরাল সিম্ফনির।

এই ছবির শেষভাগে মঠে ফেলে যাওয়া শিশুটি বড় হয়। আমাদের প্রৌঢ় ছেলেটি তার আচার্য্যপদে অভিষিক্ত। শিশুটি হ্রদের তীরে যায়, সেই ছোট্ট জলাশয়ে গিয়ে একটি মাছের মুখের মধ্যে পাথর ভরে দেওয়ার চেষ্টা করে। জীবন ফিরে আসে সেই একই বিন্দুতে। আবার বসন্ত আসে ওই হ্রদের মধ্যে। কালচক্রাসীন মৈত্রেয়কে দেখিয়ে ছবি শেষ হয়।

সেদিন এই ছবি দেখে বের হয় মনটা কেমন হয়েছিলো, তার হয়ত নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা হয়না। বাবার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে বহুবার সিকিমে গেছি। বেড়াতে। সুবিশাল হিমালয়ের কোলের মধ্যে নানা বৌদ্ধ মঠে সন্ধ্যা নামতে দেখেছি। আপাত অন্ধকার গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে একে একে জ্বলে উঠতে দেখেছি বুদ্ধের পাদপ্রদীপগুলি। অপাপবিদ্ধ, করুণাময় তথাগতর স্বল্পালোকে উদ্ভাসিত সে মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার বোধ হয়েছে এক পরিপূর্ণ শান্তি। যে শান্তি ধর্মের বাঁধন মানে না, মহাযান, হীনযানের সংজ্ঞা মানেনা। শুধু সহস্র সহস্র বছর ধরে সে বাণী ছড়িয়ে যায় দূরপ্রাচ্য থেকে সুদূর-প্রাচ্যে। আর সেই এক প্রাচ্য পরিচালকের বৌদ্ধ ছবিতে ঠিক এটাই তো চাওয়া-পূর্ণতা, নির্বাণ, যা কিনা সমস্ত বিতর্ক, চলচ্চিত্রের ভাষা, ছবির ব্যকরণের থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে উঠে সত্য হয়ে থাকে সেই অনাগত মৈত্রেয়র মত।

লেখক পরিচিতি

সৈকত পড়াশুনা করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং মাদ্রাসের আই আই টি থেকে। বিষয় পদার্থবিদ্যা। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি বহুদেশিক সংস্থাতে কর্মরত। নিবাস চেন্নাই। লেখালিখি, শর্ট ফিল্ম বানানো আর ফোটোগ্রাফির সঙ্গে সৈকতের আর একটি হবি হল মেডিটেরিয়ান খাবার বানানো।


ডাকিনীচক্র
সৌম্যজিৎ দেবনাথ

#

শিবু কলকাতার ছেলে। বাবা, মা আর বোনকে নিয়ে উত্তর কলকাতার এক ঘিঞ্জি এলাকায় তার বাড়ি। স্কুলে পড়ে সে, বাংলা মিডিয়াম। দৈনন্দিন জীবনে সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজে পড়তে বসা, তারপর কিছু খেয়ে স্কুলে যাওয়া, ফিরে পেট ভরে ভাত খেয়ে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খানিক খেলাধুলো করে বিকেলে ফের পড়াশোনা আর রাত দশটা বাজলে নৈশভোজ সেরে ঘুমোতে যাওয়া এই হল তার রুটিন। এর বাইরে খুব একটা বদল হয় না। শিবুর একমাত্র নেশা হল নানা রকমের গল্পের বই পড়া। বই পড়ার নেশাটা সে বংশগত ভাবেই পেয়েছিল। তার একমাত্র কাকারও কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান। ভালো ভালো গল্পের বইয়ের খোঁজ শিবু সেখান থেকেই পেয়ে যেত, কখনো কখনো উপহারও। তবে শিবুর ঝোঁক বেশি ভূতের গল্পের দিকে। গেল বছর এগারোয় পড়েই উপনয়ন হয়েছে তার। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার কাকা তাকে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের একটা ভৌতিক সংকলন উপহার দিয়েছে এবং সে বই সেই থেকেই তার সবথেকে প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পর্যন্ত গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে শিবুর এমনটাই ধারনা হয়েছে যে ভূতেরা শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামাঞ্চলকেই বেশি পছন্দ করে। আলোর রোশনাই ভুতেদের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে, তাই তারা গ্রামের আঁধারিতেই নিজেদের অনেক বেশি সুস্থ ও সাবলীল মনে করে। এ বিষয়ে শিবুর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেবার শিবুর বাবা স্থির করলো ডিসেম্বরের ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে আসা যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে এক ছেলে ও এক মেয়ের দায়িত্ব পালন করে, সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করে মাঝে মাঝেই বেড়িয়ে পড়ার যো তার নেই। তবু এ বছরটা খরচের হিসেব মাথায় রেখেই স্থির হল বেরিয়ে পড়া যাক। শিবুর মা শান্ত মহিলা, স্বামীর কাছে কোনদিনই তার চাহিদার বহর বেশি ছিল না। একেবারে যেটুকু না হলে নয় তার বাইরে সে মুখ খুলতো না। বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই তার মুখে যে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো তাতেই স্বামীর কাছে তার মনের ভাব প্রকাশ পেয়ে গেল।

শিবু খবরটা পেল পরের দিন মায়ের কাছ থেকে। মা তাকে ও তার বোন অলিকে বিকেলে ডেকে বলল ব্যাপারটা। শুনে তার বোনের বাহ্যিক উল্লাসটা বেশি হল বটে কিন্তু চাপা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল শিবুর মনেও। কিন্তু যাওয়া হবে কোথায়? ঠিক হয়নি। রাতে অফিস করে ফিরে শিবুর বাবা একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল বারান্দার একটা চেয়ারে বসে। এমন সময় শিবু তার পাশে এসে বসলো।

- "বাবা, আমরা কি বেড়াতে যাবো গো?"

- "হ্যাঁ, সেরকমই তো ঠিক করলাম। কেন? তোর ইচ্ছা করছে না বুঝি?"

- "না না, যাবোই তো। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে?"

- "সেটা ঠিক করিনি। সময় আছে তো এখনো।"

শিবু খানিক ভেবে বলল –

#

- "বাবা, আমাকে গ্রাম দেখাবে? আমি কখনো গ্রাম দেখিনি।"

তার বাবা একটু আশ্চর্য হয়েই শিবুর মুখের দিকে তাকাল। বলল –

- "গ্রামে যাবি?"

- "হ্যাঁ। বইতে পড়েছি গ্রামের দিকে ভূত থাকে। আমি ভূত দেখবো।"

কথাটা শুনে গম্ভীর স্বভাবের মানুষ শ্রী বীরেনচন্দ্র দেবনাথ আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেল। একি বলে এই এতটুকু ছেলে? ভূত দেখবে...! রাতে বিছানায় শুয়ে ছেলের আবদারের কথা মনে পড়ল তার। ওর বয়সী মোটামোটি সব ছেলেপুলেরাই ভুত-পেত্নী-পিশাচ এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্যাপারকে এক কথায় ভয়ই পায় এবং এড়িয়ে চলে। কিন্তু শিবু!! স্ত্রী কে এবার সে জিজ্ঞেস করলে –

- "আচ্ছা, শিবু যে সমস্ত বইটই পড়ে তার সবই কি ভুত-পেত্নী নিয়ে?"

শুনে তো ভ্রু কুঁচকে গেল চন্দনার।

- "কি বলছো এসব যাতা কথা? পড়ার বইয়ে আবার ওসব কোথায়?"

- "তা নয়, গল্পের বইয়ের কথা বলছি।"

- "ওও, তা কিছু তো আছে সেরকমই। এইতো হপ্তা দুই আগেই ধীরেন ওকে আরেকটা ভূতের গপ্পের বই এনে দিয়েচে। কিন্তু কেন বলতো?"

- "আজ শিবু এসে আমায় বলল ওর নাকি খুব ভূত দেখার ইচ্ছা, তাই সে গ্রামে যেতে চায়।"

একথা শুনে চন্দনার মুখটা কালো হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা চন্দনার মনের মধ্যে জেগে উঠলো।

সেবার কোত্থেকে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হয়েছিল শিবুদের বাড়িতে। শিবু তখন একদম ছোট। অলি সদ্য হয়েছে। বীরেনও বাড়িতে ছিল না সেদিন। সন্ন্যাসীর এই অসময় আগমনে একটু সমস্যাই হয়েছিল চন্দনার। কিন্তু সে কিছু বুঝতে দেয়নি। যথাসাধ্য সেবা আতিথ্য করেছিল এবং তাতে খুব খুশী হয়ে ওদের অনেক আশীর্বাদ করেছিল সেই সন্ন্যাসী। শিবুকে কোলে নিয়ে কত আদরই না করেছিল। এপর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু গোলটা বাধে ঠিক যখন চন্দনা অলিকে ঘুম পাড়িয়ে বারান্দায় এসে দেখে সেই সন্ন্যাসী শিবুকে এক অদ্ভুত আঁকিবুঁকি করা চাদরের উপর বসিয়ে তার লোটা থেকে কি একপ্রকার লালচে ধরনের তরল পান করাচ্ছে। চন্দনা নিজে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তার বাবা পুরোহিতগিরি করে সে জন্মের পর থেকে দেখে এসেছে। নিজে খুব বেশি পড়াশোনা না জানলেও ধর্মীয় আচার-বিচার সম্বন্ধে নেহাত অজ্ঞ ছিল না। ঘটনাটায় তার মনে কেমন যেন ভীতি সঞ্চারিত হয়। সে হা হা করে ছুটে এসে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করে এসবের মানে কি? তাতে সন্ন্যাসী এক আশ্চর্য শান্তমুখ নিয়ে বলে –

- "তোর ছেলে বিরাট ক্ষমতাশালী। ওর কপালে ডাকিনীচক্র বিদ্যমান। হাজার তান্ত্রিকের শক্তি ওর মধ্যে রয়েছে।"

- "আপনি এসব কি বলছেন যোগী বাবা? ওইটুকু শিশু আবার তান্ত্রিক কিভাবে?"

- "হ্যাঁ, আমার কথা ফেলনা নয়। ওর এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ একদিন ঘটবেই। ওকে ওর স্বাভাবিক জীবন থেকে কখনো দূরে রাখিস না। তোদের মঙ্গল হোক।"

এরপর আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি সন্ন্যাসী। নিজের ঝোলা-দন্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় বীরেন বাড়ি ফিরতেই কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে খবরটা তাকে দেয় চন্দনা। শুনে প্রথমটা আমল না দিলেও পরে যখন স্ত্রী ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে বীরেন। সেই হপ্তাতেই বাগবাজারের নাম করা জ্যোতিষী হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিবুকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কিছুই অস্বাভাবিকত্ব না খুঁজে পাওয়ায় খানিকটা আশ্বস্ত এবং শান্ত হয় বীরেন ও বিশেষ করে চন্দনা। নিশ্চয় পাজি সন্ন্যাসীটা ভড়কি দিয়ে ভয় পাইয়েছে...!! যাইহোক, এরপর থেকে এতদিন কেটে গেছে কোনদিন কোন অসুবিধা হয়নি। এই প্রথম চন্দনার পুরনো এই ঘটনাটা মনে পড়ল।

বর্ধমান জেলার এক গ্রাম পূর্বস্থলী। নবদ্বীপ ছেড়ে আরও খানিকটা যেতে হয়। সেখানে বীরেনের মামাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। বোনের জামাই এর সেখানে মস্তবড় পৈতৃক ভিটে। বীরেন আর চন্দনা তাদের বিয়ের পরে পরেই একবার গিয়েছিল সেখানে। সেবারের খাতির যত্ন তারা আজও ভুলতে পারেনি। বোন আর বোনের জামাই দুজনই দিলখোলা মাটির মানুষ। অতিথি আপ্যায়নে তাদের জুড়ি মেলা ভার। ডিসেম্বরের ছুটিতে শিবুর গ্রাম দেখার ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে বীরেন সেখানে যাওয়ার কথাই পাকা করেছে। সেইমতো চিঠিও পাঠিয়েছিল চন্দনা। উত্তর আসতে বিলম্ব করেনি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ফুলি আর তপেশ। ওদের একমাত্র ছেলে অমিতও খুব খুশী এ খবরে।

নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া জংশন থেকে ট্রেনে উঠলো শিবুরা। গন্তব্যস্থল পূর্বস্থলী। উত্তেজনা আর আনন্দের মিশ্রণে শিবুর মনের অবস্থা যেন পুরীর সমুদ্রের মতো। অলি এমনিতে একটু কমই কথা বলে। কিন্তু আজ সেও ট্রেনের সিটে জানলার পাশে বসে আনন্দের আতিশয্যে কলকল করে এটা ওটা বলেই চলেছে। শিবু স্কুলের বন্ধুদের বলে এসেছে সে ভূত দেখে তবেই ফিরবে। সেই কথার মান তাকে যে রাখতেই হবে সেটা মনে মনে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে স্মরণ করে নিল আরেকবার। খানিক পরেই ট্রেন ছাড়ার উপক্রম হতেই শেষবারের মতো সঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে নিল বীরেন। তারপর ট্রেন ছাড়তেই শিবু প্রশ্ন করলো –

- "বাবা, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?"

- "ঘণ্টা দুই আড়াই।"

- "পিসী আর পিসো কি ওখানে ষ্টেশনে আসবে?"

- "পিসো তো বলেছে আসবে। একটা কথা তোমাদের দুজনকেই বলে দিই..."

#

অলি জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, হিজিবিজি ট্রেনলাইনের উপর সূর্যের আলো পড়ে যে চমক তৈরি করছে সেদিকেই বোধহয় ওর দৃষ্টি গিয়ে থাকবে। বাবার কথায় দুজনের উল্লেখ কানে যেতেই মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকাল সে –

- "না বলে ওখানে কিন্তু এক পা-ও এদিক সেদিক যাওয়া যাবে না। অচেনা জায়গা। তার উপর পিসীরবাড়ির পিছনেই রেললাইন। ট্রেন চলাচল করে, তাই খুব সাবধান।"

শিবু যেন একটু দমে গেল বাবার এই গুরুগম্ভীর আদেশবাণী শুনে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণের জন্য স্থায়ী হল না অবশ্য। ট্রেন ছুটে চলেছে আর জানলায় ধরা পড়ছে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা। কখনো ধূ ধূ প্রান্তর, কখনো গাছগাছালি, কখনো পুকুর, ক্ষেত। এসবের মধ্যেই শিবুর কিশোর মন যেন কোথায় হারিয়ে গেল ।

শিবাজিৎ দেবনাথ। ক্লাস সেভেনের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং শান্তশিষ্ট বলে শিক্ষকমহলে একটু বেশিই স্নেহপাত্র সে। তিন চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকলেও ক্লাসের সব ছেলেদের সঙ্গেই সম্পর্ক ভালো তার। পড়াশোনাতেও একেবারে মন্দ নয়। এইতো গতবারেই বার্ষিক পরীক্ষায় সে ক্লাসের মধ্যে অষ্টম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এসব গুনের মধ্যেও তাকে তার বয়সী ছেলেদের থেকে আলাদা করে রেখেছে তার চরম গ্রন্থপ্রীতি। বই পড়ার এমন শখ ও নেশা এত কমবয়সীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কমিক্স বাদেও ছোটবড় গল্প, তথ্যবহুল প্রবন্ধ এমনকি বিভূতিবাবুর উপন্যাসগুলি পর্যন্ত তার প্রায় মুখস্তের মতো। এই কারণে স্কুলের পড়ায় মাঝে মাঝে খামতিও রয়ে যায়। ওর কাকা বলে এই গল্পের বইয়ের নেশা না থাকলে হয়তো পরীক্ষায় আরও ভালো ফল করতে পারতো সে।

দুপুর গড়িয়ে গিয়ে সাড়ে তিনটে ছুঁই ছুঁই, ঠিক তখন ট্রেন এসে থামলো পূর্বস্থলী ষ্টেশনে। মিনিট কুড়ি আগেই শিবু আর অলি নবদ্বীপের নাম করা ঝালমুড়ি খেয়েছে, তাই ওদের বিশেষ খিদে ছিল না। বীরেন ধূমপান অনেককাল আগেই ছেড়েছিল, তবে চা টা খেতেই হয় ওকে। ষ্টেশনে নেমেই চন্দনা আর বীরেন ব্যাগগুলো গুছিয়ে বসলো একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চে। শিবু আর অলি এদিক সেদিক দেখছে। এখনো পর্যন্ত নেমে সেরকম গ্রামের আবহাওয়া কিছু বুঝে উঠতে পারেনি ওরা। পিসো বোধহয় এখনো এসে পৌঁছয় নি। বীরেন চায়ে চুমুক দিয়ে চন্দনা কে বলল –

- "তপেশ আসবে বলেছিল...!! এখনো তো এল না। এখানেই কি অপেক্ষা করব নাকি একটা রিক্সা বা ভ্যান ভাড়া করবো?"

চন্দনা একটু চিন্তিত ভাবে কিছু বলতেই যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই বীরেন দেখতে পেলো তপেশ বেশ হন্তদন্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে। হাতে একটা ফুলের তোড়া আর প্লাস্টিকের ব্যাগে কিছু একটা। বীরেন হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ালো, আর তা দেখতে পেয়ে কুণ্ঠাভরেই লজ্জিত একটা হাসি হাসলো তপেশ।

- "সরি দাদা। একটু দেরি হয়ে গেল । আপনারা অনেকক্ষণ এসে পড়েছেন বুঝি? আসলে হয়েছে কি..."

- "না না। এই মিনিট পাঁচেক হল। চা টাও শেষ হয়নি এখনো। কেমন আছো আগে বলো?"

- "খুব ভালো।"

বলেই তপেশ প্রথমে ফুলের তোড়াটা চন্দনার হাতে দিলে, তারপর প্রণাম করতে উদ্যত হতেই বীরেন বেশ পটু হস্তেই সেটা নিবারণ করল। চন্দনাও হাসিমুখে তা সমর্থন করল। এরপর শিবু আর অলিকে জড়িয়ে ধরে একচোট আদর করে তপেশ প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে দুটো বড় চকোলেটের প্যাকেট বার করে দুজনের হাতে দিলে। বীরেন দাঁড়িয়েই ছিল, ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরোবার আগে চা দোকানীকে দাম দিতে গিয়ে সে পড়ল আরও বিপদে। তপেশ কিছুতেই চায়ের দাম বীরেনকে দিতে দিল না। নিজে সে দাম মিটিয়ে দিল জবরদস্তি।

- "আপনার বোন তো সকাল থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

- "তা হবে নাই বা কেন বল?? ওর তো দাদা বলতে এই আমিই পিসতুতো একজন। ধীরেন ওর ছোট। আর তাছাড়া দেখা সাক্ষাৎ নেই সেকি কম সময় হল? প্রায় বারো তেরো বছর।"

তপেশ এর মুখে হাসি লেগেই আছে। এবার সে শিবুর দিকে এসে ওর হাতটা ধরে বলল –

- "কি কেমন লাগছে এখানে এসে? তোমার নাম টা তো জানাই হল না।"

- "শিবাজিৎ।"

- "বাহ্ সুন্দর নাম। চল তোমায় অনেক কিছু দেখাবো।"

কথাটা শুনে অলি একটু অভিমানের সুরে বলল –

- "আর আমি?"

- "নিশ্চয়। তুমি তো আমার ছোট্ট পরী। তোমাকেও তো নিয়ে যাবো বেড়াতে। নৌকো চড়াবো।"

তপেশ এবার ভ্যান-রিক্সার স্ট্যান্ড থেকে একজন ভ্যানওলাকে হাতের ইশারায় প্ল্যাটফর্মের কাছে ডাক দিল। ভ্যান এলে পরে ব্যাগগুলো তাতে তুলে একে একে সবাই চড়ে বসলো। শিবু পিছনের দিকটায় পা ঝুলিয়ে বসলো। এরপরই ভ্যান চলতে আরম্ভ করলো। ষ্টেশনের পাকা রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে গেল তারা। আর সেখান থেকেই খানিক ঢালু রাস্তা নেমে শুরু হয়ে গেল কাঁচা রাস্তা। শিবু অবাক চোখে দেখতে থাকলো একেই কি বলে গ্রাম্য পরিবেশ...!! রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছের সারি সূর্যের আলোকে নিখুঁত দক্ষতায় আটকে রেখেছে, যেন রাস্তায় স্পর্শ না হয়। পথের ধারে হাল্কা ঘাসের উপরে মাথা তুলে রয়েছে নাম না জানা ছোট ছোট ফুল। আর সেই সঙ্গে শরীরে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে ঠাণ্ডা মৃদুমন্দ বাতাস। মাঝে মাঝে গাছের পাতা পড়ে সবুজ হয়ে ওঠা ডোবা দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এভাবে কতদূর গেল ঠিক বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ অলি ডেকে উঠলো।

- "দাদা দেখ একটা কুকুর আমাদের সঙ্গে আসছে।"

#

ওরা সবাই অলির কথায় বেশ আশ্চর্য হয়েই তাকাল এদিক ওদিক। সত্যিই তো...!! একটা কালো কুচকুচে কুকুর সমান তালে ভ্যানের পাশে পাশে দৌড়ে চলেছে। ব্যাপারটা বেশ অবাক করার মতো কারণ কুকুরটা একবারের জন্যেও ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কেবলই পাশে দৌড়ে চলেছে। যাইহোক খানিক দূর গিয়েই তপেশ আগাম জানালো যে তাদের গ্রাম এসে পড়েছে। একটা বাঁশবনের ভিতর দিয়েই গেছে রাস্তাটা, সেটা পেরলেই বাড়ি। চন্দনার মনে পড়ল সেবার ফুলি তাকে এই বাঁশবনে এনে ভয় দেখিয়েছিল, আর তারপর সেকি হাসি হেসেছিল "ভালো বৌদি কি ভীতু" বলে। শিবুর অবশ্য নজর ছিল কুকুরটারই দিকে। সে লক্ষ্য করলো যেই বাঁশবন শেষ হয়ে বাড়ির ফাটক দেখা গেল অমনি কুকুরটাও সট করে বাঁশ পাতার একটা ঘন ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। যা হোক সামনে তখন তিনজন অচেনা নতুন মানুষ দাঁড়িয়ে আহ্লাদে গদগদ ভাব নিয়ে। ফর্সা মিষ্টি মতো দেখতে ওই বোধহয় ফুলি পিসী, আর রোগা একটু কালো করে ওই বুঝি অমিত দাদা। অবশ্য বয়স্কা মহিলাটি যে কে তার কোন ধারনা শিবুর ছিল না। উনি তপেশের বৃদ্ধা মা, চুল সব পাকা হলেও হাঁটাচলা বেশ শক্তপোক্ত। ভ্যান থেকে নামতেই বৃদ্ধা শিবুকে জড়িয়ে ধরল। এরপর শিবু একে একে তাদের প্রণাম করতে গেলে কেউই তাকে তাদের পা পর্যন্ত পৌঁছতে দিল না। ও এতে একটু খুশিই হল। কারণ পৈতে হওয়ার পর থেকে এক মা আর বাবা বাদে ও কারোর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চাইত না। এমনকি বিজয়া দশমীতে নিজের কাকা ধীরেনকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করতো না। হয়তো কোন বইতে এ সম্বন্ধে কিছু পড়ে থাকবে। তাতে অবশ্য কারোর বিরাগভাজন হতে হয়নি কখনো ওকে। কারণ ওর শান্ত নম্র মধুর ব্যবহার। যাইহোক শিবু কৌতূহলী চোখে এদিক সেদিক দেখতে আরম্ভ করে দিল। মনের ভিতরে এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা একদম চাঙ্গাই রয়েছে। তপেশদের এই বাড়িটা আশে পাশের সব বাড়ির থেকে অনেক আলাদা। এই বাড়ি বাদে রাস্তায় যে কটা বাড়ি শিবুদের চোখে পড়েছে সেগুলো সবই ছিল কাঁচা বাড়ি, হয় মাটির নয়তো পাটকাঠির বেড়ায় গোবর লেপে তৈরি। শিবুর এটা নিয়েই একটু আক্ষেপ হল যে তার পিসীর বাড়ি পাকা দালানবাড়ি এবং দোতলা। ওর ইচ্ছা ছিল মাটির বাড়িতেই থাকার, কিন্তু আপাতত সে যো নেই। গোটা দল এক সঙ্গে হাসিহল্লা করতে করতে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। অন্তত পাঁচ ছয় রকমের ফলের গাছ, ফুলের বাগান রয়েছে বাড়ির উঠোন জুড়ে। সব মিলিয়ে এই মনোরম পরিবেশ দেখে বীরেন আর চন্দনারও মন খুশী হয়ে গেল এই ভেবে যে ছুটিটা নেহাত মন্দ যাবে না।

ফুলি অলিকে কোলে নিয়ে ঘরে এসেছিল। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলে –

- "আচ্ছা অলি সোনা, তুমি আমায় কি বলে ডাকবে?"

- "পিসীমুনি বলব?"

- "একদমই না। তুমি আমাকে ফুলি বলেই ডাকবে। আমি অলি বলে ডাকবো আর তুমিও আমায় ফুলি বলে ডাকবে। কেমন জমবে না?"

অলি একটু হাসল। শিবু এসব শুনছে আর মনে মনে ভাবছে এরা কত্তো আলাদা রকমের মানুষ, কত্তো সহজ সরল। এক কথায় এদের ভালবেসে ফেলা যায়। এমন সময় অমিত শিবুর হাত ধরে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়ে অমিত জিজ্ঞেস করলো –

#

- "ভাই, তোমায় তুমি করে বলবো নাকি তুই করেই বলতে পারি?"

শুনে একটু লজ্জিত হয়ে শিবু বলল –

- "না না দাদা, তুমি তো কত বড় আমার থেকে। তুমি তুই করেই বলো।"

- "বেশ। তুই খুব ভাল আঁকিস। মায়ের কাছে শুনেছি।"

- "একটা কথা জিজ্ঞেস করবো অমিত দাদা?"

শিবু আর চেপে রাখতে পারল না। চাপার দরকারই বা কি?

- "তোমাদের এখানে ভূত আছে?"

- "ভূত?"

এই প্রশ্নে অমিত বেশ অবাক হয়ে গেল। সবাই মজা আনন্দ করছে, ওই ঘর থেকে তার শব্দ ভেসে আসছে আর শিবু এই দিন দুপুরে একি প্রশ্ন করছে...!! সে উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করলো –

- "একথা কেন জিজ্ঞেস করছিস ভাই?"

- "না বলো না প্লিজ? আছে? কখনো দেখেছ?"

- "ওরেব্বাবারে তুই একেবারে ভূত নিয়ে পড়লি যে? ওসব হবে পরে। আগে হাত পা ধুয়ে নিবি চল, মা খাবার আনবে।"

শিবু একটু দমে গিয়েও পাল্টে জিজ্ঞেস করলো –

- "তুমি শুধু আছে কিনা বলে দাও।"

বেশ দোমনা করেই শেষমেশ অমিত জবাব দিল –

- "নেই যদি বলি তবে বোধহয় মিছে কথাই বলা হবে রে। নে এবার চটপট উঠে পর দিকি। ওঘরে চল।"

উত্তরটা শুনে শিবু মনে মনে তার অমিত দাদাকে যে কত্তো ধন্যবাদ দিল তার হিসেব ও নিজেও জানে না। যাক খানিকক্ষণের বিরতি হবে এই আলোচনায়। সেটা অনিবার্য কারণ পিসী ততক্ষণে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। বিকেলের সূর্য শেষ উত্তাপ টুকু ঢেলে দিচ্ছে কমলা বাতাবরণ সৃষ্টি করে। সন্ধ্যা নামতে আর বেশি দেরি নেই।

অমিত দেখিয়ে দিতে শিবু বাড়ির ভিতর দিকে গেল। একটা চাপকল রয়েছে, তার নিচেই গোটা তিনেক গামলা আর বালতিতে জল ধরে রাখা। ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে সামনের দিকে তাকাতেই শিবুর চোখ গেল বাড়ির পিছনের

#

দিকের জঙ্গলটায়। দেখতে জঙ্গল মনে হলেও ঠিক জঙ্গল নয়। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে বেত আর বেড়া গাছের ঝোপ, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে একটা মাঝারি সাইজের ডোবা। মানুষ যে সেই ডোবার জল ব্যবহার করে না সেটা জলের রঙ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ঘন সবুজ আর অপরিষ্কারও বটে। ডোবার ওপারে কি রয়েছে সেটা ঠিক বুঝতে পারল না শিবু। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা সে জায়গায় বড় বড় কয়েকটা ঘোড়ানিম, অশ্বত্থ, বট, পাকুর গাছ আরও ছোট খাটো গাছগাছালি। আর এই সবের ডান দিক থেকে চলে গেছে রেললাইন। শিবু এবার এসে যোগ দিল সবার সঙ্গে। হিঙের কচুরি, তরকারি আর মিষ্টি সহযোগে বিকেলের জলখাবারটা জমে গেল। চন্দনা বীরেনকে বিখ্যাত নকুরের মিষ্টি আনতে বলে দিয়েছিল, সে জিনিস পেয়ে ফুলি আর তপেশ তো আনন্দে আত্মহারা। সেই সঙ্গে সবাই খুব উচ্ছ্বসিত এতদিন বাদে আবার একত্র হতে পেরে। খাওয়া দাওয়া সম্পন্ন হতেই বীরেন তপেশকে জিজ্ঞেস করলো–

- "ভাই তপেশ, এদিকে কোথাও হাট-টাট বসে নাকি?"

- "তা বসে বইকি? নিয়ে যাবো কালই।"

- "এখানে সর্বত্র ইলেক্ট্রিসিটি আছে?"

একটু ম্লান ভাবে ফুলি বলে উঠলো –

- "না দাদা, ওটা নেই। আমাদের গ্রামে এই আমাদের বাড়ি আর পাশের মুখুজ্জেদের বাড়ি বাদে এক বাজার যেখানে বসে সেখানে আছে। আর কোথাও কারেন্ট নেই।"

শিবু চুপ করে বাবা, পিসী আর পিসোর কথোপকথন শুনছিল। বিদ্যুৎ না থাকার ব্যাপারটা তার স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ হল। রাত হলেই অন্ধকার নেমে আসবে, চারিদিকে ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হবে, কখনো শীতে কাতর হয়ে শিয়ালের পালের আর্তনাদ শোনা যাবে, এসব মিলিয়ে মিশিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশ সে নিজের মনে মনেই কল্পনা করে নিল। ভালো পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তি ভালই হয়। শিবু তার এই কল্পনা প্রবণতাকে কখনই দমিয়ে ফেলার চেষ্টা করেনি, বরং সে এটা বেশ উপভোগই করে।

সন্ধ্যার ঠিক পরে পরেই তপেশের বৃদ্ধা মা শিবু আর অলিকে সঙ্গে নিয়ে বসে নানা কথা বলতে লাগলো। চন্দনা, বীরেন আর তপেশ তখন ছাদে গল্পগুজব করছে। অমিত গেছে এক বন্ধুর বাড়ি, কি যেন আনতে। তাড়াতাড়ি চলে আসবে বলে গেছে। শিবুর দিদাকে বেশ ভালই লাগছে, নানান রকম কথা বলতে পারে। এমন সময় শোনা গেল তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ, ট্রেন আসছে। শিবু আর অলি ছুটে জানলার দিকে গেল দেখবে বলে। অন্ধকারে শুধু ট্রেনের ভিতরের আলোগুলো দেখা গেল অবশ্য। ট্রেন চলে যেতেই পুনরায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করে নিল অঞ্চলটাকে। ওরা আবার দিদার পাশে এসে বসলো। শিবু জিজ্ঞেস করল –

- "দিদা, তুমি ভূতে বিশ্বাস করো?"

হাল্কা হাসি হেসে বুড়ি বলল –

#

- "করি তো। যে জিনিস এতো কাল চোখে দেখে আসছি তা কি আর বিশ্বাস না করে পারা যায়...!!"

শিবু তো অবাক। দেখে আসছি মানে?? কি বলছে দিদা এসব? উতলা হয়ে শিবু জানতে চাইলো –

- "কোথায় দেখলে দিদা? আমিও দেখবো।"

- "তা হবে না। তুমি অনেক ছোট, ভয় পাবে। শরীর খারাপও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বোন আছে..."

- "বোন ঘুমিয়ে পড়লে দেখবো। আমার কিছু হবে না।"

ওদের আলোচনাতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে দিল বাড়ির বাইরে থেকে আসা একটা বিরক্তিপূর্ণ চিৎকার। অমিত এর গলা। ওরা একে একে বাইরে এল। তপেশ ছাদ থেকেই জিজ্ঞেস করলো ব্যাপারখানা কি? অমিত তারস্বরে বলে উঠলো –

- "কাটা পা নিয়ে এসেছে আবার।"

চন্দনা, শিবু, অলি সবাই চমকে উঠলো কথাটা শুনে। সত্যিই এখানে এটা বিরাট সমস্যা। মাঝে মাঝেই রেলে কাটা পরে মানুষজন। কেউবা আত্মহত্যা করে তো কেউ হয়তো দুর্ঘটনার শিকার হয়। কিন্তু যাই হোক না কেন রেললাইনের ধার থেকে এরকম কাটা হাত, পা যে কি করে এই বাড়ির উঠোনে এসে উপস্থিত হয় সেটা আজ অবধি কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। চলতি কথায় বলে দেওয়া যায় যে হয় কুকুর নয়তো শিয়ালেরই কাজ। তাই হয়তো হবে কিন্তু এই আপদ পরিষ্কার করার জন্য বেশ খানিক খরচ হয় তপেশের। আর বিশেষ করে ব্যাপারটা অমঙ্গলজনকও বটে। সেটা তপেশের বুড়ি মা খুব ভালো ভাবেই জানে। খুব গম্ভীর হয়েই বুড়ি আদেশের সুরে বলে উঠলো –

- "আজ বেশি রাত করা যাবে না। দরজা জানলা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিবি তপেশ। রাতের রান্নাও চাপিয়ে দে গিয়ে ফুলি।"

হঠাৎ শিবু অমিতকে ধরল তাকে একটি বারের জন্য ওই ভয়ানক জিনিসটা দেখাতে হবে। অমিত মানা করা সত্ত্বেও শিবু কিছুতেই শুনল না, নাছোড়বান্দা হয়ে রইল। অগত্যা অমিত ওর হাতের গোল মাটির হাড়িটা ঘরে রেখে চুপ করে বেরিয়ে এসে চকিতের মধ্যে শিবুকে কোলে তুলে ছুটে গেল উঠোনে জামরুল গাছটার দিকে। সমস্ত ব্যাপারটা এতো জলদি ঘটে গেল যে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। টর্চের আলোয় বোধহয় দু-তিন সেকেন্ড দেখে থাকবে, তাতেই গা গুলিয়ে উঠলো শিবুর। এতো পচেগলে গেছে মনে হচ্ছে। রক্ত নেই, শুধুই লালচে ক্ষত আছে কিছু। আর হাঁটুর খানিক নিচ থেকে কাটা গেছে। পুরোটাই যেন ভেজা, চকচক করছে। টর্চ নিভিয়ে অমিত ফেরবার উপক্রম করতেই শিবুর চোখ গেল বাড়ির ফাটকের দিকটায়। অনতিদূরের বাঁশবনটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হাল্কা চাঁদের আলোয় সে দেখল বাড়ির সামনের গেটের কাছেই কে যেন দাঁড়িয়ে আছে এদিকে চেয়ে। কিন্তু অমিত খানিকটা দৌড়েই ঘরে এসে ঢোকার ফলে আর বেশি ভালো করে দেখার সুযোগ পেলো না শিবু।

এই কাটা পায়ের ব্যাপারটা নিয়ে বড়দের মধ্যে কিছু একটা গুপ্ত আলোচনা হল সেটা ভালই বুঝতে পারলো শিবু। সে আর অলিই শুধু বাদ থেকে গেল। তা হোক গিয়ে। অলি একটু ভয় পেয়েছে মনে হল চন্দনার। রাতে খাওয়া দাওয়া

#

হয়ে গেল নটার মধ্যেই। শিবু এতো আগে কোন দিনই রাতের খাবার খায়নি। কিন্তু আজ তা হবার নয়, দিদার আদেশ তার ভালই মনে আছে। রাতে শোবার ব্যবস্থা ভালই হল। বড় একটা ঘরে বীরেন আর চন্দনা অলিকে নিয়ে শোবে ঠিক হল। শিবু, অমিত আর ওদের দিদা এক ঘরে। অমিত ওর এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল সন্ধ্যায়। সেখান থেকে এক হাড়ি খেজুরের রস নিয়ে এসেছে। এর স্বাদ গন্ধ যে কোনো বাঙালি মনকে আরাম যোগাতে পারে। সবাই গ্লাসে করে রস খেতে জড়ো হল, কেবল অলি ঘুমিয়ে পড়ায় ওই বাদ। অমিত ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। শিবু ওর বাবা, পিসী, পিসোর বাহবা ধ্বনি শুনে উৎসাহিত হয়ে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল কিন্তু রসটা বিশেষ জুত করে খেয়ে উঠতে পারলো না, ওর কাছে কেমন যেন বিস্বাদ মনে হল। হয়তো গা গুলোনোটা কমেনি এখনো। ভেবে দেখল খেতে বসেও ঠিক সুবিধা করতে পারেনি ও। পিসীর অমন রান্নার গন্ধে তো পেট চুঁইচুঁই করছিল, কিন্তু খেতে শুরু করার পর মনে হল খিদেটা যেন মরে গেছে।

রাতে শুয়ে ওর হঠাৎ মনে পড়ল সেই ছায়ামূর্তির কথা। কে ও? ওখানে কেনই বা দাঁড়িয়ে? ও কি আসলে মানুষ নাকি অন্য কিছু? এতো তাড়াতাড়ি ওর মনের ইচ্ছাপূরণ হয়ে যাবে কি? এসব ভাবতে ভাবতেই শান্ত ভাবে বলল –

- "দিদা, তোমাদের বাড়ির গেটের বাইরে অন্ধকারে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ও কে?"

শুনে অমিত আগে বলে উঠলো –

- "কখন দেখলি?"

- "ওই যখন তুমি আমায় কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলে তখন।"

বুড়ি এবার কথা বলে উঠলো। অন্ধকার ঘরে কেউ কারোর মুখাভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে না।

- "অমু তুই ওকে নিয়ে কোথায় গেছিলি?"

অমিত একটু ইতস্তত করে বলল –

- "কোথাও না ঠাম্মা। ওই সামনের সিঁড়িতে নেমেছিলাম, সেখান থেকেই ফিরলাম ঘরে।"

- "ভাই কে নিয়ে এমন কিছু করবি না কিন্তু যাতে হিতে বিপরীত হয়।"

- "না, না।"

শিবু ওদের থামিয়ে দিয়ে বেশ অধৈর্য হয়েই বলে উঠলো –

- "ওই লোকটা কে বলনা?"

বুড়ি রেগে বলল –

- "শুনবি? ভয় পাবি না তো?"

#

- "উঁহু।"

বুড়ি মনে মনে ভাবলো এইটুকু ছেলের সাহসের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেশি, নতুবা সাংঘাতিক কৌতূহলী। খানিক ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে মন্দ হয় না, তাতে করে যদি ওর এই ভুত-প্রেত নিয়ে আগ্রহ কমে। যেমন বলা তেমনি কাজ। বুড়ি গল্প বলা শুরু করতেই অমিত জিজ্ঞেস করলো যে এই গল্প সে জানে কিনা। উত্তরে বুড়ি না বলায় সেও মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

- "খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়, তোদের দাদু তখন বেঁচে, এই গ্রামেই এক সাধু থাকতো। সে নাকি ডাকিনী মন্ত্রসিদ্ধ ছিল, লোকে বলতো। আমরা অবিশ্যি তার কাছে কখনো যেতাম না, সে দরকার পড়েনি কখনো। তবে শুনতাম লোকজন গেলে নাকি অনেক রকম সাহায্য করতো। হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা, শিকড়-বাকড়, মাদুলি দেওয়া এসব করতো। গ্রামের বাইরে থেকেও লোকজন আসতে দেখেছি। তা সে একবার বর্ষায় আমাদের এই বাড়িতে এল। আমি ছিলাম তখন দাওয়ায় বসে। ওকে আসতে দেখে আমি একটু অবাকই হই। মুখ চেনা হলেও কখনো কথাবার্তা আলাপ ছিল না, হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে আসা ভাবতে ভাবতেই সে উঠোন পর্যন্ত এসে একটা লম্বা পেন্নাম ঠুকলে। বললে 'মা সামান্য চাল আর ডাল দাও, বড় অভাব হয়েচে সংসারে। বৌডা অসুখে পড়ল, কি যে করব ভেবে পাচ্ছিনে।' আমি জানতে চাইলাম তার তো ভালই রোজগার ছিল, জ্যোতিষী বলে নাম আছে, তন্ত্রমন্ত্রও জানা আছে। তাহলে হঠাৎ এমন দুর্দিন কি করে? সে বললে, না কোথায় আর সেই দিন? এখন আশেপাশে অনেক জ্যোতিষী হয়ে গেছে। দূর থেকে লোকজন আর আসে না তার কাছে। গ্রামের থেকেও আর তেমন রোজগারপাতি হয় না। আমি বললাম ঠিক আছে তুমি একটু দাঁড়াও আমি দেখি ঘরে কি আছে। তারপর আমি ঘর থেকে এক পুঁটুলি চাল আর এক বাটি মুসুর ডাল এনে তাকে দিলাম। লোকটার মুখ দেখে তার বয়স বোঝার যো নেই, তবে মনে হল চল্লিশের নিচে নয় কিছুতেই। সে তার ঝোলাতে ওগুলি পুরছে এমন সময় তার শীর্ণ দারিদ্রভরা মুখটা দেখে মনে ভারী মায়া হল। পরিপাটি করে ভরে নিয়ে সে এক আশ্চর্য কাণ্ড করলো। ডুকরে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে, এমন করে যে আরেকটু হলেই বৃষ্টি ভেজা উঠোনের কাদায় আছাড় খেয়ে পড়তাম। 'একি করো কি' বলে তো চেঁচিয়ে উঠলাম। এমন আচমকা ছুঁয়ে ফেলল, কি না কি জাত ভাবছি ঠিক তখনই পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই বললে 'মা অপরাধ নেবেন না, আমি ব্রাহ্মণ, নাম ভবানী চক্রবর্তী। আমার গুরু আমায় মহাকালের মন্ত্র দেওয়ার পর থেকেই আমি এপথে এসেছি। তন্ত্র সাধনা তো আর ছেলেখেলা নয়, অনেক কিছু খুইয়েছি সে পথে। শেষে বৌডা আমারে সংসারী করলো। আজ আট দিন ধরে বিছানায় শোয়া, বদ্যি আনবো তার পয়সা নাই ঘরে। দুজনের কাছে চাইলাম দুডি টাকা, দিল না। আপনারা বড় মানুষ মা, যদি দুডি টাকা দ্যান, আমার কাছে হলেই আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাবো পতিজ্ঞা করে বলছি।' আমি মনে মনে ভাবলাম বাহ্ ভালই চালাকি জানে দেখছি, আগে চাল ডাল নিয়ে এখন আবার টাকা...!! বিরক্ত মুখেই বলে দিলাম 'নাগো টাকা আমার কাছে নেই। আমার ছেলে কাজে বেরিয়েছে, পরে কখনো এসো।' শুনে একরকম হতাশ হয়ে গুটি গুটি পায়ে সে বাড়ির বাইরে চলে গেল। বাইরে বসেই খানিক ভাবলাম, সত্যিই গরিব তায় আবার ব্রাহ্মণ, খুব শক্ত করে কিছু বলে ফেললাম না তো? তারপর ভাবলাম একেবারেই যে কিছু দিইনি তা তো নয়... যাইহোক সেদিন তপেশ ফিরলে পর ওকে বললাম যে কাল তো তোর ছুটি, একবার ওই শিবমন্দিরের পিছনে সাধুর বাড়িতে যাস তো, আর পারলে দুটি টাকা ওর হাতে দিয়ে আসিস বাবা। তপেশকে তারপর সবটা বললাম। ও শুনে রাজি হল। তোদের দাদু একটু রাগ নিয়েই তাকাল আমার দিকে, বুঝলাম উনি থাকলে হয়তো

#

টাকাটাও দিয়ে দিত সাধুকে। পরের দিন যথাসময়ে তপেশ গেল সাধুর বাড়িতে। তবে বেশ কিছু সময় পর ফিরে এসে ও যা শোনাল তাতে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। সাধু নাকি ঘরের দরজার চৌকাঠের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আজে বাজে গালাগালি করে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটা বোতলে মুখ লাগিয়ে ঢক ঢক করে মদ গিলছে। কিছু লোকজন, বাচ্চাকাচ্চা জড়ো হয়েছে, সবাই অবাক হয়ে সাধুর কীর্তি দেখছে। এরপর তপেশ কাছে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে খপ করে তপেশের হাত ধরে বলে 'বাবা আমার বৌডা বুঝি আর বাঁচল না, আজ বদ্যিকে ডাকতে গেছিলাম, এসে দেখি তার আর শ্বাস চলছে না। বদ্যি বলে দিল, মরে গেছে। কিন্তু না.....আমি জানি সে মরে নাই। কিন্তু সেকি আর বাঁচবে??!!' এরপর আবার সেই গালাগালি। তপেশ চেষ্টা করেছিল উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার কিন্তু তেমন কিছু ওর চোখে পড়েনি। তাছাড়া সাধুর গায়ের দুর্গন্ধ আর দেশি খারাপ মদের উদ্ভট গন্ধের দাপটে ও আর ওখানে থাকতে পারেনি। সাধুর সামনে দু'টাকার একটা নোট রেখে চলে আসে বাড়িতে। এরপরেই পাই সেই আশ্চর্য খবরটা যার কোন কিনারা আজও হয়নি। সাধু আর তার বৌ সেদিনের পর থেকে উধাও। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সাধু তার বৌয়ের নিথর দেহটাকে নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে মুসলমানদের কবরখানার পাশে আগুন জ্বালিয়ে কিসব করেছিল। অনেকের ধারনা সে ডাকিনী মন্ত্রবলে বৌকে জীবিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তারা দুজনই উধাও হয়ে গেছে। এরপর থেকে লোকজন ওই দিকটায় বেশি যেত না, রাত হয়ে গেলে তো না-ই। তারও কিছু দিন পর একদল মুসলমান ছেলেপুলে রাতে ওই দিকটায় গিয়ে দেখতে পায় কেউ তাদের পবিত্র কবরস্থানের গম্বুজটা ভেঙে দিয়েছে, শুধু তাই নয়, কিছু কিছু কবরও খুঁড়ে রেখেছে। এ ঘটনা জানাজানি হতেই এ গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে ঠিক করে দু'জন রাত পাহারা রাখা জরুরী। সেইমতো ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু দুদিনও গেল না তারা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। কবরের আশেপাশে তাদের জুতোগুলি পাওয়া গেল। এরপর থেকে সেই কবরস্থান পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। মুসলমানদের যারা পুরোহিত হয় সেই মোল্লাসাহেব এরপর কবরখানা করলো রেললাইনের পাশে ডোবার ধারের ওই বনজঙ্গলের মধ্যে। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে তাকালে যে বাঁশের বেড়া দেওয়া জায়গাটা দেখা যায় সেটা। কিন্তু তাতেও সমস্যা সমাধান হল না। মাঝে মাঝেই ওখান থেকে অদ্ভুত সব গলার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এরপর ঘটল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। রাতে আমরা সবাই শুয়েছি, কত রাত ঠিক খেয়াল নেই, জানলার কাছে শুনলাম একটা চাপা গর্জনের মতো গলার স্বর। 'ওমা চাল দে, ওমা চাল দে' আমি তো চমকে লাফিয়ে উঠে বসলাম বিছানার উপর আর দেখি উনিও সেইসঙ্গে আমার হাতটা চেপে ধরেছে। আবার সেই কণ্ঠস্বর, 'ওমা চাল দে' বলেই দুম দুম করে জানলায় দুটো ঘা পড়ল। আমার তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোদের দাদু দারুণ একটা কাজ করে বসলো। জোরে জোরে চণ্ডীপাঠ করতে আরম্ভ করে দিল। খানিক পরেই আর কোথায় কি? সব চুপ। পরের দিনই বড় পূজারী ডেকে আনা হল, সে আমাদের বাড়িটা রক্ষামন্ত্রে বেঁধে দিলেন। পূজাআচ্চা করে উনি বললেন ওই সাধুর অতৃপ্ত আত্মা ঘোরাঘুরি করে আমাদের বাড়ির আশেপাশে। কিন্তু এখন থেকে সে আর বাড়ির সীমানায় ঢুকতে পারবে না। আমাদের সবাইকে মন্ত্রপূত তাবিজ দিলেন, সেটা আজও পড়ে আছি। কিন্তু তবু মধ্যরাতের পর আমাদের বাড়ির কেউ বাইরে কখনো থাকে না। শব্দ শোনা যায় এখনো মাঝেসাঝে কিন্তু দরজা জানলায় ঘা পড়ে না।"

শিবু আর অমিত দুজনেই দমবন্ধ করে শুনছিল দিদার গল্প। এবার শেষ হয়েছে বুঝেও কেউ কোন কথা বলল না। এদিকে বুড়ি ভাবল হয়তো দুটোই ঘুমিয়ে পড়েছে, সেও পাশ ফিরে শুলো। ঘুমে আস্তে আস্তে চোখ জড়িয়ে আসছে

#

যে। দূরে কোথায় শিয়াল ডেকে উঠলো, শিবু কান খাড়া করে শুনল। নাহ্ এরকম আসল ঘটনা শোনার যে ধারে কাছেও আসে না গল্পের বই পড়া সেটা সে ঢের বুঝতে পারলো।

পরের দিন ঘুম ভাঙল একটু দেরি করেই। উঠে বসেই শিবু দেখতে পেলো ফুলি পিসী কার জন্য বড় একটা ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় অমিত পাশে এসে বলল চটপট মুখ চোখ ধুয়ে নিতে হবে কারণ খেয়েদেয়েই ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। বেড়াতে যাওয়ার কথা শোনা মাত্র আর বিলম্ব করলো না শিবু। মায়ের কাছ থেকে টুথব্রাশ এনে নিয়ে কলপারে এসে দাঁড়াল। দাঁত মাজতে মাজতে আনমনে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে পিছনের সেই কঞ্চির বেড়া দেওয়া জায়গাটায় নজর পড়ল, ঝোপঝাড়ই কেবল। এরপর প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে এসে বসতেই ফুলি তাকে জিজ্ঞেস করলো –

- "বাবা তুই কুমড়ো খাসতো?"

সামান্য মাথা দুলিয়ে শিবু সম্মতিসূচক ইশারা করলো। তারপর লুচি, কুমড়োর তরকারি, আলুর দম আর বড় বড় সাইজের দুটো কমলাভোগ সহযোগে প্রাতরাশ সেরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল। কাল রাতের অরুচিভাবটা অনেকটা কেটেছে মনে হল, এটা বেশ ভালো লক্ষণ। বেড়াতে এসে শরীর ঠিকঠাক সঙ্গ না দিলে মনটাই খারাপ হয়ে যায়। শিবু মায়ের কাছে গেল ভালো জামা আর প্যান্ট আনতে, বেড়াতে যাবে কিনা। মায়ের মুখেই ও শুনল অনেক সকালেই ওর বাবা আর পিসো কোথায় যেন বেরিয়েছে আর কাল সন্ধ্যার সেই অবাঞ্ছিত বস্তুটিকেও একটা মেথর ছেলেকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিপাটি করে সেজে তৈরি হয়ে নিল শিবু, অমিত দাদা সাইকেল বার করছে। ভালই হল, অনেকটা দূরত্ব বেড়িয়ে আসা যাবে সাইকেল চড়ে। তবে প্রথমে খানিক দূর হেঁটে গেল ওরা, রাস্তার দুপাশের হাল্কা রোদের চাদর বিছানো প্রান্তর, বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ার সরসর শব্দ শিবুর কিশোর মনে এক অনাবিল স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল। ও মনে মনে ভাবল, এখানে যদি ওর বাড়ি হতো তবে কত ভালই না হতো। এবার অমিত বলে উঠলো যে সাইকেলে উঠতে হবে, শিবুও দু'পা ছড়িয়ে উঠে বসলো সাইকেলের পিছনের স্টিলের ক্যারিয়ারে। কাঁচামাটির রাস্তা ধরে ওরা এগিয়ে গেল গ্রামের ভিতরের দিকটায়। রাস্তার দুপাশে কত ছোট ছোট মাটির বাড়ি, কুঁড়ে ঘর, মাঝে সাঝে ধানের গোলাও চোখে পড়ল শিবুর, আনন্দের আতিশয্যে চোখের পলকটুকুও পড়তে দিতে চাইছে না মন। এবার একজায়গায় এসে অমিত দাঁড়াল, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল –

- "দেখ ভাই, ওখানে বাচ্চারা পড়ছে।"

শিবু উৎসাহের সঙ্গে দেখল বাড়ির দেওয়াল ইট গেঁথে তৈরি কিন্তু তার যে চাল সেটা খড়ের এবং প্রায় মাটি পর্যন্ত নেমে এসেছে, এতোটাই যে ওকে ঢুকতে গেলেও মাথা নুইয়ে ঢুকতে হবে। বাড়িটার সামনে প্রশস্ত বারান্দা, তার মাঝে মাঝে গোটা চারেক বাঁশের খুঁটি পোতা। খুঁটিগুলিই চালাটাকে ঠেস দিয়ে ধরে রেখেছে। জনা আষ্টেক ছেলেমেয়ে একটা চাটাই এর উপর বসে আছে, কিন্তু পণ্ডিতমশাইটিকে দেখা গেল না। হয়তো অন্যত্র গিয়ে থাকবেন। শিবু জিজ্ঞেস করলো –

- "এটাকেই কি পাঠশালা বলে?"

#

অমিত হেসে জবাব দিল –

- "হ্যাঁ ভাই। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা এখানেই পড়াশোনা করে।"

আবার ওরা চলতে শুরু করলো। গ্রামের বসতি পেছনে ছেড়ে ক্ষেত শুরু হল। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে সূর্যের আলোর রোশনাই চকমক করছে যেন। অমিত বলে বলে দিচ্ছে, শিবুও প্রতিটা জিনিস মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। সরু রাস্তা চলেছে এঁকেবেঁকে, তার একপাশে বাঁধাকপির চাষ হচ্ছে আর অন্য পাশে ঘেরা জমিতে বেগুন গাছ। এভাবে আর খানিক দূর যেতেই অমিত বলল –

- "সামনেই ওই যে দেখছিস বটগাছ ওর পেছনেই শিবমন্দির।"

শিবু চেয়ে দেখল, হ্যাঁ ওইতো দেখা যাচ্ছে লাল সুরকির দেওয়াল। তারপর সামনে পৌঁছে ভালো করে মন্দিরটাকে দেখলো, পুজোটুজো দেওয়া হয় বোঝাই যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল দিদার কাল রাতের সেই গল্পটা। এই মন্দিরের পেছনেই কি তাহলে ছিল সাধুর বাড়ি...!! অমিতও বোধহয় মনে মনে একথাই ভাবছিল। দুজনেরই খুব ইচ্ছা হল ওই দিকটায় একটিবার যাওয়ার। অমিত স্থানীয় ছেলে হলেও মন্দিরের পিছনের দিকটায় কোনদিন যায়নি জংলা পরিত্যক্ত জায়গা বলে।

- "পেছন দিকটায় যাবে দাদা?"

অমিত আপত্তি করলো না। বলল –

- "হ্যাঁ আমারও তো ইচ্ছা করছে। কাল ঠাম্মা যা গল্প শোনাল, বাপ্‌রে...!!"

- "তাহলে চলো যাই।"

- "যদি কোন গণ্ডগোল হয়?"

- "কি হবে? আমাদের তো পৈতে আছে। আর সেরকম কিছু হওয়ার আগেই পালিয়ে চলে আসবো।"

অমিত আর কথা বাড়াল না, সাইকেলটা মন্দিরের পাশে দাঁড় করিয়ে একবার চাতালটার উপরে উঠে মহাদেবকে প্রনাম করে নিল। শিবুও বুকে হাত রেখে দেবাধিদেবকে স্মরণ করলো, তিনিই তো সর্বশক্তিমান, রক্ষাকর্তা। তারপর দুজনে একসঙ্গে সন্তর্পণে গিয়ে ঢুকল মন্দিরের পিছনের বেড়াঝোপের মধ্যে। এখানে মাটিও বেশ নরম, পা ঈষৎ ডেবে যেতে লাগলো। সাবধানে গুল্মলতার ঝোপ ঠেলে খানিক অগ্রসর হতেই ওরা দেখল সামনে একটা কুঁড়েঘরের ধ্বংসাবশেষ। ওদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটাই এককালে ছিল সেই সাধুর বাড়ি। খানিকটা দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক দেখল শিবু, বড় মাঝারি অনেক গাছ আছে সেখানে, অনেকগুলোর নামও জানে না। অমিত বলল –

- "চল এবার। আর কিছু তো নেই।"

- "হ্যাঁ চলো।"

#

এই বলে যেই না ওরা পেছনে ঘুরেছে, কোত্থেকে কালো একটা কুকুর হিংস্র দাঁত বার করে লাফিয়ে পড়ল শিবুর গায়ে। আচমকা এই আক্রমণে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল ওর। অমিত নিমেষের মধ্যে শিবুকে টেনেহেঁচড়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করলো বটে কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হল না। শিবুর বাঁ পায়ের ক্ষতস্থান থেকে ততক্ষণে রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে ফেলল ও। কুকুরটা এভাবে কামড়ে দিল কেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। অমিত শিবুকে কোলে তুলে নিল, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে এমন সময় চোখ পড়তেই দেখল কুকুরটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সামান্য হাঁ করে জিভটা অল্প বের করে রেখেছে, তার এমনই ভাব যে কামড়টা দিয়ে যেন সে খুব খুশীই হয়েছে। এদিকে রাগে দুঃখে দু'জনের মনের অবস্থা বলার মতো নয়। অনেক কষ্টে অমিত শিবুকে সাইকেলে করেই নিয়ে গেল বাজারের দিকটায়, সেখানে একটা ওষুধের দোকান আছে। একটা রুমাল দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিয়েছিল অমিত। খুলে দেখাতেই দোকানের লোকটা ক্ষতস্থানের প্রাথমিক চিকিৎসা করে দিল, ভালো করে পরিষ্কার করে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। আর বলে দিল যে এতেই হবে না, কুকুর কামড়ানোর পরে ইঞ্জেকশান নিতে হয় চোদ্দটা। রাস্তার পাগল কুকুর, নইলে জলাতঙ্ক হয়ে গেলে মহাবিপদ হবে। শিবু শান্তমনে চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবল, তারপর তাকিয়ে অমিতকে উদ্দেশ্য করে বলল –

- "এটা সেই কুকুরটা।"

অমিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো –

- "কোন কুকুরটা?"

- "যেটা আমাদের ভ্যানের পাশে পাশে দৌড়ে এসেছিল তোমাদের বাড়ির ওই বাঁশবনটা পর্যন্ত।"

অমিত একটু অন্যমনস্ক হয়ে দোকান থেকে দুটো ব্যথার ট্যাবলেট কিনে নিল। তারপর শিবুর দিকে তাকিয়ে বলল –

- "ভাই, একটা রিক্সা করে দেব? তুই ওতে বসে যেতে পারবি আরামে। আমি পাশে সাইকেল নিয়ে যাবো।"

শিবু আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল যে তার রিক্সা লাগবে না, সে সাইকেলের পেছনে বসেই চলে যেতে পারবে। অমিত আরও কয়েকবার বললেও শিবু রাজি না হওয়ায় অগত্যা সাইকেলে করে নিয়ে ফেরার ব্যবস্থাই হল। তারপর খানিক পথ এসে অমিত জিজ্ঞেস করলো –

- "তখন কি বলছিলি ভাই? ওটা কোন কুকুর ছিল?"

- "আমরা যখন কাল ষ্টেশন থেকে ভ্যানে করে আসছিলাম, তখন এই কালো কুকুরটাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলো। তারপর যখন তোমাদের বাড়ির সামনে চলে এলাম তখন ওই বাঁশবনের ভিতরে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল।"

#

- "ওও... কিন্তু বুঝতে পারছি না এভাবে কামড়ে দিল কেন? আমরা তো আর ওকে বিরক্ত করিনি। লেজ মাড়িয়েও ফেলিনি। নাহ্ কিসব যে হচ্ছে কে জানে...!!"

এমন সময় শিবু ওর গলার স্বরটা বদলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল –

- "বিরক্ত যে আমরা করিনি সেটা কি বলা যায়? বলা যায় না।"

বাড়ি ফিরতেই হইহই কাণ্ড বেঁধে গেল। চন্দনার তো মাথায় হাত, এতো বছরে এরকম দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি ওর ছেলের সঙ্গে। আজ এইভাবে এখানে এসে এরকম ঘটে গেল এটা যেন ও বিশ্বাসই করতে পারছে না। তপেশ অমিতকে জিজ্ঞেস করলো দুর্ঘটনাটা কোথায় কিভাবে হল, কিন্তু অমিতকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে শিবু জোর গলাতে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো –

- "সেই কুকুরটা পিসো..... সেই যে কালো কুচকুচে।"

অলি ভীতভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল। দাদার কথা শুনে চোখ বড় বড় করে বলল –

- "কাল আমাদের সঙ্গে আসছিলো যেটা?"

- "হুম।"

বীরেন একটু রাগের স্বরেই বলল –

- "গেছিলি কোথায় তোরা? আর কুকুরটা কামড়াল কেন?"

অমিত চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল, হয়তো অনুতাপ হচ্ছিল এভাবে ভাইকে কষ্ট পেতে দেখে। মামার এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সে স্থির করে উঠতে পারলো না। সাধুর বাড়ির ওদিকে গেছি সেটা বললে হয়তো ওর বাবা আর ঠাকুমা চটে লাল হয়ে যাবে। কিন্তু মিথ্যা ও বলতে পারলো না। শুধু বলল যে ওরা শিবমন্দিরের কাছে গেছিলো, আর সেখানেই এই বিপত্তিটা ঘটে। এও বলল যে তারা কোনপ্রকার বিরক্ত না করা সত্ত্বেও কুকুরটা তেড়ে এসে কামড়ে দেয়। কথাটা শোনামাত্র তপেশের বুড়ি মা মনে মনে যা ভাবার ভেবে নিল, তার আর বুঝতে এতটুকু বাকি রইল না যে ওরা সাধুর বাড়ির আশেপাশেই গিয়েছিল। যাইহোক তপেশ আর বিলম্ব না করে সাইকেল নিয়ে তখনই ছুটল ষ্টেশনের দিকে, পারুলিয়াতে পরিচিত একজন ডাক্তার থাকে, তাকে আনতে হবে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের কয়েকঘর প্রতিবেশী দেখতে এল। গ্রাম পঞ্চায়েত এর সভাপতি রমাকান্ত বোস তপেশ আর ফুলিকে খুব স্নেহ করেন। তিনিও এলেন ব্যাপারটা শুনে। শিবু নিচতলার একটা ঘরে বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। পাশের বাড়ির মুখুজ্জে গিন্নি খুব করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। চন্দনা খুব কাছে এসে একবার জিজ্ঞেস করলো যে ওর খিদে পেয়েছে কিনা, তাতে শিবু বলল যে খিদে তো পায়ই নি বরং খুব ঘুম পাচ্ছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই চলে গেলে শিবু দিদাকে কাছে ডাকল। কিন্তু কোথায় সে? ফুলি এঘর-ওঘর খুঁজে না পেয়ে বাইরে

#

বেরিয়ে এল। অমিত সাইকেলটা গুদাম ঘরে ঢুকিয়ে রেখে উঠোনের উপর দিয়ে হেঁটে আসছিলো, ওকেই জিজ্ঞেস করলো ফুলি –

- "তোর ঠাম্মা কোথায় গেল রে দেখেছিস?"

- "এইতো এইমাত্র বেরোল কোথায়। একটু পরেই আসবে বলেছে।"

শিবু সেটা শুনে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। বোধহয় খানিক ঘুমিয়েও পড়েছিল, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন এক অস্বস্তিজনক জ্বালা জ্বালা ভাব অনুভব করলো সারা গায়ে। পাশেই বসেছিল ওর দিদা। শিবুকে নড়াচড়া করতে দেখে জিজ্ঞেস করলো –

- "কি ভাই আমাকে ডাকছিলে?"

খুব কষ্ট করে ভাঙা গলায় শিবু বলল –

- "দিদা আমার সারা গা খুব জ্বালা করছে।"

বুড়ি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে। চন্দনা উদ্বিগ্ন নয়নে তাকিয়ে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ও গায়ে হাত দিল। বাপ্‌রে, এতো সাংঘাতিক জ্বর...!! বীরেনের দিকে ছলছলে চোখে তাকাল চন্দনা। বীরেন ওর মনে ভাব বুঝতে পেরে বলল –

- "দাঁড়াও, চিন্তা করো না। তপেশ তো গেছে ডাক্তার আনতে, ফিরে আসার সময় হয়ে গেল। এসে দেখুক, না হলে কালই কলকাতায় নিয়ে চলে যাবো।"

তবু মায়ের মন তো, সেকি আর এমন পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা কথায় বাগ মানে...!! ফুলিরও মুখ ভার। শিবু কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলো, তারপরই উঠে বসে বলল –

- "জল খাবো।"

সবাই একটু আশ্চর্য হল, গলার স্বরটা বেশ পাল্টে গেছে বলে মনে হচ্ছে। শিবুর সেই মিষ্টি নম্র গলার আওয়াজ এটা নয়। তার বদলে বেশ কর্কশ হেঁড়ে গলা। বীরেন ভাবল হয়তো জ্বর হয়ে গলাটা ভেঙে গেছে। ফুলি জল এনে দিল গ্লাসে। সেটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে আবার জল চাইলো শিবু। মুখটা তুলে সামনের দিকে তাকাচ্ছে না ও, বসেই খানিক সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে আর মাথাটাকে নিচের দিকে গুঁজে রেখেছে অদ্ভুতভাবে। চন্দনা ভীত সন্ত্রস্তভাবে জানতে চাইলো এরকম করে বসে থাকার কারণ কি, তাতে আবার সেই অদ্ভুত হেঁড়ে গলায় জবাব দিল শিবু –

- "ভালো লাগছে এভাবে।"

#

এরকম ভাবে কাটল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে শিবু তাকাল ওর বাম পাশে বসে থাকা বুড়ির দিকে। জড়ানো জড়ানো গলায় বলে উঠলো, ঠিক যেন কোন হৃদরোগীর বেঁকে যাওয়া জিভের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা কণ্ঠস্বর।

- "আমার আসতে একটু দেরি হয় গেল। এ বাড়ির রক্ষাকবচ সামনের অমাবস্যার আগেই নষ্ট হয়ে যাবে। ভবানীর রাগ এখনো কিন্তু পড়েনি।"

বুড়ি শিবুর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো। একি মূর্তি এটুকু ছেলের...!! চোখ দুটো রক্তাভ, ঠোঁট দুটো শুকনো, সারাটা মুখ জুড়ে একটা কঠোর রুক্ষতা। বীরেন আর চন্দনার কপালে বিস্ময়ের ভাঁজ পড়ল, ছেলে কি তবে প্রলাপ বকছে??!! ঠিক সেই সময় তপেশের গলার শব্দ পাওয়া গেল, ফুলি আর অমিত ছুটল সেদিকে। তপেশ ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সঙ্গে আরও একজন, বোধহয় ডাক্তারেরই সহযোগী হবে। খানিকের জন্য সবার ধ্যান চলে গেল ডাক্তারের দিকে। সে এসে বসলো শিবুর পাশে, পায়ের ব্যান্ডেজটা একটু ধরে দেখে জানতে চাইলো বমি বমি লাগছে কিনা। শিবু আবার স্বাভাবিক, এতে সবাই খানিকটা হলেও আশ্বস্ত হল। ডাক্তারের প্রশ্নে শিবু মাথা নেড়ে না করলো। তারপর গতবাধা কিছু শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তার তার স্যুটকেস থেকে একটা ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ আর ছোট কাচের শিশিতে ওষুধ বার করলো। শিবু আড়চোখে চেয়ে দেখছিল সবটা, ডাক্তার সিরিঞ্জে ওষুধটা পুরছে এমন সময় আবার সেই গম্ভীর কর্কশ গলায় বলে উঠলো –

- "এসবের দরকার নেই ডাক্তার।"

ডাক্তার অবাক হয়ে শিবুর মুখের দিকে তাকাল। ঘরের সবাই থ হয়ে দাঁড়িয়ে, শিবু বলল –

- "আমার ক্ষত সেরে গেছে। বিশ্বাস না হলে বাঁধন খুলে দেখে নাও।"

ডাক্তার একথা শুনে এবার একটু হাসল। মনে মনে ভাবল বাচ্চা ছেলে, ইঞ্জেকশান নিতে ভয় পাচ্ছে এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। ধৈর্য সহকারে সে বলল-

- "একটুও ব্যথা লাগবে না তোমার, তুমি ওই দিকে তাকাও দেখো নিমেষের মধ্যে হয়ে যাবে।"

কিন্তু শিবু এতো কথা শোনার অপেক্ষায় নেই, বিরক্ত হয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলো –

- "আমি কি মশ্‌করা করছি তোদের সঙ্গে?"

বলেই এক লাফে বিছানার উপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের ব্যান্ডেজটা টেনেহিঁচড়ে খুলে ফেলতে লাগলো। সব্বাই বিস্ময়ে হতবাক, করছে কি ছেলেটা? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি...!! কিন্তু ডাক্তার, তার সহযোগী আর বাড়ির সবাইকে একরকম সম্মোহিত করে দিয়ে শিবু ব্যান্ডেজটা খুলে পা-টা মেলে ধরল সর্বসমক্ষে।

- "দ্যাখ্, আছে কিছু?"

#

শিবুর পা একদম স্বাভাবিক, কামড়ের ক্ষত তো দূর একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই সেখানে। এই দৃশ্য দেখে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন চিন্তার উদয় হল। এক অমিত বাদে কেউই সেই ক্ষতস্থান চোখে দেখেনি, শুধু ব্যান্ডেজ বাঁধা সেটাই দেখেছে। ডাক্তার তো রীতিমত রেগে গেল, আর রাগ হওয়ারই কথা। দিন দুপুরে এমন মশকরা করতে এতদূর নিয়ে এসে এরা ঠিক কাজ করেনি...!! ধাঁধা লেগে গেল অমিতের। ও সামনে এগিয়ে এসে ভালো করে পা টা দেখতে শুরু করলো। নাহ্, কোথায় কামড়ের দাগ? একদম মসৃণ ত্বক। ডাক্তার তার ব্যাগে জিনিস গুছিয়ে নিয়ে তপেশকে উদ্দেশ্য করে বলল –

- "এটা কি হল তপেশ? মজা করার আর সময় পেলে না?"

তপেশ ধন্দে পড়ে অমিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো –

- "ওকে কুকুরে কামড়ায়নি?"

অমিত ভ্রু কুঁচকে কাঠিন্যের সঙ্গে জবাব দিল –

- "বিশ্বাস করো বাবা, আমার চোখের সামনেই কামড়েছে, নইলে কি আর মজা করবো এসব নিয়ে?"

তপেশ ভালভাবেই চেনে ওকে। এরকম মজা করবার পাত্র যে তার ছেলে নয় সেটা বিলক্ষণ জানা। কিন্তু তাতে করে হিসেব যে মিললো না...!! যাহোক ডাক্তারের কাছে বেশ কিছু বাক্যব্যয়ে মার্জনা প্রার্থী হতে হল তাকে। ডাক্তার ফিরে গেল, অমিত সঙ্গে গেল তাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসতে। এদিকে বাকি সবার মুখ বিস্ময় আর ভীতির সমন্বয়ে কালো হয়ে আছে। চন্দনা খানিক স্বস্তি পেলো এটা ভেবে যে তার ছেলেকে অন্তত কুকুর কামড়ায়নি, আর যাই হোক না কেন। বাকি দিনটা সবার বাড়ির ভিতরেই গল্পগুজব করে কাটল। কিন্তু সবার মনেই একটা প্রশ্ন চাপা পড়ে দম আটকে রয়েছে, বিশেষ করে বুড়ির মনে। শিবুর মধ্যে থেকে কে কথা বলে উঠলো? বুড়ি একবার ভাবল, কাল রাতের গল্পটা কি শিবুর মনে এতটা জায়গা করে নিয়েছে যে সে ঘটনাগুলির অনুসরণ করছে...!! কিন্তু এ ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। শিবুর চোখ মুখের যা অবস্থা বুড়ি আজ দেখেছে সেটা কখনোই ওইটুকু ছেলের পক্ষে অভিনয় করে দেখানো সম্ভব নয়। এদিকে ডাক্তার যাওয়ার পর থেকে শিবু কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেনি, এমনকি অলিও দাদার কাছে যায়নি আর। একটা ঘরেই শুয়েছিল শিবু, শুধু সময় মতো খেয়েছে। সারাটা সকাল ধরে যা ধকল গেছে ছেলেটার উপর দিয়ে তাতে এই নিস্তেজ ভাবটা বাড়ির লোকেদের কাছে খুব একটা অস্বাভাবিক লাগলো না। চন্দনা আর ফুলি শিবুর ঘরেই ছিল দুপুরটা, বিকেল হতে ওরা একটু বাগানে বেরতে অমিত পাশে এসে বসলো। হাল্কা হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ভাইয়ের মাথায়। শিবু তাকাল –

- "তুমি আমাকে বিশ্বাস করো দাদা?"

অমিত সস্নেহে জবাব দিল –

- "নিশ্চয়ই। কি হয়েছে আমায় বল?"

#

- "আমার কিছু হয়নি। আমার একটা পুরনো কাজ বাকি থেকে গেছিলো, সেটা করতেই এখানে এসেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে কিছু কথা বলবো...!!"

অমিত উৎসুক হয়ে বলল –

- "বিশ্বাস না করার কিছুই তো নেই। তুই বল, আমি আছি তো।"

শিবু এবার বিছানার উপর উঠে বসলো সটান হয়ে। পা দুটোকে গুটিয়ে পদ্মাসন করে অমিতের দিকে ঘুরে বসলো, তারপর আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে সেটা বন্ধ করতে বলল। অমিত সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে দেখে শিবু ওর হাঁটুর উপর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হাতের আঙ্গুলগুলো ক্রমাগত নাড়িয়ে চলেছে। অমিত নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। এবার আঙ্গুল নাড়ানো থামিয়ে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠর মাথা দুটো স্পর্শ করাল, আর দেখতে দেখতে শিবুর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। চোখ দুটো আবার টকটকে লাল হয়ে গেল, গলার স্বর কর্কশ।

- "কাছে এসে বস্। মন দিয়ে শোন্ কি বলছি।"

অমিত কলের পুতুলের মতো এসে বসলো বিছানার একটা কোণে। শিবু বলতে শুরু করলো –

- "এখন আমি তোর ভাই নই। আমি এক তান্ত্রিক, নাম নাইবা জানলি। কিন্তু খুব ভুল করবি যদি আমাকে বাকি তান্ত্রিকদের মতো ভাবিস তো। এখন যারা নিজেদের তান্ত্রিক বলে, তন্ত্র সাধনা করে অথচ মানুষ ঠকায় আমি তাদের মতো অপগণ্ডো নই। তারা নীচ, পতিত, শৈবপন্থায় চলার কোন অধিকার নেই তাদের। কিন্তু এই যুগে তাদের পথে আনার লোক কোথায়? আগে মুনিঋষিরা ছিলেন, শক্তিমান যোগী মহারাজরা ছিলেন, তাদের সময়ে এইসব অকল্যাণকর তন্ত্রচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এরা মুক্ত। আমিই একমাত্র ছিলাম যে এদেরকে ঠিক পথে আনছিলাম। আমি অঘোর সাধনা করে তন্ত্রসিদ্ধ হয়েছি, উচ্চমার্গের সাধনা করে স্বয়ং মহাদেবের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলাম। তারপরই দেবাধিদেবের আদেশ রক্ষার্থে আমি বেরিয়ে পড়ি নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই ভণ্ড তান্ত্রিকদের মধ্যে জ্ঞানের জাগরণ ঘটাতে। ভবানীকে আমি পাই মেদিনীপুর জেলার একটা গণ্ডগ্রামে, সেখানে বাণমারা মারন-উচ্চাটনের বুজরুকি ব্যবসা খুলে বসেছিল সে। তারপর আস্তে-ধীরে ওকে আমি সোজাপথে নিয়ে আসি। ও মানুষ ছিল ভালো, উচ্চমার্গের তন্ত্র সাধনা করে প্রায় আমার পথ ধরেই চলছিল। অনেকদূর গেছিলোও, কিন্তু তারপর সব ছেড়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলে যায়। আমি অবশ্য শিবনেত্রি তন্ত্রবলে খোঁজ করে দেখতে পাই ভবানী একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেছে। খুব রাগ হল, কারণ আমাদের এই পথে সাংসারিক বন্ধনে বাঁধা পড়া চলে না। অঘোর সাধনা বিফলে চলে যায়। ভেবেছিলাম ব্রাহ্মণ সন্তান, কিছুতো শিক্ষা আছে পেটে, সাচ্চা অঘোরী হতে পারবে। কিন্তু সব মিথ্যে...!! একদিন এই গ্রামে এসে আমি দেখা করি ভবানীর সঙ্গে। ঠিক ছিল ওর সমস্ত শক্তি যা যা অর্জন করেছিল অ্যাদ্দিনে সব কেড়ে নিয়ে যাবো, কিন্তু ওদের দুজনের আন্তরিক ব্যবহার আর বৌটার সত্যিকারের ভালোবাসা দেখে আমি মত পাল্টাই। মানুষ সুখে থাকুক এর থেকে বড় আর কিছুই হতে পারেনা। কিন্তু সে সুখ আর বেশিদিন টিকলো কোথায়? এই গ্রামের বেশ কিছু মানুষ ভবানীর দ্বারা উপকৃত

#

হয়েছিল, কিন্তু ওর দুর্দিনে পাশে এসে দাঁড়াল না কেউই। আমি জানি তোর ঠাকুরমা দুটাকা দিয়েছিল, কিন্তু সেটা অনেক দেরী করে।"

এমন সময় ব্যাঘাত ঘটিয়ে দরজায় টোকা পড়ল। দিদারই গলা। অমিত সময় নষ্ট না করে দরজার সামনে এসে বলে দিল ওরা দুই ভাই গল্প করছে, চিন্তার কিছু নেই। তারপর আবার শুরু হল বলা –

- "তন্ত্রের এক উচ্চমার্গ হল নাথপন্থী ডাকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া। ভবানী কঠোর সাধনায় ডাকিনীচক্র নিজের শরীরে ধারণ করতে পেরেছিল। এর ঠিকমত প্রয়োগে একদম মুমূর্ষুকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়। নিজের বৌকে নিয়ে সে চেষ্টা করেছিল ভবানী। কিন্তু বহুদিনের চর্চা না থাকায় সফল হতে পারেনি। আমি কাছে থাকলে হয়তো ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। জেগে ওঠা ডাকিনী ছিল বিধর্মী, মুসলমান। ওর বৌয়ের সমস্ত শরীরটা ধীরে ধীরে গলতে শুরু করে আর কবরের মধ্যে চলে যায়। শুধু তাই নয়, ভবানীর জ্যান্ত শরীরটাও নিয়ে চলে যায় কবরের মধ্যে। বৌয়ের জন্য রাগে-দুঃখে পাগল হয়ে গিয়ে এমন ভুল করেছিল নাকি কাছেপিঠে শ্মশান না থাকায় কবরখানাতে গিয়ে এটা করলো সেটা ঠিক জানি না। এখন ভবানীর অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়, ফিকির খোঁজে কিভাবে আবার তার বৌকে জাগিয়ে তোলা যায়।"

এ পর্যন্ত শুনে অমিত প্রশ্ন করলো –

- "আচ্ছা যদি এখনো ভবানী এখানেই আছে তাহলে কোন মানুষের ক্ষতি তো করে না, অন্তত আমাদের কারোর কোন ক্ষতি হয়নি কখনো।"

- "যাদের কাছ থেকে ও উপকার চেয়ে পায়নি সেই তিন পরিবার আজ বহুদিন হল ভয়ে গ্রামছাড়া, তোর ঠাকুমা জানে সেটা। তোদের বাড়ি যে পুরোহিত মন্ত্রে বেঁধেছিল সে-ই ওদের সাহায্য করে, তবে ওদের প্রত্যেকেরই বাড়ির বাস্তুতে গণ্ডগোল থাকায় কবজ করা যায়নি। দুদিন পর গ্রাম ছাড়ে ওরা। ভবানীর এই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই আর কিছু করতে পারেনি। এখানে এখন শুধু তোদের উপরই যত ক্ষোভ ওর। কিন্তু এই বাড়ির রক্ষাকবচ আছে। দিনে আত্মারা শক্তিশালী থাকে না। আর রাতে তোরা বাড়ির বাইরে থাকিস না। তবে আমার মনে হয় তোদের কাউকে মেরে ফেলতে চায়নি ভবানী, তার কিছু কারণ আছে। বোধকরি আরও বড় কিছু চায়। এই রক্ষাকবচ আসছে অমাবস্যার আগেই নষ্ট হয়ে যাবে বলেছি সেটা এমনি এমনি নয়। ভবানীর কাজ সেটা, নিজে তো ঢুকতে পারতো না এ বাড়ির সীমানায়। রেলে কাটা পড়া মানুষের হাত পা এসব তোদের বাড়িতেই আসতো কিভাবে?"

বলেই হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠলো শিবু তথা ওর মধ্যে থাকা তান্ত্রিক। যত সময় যাচ্ছে অমিতের মনও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। একি সত্যি না অবাস্তব দুঃস্বপ্ন সে দেখে চলেছে...!! অনেক জোর নিয়ে এবার সে জিজ্ঞেস করলো –

- "কিন্তু আপনি আমার ভাইয়ের মধ্যে এলেন কিভাবে?"

তান্ত্রিক এর কোন সোজাসাপ্টা জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে বলল –

#

- "আজ রাতে আমি বাড়ির বাইরে যাবো। তুই শুধু বাড়ির লোকজনকে সামলে রাখবি আর খেয়াল রাখবি যেন ওরা আমি ফিরে না আসা অবধি বাইরে না বেরোয়। তবে কথা দিচ্ছি, তোর ভাইয়ের কোন ক্ষতি হবে না। কিছুতেই না। ওর শক্তি ছাড়া আমি সফল হব না, ছোটবেলাতেই আমি ওকে চিনেছিলাম। এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম এই দিনটার। যাইহোক আমার কথাগুলো মাথায় রাখিস।"

এই অবধি বলে শিবু বালিশে হেলান দিয়ে একটু কাত হয়ে গেল আর দেখতে দেখতে স্বাভাবিক হয়ে গেল। অমিতও খানিক স্বস্তি পেয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চন্দনারা তখন বাইরেই বারান্দায় বসা। আকাশ লালচে হয়ে আসছে, পড়ন্ত বিকেলের রোদ বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বীরেন অলিকে নিয়ে তপেশের সঙ্গে বেরিয়েছিল কাছেই, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ফিরে এল। চন্দনা আর ফুলি দুজনেরই মন উদ্বিগ্ন ছিল সারাটা দিন। ঘরে এসে শিবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চন্দনা জিজ্ঞেস করলো –

- "শরীর ভালো লাগছে এখন?"

উত্তরে শিবু মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ করলো। যাক সবাই আশ্বস্ত, ছোট ছেলেটার উপর কিনা গেল...!! এবারে ভালোয় ভালোয় কটা দিন আনন্দে কাটলেই মঙ্গল। অমিত শুধু চুপ করে রইল, এখনি কাউকে কিছু বলার দরকার মনে না করায়। এইভাবেই দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা হবে, তপেশ খাঁটি গরুর দুধ আর ঘি এনেছে। ঘি টা অবশ্য বীরেন সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাবে, তবে দুধ দিয়ে আজই তৈরি হবে ক্ষীর। তার আগে থাকবে মুড়ি আর গরম গরম বাঁধাকপির শিঙাড়া। যাইহোক এরকম ভালো ব্যবস্থাপনার জেরে ভালই কাটল সন্ধ্যাটা। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে, দূরে এক-আধটা টিমটিমে আলো দেখা যায় মাত্র। খাওয়া সেরে শিবু বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মনে মনে একটা গভীর আচ্ছন্নতা এসে গ্রাস করছে ওকে। এরকম কখনো হয়নি আগে। বিভূতিবাবুর হিরেমানিক জ্বলে বা চাঁদের পাহাড় পড়ে মোহগ্রস্ত হয়েছিল সে, এরকম অনেক সময় অনেক কিছু পড়ে বা ভেবে মনে মনে উদাস হয়েছে। কিন্তু আজকের এই উপলব্ধিটা আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা। কে যেন মনের ভিতরে কল্পনার ঝাঁপি খুলে দিয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে উঠোনে রাখা একটা বেতের মোড়ায় বসলো শিবু। চোখ বন্ধ করে মনের ভিতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলো, কে যেন কিছু বলতে চাইছে। এরকম পরিণত মানুষও মনে হয়নি কখনো এর আগে। সবই কেমন নতুন লাগতে শুরু করেছে, নিজেকে অচেনা লাগছে। চোখ বুজে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যেই কোথায় হারিয়ে গেল শিবু।

রাত নটা, ঘড়িতে ঘণ্টা পড়ল। চন্দনা অঝোরে কাঁদছিল, বীরেন আর তপেশ ছাদে গেছে এদিক সেদিক কিছু দেখা যায় কিনা দেখতে। অমিত অলিকে নিয়ে বসে আছে বুড়ি ঠাকুমার পাশে আর অনবরত বলে চলেছে সবাইকে যে কেউ যেন ভুলেও বাড়ির সীমানার বাইরে না যায়। কিন্তু চন্দনার তখন মাথার ঠিক নেই, ফুলি বার বার বোঝানোর চেষ্টা করছে ওকে। বুড়ি অমিতকে জিজ্ঞেস করলো –

- "তোকে কি বলেছে? কোথায় গেছে শিবু?"

- "আমি জানি না কোথায় গেছে, তবে আমাকে বলে গেছে তোমাদের বলতে যে চিন্তার কোন কারণ নেই।"

#

শুনে ফুলি বিরক্তিভরে খেঁকিয়ে উঠলো –

- "চিন্তা করবে না তো আর কি করবে? বাইরে সুন্দর বসে ছিল, হঠাৎ করে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? আর একটু চোখে চোখে রাখতে পারলি না?"

অমিত ধৈর্য সহকারে জবাব দিল –

- "মা তুমি বুঝতে পারছ না, শিবু আমাকে অনেক কিছু বলেছে বিকেলে। বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ঠাম্মা জানে ব্যাপারটা।"

বুড়ি বলল –

- "আমি কি জানি?"

- "ঠাম্মা, তুমি যে গল্প বললে কাল সেটার বাকিটুকু আমি জেনেছি। শিবুর মধ্যে অন্য একটা তান্ত্রিক ভর করেছে। সে আমাদের ওই ভবানী সাধুর ভূতের হাত থেকে বাঁচাবে।"

এইসময় বীরেন আর তপেশ এসে জানালো কোথায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাই ওরা বাইরে গিয়ে দেখে আসবে। অমিত এটা শুনেই চকিতের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল, কিন্তু বীরেন এতে রেগেমেগে একরকম জোর করেই বেরতে যাবে এমন সময় চন্দনা বলে উঠলো–

- "ছেলে আমার কলকাতায় ভালই ছিল। কিন্তু কপালের ফের। ওই সেই সন্ন্যাসী যোগীর কথাই ঠিক প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।"

বীরেন থমকে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলল–

- "কোন যোগী?"

- "সেই যে গো এসেছিলো আমাদের বাড়িতে, তোমায় বললাম না। অনেক বছর আগে।"

- "হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু তখন তো সেরকম কিছু হয়নি। ভালো জ্যোতিষী দেখিয়েছিলাম। দেখো হয়তো ভূত দেখবে দেখবে করছিলো, যে সেই জন্যই কোথাও অন্ধকারে ঘুরে আসতে গেছে। আমি দেখছি দাঁড়াও।"

- "দেখো আর ছেলেকে যেভাবে হোক এনে দাও।"

বলতে বলতে আবার নিঃশব্দে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল চন্দনার গাল বেয়ে। অমিত হঠাৎ যেন একটা সূত্র পেয়েছে মনে করলো –

- "মামি, ওই সেই সন্ন্যাসী তো এই হতে পারে? যে এখন রয়েছে শিবুর মধ্যে।"

#

সবাই অবাক চোখে তাকাল অমিতের দিকে। অবিশ্বাস্য কিন্তু অসম্ভব নয়। অমিত আর বলল –

- "আমাদের উচিৎ একটু সময় অপেক্ষা করা। কারণ ওই তান্ত্রিক আমাকে বলেছে যে তোর ভাইয়ের কোন ক্ষতি হবে না।"

সবাই একে একে বসলো ঘরে ও বারান্দার বিভিন্ন জায়গায়। এখন শুধু ফাটকের দিকে চোখ রেখে পরমেশ্বরের স্মরণ করে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। ছেলের চিন্তায় বীরেনেরও মাথা ঠিক করে কাজ করছে না। একবার ভাবছে বসে না থেকে দেখেই আসে ঘুরে, তো পরক্ষণেই ভাবছে ছেলের মধ্যে যদি সত্যিই কোন অলৌকিক কোন ক্ষমতা এসে থাকে...!! কুকুরের কামড়ের ক্ষতটা নিজে থেকেই সেরে ওঠা স্বাভাবিক ব্যাপার মোটেই না। এছাড়াও মাঝে মাঝে শিবুর মধ্যে যা পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে তাতে বেরিয়ে পড়ার সাহস হয়ে উঠলো না বীরেনের, ভাবল খানিক অপেক্ষাই করা যাক। অমিত মনে মনে নানা কথা ভাবছিল, হঠাৎ কি মনে করে ও সোজা ছাদে উঠে এল। যদি কিছু চোখে পড়ে। বেশ খানিকক্ষণ এদিক সেদিকে তাকিয়ে কিছু চোখে পড়ল না। খানিক পর রাত নটা চল্লিশের ট্রেনটা ঝমঝম করে এগিয়ে আস্তে লাগলো, তার আলো অনেক দূর থেকে দেখতে পেলো অমিত। তার মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের বুক চিরে দিয়ে কাটোয়ার দিকে ছুটে গেল ট্রেনটা। সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে নিস্তব্ধতাকে ক্ষনিকের জন্য ভেঙে চুরমার করে দিল। অমিত পাশের বাড়ির উঠোনের দিকে তাকাল। সুধীর মুখুজ্জে জোয়ান মানুষ, গাঁয়ের বাজারে তার দোকান আছে দুটো। আজ দোকান বন্ধের দিনে চাদর গায়ে বাড়ির বারান্দায় পাতা খাটে বসে গুড়গুড়ি টানছিল সে। অমিত জোর গলায় ডাক দিল তাকে।

"প্রতিবেশী লোকজন বিপদের সময়ে পাশে থাকবে না একি হয়" বলে আশ্বস্ত করলো সুধীর। ওর গিন্নিও এসেছে সঙ্গে। তারপর মোটামুটি ব্যাপারগুলো শুনে নিয়ে সুধীরও খানিক চিন্তিত মুখ নিয়ে বলল –

- "দেখ তপেশ তুই ভাবছিস আজকের দিনে অনেকেই হাসবে হয়তো এসব শুনে, কিন্তু এ জিনিস যারা জানে বা দেখে তারাই বোঝে। তোরা যখন বেরতে পারবি না তখন আমি দেখে আসছি ঘুরে।"

মুখুজ্জে গিন্নি বিন্দুমাত্র আপত্তি করলো না, মনের দিক থেকে যে তার কোন তুলনা হয় না। বিশেষ করে বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করতে যে সে পিছ্পা হয় না সেটা গ্রামের অনেকেই জানে।

- "হ্যাঁ সেটাই ভালো। তুমিই দেখে এসো। ওইটুকু তো ছেলে, তার উপর সকাল থেকে অসুস্থ। কদ্দূরই বা যাবে?"

সুধীর একটা বড় টর্চ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল দেরী না করে। কিন্তু প্রথমে কোন দিকটায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করলো বাঁশবনটা দেখে আসা যাক। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আকাশ পরিষ্কার কিন্তু চাঁদ ছোট হয়ে এসেছে বলে আলো কম। বাঁশবনের ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে বেশ খানিকটা ভিতরে চলে গেল সুধীর। কিন্তু নাঃ, কোথাও কিছু নেই। রাশি রাশি পাতা আর কঞ্চি পড়ে রয়েছে। মনে মনে একটাই কথা ভেবে চলেছে সুধীর, কোন ক্ষতি না হয় ছেলেটার। তারপর বাঁশবন থেকে বেড়িয়ে এসে ও গ্রামের ভিতর দিকটায় গেল। পথে ঘরফিরতি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস

#

করলো কিন্তু কেউই খোঁজ দিতে পারলো না, এমনকি কেউ কিছু দেখেওনি। শিবমন্দিরটার কাছে এসে সুধীরের নাকে হাল্কা অথচ উদ্ভট গা গোলানো একটা গন্ধ এল। টর্চের আলোয় দেখা গেল রাস্তার ধারে মন্দিরের পিছন দিকটায় কালো মতো কিছু পড়ে আছে আর তার উপরভনভন করে মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু কাছে এগিয়ে যেতেই বোঝা গেল সেটা একটা কালো কুকুরের মৃতদেহ, পচতে শুরু করেছে। ও তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে আরও খানিক দূর এগিয়ে গেল, বছর বারোর একটা ছেলের সাহস এই পরিমাণ হতে পারে সেটা চিন্তা করতে করতে।

গভীর আচ্ছন্নতা ধীরে ধীরে কাটছে বোধকরি, চোখ মেলে তাকাল শিবু। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তার জানা হয়ে গেছে। সামনে বড় কাজ, উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখল চোখ ঘুরিয়ে। একদম ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে সে। এখান থেকেই তো শুরু হবে যাত্রা। এইতো সেই পুরনো পরিত্যক্ত কবরখানা যেখানে ভবানীর ও তার বৌয়ের দেহের অবশেষ রয়েছে। শিবু একটা ভাঙা গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে বসলো, একটা ঢিবিকে সামনে রেখে। তারপর সেই গাছের ডালটা দিয়ে ঢিবির উপর দাগ কেটে মণ্ডল আঁকতে লাগলো মন দিয়ে। সাঙ্কেতিক চিহ্ন, মন্ত্র আর নানা আঁকিবুঁকি একটা বড় তারার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে উঠতে লাগলো। এভাবে দেখতে দেখতে পুরো ঢিবিটা জুড়ে একটা সাঙ্কেতিক মণ্ডল তৈরি হয়ে গেল। আঁকা হয়ে গেলে শিবু সেই ডালটা দুহাতে শক্ত করে ধরে পাশে মাটির মধ্যে এক কোপে পুঁতে দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাল্কা বাতাসের স্রোত বইতে শুরু করলো। সেই সঙ্গে শুকনো পাতা খরখর শব্দে মাটির উপর দিয়ে উল্টেপাল্টে উড়ে যেতে লাগলো। শিবু মনে মনে একটু হেসে উঠলো, ভবানী টের পেয়ে গেছে। যদিও আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই নেই, টের পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে দূরেই রাখতে হবে, কাছে এলে কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে। আগে ভবানীর বৌয়ের দেহাবশেষকে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে, তারপর ভবানীর আত্মাকেও শান্তির পথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শিবু জানে যে সেটা মোটেই সহজ কাজ নয়, কারণ ভবানী খুব সহজে বৌয়ের দেহাবশেষকে নষ্ট হতে দেবে না। আর সবথেকে কঠিন ব্যাপার হল ভবানীর দেহের এবং আত্মার মালিক এখন অন্য কেউ, তার থেকে আগে মুক্ত না করে অন্তিম মুক্তিলাভ অসম্ভব। এর জন্য সেই ডাকিনীকে জাগাতে হবে যার জিম্মায় রয়েছে ভবানী। তবে সবার আগে ওর বৌয়ের দেহাবশেষের ব্যবস্থা করা দরকার।

'আদিনাথাঃ সর্বেসম নাথানাম প্রথমা ততঃ নাথা সম্প্রদায়াঃ প্রবর্ত ইতি নাথা সম্প্রদায়িনো বদন্তি।'

'সনাতন ধর্মে প্রাচীনতম তন্ত্রসাধনা নাথপন্থী। বহু হাজার বছর পুরাতন এই তন্ত্রসাধনা। যোগীশ্বর স্বয়ং মহাদেব, যোগের সৃষ্টিকর্তা। শিবু পদ্মাসনে তান্ত্রিক মুদ্রায় বসে অস্ফুট স্বরে একের পর এক মন্ত্র পড়ে স্বয়ং শিবকে প্রণাম জানিয়ে তার আজকের কর্ম ও সাধনার সাফল্য প্রার্থনা করে নিল। উপাচার বেশি কিছু নয়, শুধু দুটো গোল মাটির তাল বানিয়ে নিয়ে মণ্ডলের পাশে রাখল শিবু। এমন সময় সামনের একটা গুল্মলতার ঝোপ নড়ে উঠলো। দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে শিবু কৌলমন্ত্র পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। ছায়ামূর্তি নিথর ভাবেই দাঁড়িয়ে, শুধু চাপা একটা শব্দ করে চলেছে ক্রমাগত। শিবু সোজা কথা বলে উঠলো –

- "তুই এসেছিস ভবানী?"

খানিক স্তব্ধ থেকে উত্তর এল –

#

- "আপনি চলে যান।"

- "তাতো হবে না। তুই কষ্ট পাচ্ছিস, আমি তোর মুক্তির উপায় বের করতেই এসেছি।"

- "আমি মুক্তি চাই না। আমার বৌকে ফিরিয়ে দিন।"

- "মৃতজনকে জীবিত করা যায় না।"

- "মিছে কথা। আমরা তো তান্ত্রিক, আমরা পারি।"

- "তাহলে তুই পারিস নি কেন? চেষ্টা তো করেছিলি।"

- "ভুল করে ফেলেছিলাম, বিরাট ভুল। ডাকিনী তন্ত্রবলে মরা মানুষকে জীবিত করা যায় না, সেটা আমার জানা ছিল না।"

শিবু মুচকি হাসল। যাক, নিজের ভুল বুঝেছে তাহলে। নাথপন্থী তন্ত্রবলে আরোগ্যলাভ করা যায়, কঠিন থেকে কঠিনতর রোগ থেকে। কিন্তু মৃতকে জীবিত করা যায় না। শিবু জিজ্ঞেস করলো –

- "তুই এই ভুল থেকে নিশ্চয়ই এটা জেনেছিস যে ডাকিনীতন্ত্র সাধনা করে তোর মনস্কামনা পূরণ হওয়ার নয়? তবু কেন বৃথা সেই চেষ্টায় নিজেও কষ্ট পেয়ে মরছিস?"

ভবানীর ছায়ামূর্তি এতক্ষণ নড়াচড়া করেনি একটুও, কিন্তু এই কথা শুনেই অদ্ভুতভাবে সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে আস্তে লাগলো শিবুর দিকে। সঙ্গে রক্ত জল করা শয়তানি হাসি, এতোই তার আওয়াজ যে মনে হল সারা গ্রামের লোক বোধহয় শুনে ফেলতে পারে। শিবু সঙ্গে সঙ্গে কৌলতন্ত্রের কবচমন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল। ভবানীকে নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরেই আটকে দেওয়া প্রয়োজন। মণ্ডলের কাছে আসতে দেওয়া মানেই সব কিছু পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। শিবু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে একমুঠ ঝুরঝুরে সাদা বালি মেশানো মাটি তুলে নিল হাতে। আর সেটা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে, মণ্ডলের সামনে কিছুদূরে। ঘাসের উপর সেই মাটি পড়তেই সেখান থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে খানিক অস্পষ্ট হয়ে গেল চারিদিক। দেখা গেল ভবানীও সেই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, হাসি থেকে গিয়ে চাপা গর্জনের আওয়াজ আসছে। ক্রুদ্ধস্বরে সে তার একসময়ের গুরুকে উদ্দেশ্য করে অশ্রদ্ধার ভাষায় বলে উঠলো –

- "তুই আমায় আট্‌কাতে পারবি ভাবছিস? তাও কিনা একটা পুঁচকে ছোড়ার শরীর নিয়ে?"

শিবু জানতো এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবে, তাই শান্তভাবে জবাব দিল –

- "আমার শরীরে তোর গুরু ভর করেছে ভাবছিস? ভালো করে দ্যাখ্, আমি তোর গুরুকে আমার শরীরে ধারণ করেছি। ওর সমস্ত বিদ্যা, শক্তি এখন আমার। আমার রক্ত শিব গোত্রীয় যোগীবংশের, কুণ্ডলীতে যোগসাধনা আর সিদ্ধি তোর গুরু কালিকার। তুই যেই জগতে আছিস সেই অভিশপ্ত প্রেতলোক থেকে তোকে টেনে এনে পরলোকে পাঠাতে এই সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন ছিল।"

#

এই শুনে আর শান্ত থাকতে পারলো না ভবানী। সে এক দারুণ তুলকালাম বাধিয়ে দিল রাগে অন্ধ হয়ে। শিবু সময় নষ্ট না করে আবার পদ্মাসনে বসে পড়ল, বেশি সময় নেই। খানিকটা মাটি নিয়ে মন্ত্রসিদ্ধ করে সেটা সে নিজের চারপাশে গোল করে ছিটিয়ে দিল প্রথমে, তারপর নিজের হাত দুটোকে বিপরীতভাবে দুপাশে নিয়ে ভূতডামর মুদ্রায় শুরু করলো সাধনা। 'অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্, সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্, অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।' এদিকে ভবানী অক্লান্তভাবে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে চলেছে আর সেই সঙ্গে আশেপাশের ঝোপঝাড় যা পাচ্ছে তছনছ করে পুরনো কবর খুঁড়ে যেখানে সেখানে মাটির স্তূপ তৈরি করে ফেলছে। কিন্তু তাতে শিবুর চিন্তার কারণ নেই। এখানে পৌঁছেই সে ঠিক জায়গা মতো নিজের সাধনস্থল খুঁজে নিয়েছিল। সুতরাং ওদিকে ধ্যান না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলো মনোযোগ সহকারে।

ভবানী অনেক চেষ্টা করলো আটকানোর, কিন্তু না। অনেক বেশি শক্তিশালী মন্ত্রের জোরে আটকে রেখেছে ওই ঢিবিটাকে, যা ভেদ করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই ব্যর্থ চেষ্টা করে যখন ফল হল না, তখন যতটা কাছে আসা যায় ততটা এসে শিবুকে বলল–

- "আমাকে ছেড়ে দে। এই অমাবস্যায় আমি ওদের বাড়িতে ঢুকে যতুধন তন্ত্রশক্তির ঘড়া রেখে আসবো ঠিক করেছি। তাতে ওই বুড়ির তাবিজটা নিষ্ফল হবে আর আমিও ওর আত্মাটা নিজের বশে করে নিয়ে যাবো ডাকিনীর কাছে। ওই বামুন বুড়ির আত্মার বিনিময়ে আমি নিজেকে মুক্ত করবো। তুই ভালো মানুষ, যতুধন তন্ত্রের ভয়ঙ্কর কালাজাদু তুই সহ্য করতে পারবি ভাবছিস?"

শিবু মনে মনে একটু চিন্তিত হল কথাটা শুনে। যতুধন তন্ত্রসাধনা তো সবথেকে সাংঘাতিক, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকরা আজ বিলুপ্ত। নাহ্, ভবানী নির্ঘাত চালাকি করছে কোনো। এই তন্ত্র যদি থেকেও থাকে, ভবানীর তাতে সিদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওর ডেরা থেকে বেরিয়ে গিয়েই তো সংসারী হয়েছিল, এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসবিদ্যা চর্চা করলো কবে? মনে আবার সম্পূর্ণ বল ফিরে পেল শিবু। মহাডামর উচ্চতন্ত্রের শাখা ভূতডামরের মন্ত্র পড়ে যেতে লাগল ক্রমাগত, ওর কাজে সহযোগিতা করবে এমন একজন সদাত্মার প্রয়োজন। এদিকে ভবানী উত্তর না পেয়ে ফস্ করে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল।

বহুযুগ আগে এক গরীব সুফিকে কবর দেওয়া হয়েছিল এই পুরাতন কবরখানায়। তার নাম ছিল ইস্মাইল দবিরুদ্দিন শাহ। গান গাওয়ার অপরাধে কেউ বা কারা তাকে হত্যা করেছিল। শিবুর আহ্বানে প্রায় নব্বই বছর পুরনো দবিরুদ্দিনের রুহ জেগে উঠে সামনে এসে দাঁড়াল। শিবু তাকিয়ে দেখল ঢ্যাঙা কঙ্কালসার একজন আলখাল্লা পরা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, সে যে চামড়ার রঙ না হাড়ের বোঝা দায়...!! যাইহোক, শিবু তাকে ছোট করে অভিবাদন করে নিয়ে কাজের কথা বলল –

- "বাবা আমার কয়েকটা জিনিস লাগবে, তোমায় জল্দি এনে দিতে হবে।"

- "কি জিনিস বেটা?"

#

আহা!! গলার স্বর আর বলার ভঙ্গি শুনে শিবুর মন উদাস হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। এমন সুরেলা অথচ গম্ভীর গলা ও আজ অবধি শোনেনি। যেন স্বয়ং দাউদের কণ্ঠস্বর। শান্তভাবে বলল শিবু –

- "কিছু শুকনো গাছের ডাল, ধুনো আর এক কৌটো সিঁদুর। তারপর তোমার কিছু কাজ আছে, তুমি সঙ্গে না থাকলে অনর্থ ঘটবেই আজ।"

- "কিছু হবে না বেটা। আমি এনে দিবো।"

বলেই অদৃশ্য হল বুড়ো। শিবুও চোখ বন্ধ করে খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলো ভবানীকে। নিশ্চয় কিছু উৎপাত করার মতলব আছে, নয়তো এতো সহজে হার স্বীকার করে কেটে পড়ার পাত্র সে নয়। শিবনেত্রি মন্ত্রবলে পরিচিত কাউকে কিছু সময়ের জন্য খুঁজে ফেলা যায়, এইভাবেই সে ভবানীকে খুঁজে পেয়েছিল আগে। আজও সে চেষ্টা করতে না করতেই হঠাৎ সামনে ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড দেখতে পেলো শিবু। তিনটে স্ত্রীমূর্তি ঘিরে ধরেছে দবিরুদ্দিনকে, আর তাকে সমানে আঁচরে কামড়ে চলেছে। চিৎকার করে লড়াই করেও ফল হচ্ছে না, মাঝে মাঝে ওকে মাটির ভিতরে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে পেত্নীগুলো। আর পাশে কিছু দূরেই ভবানীর ছায়ামূর্তি থেকে থেকে অট্টহাস্য করে উঠছে। শিবুর বুঝতে বাকি রইল না যে ভবানীও তন্ত্রবলে এই পেত্নীদের জাগ্রত করেছে যাতে তার কাজ পণ্ড করা যায়। এখন উপায় একটাই, দবিরুদ্দিনকে এদের হাত থেকে বার করে আনতে হবে। নইলে জিনিসগুলো পাওয়া যাবে না, আর ওগুলো না পেলে কাজ এগোবে না। শিবু দবিরুদ্দিনকে একটু কাছে এগিয়ে আসতে বলল, যেভাবেই হোক। আর নিজে আরও খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে তা মুখের কাছে এনে থুতু ছেটাল, তারপর মন্ত্র পড়ে মুঠো করে ধরল। এদিকে দবিরুদ্দিনও অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে কিছুটা সামনে এল। পূতিগন্ধময় পেত্নীগুলোর ক্রমাগত চেঁচামেচিতে কান পাতা কঠিন। শিবু দেখতে পেলো বুড়োটার শরীরের নানা জায়গা খুবলে গর্ত হয়ে গেছে। এরপর হাল্কা চাঁদের আলোয় ঠিক মতো নিশানা করে হাতের মাটির দলা ছুঁড়ে মারল। সেই আঘাত লাগতেই খোনা গলায় আর্তনাদ করে উঠে দুটো পেত্নী সড়াৎ করে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে গেল আর আরেকটা হুস্ করে উড়ে কোথায় যেন চলে গেল। কিন্তু শিবু জানে, এটা মাত্র কিছু সময়ের ব্যাপার। ওরা আবার আসবে। ভবানী ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গেছিল, কিন্তু চটকা ভাঙতেই নিজে ছুটে এল দবিরুদ্দিনের গলা টিপে ধরতে। সে এক ভয়ানক জিঘাংসা ভরা মূর্তি। কিন্তু অসফল হতে হল তাকে, পেত্নীদের হাত থেকে ছাড়া পেতেই অদৃশ্য হয়ে গেছে বুড়ো সুফি।

এই ভুত, প্রেত বা ডাকিনীদের মতো ভবানীর আত্মার কিন্তু স্বাধীনতা নেই, আবার মুক্তিও নেই। এ এক অদ্ভুত করুণ দশা। ডাকিনীতন্ত্র দ্বারা যে কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিল সেটা উল্টো ফল জুগিয়েছে। যেই ডাকিনীকে জাগিয়ে তুলেছিল ভবানী তাকে অবশ্যই সেইরূপ ক্ষমতাশীল হতে হতো যে কিনা মুমূর্ষু প্রাণ তাজা করতে পারে, কিন্তু বুঝতে পারেনি জেগে ওঠা সেই মুসলমান ডাকিনী ছিল আত্মার সওদাগর। যাকে জার্মানরা মেফিস্টোফিলেস্ বলে থাকে। এরা একদমই হিংস্র স্বভাবের হয় না, বরং শান্ত হয়। কিন্তু সমস্ত কাজের আগে এরা চুক্তি করে নেয় যে সাহায্যের বদলে কোন নতুন আত্মা তার কাছে বন্ধক রেখে দিতে হবে। এই আত্মার সমষ্টিই এদের আসল শক্তি। এভাবেই একের পর এক আত্মা জড়ো করে এরা শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে। দিনে দুপুরে মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতেও সক্ষম হয় এরা। যাইহোক, সেদিন বারবার ভেবেও আর কোন পথ বের করতে পারেনি ভবানী। শেষমেশ যখন নিজের আত্মা সমর্পণ করে বসলো

#

বৌকে বাঁচাতে, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার ক্ষণিক আগেই নিভু নিভু প্রাণটুকু বেরিয়ে গেছে বৌটার জরাক্লিষ্ট দেহ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে বিনা সাহায্যে সেই সওদাগর ভবানীর আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেনি। সেই থেকে রাত হলেই অশরীরী হয়ে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো আর সুযোগ খোঁজা এই ছিল ওর কাজ। মনে প্রতিহিংসা সেভাবে না থাকলেও একরকম জেদ চেপে আছে যে তপেশের মায়ের আত্মা ও যে করেই হোক বার করে আনবে আর নিজের মুক্তির সওদা করবে। কিন্তু ওই বাড়ির আর কারোর ক্ষতি করার কথা ভাবেই না ভবানী। এখন ভয় ওর শুধু একজনকেই, সে হল কালিকা। নিজেকে হত্যা না করে দেহ বদলানো কিভাবে সম্ভব? সঙ্গে আবার পুঁচকে ছোড়াটা, বহরে ছোট হলেও কাজে নয়। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে ছেলেটার মধ্যে। তবু সহজে ছেড়ে দেবে না সে। বৌ চলে গেছে তো কি? কিন্তু নিজের বাঁচার শখটা যেন দিন দিন লালসার লকলকে লতার মতো আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলছে ওকে। এ থেকে ছাড়া পাওয়া কি খুব সোজা?



#

শিবু মণ্ডলের নানা স্থানে তর্জনী স্পর্শ করে মন্ত্র পড়ছিল। দবিরুদ্দিন ফিরে আসার আগে ভবানীর বৌয়ের কঙ্কালটা মাটির নিচ থেকে বের করে আনা প্রয়োজন। মন্ত্র উচ্চারণের বেগ একটা সময় বেড়ে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে এসে দাঁড়াল, এরপর তর্জনী দিয়ে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকতেই ঢিবির মাটি ঢেউ খেলার ভঙ্গিতে নড়ে উঠলো। অদৃশ্য কোন শক্তিবলে ঢিবির মাটি নিচ থেকে ঠেলে উঠতে লাগলো বগবগ শব্দ করে আর দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচ ছয় হাত মতো গভীর এক গর্ত সৃষ্টি হল। দেরী না করে শিবু নেমে পড়ল সেই গর্তে। ভিতরে বিটকেল ভ্যাঁপসা গন্ধ আর ভয়ানক অন্ধকার, কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হল না আসল জিনিসটার নাগাল পেতে। দুহাতে করে কঙ্কালটা তুলে ঢালু জায়গাটা বেয়ে উপরে উঠে এসে শিবু মাটিটা স্পর্শ করতেই গর্তটা বুজে গেল। ভবানী হঠাৎ কাছে এগিয়ে এল, দৃষ্টি সোজা শিবুর হাতজোড়ার দিকে। কঙ্কালটার ডান হাতে এখনো লোহার বালাটা রয়ে গেছে। অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে শুরু করলো ভবানী, শুনে মনে হল যেন কোন গানের কলি গুনগুন করে গাইছে। শিবু একটু সহানুভূতির গলায় বলল–

- "আর কোন ব্যাঘাত ঘটাস না ভবানী। তোর বৌয়ের আত্মা শান্তি পাক তুই চাস না? শাস্ত্র মতে ওর দাহ অন্ত্যেষ্টি হোক তুই চাস না?"

ভবানী নিজের মতো গুনগুন করে সুর ভেজেই চলেছে, শিবুর কথা শুনল কিনা বোঝাও গেল না। এই সময়ে শিবুর পিছন দিক থেকে শুকনো পাতার খচখচানি শোনা গেল, হুড়মুড়িয়ে কিছু শুকনো গাছের ডালপালা এসে জড়ো হল, আর দেখা গেল কুঁজো হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো দবিরুদ্দিন।

- "এইনে বেটা, তোর সামান্।"

বলে কয়েক টুকরো ধুনো আর একটা লাল ছোট কৌটো রাখল শিবুর পায়ের কাছে। জিনিসগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিবু কাঠের স্তূপের ওপর কঙ্কালটা শুইয়ে দিল। ভবানী একদৃষ্টে সব দেখছিল, এবার বলে উঠলো –

- "আমাকে বড় ভালোবাসতো বৌডা, বাঁচাতে পারলাম না। ওর আত্মাটাও বশে রাখতে পারিনি।"

শিবু তাকিয়ে দেখল ভবানী হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে দু'হাত আর দুই হাঁটুতে ভর করে এদিক পানে চেয়ে রয়েছে। ওর মনের জ্বালা যে অনেক সেটা না বললেও বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যাইহোক নির্বিঘ্নে কাজ সারা হয়ে গেলে আর কি চাই!! শিবু চিতার দিকে মুখ করে একটা ডালের গায়ে কিছুটা সিঁদুর লাগিয়ে দিল। তারপর সেটা কঙ্কালের খুলির দিকে আড়াআড়িভাবে রেখে একটা ধুনোর চাই গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দিল চিতার উপর। দবিরুদ্দিন খানিক দূরে সেরকম কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েই ব্যাপারখানা দেখছে। ভবানী বুঝল এই শেষ, এবার বৌকে চিরবিদায় জানাতে হবে। শিবুকে বলল –

- "আগুনটা আমি দেবো।"

খানিক ভেবে সম্মতিই জানালো শিবু, আপত্তি করলে অন্য বিতণ্ডা না শুরু হয় সেটা ভেবে। বলল –

- "নিশ্চয়। কিন্তু তুই কি সেটা পারবি?"

#

প্রশ্নটা শুনে বেশ বিরক্ত হল ভবানী, এতটাও নিচুমানের সাধক সে ছিল না। কিন্তু মুখে শুধু বলল –

- "চিতার ওপর থেকে তোর মন্ত্রের বাঁধন তুলে দে।"

শিবু তাই করলো। মন্ত্রের বাঁধন থাকলে ভবানীর কোন শক্তি তাতে কার্যকরী হবে না। চিতাটাকে মন্ত্রের গণ্ডির বাইরে বার করে দিয়ে নিজে মণ্ডলের কাছে সরে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, ভবানী অদ্ভুত সুরে কি যেন গাইতে গাইতে চিতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আড় চোখে দেখল বুড়ো সুফিও এদিকেই তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে ভবানীর সেই গানের সুর কবিতার মতো ছন্দে পরিণত হল, কিন্তু ভাষা বোঝা যায় না। না বাংলা, না সংস্কৃত। একদমই অজানা কোন ভাষা। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ভবানী চুপ করে গেল, দুহাত প্রসারিত চিতার দিকে। শিবু দেখতে পেলো কাঠের নিচ থেকে আগুনের শিখা দপ দপ করে জ্বলে উঠছে। মনে স্বস্তি এল, যাক একটা কাজ মিটলো। ক্রমে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো, শিবু আরও খানিকটা ধুনো ছিটিয়ে দিল আগুনে। চারপাশের পরিবেশ সেই আগুনের আলোয় অদ্ভুতদর্শন চেহারা নিল, যেন ওরা যমলোকে এসে পড়েছে। শিবু সেই আলোতে খেয়াল করলো পেত্নীগুলো বড় একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে আর নাকিসুরে কান্নার মতো শব্দ করছে। আলো ওদের পছন্দ না, তায় আবার আগুন। এভাবে কাটল কিছু সময়, আগুনের তেজ কমে আসছে ধীরে ধীরে। তখন ভবানী অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলো শিবুকে –

- "আমাকে জ্যান্ত করে দিতে পারিস?"

শিবু তাকাল ওর মুখের দিকে। মনে মনে অন্যকিছু ভেবেছিল, কিন্তু ভবানী একদমই সেরকম নেই আর। ও নিজের জন্যই বাঁচতে চায়, বৌয়ের জন্য না। শয়তানের সঙ্গে আত্মার সওদা করে কি তবে স্বার্থপর হল? কিন্তু শিবু জানে ও মানুষ ছিল ভালো। জীবদ্দশায় এক সময় পাপ কাজ করেছে বটে, কিন্তু কালিকার সান্নিধ্যে এসে থেকে কখনো কারোর উপকার বৈ ক্ষতি করেনি। যাইহোক, মৃত্যুর পর বন্দী অতৃপ্ত আত্মারা লোভ-লালসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে কখনো কখনো। শিবু বলল –

- "ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোন অধিকার নেই কারোর। আর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা নেই কোন তান্ত্রিকের।"

- "তবে তুই কি করে রয়েছিস বিদেহী হয়ে?"

শিবু আর উত্তর করলো না। কৌলবিদ্যা অনেক কঠিন আয়ত্ত করা, নিজেকে আকারহীন বানানো আরও কঠিন। কিন্তু একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে নিমজ্জিত করলে কি না হাসিল করা অসম্ভব থাকে...!! দবিরুদ্দিনকে কাছে আসতে বলে শিবু নিজে বসলো মণ্ডলের সামনে। ভবানী গতিক বুঝতে পারছে, একে নিরস্ত করতে পারবে না ভালো কথায়। শিবু চোখ বন্ধ করে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলো। দবিরুদ্দিন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ভবানী বুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। পেত্নীগুলোও নেমে এসেছে গাছ থেকে, ভবানী ওদের কাছে গিয়ে কিছু ফিসফাস করলো, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু

#

তারপরই ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। শিবু সিঁদুর ঢেলে নিল হাতে খানিকটা, তারপর একটা মাটির তালের গায়ে মাখিয়ে সেটাকে মণ্ডলের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে সুফি বুড়োকে বলল –

- "বাবা তুমি তোমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর আর দেখো ওরা যেন গ্রামের কোন মানুষের অনিষ্ট না করতে পারে। আমি তোমার শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে শিবু ওই মাটির তালটাতে ডান হাতের তর্জনী স্পর্শ করাল আর বাঁহাত দিয়ে নিজেরই ডানহাতের কনুইয়ের জায়গাটা চেপে ধরল। অমনি ডান হাতের ওই জায়গা থেকে একরকম লালচে তরল গড়িয়ে পড়তে লাগলো মাটির তালটার উপরে। দেখা গেল কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো সুফি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, গায়ের ক্ষতগুলিও নিমেষে উধাও। শিবু বলল –

- "আমার এই ন্যায়ের কাজে আমার পাশে থাকো। তোমার মুক্তির ব্যবস্থাও আমি করে দেবো।"

- "গাঁয়ের কারোর ক্ষতি হবে না আমি থাকতে।"

এই বলে বুড়ো সুফিও অন্তর্হিত হল। শিবু এবার শুরু করলো মহাডাকিনীতন্ত্র সাধনা, যাতে মুসলমান সওদাগরের উত্থান হবে। মনে চিন্তা অনেক, সওদাগর খুবই সাংঘাতিক আর শক্তিশালীও বটে। তাকে কব্জা না করতে পারলে মুশকিল, তাহলে সওদা করতে হবে। আর সেটা করতে হলে জীবিত মানুষের আত্মার প্রয়োজন হবে, অথবা নিজের অধীনে থাকা আত্মার। কিন্তু সেরকম কিছুই নেই শিবুর কাছে। তাই কঠিনভাবে শক্তি বিস্তার করে যেতে হবে।

এদিকে তখন সুধীর শিবমন্দির ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা পথ এসেছে খুঁজতে খুঁজতে। আরেকটু এগোলেই ক্ষেত। মনে মনে ভাবছে আর কি এগিয়ে লাভ হবে, সামনেই খোলা মাঠ। এখানে এতো রাতে ওইটুকু ছেলে আসবে বলে তো মনে হয় না। তার থেকে বরং বাড়িতেই ফিরে যাওয়া যাক, যদি ইতিমধ্যে এসে পড়ে থাকে। এই ভেবে থেমে গেল সুধীর, টর্চটা নিভিয়ে পেছনে ঘুরতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কি যেন অনুভূতি খেলে গেল ওর শরীরে। ও এখন আর একা নয়, পিছন ঘুরতেই দেখতে পেলো আবছা আলোয় তিন ছায়ামূর্তি। লিকলিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে সামনের দিকে, চোখগুলো ধবধবে সাদা কিন্তু মণি নেই তাতে। নিমেষের মধ্যে ভিরমি খেয়ে সুধীরের চোখ উল্টে গেল। হাত থেকে টর্চটাও ঠনাৎ করে রাস্তায় পড়ে গেল। এতো বছরের বাসিন্দা হয়েও এর আগে এরকম ভয়াবহ মুহূর্তের সম্মুখীন কখনো হতে হয়নি সুধীরকে। তাছাড়া নেহাত ভীতু মানুষও নয় সে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটা অত্যাশ্চর্য। কি একটা জাদুমন্ত্রের জোরে ওর ভিতরের সাহসটা যেন মরে গেছে। চোখেমুখে অন্ধকার নেমে আসছে সুধীরের, কিন্তু রাস্তায় লুটিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে সে যা দেখল তা ঠিক ওর বিশ্বাস হল না। মনে করলো এ কোনো দুঃস্বপ্নই হবে।

শিবু মণ্ডলের মাঝখানে এসে বসেছে, দুহাত সটান উঁচু করে রেখে একের পর এক ডাকিনী মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। নবনাথের কৃপা একান্ত কাম্য। এভাবে কিছুক্ষণ পর মণ্ডলের চারপাশ থেকে ঘন ধোঁয়া বেরতে আরম্ভ করলো, সেই সঙ্গে অপূর্ব আতরের সুগন্ধ। শিবু মন্ত্র পড়া থামাল, পৈতেটাকে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পেঁচিয়ে নিজের কপালের মাঝখানে ঠেকাল। যতদূর দেখা যাচ্ছে কবরখানাটার একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটু আগেই যা জঙ্গল, মাটির স্তূপ,

#

গাছের ডালপাতা ইত্যাদি ছিল সব সাফ হয়ে গেছে। শিবু মণ্ডলের মাঝখানেই উঠে দাঁড়াল, ওর একদম সামনাসামনি কিছুদূরে এক স্থূলকায় মূর্তি দাঁড়িয়ে। শিবু তাকে উদ্দেশ্য করে বলল –

- "ধন্যবাদ আসার জন্য। আমি কি চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ?"

মূর্তি খানিকটা অগ্রসর হল। তারপর জবাব এল –

- "বদলে কি পাব?"

- "আমি যা চাইছি তাতে তোমার কোন অধিকার নেই। বদলে কিছু পাওয়ার কথা আসে না।"

- "আমার সঙ্গে সওদা হয়েছিল, অধিকার তো আমারই।"

- "সেই চুক্তি অনুসারে তোমাকে কোনরকম সাহায্য করতে হতো। কিন্তু তা তোমায় করতে হয়নি।"

এবারে শয়তানি হাসি শোনা গেল, গায়ের প্রতিটা রোম কাঁপিয়ে দেয় সেই খ্যানখ্যানে হাসি।

- "তান্ত্রিকের আত্মা আমাকে অনেক শক্তিশালী করেছে। একে নিয়ে আমি কোন সওদা করবো না।"

শিবু আর কথা বলল না। অন্য যে মাটির তাল তা ছিল সেটা হাতে করে তুলে নিল। তারপর সেটাকে দুহাত দিয়ে গোল করে চেপে ধরল। মুসলমান ডাকিনীটা শিবুর কাণ্ড দেখে একটু হাসল। তারপর নিজের বুকের উপর দুহাত রেখে মুখ গুঁজে দিল নিচের দিকে। অমনি দেখতে না দেখতে ওই সওদাগরে নাক মুখ কান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে লাগলো। কিন্তু সে শুধু ধোঁয়া নয়, সেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে ছোট ছোট মমির মতো কঙ্কালের আকার ধারণ করলো। শিবু বুঝল এগুলি সেই আত্মা যারা এই সওদাগরের দাস। এরপর যা ঘটল এককথায় বলতে গেলে যুদ্ধ, ছোটখাটো যুদ্ধই বলতে হয়। একটা বিধর্মী ডাকিনীকে কিভাবে বাঁধা যায়, তাও কিনা এরকম শক্তিশালী শতাধিক আত্মার মালিক এক শয়তানকে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা কালিকার ছিল না। সমস্ত বল-বিদ্যা প্রয়োগ করে তাই সে চেষ্টা করছে, নিষ্পাপ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ শিবুর যোগীবংশের রক্ত আর ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও এতদূর আসা সম্ভব ছিল না। ওদিকে সওদাগরের অধীনস্থ সেই উড়ন্ত আত্মার দল সমানে হামলা চালিয়ে চলেছে শিবুকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে। কিন্তু মা শ্মশানকালী রক্ষায় আছেন, কৌলতন্ত্রের রক্ষাকবচ ভাঙতে পারে কার সাধ্যি? কাছে আসতেই অদৃশ্য কোন শক্তি যেন উল্টে সেই ধূমায়িত আত্মার দলকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শিবু চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো –

- "শেষবারের জন্য বলছি, আমাকে ভবানীর দেহাবশেষ আর ওর আত্মা সমর্পণ করবি কি না?"

- "না করবো না। তুই কতক্ষণ সালামত্ থাকবি? তোকে আমি কাঁচা খাবো।"

- "নে মর তবে।"

বলে শিবু এক লাফ দিয়ে হাতে ধরা মাটির তালটা আছড়ে ফেলল নিচে মণ্ডলের উপর। তারপর নিচে বসে একমুঠো ঝুরো বালি কুড়িয়ে তাতে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে তেবড়ে যাওয়া মাটির তালের উপর ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে

#

ডাকিনী সওদাগরের চিৎকার শোনা গেল, বিকট জোরে চিৎকার করতে লাগলো শয়তানটা। সেই শব্দে মনে হল পাশের গাছগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। শিবু চেঁচিয়ে উঠলো –

- "তোর বশে থাকা সব আত্মা মুক্ত হোক, মুক্ত হোক, মুক্ত হোক।"

মূর্তিটা তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সাজানো গোছানো কবরখানাটাও আবার আগের মতো শ্রীহীন হয়ে যেতে লাগলো। আর শিবুর পায়ের কাছে মণ্ডলের উপরে থাকা ভাঙা মাটির তালটা ক্রমশ গলতে শুরু করলো। তন্ত্রশক্তির অদ্ভুত এই প্রয়োগ অভূতপূর্ব আবার সেই সঙ্গে জনমানস বর্জিতই থেকে গেল। এভাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কেঁপে কেঁপে উঠে ওই সওদাগরের পৈশাচিক চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। এরপরই সমস্ত প্রান্তর জুড়ে মনে হল যেন বহু লোকের কোলাহল শুরু হল, কিন্তু খানিক বাদে ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে গেল। দেখা গেল শিবুর সামনে পড়ে থাকা শয়তানটার অবয়বটাও কুণ্ডলীকৃত কালো ধোঁয়ায় পরিণত হছে আর আকাশপানে উঠে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যাক নিশ্চিন্ত, এবারে ভবানীকে সহজে কব্জা করে ফেলা যাবে। দবিরুদ্দিনকে আহ্বান করতে লাগলো শিবু। ওকে কথা দিয়েছে, মুক্তির পথ করে দেবে।

সুধীরকে হাতের কাছে পেয়ে ভবানী শেষ চেষ্টার ফন্দি এঁটেছিল, যে ওকে দিয়েই নিজের জানের সওদা করে নেবে। সুধীর ব্রাহ্মণ সন্তান, সওদাগর ব্রহ্মদৈত্য পেলে নিশ্চয়ই ভবানীকে ছেড়ে দেবে। নিজের ইচ্ছা আর মানসিকতার বিরুদ্ধাচারণ তাকে করতেই হবে যদি টিকে থাকতে হয়, সময় একদমই নেই। এদিকে কালিকাও যে সওদাগরের বিরুদ্ধে পেরে উঠবে না, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ওর। কিন্তু সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। দবিরুদ্দিন আবার এসে পরে মাঝে, পেত্নীগুলোকে আসুরিক শক্তিতে আঘাত করে ভাগিয়ে দেয় আর ভবানীকে চেপে ধরে। আর ছাড়া পায়নি ও। ভবানীকে বাধ্য করে পেত্নী তিনটেকে পুনরায় প্রেতলোকে পাঠাতে। তারপরে শিবুর ডাক পেয়ে বুড়ো সুফি নিজের সঙ্গে করেই নিয়ে আসে ভবানীকে। শিবু তখন শান্ত ভাবে বসেছিল, মুখে প্রসন্নতা। ভবানীর দেহাবশেষ খুঁজে পেতে সময় লাগেনি বেশি। সেটাকে বাকি ডালপালা আর কাঠের উপর রেখে ভবানীর সঙ্গে শেষবারের জন্য কথা বলতে ইচ্ছা হল –

- "তুই আমার অনেক প্রিয় ছিলিস ভবানী। আমাকেই যে এটা করতে হল তার দুঃখ চিরকাল থাকবে আমার। তোর বন্দীদশাও আমি দেখতে পারতাম না আর তুই কোন মানুষের অনিষ্ট করে বসতিস, সেটাও মানতে পারতাম না। পরলোকে গিয়ে তুই তোর বৌয়ের সঙ্গে মিলিত হবি আমি জানি। সেটাই একমাত্র পথ তোদের মিলনের।"

বলেই আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে শিবু ধুনো ছিটিয়ে দিল বানানো চিতার উপর, আর তারপর আঙুল বাড়িয়ে একটা কাঠ স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করতেই আগুন জ্বলে উঠলো। ভবানী এই প্রথম নির্মল একটা হাসি হেসে বলল –

- "আমাকে ক্ষমা করো গুরুদেব, আমার অন্যায়গুলোকে ক্ষমা করো। আমি অসফল তান্ত্রিক, অসফল স্বামী এবং অসফলতাই আমার এই দশা করেছে। দেহের অবশেষ পুড়ে যাচ্ছে, আমাদের আত্মা দুটো যেন অন্তত শান্তি পায় সেই ব্যবস্থা করো গুরুদেব।"

এই বলে ভেজা গলার স্বর থেমে গেল। শিবু বন্ধ চোখে মণ্ডলের উপর স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে তারপর সেটা তালুর ঘষায় মুছে ফেলল। চোখের কোনায় এক বিন্দু জল এসে জমেছে, চিরকালের মতো এই জগৎ ছেড়ে চলে গেল ভবানী।

#

গ্রামের মানুষজন আর ভয় পাবে না, কখনো কোথাও অশরীরী দেখা যাবে না আর। অমিতদের বাড়ির জানলা দিয়ে রেললাইনের উপর রাতদুপুরে স্কন্ধকাটা চলে বেড়াতেও দেখা যাবে না আর। কাটা পড়া মানুষের হাত পা আর এসে পড়বে না তপেশের সাধের বাগানে। সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার অবসান এখানেই।

শিবু উঠে দাঁড়িয়ে দবিরুদ্দিনের দিকে তাকাল। বুড়ো আবার কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করলো–

- "গ্রামের কারোর কোন অনিষ্ট হয়নি তো?"

- "না বেটা। একজন আদমিকে চুড়েইল্‌গুলি ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু আমি তাকে সুস্থ করে রেখে এসেছি।"

- "কে সে?"

- "তোমারই খোঁজ করতে বেরিয়েছে।"

শিবু চোখ বুজল। মনে মনে আবার কিছু কথা শুনতে পাচ্ছে। কালিকা শিবুকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করলো আর সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জানালো। এবার তাকে এই শরীর ছাড়তে হবে, কাজ শেষ। যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থা সে করে যাবে যে শিবুর কৈশোর জীবনে যেন এই অভিজ্ঞতার কালো ছায়া না পড়ে। এখন আপাতত দবিরুদ্দিন তাকে শিবমন্দিরের কাছে রেখে আসবে, বাকি পথটুকু সে সঙ্গ পেয়ে যাবে কারোর। তাই অসুবিধা হবে না। বাড়ি ফিরে শুধুমাত্র একটাই কাজ শিবুর, সেটা হল বুড়ি আর তপেশের গা থেকে তাবিজ খুলে ফেলার কথা বলতে হবে। কারণ ওটার আর কোনদিন দরকার পড়বে না ওদের। এটুকু শুনে শিবু চোখ খুলে দেখল অন্য এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর সামনেই একজন লোক টর্চ হাতে এগিয়ে আসছে "শিবু নাকি? শিবু?" বলতে বলতে।

- "হ্যাঁ কাকু।"

- "এসো বাবা। তোমার জন্য সবাই চিন্তা করছে বাড়িতে।"

বাড়ির সামনে পর্যন্ত আসতেই সবাই হইহই করে ছুটে গেল। চন্দনার কান্না আর থামে না, আনন্দ মিশ্রিত অদ্ভুত এই কান্না। অক্ষত শরীরে শিবু ফিরে এসেছে এর থেকে বড় ব্যাপার আর কি হতে পারে? বীরেন সুধীরের হাত ধরে অনেকবার ধন্যবাদ জানালো। শিবু ঘরে এসে আগেই দুজনের তাবিজ খুলে দিল আর ছোট করে বলল সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটেছে। ফুলি আর অমিত দুজনেই ওকে দফায় দফায় আদর করে নিল জড়িয়ে ধরে। অলিও খুব খুশী দাদাকে কাছে পেয়ে। বীরেন জিজ্ঞেস করলো –

- "কোথায় গেছিলি এতক্ষণ ধরে?"

শিবু মিষ্টি করে জবাব দিল –

- "একটা ছোট অভিজ্ঞতা হল বাবা, আমার মনের ইচ্ছাপূরণ হল। এখন আমি খুব খুশী।"

- "আমাদের তো ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। না বলে এভাবে কেউ যায়?"

#

- "বললে তো যেতে দিতে না। তাই না বলে গেছিলাম। এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

ফুলি ব্যস্তভাবে বলল –

- "এইতো দাঁড়া বাবা এক্ষুনি এনে দিচ্ছি খাবার।"

এরপর শিবু ভালো করে হাত-পা ধুয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নিল। সবাই বেজায় খুশী। মুখুজ্জে পরিবারও আজ তপেশদের বাড়িতেই নৈশভোজ সারতে বাধ্য হল বীরেন আর চন্দনার বিশেষ অনুরোধে। রাতে শুয়ে অমিত প্রশ্নটা করলো–

- "কি হল এবারে বল ভাই?"

- "দাদা আমার ঠিক সব কিছু মনে নেই। তবে ভবানী সাধুর আত্মা মুক্তিলাভ করে চলে গেছে। তোমাদের আর কোন চিন্তা নেই।"

- "বেশ।"

বুড়ি সেই রাতে শিবুকে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। পরের পাঁচটা দিন সম্পূর্ণ অন্যভাবে মহানন্দে কাটল ওদের। বেড়ানো, নৌকা চড়া, পেয়ারা বাগানে গিয়ে পেয়ারা পাড়া, মেলায় গিয়ে নাগরদোলা চড়া এরকম নানা আমোদ-রঙ্গ হল। এভাবে সাত দিনের ছুটি কাটিয়ে, পিসীরবাড়ির সকলের প্রাণভরা ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরল শিবু। এর মাঝে আর কেউ কখনো ওই বিষয় নিয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি। ট্রেনে চেপে ফেরার সময় জানলার বাইরে চোখ রেখে প্রবাহমান জগৎটাকে দেখতে দেখতে শিবুর মনে পড়ল বুড়ো সুফিকে। কালিকা কি ওর দেওয়া কথা রেখেছিল? জানার আর কোন উপায় নেই।

অলঙ্করণঃ সৌম্যজিৎ দেবনাথ

লেখক পরিচিতি

সৌম্যজিৎ দেবনাথ ওরফে জেম্‌স্‌ একজন শিল্পপ্রিয় মানুষ। মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র হয়েও সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। নানান বিষয়ের বই পড়ার পাশে মাঝে মধ্যে সে কিশোরপাঠ্য গল্প লিখে থাকে। এটিই তার লেখা প্রথম উপন্যাস।

পাঠ প্রতিক্রিয়া - ডানাওলা মানুষ

অরুন্ধতী সিংহ রায়



বইঃ ডানাওলা মানুষ

লেখকঃ বিনোদ ঘোষাল

প্রকাশকঃ পত্র ভারতী

প্রথম পত্র ভারতী প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদঃ গৌতম দাস

অলঙ্করণঃ রাজীব পাল

#

আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম হল বিনোদ ঘোষাল। লেখকের লেখার সময়কাল দীর্ঘ না হলেও, এই স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন বেশ কিছু ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গল্প। Happy ending নয় মানুষের জীবনের বিভিন্ন দুঃখ ফুটে উঠেছে ওঁর লেখনীতে। সব মানুষই কমবেশি দুঃখবিলাসী। মানুষের সেই চরিত্র ও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বিনোদ ঘোষালের লেখায়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই নবীন লেখকের লেখার এক বিশেষ স্বকীয়তা আছে। আমার মতে, সাধারণ মানুষের জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের এক অনন্য দর্পণ বিনোদ ঘোষালের লেখনী। সম্প্রতি পড়লাম "ডানাওলা মানুষ"। ২০০০-এর শতকে বিভিন্ন প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকা যেমন দেশ, সুখী গৃহকোণ, সানন্দা-তে প্রকাশিত বাছা বাছা পনেরোটি ছোটগল্পের সঙ্কলন এই "ডানাওলা মানুষ"।

প্রথম গল্প "একটু জীবনের বর্ণনা"। প্রতিটি মানুষের জীবনেরই এক বিশাল অংশ তার মা। মায়ের মৃত্যুর পর কি কি চিন্তা মানুষের মাথায় আসে, বা সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে মানসিক অবস্থা কি হয়, লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনদিনের তফাতে "মা" থেকে "বডি" তে রূপান্তর রমিতকে খুব ভিতরে কোথাও গিয়ে ধাক্কা মারে। নিমতলায় মৃতদেহ সৎকারের ফাঁকে কিছু ঘটনা পাঠককে সত্যই এক দোলাচলের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। "শূন্যস্থান" গল্পটি একটু ভিন্ন ধারার গল্প। হটাৎ করে ".. কোন অজ্ঞাত কারণে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অস্বাভাবিক কমে গেছে"। দুটো মানুষ পরস্পরকে ছুঁতে গেলেই চরম বিকর্ষণ বল দুজনকে ছিটকে সরিয়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে রয়েছে, এক মা, তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মরীয়া। ছেলের জীবনভিক্ষার জন্য সে দুরাচারী বস-এর যেকোনো দাবী মেটাতে প্রস্তুত। গল্পে যৌনতা আছে কিন্তু তা বিকৃত বা কুৎসিত নয়। যৌনতা মানবজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। লেখক তা অস্বীকার করেননি বা কোথাও এড়িয়ে যেতেও চাননি। "দৃষ্টি বদল", "ডানাকাটা পরী", "একটি দ্বীপের দুচারজন" গল্পগুলিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মানুষের কিছু অসহায়তা, নিঃসঙ্গতার কথা। গল্পে মানুষের আদিম রিপুর প্রতিফলন ঘটলেও তা কোথাও শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম করেনি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের গতানুগতিক জীবনের নিরন্তর সংগ্রামও বিনোদ ঘোষালের সাহিত্য কল্পনা থেকে বাদ পড়েনি। দুই প্রজন্মের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই লেখক সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন "দুই পুরুষ" গল্পে অতনু আর সমীরের অসম - প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। গল্পের শুরুতে এটাই মনে হয় যে লেখক বলতে চেয়েছেন "হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে"। কিন্তু শেষ অবধি বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে কূটনীতির আশ্রয় নিতেই হয়। স্বামী-স্ত্রী-র সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে যখন স্বার্থবুদ্ধি কাজ করে তখন সেই সম্পর্ক তার স্বাভাবিকত্ব হারায়। "আত্মবিষ" গল্পে পিতা ব্রজ তার পুত্র সজলকেই দায়ী করেন তার দুর্ঘটনার জন্য। ছেলের বন্ধুদের পছন্দ করেন না, অসৎ সঙ্গে পরে বখে গেছে ছেলে এমনই তাঁর মানসিকতা। এহেন ব্রজ বেশ কিছুদিন ছেলের নার্সিং হোমের খরচ টানার পর বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় দুর্বিনীত ছেলের জন্য সরকারি হাসপাতালই যথেষ্ট। স্নেহান্ধ মা আরতি পরে যায় ধর্মসঙ্কটে। একদিকে স্বামীর জেদ, ক্রোধ, ক্ষোভ অন্যদিকে পুত্রের সুরক্ষা। ছেলেকে ভাল ভাবে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে! কি করবে সে এবার?

#

"চক্ষুদান" গল্প ধারাটি আমাদের অতি পরিচিত। ছেলে বউমার শহরপ্রীতির সামনে মায়ের নিজের বাড়িতে থাকার মানসিকতা ফিকে পড়ে যায়। চেষ্টা করেও তিনি সফল হতে পারেননি ছেলের সিদ্ধান্ত বদল করতে। কিন্তু গল্পের টুইস্টটি আসে অন্যভাবে। ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে যখন জেদ ধরে বসে যে সে ঠাম্মিকে ছেড়ে, এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। কি করবে এবার বরুণ-শতাব্দী? যতদিন মানুষ বেঁচে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রশ্ন তার মনে আসে। অনেকক্ষেত্রেই এমন হয় যে সে তার সব প্রশ্নের উত্তর পায় না, তার মৃত্যু ঘটে কিছু প্রশ্নকে সঙ্গে নিয়েই। মৃত্যুর পর একটি যুবক তার জীবন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয়। শুধু তার নিজের কাজের বিচার নয়, বাবা, কৃষ্ণা, সাধনা মাসি সবাইকে নিয়েই প্রশ্ন করে সেই যুবক 'এক মানুষ, ছাই" গল্পে।

"প্রতি রবিবার", "মানুষীর কথা", "যে জীবন আমাদের" এই গল্প তিনটে অনেকটাই নারীকেন্দ্রিক। বয়েসের বিভিন্ন স্তরে এক নারীর জীবন কিভাবে বদলে যায়, নিজের মনমত অথচ সামান্য কিছু আশার পরিপূরণের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন। বিনোদ ঘোষালের লেখায় এক নারীর মানসিকতার সম্যক প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজ ও পরিবারের প্রতিকূলতার কারণে একটি মেয়ে যে কি করতে প্রস্তুত হয়, "যে জীবন আমাদের" গল্পটি তারই উদাহরণ।

"ডানা" ও "একটি প্রলাপের জন্ম" গল্প দুটি অনেকটাই স্বতন্ত্র। "ডানা" গল্পে কৃষ্ণেন্দুর কুশলী ছোঁয়ায় ভ্রমণপিপাসু হয়ে ওঠে অনুস্কার মন। তার মন ও ডানা মেলতে চায় সুদূরের উদ্দেশ্যে। জীবনের কঠিন পরিস্থিতির সামনে মানুষের অসহায়তার আর এক নিদর্শন "একটি প্রলাপের জন্ম গল্প" টি। তবে সঙ্কলনের বাকি গল্পগুলির তুলনায় এই দুটি গল্পকে আমার খানিক দুর্বল মনে হয়েছে। সঙ্কলনের শেষ গল্প "ডানাওয়ালা মানুষ"। তবে এই গল্পটিকে নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। Spoiler দিয়ে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু এটুকুই বলব, লেখক এই গল্পটির মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন সংসারের মধ্যে থেকেও জাগতিক-পার্থিব জিনিসের আকৃষ্ট না হয়েও থাকা যায়।

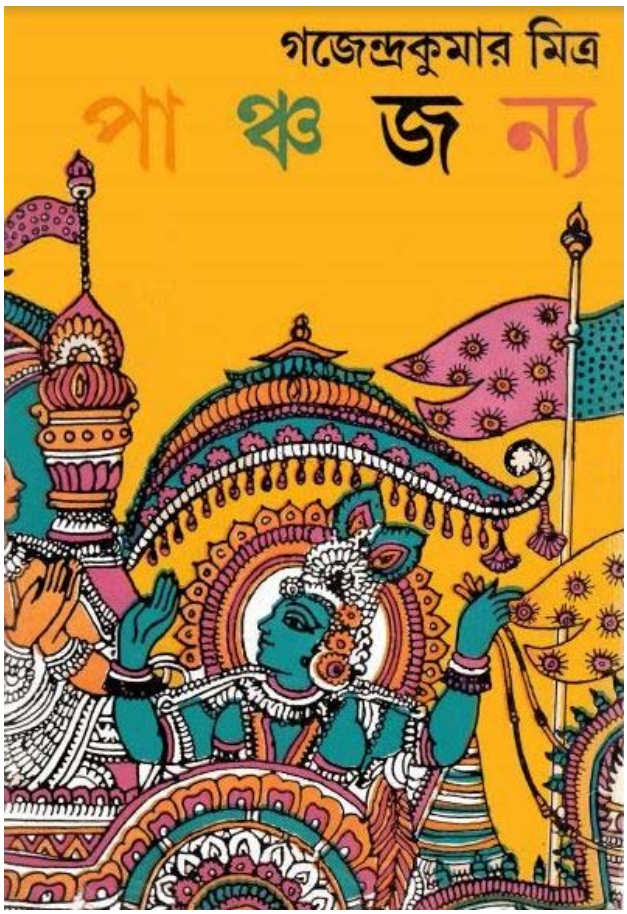
মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন যেমন সাধারণ তেমন তাদের দুঃখ কষ্ট চাওয়া-পাওয়াগুলিও অনেক সাধারণ, সীমিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের হিসেবের খাতার না চাওয়া, না পাওয়ার অঙ্কটাই ভারী হয়ে থাকে। বিনোদ ঘোষাল এমন এক লেখক যিনি এই হিসেবের অঙ্কটা যেমন সেটাকে সেভাবেই দেখাতে চেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। একজন contemporary লেখক হিসেবে তাঁর লেখায় বাস্তবিক সমাজচিত্র স্বাভাবিকভাবেই প্রকট হয়েছে যা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে।

লেখক পরিচিতি

অরুন্ধতী সিংহ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অর্থনীতির ছাত্রী। কল্পবিশ্বের মাধ্যমে প্রথম বুক রিভিউ লেখার হাতেখড়ি। বিভিন্ন বিষয়ের বই ও গল্পের বই পড়াটা ভালোলাগা থেকে এখন এক ভয়ঙ্কর নেশায় পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ভাল লাগে গান শুনতে, টিভি সিরিজ দেখতে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া – পাঞ্চজন্য

শাশ্বত চৌধুরী



বইঃ পাঞ্চজন্য

লেখকঃ গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রকাশকঃ মিত্র ঘোষ

প্রথম অখণ্ড সংস্করণঃ বৈশাখ ১৩৯৪

প্রচ্ছদঃ অমিয় ভট্টাচার্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা পাঞ্চজন্য বইটা শ্রীকৃষ্ণের ভাববাচ্যে লেখা। তাঁর ভাবনা-চিন্তা, কামনা-বাসনা কোনো কিছুই বাদ যায়নি। মহাভারত বা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন দেখি এখানে তেমন নয়! এখানে তিনি ভগবান নন, রক্তমাংসে গড়া চরিত্রটি এই ধরাভূমিরই অংশ।

#

স্বয়ংবর সভায় প্রথমবার পাঞ্চালীকে দেখা মাত্র বাসুদেব বুঝতে পারেন যে এই সেই রমণীরত্ন যে হতে পারত 'সিংহের সিংহী'। তাঁর নিজের আদর্শ নারী যাকে পেলে নিজের আরব্ধ কাজের জন্য তাঁর আর অন্য-কারোর সাহায্য দরকার হবে না। পরমূহুর্তেই সচেতন হন তিনি। উপলব্ধি করেন ওই নারী সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নির্দেশে ধ্বংসরূপিনী সে যার ঘরেই যাক, তাকে কেন্দ্র করে প্রলয়সম ধ্বংস নেমে আসবেই। যে ধ্বংস তাঁর লক্ষ্য।

আবার পাণ্ডবদের সঙ্গে বিয়ের পর অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণার বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য করে কি কিঞ্চিৎ অসূয়া অনুভব করলেন বাসুদেব? এ বাসুদেব ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ নন। এ বাসুদেব নিজের আরব্ধ কাজ সমাপন করার দুরূহ ব্রতধারী কূটনীতিক বাসুদেব। সবচেয়ে যেটা অন্যরকম তা হলো মাঝেমাঝেই পাঞ্চালীর জন্য বাসুদেবের অন্তর্লীন অনুভূতি। সেই অতুলনীয়া রমণী বারবার তাঁকে আনমনা করেছে! বাসুদেব অস্বীকার করতে পারেননি ক্ষণিকের সেই অনন্য অনুভূতি, আবার পরমূহুর্তেই নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছেন। কখনো বা নিমেষকালের সেই গোপন ভাবনার জন্য নিজেকে শাস্তি দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি তিনি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার শপথ নিয়েও নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ভীষ্মের প্রতি অস্ত্র হাতে অগ্রসর হওয়া শ্রীকৃষ্ণের এক মহান লীলারই অঙ্গ। বারবার নানা ভাবে নিজে অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে (ভগদত্তের অস্ত্র) বা ঘটোৎকচকে সামনে এগিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মিথ্যা অহংকার (অজেয় বীর) ভেঙে দিয়েছেন! সে কি শুধু প্রিয় সখা ও ভক্তকে বাঁচাতে না অন্য কোনো উদ্দ্যেশ্য আছে তার পিছনে?

উপসংহার অংশে বাসুদেবের আত্মসমীক্ষা অনবদ্য। কংসবধ আত্মরক্ষা কারণে সমর্থনযোগ্য হলেও জরাসন্ধ-বধ বা অন্যায় আশ্রয় করে কর্ণ/দুর্যোধন/দ্রোনাচার্য বা জয়দ্রথ-বধ-এর ব্যাপারে সংশয় পরবর্তীকালে তাঁর নিজের মনেও জেগেছে। বৃহত্তর কারণে বা মহান আদর্শের জন্য ছোট ছোট অন্যায় করাটা একদিন সমর্থনযোগ্য মনে হলেও পরে এই নিয়ে সংশয় জেগেছে স্বয়ং কৃষ্ণ অন্তরে। ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন আর সাধনের জন্য যেকোনো পন্থা গ্রহণযোগ্য, এই অজুহাত পরে নিজের কাছেই লজ্জাকর লেগেছে। বাইরে থেকে অধর্মচারী আত্মসুখমগ্ন রাজন্য-সম্প্রদায়কে নির্মূল করলেই ধর্ম-রাজ্য স্থাপন হয় না; কারণ সাধারণ প্রজারা যতক্ষণ না নিজেরা সেটা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেই শূণ্যতা ভরাট করে দায়িত্ব গ্রহণ করতেও তারা অসমর্থ। ফলে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ শূণ্যতার। সেই শূণ্যতা ভরাট করতে উঠে আসতে পারে আরও অযোগ্য ব্যক্তিরা। (বাস্তবের সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি?) এছাড়াও 'সত্যম শিবম সুন্দরম'। সত্যকে শিব (চিরকাল/শাশ্বত)-এর মত আশ্রয় করে না থাকলে সুন্দরের কাছে পৌছানো যায় না ... সত্য বিচ্যুতি শেষপর্যন্ত শিব ও সুন্দরের দিক থেকে বিচ্যুত করবেই!

বইটা পড়তে পড়তে মুগ্ধ হওয়ার মত আরেকটা চরিত্র আছে। সেই অনন্যসাধারণ চরিত্রটি কর্ণ। নিজের সত্যিকারের জন্মপরিচয় জেনেও নিশ্চিত জয়ী-পক্ষে (যেখানে থাকার সামাজিক অধিকারও আছে তাঁর) যোগ না দিয়ে ভাগ্যের বঞ্চনা মেনে নিয়ে 'হতাশ নিষ্ফল'-এর দলে থাকার মানসিক শক্তি সেই মহান বীরেরই ছিল। বাসুদেব শেষপর্যন্ত এটাও অস্বীকার করতে পারেননি যে দ্রৌপদীর অন্তর-প্রান্তে কর্ণের জন্য সঞ্চিত শ্রদ্ধা ভক্তি পরোক্ষে তাঁকে কর্ণ-বধে প্ররোচিত ও সহায়তা করেছে। কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শ্রদ্ধা-অসূয়া অসাধারণ ফুটে উঠেছে এই স্বল্প পরিসরে।

#

শুধু মনে হয়েছে অনাবশ্যক ভানুমতি (দুর্যোধন ভার্যা) চরিত্রটি ছোট করে দেখানো হয়েছে! কৌরব রাজ-বধূ, উচ্চ-বংশে জন্ম যার, সে যতই ঈর্ষান্বিত হোক, এতটা বহিঃপ্রকাশ সম্ভব নয়। আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কারে বাধবে সেখানে।

সব মিলিয়ে অতি-অসাধারণ একটা বই। পড়ার, জানার আর উপলব্ধি করার মত বই। অবশ্য পাঠ্য বা বারংবার পাঠ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

লেখক পরিচিতি

শাশ্বত চৌধুরী অর্থনীতি পড়াশোনা করে আপাতত কর্মসূত্রে দিল্লীবাসী। কলকাতা থেকে দূরে থেকেও বাংলা বইয়ের নেশায় অন্তর্জালের মাধ্যমে নিয়মিত বাংলা বইয়ের পাঠক। বাংলা বই পড়া ছাড়া নির্ভেজাল আড্ডা, বাঙালি খাওয়া-দাওয়া আর বেড়ানোর নেশা।

রান্নাবান্না - ডাল মালাই

সিজন

উপকরণঃ

দুধ - ২৫০ মি.লি. (১ কাপ)

অলিভ অয়েল - ৮০ মি.লি. (১/৩ কাপ)

পেঁয়াজ - ১ টা বড়, চৌকো চৌকো করে কাটা

ময়দা - ১ টেবল চামচ (প্লেন সাদা ময়দা বা অল পারপাস ফ্লাওয়ার)

টমেটো পেস্ট - ১ টেবল চামচ (কন্সেনট্রেটেড পিউরী)

মুসুর ডাল - ১২৫ গ্রাম (১/২ কাপ)

চিলি ফ্লেক্স - ১ টেবল চামচ ও ছড়িয়ে দেবার জন্য অতিরিক্ত

প্রণালীঃ

১. একটা বড় সসপ্যানে অলিভ অয়েল গরম করতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে তাতে মাঝারি আঁচে পেঁয়াজের বড় চৌকো টুকরো গুলো ৫-৬ মিনিট ধরে ভেজে নিতে হবে, যতক্ষণ না পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে আসছে। এখন এতে টমেটো পেস্ট ও ময়দা দিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে নেড়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে।

২. এবার এতে ডাল, চিলি ফ্লেক্স ও ৫০০ মি.লি. (২ কাপ) জল দিতে হবে। তারপর স্বাদ মতো নুন ও টাটকা পেষাই করা কালো গোল মরিচ দিয়ে ডালটা ফোটাতে হবে। ডাল একবার ভাল করে ফুটে উঠলে ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢিমে আঁচে ২০ মিনিট রান্না করতে দিতে হবে, যতক্ষণ না ডাল নরম হয়ে যাচ্ছে।

৩. ডাল নরম হয়ে গেলে এতে দুধ দিয়ে আরও ৫ মিনিট ধরে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে।

৪. ওপরে চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

পরিবেশনের আগে ডালের মিশ্রণটি ব্লেন্ডারে ভাল করে পিষে মিশিয়ে নিয়ে গরম গরম স্যুপের মতোও পরিবেশন যায়।

চুপিগুপ্তার নোটঃ চিলি ফ্লেক্স না থাকলে লাল শুকনো লঙ্কা কাঁচি দিয়ে কুচিয়ে নিলেই হয়ে যাবে চিলি ফ্লেক্স। দানা বেশী থাকলে ঝাল বেশী হবে।



ছবিঃ লেখক

লেখক পরিচিতি

সিজন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে মাস্টার্স, মেলবোর্ন বিসনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেছেন এবং বহুদিন অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত।

রান্নাবান্না – বিকেলের জলখাবার

অভিষেক ঘোষ

চিকেন ক্রোকেঃ

চিকেন ব্রেস্টপিস ছোট করে কেটে নাও। তারপর কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে তাতে আদাকুচি, রসুনকুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে তার মধ্যে পেয়াঁজকুচি দাও। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নুন-হলুদ মাখানো চিকেন দিয়ে দাও। দুই মিনিট নাড়াচাড়া করবার পর অল্প পরিমাণে হলুদ, টমেটো কেচাপ, রেড চিলি ও সয়া সস দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে রাখো। মাংস সেদ্ধ হলে ধনেপাতাকুচি, পেয়াঁজকুচি, গোলমরিচ ও গরমমশলা দিয়ে নেড়ে পুর নামিয়ে নাও। বড় পাঁউরুটির খয়েরি অংশ বাদ দিয়ে এক পিঠে হালকা হাতে জল দিয়ে তাতে মাংসের পুর দিয়ে রোলের আকারে গড়ে ডিমের গোলায় চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ফ্রিজে রাখো। কিছুক্ষণ পর ডোবা তেলে ভেজে টমেটো কেচাপের সঙ্গে গরম পরিবেশন করো।

আম্রখণ্ডঃ

ঘরে পাতা টক দই নিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। আঁশ ছাড়া মিষ্টি আমের পাল্প এক বাটি, এক বাটির একটু বেশি টক দই, হাফ টিন মিল্ক মেড ভালো করে মিশিয়ে তাতে আমের ছোট টুকরো দাও। প্রি-হিট করা আভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে ২০ মিনিট বেক করো। রুম টেম্পারেচারে কিছুক্ষণ রেখে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দাও। ঠাণ্ডা পরিবেশন করো।

চিকেন বার্গারঃ

কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তাতে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে তাতে সাদা জিরে, চিকেন কিমা, পেয়াঁজকুচি, রসুনকুচি, আদাকুচি দিয়ে নেড়ে নাও। টমেটো কেচাপ, কাঁচালঙ্কাকুচি, স্বাদমতো নুন দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে রাখো। মাংস সেদ্ধ হলে অল্প মিষ্টি এবং গরমমশলা নিয়ে শুকনো পুর ঠাণ্ডা করতে দাও। তারপর সেটিতে ব্রেডক্রাম্ব দিয়ে প্যাটির আকারে গড়ে ডিমের গোলায় দিয়ে সোনালি করে ভেজে নাও। বার্গার বান অর্ধেক কেটে মাখন লাগিয়ে সেঁকে নাও। বানের ওপর টমেটো কেচাপ ও মেয়নিজের মিশ্রণ দিয়ে তার ওপর লেটুসপাতা, গোল করে কাটা পেয়াঁজ, শশা, টমেটো এবং তার ওপর চিকেন প্যাটিটা রেখে আরেকটা বান দিয়ে চেপে দাও। গরম গরম পরিবেশন করো।

আপেল টার্টঃ

২ কাপ ময়দায় ২ ১/২ চামচ মাখন দিয়ে হাত দিয়ে ডলতে হবে যাতে ব্রেডক্রাম্বের কন্সিসটেন্সি হয়। সেটিকে ঠাণ্ডা জল দিয়ে শক্ত করে মাখতে হবে। তারপর সেটা কিছুক্ষণ রেখে দাও। লেচি কেটে রুটির থেকে একটু মোটা করে

#

বেলে নিয়ে টার্ট মোল্ড এ চেপে লাগিয়ে নাও যাতে ভেতরটা ভরে থাকে। প্যানে মাখন দিয়ে তাতে আপেলকুচি দাও। আপেল সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে অল্প মধু, চিনি ও দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে শুকনো করে নামিয়ে নাও। টার্ট মোল্ড এ পুর দিয়ে সেই ময়দার সরু স্ট্রিপ কেটে টার্টের ওপরটা ঢেকে দাও। প্রি-হিট করা আভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে ১৫-২০ মিনিট বেক করো। চকলেট সস দিয়ে পরিবেশন করো।

লেখক পরিচিতি

অভিষেক ঘোষ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। বিডির কনিষ্টতম মেম্বার (দাদুর পরেই)। ধোনী এবং রোরার অন্ধভক্ত। মায়ের হাতের রান্নার জন্য পাগল। ঘুরতে ভালোবাসে এবং দেশ বিদেশের খাবার নিয়ে পড়াশোনা করে।



সে দিনও চাঁদ উঠেছিল – কোজাগরীর গোল চাঁদ। নিটোল, নিখুঁত – আলোর বন্যায় চরাচর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই চাঁদ।

আমি ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম– আলসেবিহীন সেই ছাদ। যেখানে আমাকে উঠতে বারণ করা হত – কিন্তু যখন সারা পৃথিবী আলোতে ডুবে আছে, আমার চোখে তমিস্রা কিভাবে নামতে পারে? আমি তাই সব নিষেধ উপেক্ষা করে, চুপি চুপি উঠে এসেছিলাম ছাদে। চিলেকোঠার ঘরটা পেরিয়েই চোখে পড়েছিল সেই অসাধারণ দৃশ্য।

আহা! -কি দারুণ। প্রকৃতি যেন কম্পাস দিয়ে অ-কম্পিত হাতে এঁকেছিলেন এই গোলাকার অবয়বকে। কিছু কালো কালো দাগ ছাড়া, কি অপূর্ব সেই বিরাট বল -আর তার গা দিয়ে ঝরে পড়ছে সাদা আলোর কুচি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে একটু বেশিই অসাবধান হয়ে গেছিলাম আমি। পা চলে গেছিল ছাদের সীমানার বাইরে - ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি নেমে গেছিল আমার – আর আমার শরীর নেমে গেছিল মাধ্যাকর্ষণের টানে বেশ খানিকটা নিচে। একটা ভোঁতা শব্দের সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছিলাম আমি – চিত হয়ে পড়ে থাকার ফলে আমগাছের ফাঁক দিয়ে সেই গোল চাঁদ পড়েছিল চোখে। কিন্তু সে চাঁদের রঙ তখন লাল।

“লাল চাঁদ? – সঙ্গে বড়াল নেইত?” হেসে উঠল ছোটকাকা।

হাসপাতালে শুয়ে থাকতে থাকতে বড্ড একা লাগত। তাই ছোটকাকা মাঝে মাঝে আসত সঙ্গ দেবার জন্য। বাবার অত সময় নেই –অফিসের কাজে এদিক সেদিক দৌড়তে হয় তাঁকে। তবুও বাড়িতে থাকলে রোজই আসতেন, আর গম্ভীর হয়ে থাকতেন। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ছেলেকে নিজে সময় না দিতে পারার যন্ত্রণা তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠত

#

তখন। আমার বাবা আমাকে কোনোদিন উপদেশ দেননি – নিষেধও করেননি। আমার জীবনে বাবার এক উজ্জ্বল অনুপস্থিতি নিয়েই আমি বড় হয়ে উঠেছিলাম। আর সেইজন্য হয়ত আমিও কেমন জানিনা অন্যদের থেকে কিরকম আলাদা তৈরী হয়েছিলাম। বেশী কথা বলতে ভালো লাগত না, খেলাধূলোতেও আগ্রহ ছিল না – শুধু প্রকৃতির ওপর অমোঘ একটা আকর্ষণ তৈরী হয়ে গেছিল আমার মধ্যে। চুপচাপ ঘরে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম কখনো জানলা দিয়ে, কখনো বা ছাদে উঠে। মামার বাড়ির ছাদটা বেশ বড় –কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কেউ আলসে তৈরীতে আগ্রহ দেখায়নি। মামারা পারতপক্ষে ছাদে ওঠেন না, আর দিদার বয়স এবং তাঁর বেতো হাঁটু তাঁকে বিছানা ছাড়তেই অনুমতি দেয় না - ছাদে ওঠা তো স্বপ্ন দেখার সামিল। তাই ঐ নেড়া ছাদটাই হয়ে উঠেছিল আমার নিজের একান্ত জগত।

একদিন এরকমই ছাদে উঠে পাখির পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রায় পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছিলাম, আর কি ভাগ্যি, সেদিনই আমার বড়মামা ছাদে এসেছিলেন চিলেকোঠার ঘরে কিছু একটা খুঁজতে। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, আর সেদিন থেকে সর্বসমক্ষে আমার ছাদে ওঠার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যায়। "সর্বসমক্ষে" কারণ আমি এরপরেও বহুবার ছাদে উঠেছি – সেসবই মাঝরাতে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর। আমার এই আর এক দুর্লক্ষণ – রাতে আমার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। যাও বা আসে, সেই রাত তিনটের পর। মামার বাড়িতে সবাই রাত এগারোটাতেই নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন -কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

সেই বিনিদ্র রাতগুলোয় কতবার ছাদে উঠেছি। বাড়ির একপ্রান্তে একটা জংলা ডোবা, আর বাকি দুপ্রান্তে ঘন ঝোপঝাড় – আর সেই ঝোপের মাঝেই গজিয়ে উঠেছে এক ঝাঁকড়া আমগাছ। হাল্কা চাঁদের আলোয় সেই আমগাছের ছায়াকে যেন আরও ভূতুড়ে লাগে, সেদিকে তাকিয়ে কিরকম একটা গা ছমছম করে। মনে হয় যেন ঐ ঘন ছায়ার আশেপাশে একটা কালো অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, অনন্তকাল ধরে। কোনভাবে সেটা আমায় পেলেই গ্রাস করে নেবে। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে থাকার একটা চৌম্বক আকর্ষণ আমাকে পেয়ে বসেছিল – সেটা যেন আমাকে টানত। ছাদের আলসের কিনারায় বসে সেই কালো ঝুপসি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অনেকক্ষণ। এরপর হঠাৎ করে একটা রাতপ্যাঁচা ডেকে উঠত, আর দূরে করুণ সুরে কুকুরের কান্না শোনা যেত। প্রায় প্রতিদিনই – একই সময়ে। কারণ সেটা শুনেই আমি নেমে আসতাম নিচে – নিজের বিছানায় – আর ঘুম চলে আসত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতাম – রাত তখন ঠিক তিনটে।

আমার ছিল দুই মামা। কাকারা আলাদা থাকত বলে বাবা আমাকে ওঁদের সঙ্গে রেখে আসার সাহস পাননি। শুনেছি, খুব ছোটবেলায় আমার মা এক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান – খুব ভয়ানক ছিল নাকি সেই দুর্ঘটনা। এক বিয়ে বাড়ি থেকে খেয়ে দু তিনটে গাড়ি করে আমাদের পরিবার ফিরছিল। এক গাড়িতে ছিল মা, আমার পিসী আর পিসো। আর অন্য গাড়িতে ছিলাম আমি, কাকারা আর মামারা। মায়েদের গাড়ির ড্রাইভার নেশাগ্রস্ত ছিল হয়ত, তাই হাইওয়েতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা এক ট্রেলারের পেছনে প্রায় এক'শ কিলোমিটার বেগে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়ি। মা পেছনে বসেছিল বলে তার গোটা শরীরটা অন্তত সৎকারের জন্য পাওয়া গিয়েছিল - বাকিদের কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল আমার পরিজনদের। তবে এসবই শোনা গল্প – আমার কিছুই মনে পড়ে না। তবে মাঝে মাঝে মায়ের ছবিটা

হাতে নিয়ে কল্পনায় দেখতে ইচ্ছে করে মা'কে। কেমন ছিলো মা? বেঁচে থাকলে আমার এই পাগলামি কতটা মেনে নিতো? নাকি মা থাকলে আমি এরকম হতামই না হয়ত – হয়ত আমি হতে পারতাম এক স্বাভাবিক ছেলে।

"লালচাঁদ বড়ালের নাম শুনেছিস?"– ছোটকাকার কথায় সম্বিত ফিরে এলো। "শুনবি কি করে? বহু পুরোনো গায়ক। ছাড় সেসব কথা – আগে বল, তোর কি মামার বাড়িতে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে?"

আমি চমকে উঠলাম, "আরে না না – কি যে বলো ছোটকা – আমার কোনো অসুবিধে নেই।"

"তোর ওপর ভালো করে নজর রাখা দরকার সেটা বুঝতে পারছি। মামারা পেরে উঠছে না – আর দিদার কথা তো বাদ দে। তুই এত রাতে ছাদে কি করতে গিয়েছিলি?" ছোটকার গলা এবার তরল থেকে গম্ভীর।

আমি চুপ করে রইলাম –কি বলব? কি করে বোঝাবো যে আমার রাতে ঘুম আসেনা – আর সেই জমাট অন্ধকারের ওপর আমার এমন এক টান তৈরী হয়েছে যে সেটা এড়াবার কোনো উপায় নেই। রোজই আমাকে ছাদে যেতে হয় – তবে সেদিনের কথা আলাদা ছিল। সেদিনের প্রকৃতি আমাকে টানছিল – আলো আমাকে টানছিল – অন্ধকার নয়।

আমি ছোটকাকে সব খুলে বলেছিলাম সেদিনের কথা –সেই লাল রঙের চাঁদের কথাও বাদ দিইনি। কিন্তু ছোটকার কথায় পরিষ্কার বোঝা গেল, কিছুই বিশ্বাস করেনি। খুব স্বাভাবিক – বাচ্চা ছেলেদের মন একটু কল্পনাপ্রবণ হয়েই থাকে, তাদের সব কথায় এত আমল দিলে চলে? আমি আর কিছু বলিনি। চুপ করে চোখ বুঝে মটকা মেরে পড়েছিলাম। ছোটকা চলে যাবার পর, ছোটমামা এসেছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথাও বলে গেলেন খানিকটা। আর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যাবার সময় বললেন, "সমু, তোকে খুব শিগগিরি বাড়ি নিয়ে যাবো। চিন্তা করিস না। ডাক্তার বলেছেন, বিশেষ কিছু হয়নি – পাঁজরার কয়েকটা হাড় ভেঙেছে আর মাথায় সামান্য কিছু আঘাত। চিন্তার কিছু নেই। রিপোর্ট সবই ভালো।"

সেদিন রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। অদ্ভুত সেই স্বপ্ন – আমি সেই ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু সেই আলোর ঝর্নাধারায় চারদিক ভাসিয়ে দেওয়া চাঁদ না, সেদিনের দেখা সেই লাল রঙের চাঁদ–আর সেই চাঁদের থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া কালচে লাল আলোয় গাছের তলার সেই গাঢ় অন্ধকার যেন আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম জানিনা, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম সেই অন্ধকার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম সেই নিবিড় কালো তমিস্রাতে। কিন্তু সেখানে যেন আমি একা নই, আরও কেউ কেউ আছে আশে পাশে, কিন্তু তারা দৃশ্যমান নয়। না দেখতে পেলেও, তাদের উপস্থিতি ঠিকই টের পাওয়া যায়। সেই অন্ধকারের চাদরের ভিতরে থেকে বাইরের পৃথিবীটাকে যেন কেমন মায়াবী লাগছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার খিদে পাচ্ছে – প্রচণ্ড খিদে। সর্বগ্রাসী সেই খিদে যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। হঠাৎ দেখলাম আমার ঠিক পাশ দিয়ে কে যেন এগিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধকারের সীমানা পেরিয়ে – কেমন যেন কৃত্রিম তার চলাফেরা – ঠিক যেন রোবটের মত। তার মুখ দেখতে পেলাম না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম, তার হাঁটা চলা, সবই আমারই মতো। কিন্তু সে আমি নই। নিজের দিকে তাকালাম – অন্ধকারে নিজের দেহ খুঁজে পেলাম না। হাত দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে দেখলাম আমার হাত নেই – আমার সারা শরীরের কোনও অস্তিত্ব নেই। চিৎকার করে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারলাম –আমার কণ্ঠও নেই। যেন আমার সমস্ত জাগতিক সত্ত্বা ডুবে গেছে সেই কালো তিমিরে। কিরকম একটা কষ্ট হতে লাগল – অবর্ণনীয় সেই কষ্টের বিবরণ দেবার

ভাষা আমার নেই, কিন্তু সেই যন্ত্রণাতেই যেন আমার ঘুম ভেঙে গেছিল সেদিন – চোখ খুলে দেখেছিলাম হাসপাতালের ঘড়িতে তখন ঠিক রাত তিনটে।

ঘামে জবজবে হয়ে বাকি রাত জেগে কাটালাম – যদিও ঘুম আর আসেনি। আর হ্যাঁ, সেই ছাদ থেকে পড়ে যাবার পর আমার মধ্যে একটাই পরিবর্তন এসেছিল – একটাই। প্রতিদিন আমার ঘুম রাত তিনটেতেই ভেঙে যেত। আগে যেমন ঠিক ওইসময় ঘুম আসত, এখন ওইসময় ঘুম থেকে উঠে পড়তে লাগলাম প্রতিদিন। কখন যে ঘুম আসত তা জানতাম না, আর সেদিনের পর প্রতিদিন ওই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। প্রতিদিনই দেখতাম আমার মত একজন সেই অন্ধকারের সীমানা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে চলেছে – আর তারপরই আমার ঘুম ভেঙে যেত। সারা সকাল শুয়ে শুয়ে অনুভব করতাম আমার শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব, আর রাতে ঘুমের মধ্যে যেন আমার বিদেহী সত্ত্বা আমাকে অন্যরূপে প্রশিক্ষণ দিত। এ যেন এক অদ্ভুত টানাপোড়েনে পড়ে গেছিলাম আমি – যার থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমার জানা ছিল না।

মাসখানেক হাসপাতালে কাটিয়ে মামার বাড়ি ফিরে গেলাম। তখনো ভালো করে চলতে পারি না – বুকের ডানদিকে ব্যথা করে – আর মাথা টাল খেয়ে যায়। বাবা কদিন ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে থাকলেন – কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমি নিজেকে নিয়েই এত মশগুল থাকতাম যে, কে এল, কে গেল আমার তাতে বিশেষ কিছু এসে যেত না। বাইরের দুনিয়ার প্রতি আমার একটা অদ্ভুত নিরাসক্তি, এক অবিমিশ্র নির্লিপ্ততা আমাকে গ্রাস করেছিল। তবে অদ্ভুতভাবে, মামার বাড়িতে ফিরে আসার পর আমি সেই স্বপ্ন আর দেখতাম না। তার বদলে দেখতাম আরও এক অদ্ভুত জিনিস। দেখতাম, আমার অবয়ব বিশিষ্ট সেই মূর্তিকে – সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। এ যেন আমিই আমাকে দেখছি –ঠিক যেমন আয়নাতে দেখায়, সেরকম। কিন্তু আমার দ্বৈতসত্ত্বার মুখের ভাবে যেন একটা অপরিসীম ক্রুরতা, একটা হিংস্র ভাব লেগে আছে। কিছু একটা ভয়ানক করার ইচ্ছে আর আকাঙ্খায় যেন সে ছটফট করছে, কিন্তু সে যেন কিছুতে বাঁধা পড়ে আছে। সেখান থেকে মুক্তি পেলে যেন সে ভীষণ কিছু করে ফেলতে পারে। আমার স্বপ্নের শেষের দিকে সে ভয়ানক রাগে গরগর করতে থাকত আর মুখব্যাদন করে উঠত – আর আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম তার মুখের মধ্যে অবস্থিত শ্ব-দন্তগুলিকে।

সকালে দাঁত মাজতে গিয়ে কি ভেবে নিজের দাঁতগুলো আয়নায় ভালো করে দেখলাম। নাঃ – সন্দেহজনক কিছু তো নেই। আমি এরকম প্রায় প্রতিদিনই করতাম – মনে ভাবতাম যদি আমার এই বিপরীত সত্ত্বার সঙ্গে আমার কোন বাস্তব মিল থাকে, তা একদিন আমার ঠিক চোখে পড়বেই। কিন্তু আমাকে হতাশ হতে হত। আমার গোবেচারা মুখে ঐ হিংস্র ভাব কোনদিন ফুটবে বলে আমার বিশ্বাস ছিল না – আর আমার মধ্যে সেই ছটফটে ব্যাপারটাও নেই। কিন্তু প্রতিদিন এই দ্বিতীয় আমি-কে দেখতে দেখতে আমার মধ্যে কেমন জানি এক বিষণ্নতা জেগে উঠছিল –যার ফলে আমি বাস্তব জীবনেও অস্বাভাবিক ভাবে গুটিয়ে যেতে লাগলাম। কেউ ডাকতে এলে ভালো লাগত না, কেউ অনবশ্যক কথা বলতে এলে প্রচণ্ড বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে যেত। অবস্থা ভালো নয় বুঝে – আমার বাবা এক মনোবিদের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন।

“কতদিন এইসব দেখছো?” - ডাক্তার একটু ঝুঁকে এলেন আমার দিকে।

#

মনোবিদদের মনে হয় এটাই ধরন। কদিন ধরে চুপ করে আমাকে ষ্টাডি করে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক- আমার বিরক্তি, রাগ, অস্বস্তি সবই পড়ে ফেলেছিলেন। আর তাই আমার পেট থেকে কথা বার করতে ওঁকে বেশী বেগ পেতে হয়নি।

"বেশ কদিন ধরেই –এই গত মাস তিনেক থেকে।"

"মা কে মনে পড়ে?"

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ– "নাঃ – অতটাও নয়। তবে কৌতুহল আছে মা'কে নিয়ে।"

"মামার বাড়িতে তো দুই মামা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন – তোমার একা লাগে না? সারাদিন দিদা আর তুমি বাড়িতে। স্কুলেও তো যাচ্ছো না এখন।"

"নাঃ – আমার একা লাগে না। আমি ভালোই আছি।"

"স্কুলে তোমার কোনো বন্ধু নেই? তাদের সঙ্গেও তো মাঝে মাঝে গল্প করতে পারো।"

"আমার কারুর সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে না।" মাথার মধ্যে কেমন দপদপ করছে। মনের মধ্যে একটা রাগ কেমন যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

ডাক্তার যেন ব্যাপারটা বুঝলেন। কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে বললেন –"আজ যাও। তোমার ছুটি। আবার কবে আসতে হবে পরে বলে দেবো।"

বাইরে এসে বাবার সঙ্গে কি সব গুজগুজ ফিস্‌ফাস করলেন। বাবার গম্ভীর মুখটা আরও এক পোঁচ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমার হাত ধরে বললেন –"চলো, কাল থেকে তুমি বড়পিসীর বাড়িতে থাকবে, ব্যাঙ্গালোরে। আমি ব্যবস্থা করে এসেছি।"

আমার বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল, "কেন বাবা? আমি তো এখানে ভালোই আছি।"

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধরা গলায় বললেন, "সমু, তোমার মা চলে যাবার পর থেকে আমার আর বাড়িতে মন বসত না। কেন জানি না – আমি নিজের থেকে কেমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। সেদিনের সেই ঘটনার জন্য আমার নিজেকে দায়ী মনে হয়। আসলে, ওই গাড়িটাতে আমার যাবার কথা ছিলো। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আমি কবিতাকে পাঠিয়ে দিলাম প্রথম গাড়িতেই।" বাবার গলার স্বর কিরকম ঘড়ঘড়ে শোনাল। "ওই ঘটনার পর আমি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। অনেক কাউন্সেলিং করিয়ে তবে সুস্থ জীবনে ফিরতে পেরেছিলাম। বাড়ির থেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরে থাকতাম, আর সেটা করতে গিয়েই তোমার এই অবস্থা হলো।" বাবা আমাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন – স্পষ্ট বুঝলাম কান্নার দমকে তাঁর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি আবার

বললেন, "তাই ঠিক করেছি তুমি এবার থেকে পিসীর বাড়িতে থাকবে। আমিও ব্যাঙ্গালোরে পার্মানেন্ট পোষ্টিং পেয়েছি – এবার থেকে ওখানেই থাকব।"

আজ থেকে মাস ছয়েক আগে হলে হয়ত প্রস্তাবটা শুনে আমি ফেলতে পারতাম না। কারণ স্কুলে ছুটি পড়ার পর মামার বাড়িতে আমার খুব যে একটা ভালো লাগত তা নয়। একা একা কতক্ষণ কাটানো যায়? আমার বন্ধুবান্ধব খুব একটা কেউ নেই – আর নিজে যেচে খেজুরে আলাপ আমার ভালো লাগত না। কিন্তু এখন ব্যাপার আলাদা – আমার এক সাথী আছে – আর সেটা আমি নিজে। আমার প্রতিদিনের স্বপ্নে সে আসে, তার স্বপ্ন সঙ্গ আমার এখন ভালোই লাগে – তার মুক্তির উপায়ও সে আমাকে জানিয়েছে। আর সে এও জানিয়েছে, যে বেরিয়ে আসতে পারলে, আমার মনে স্ফূর্তির অভাব হবে না। তাই এখন এখান থেকে যাওয়াটা আমার কাছে অঙ্গচ্ছেদের সামিল।

বাড়ির কেউ জানে না – এখন প্রতিদিন আমি রাতের বেলায় ছাদে গিয়ে বসি। আকাশে তখন রক্তচন্দ্র – সেদিনের পর সাদা চাঁদ আর আমার চোখে ধরা পড়েনি। ডাক্তার বলেছিল, মাথায় আঘাত লাগার ফলে আমি নাকি বর্ণান্ধ হয়ে গেছি। হাস্যকর – তাহলে আমি লাল রঙ চিনছি কিভাবে? তবে সেই অন্ধকারের সঙ্গে, আমার রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেইদিকে চেয়ে আমি – আমার সঙ্গে কথা বলি। আবার ভোররাতে নীচে নেমে আসি। এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে এটা আমি কোথায় পাবো?

সেদিন রাতেও সেই কথাই হচ্ছিল ওর সঙ্গে। হঠাৎ মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি – সেই সেদিনের স্বপ্নের মতো অন্ধকার এগিয়ে আসছে আমার দিকে- আছন্ন করে ফেলছে পুরোপুরি। আর সেদিনের মতো আমার শরীর ধারণ করে কেউ চলে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। যাবার আগে সে শুধু আমার দিকে একবার ফিরে চাইল। স্পষ্ট দেখলাম, তার চোখ রক্তবর্ণ। সঙ্গে সঙ্গেই অনেকদিন পর আমার মধ্যে আবার ফিরে এলো সেই অঙ্গ বিচ্ছেদের অনুভূতি –যেন আমার সত্ত্বাকে কেউ বেঁধে রেখেছে এক অন্ধ কুঠুরিতে– আর আমার দেহ ধারণ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে গেছে অন্য কেউ। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

পরেরদিন বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। আমার বাবাকে যেন কে বা কারা এসে হত্যা করে গেছে। বীভৎস নারকীয় সে দৃশ্য –আমাকে দেখতে দেওয়া হলো না। পুলিশ, ডাক্তার – রিপোর্টারে বাড়ি ছয়লাপ। কদিন ধরে বাড়ির সব্বাইকে জিজ্ঞাসাবাদ চলল দফায় দফায়। ছোট বলে আমাকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মামাদের হেনস্থা হতে হল খুব। কিন্তু পুলিশ এই খুনের কোন কিনারা করতে পারল না –খুনি কে, তার মোটিভ, তার খুনের অস্ত্র কিছুই পাওয়া গেল না। তাই মাস ছয়েক অনেক জলঘোলা হবার পর পুলিশবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। আর হবার মধ্যে শুধু একটাই হলো – যে আমাকে মামার বাড়ি ছেড়ে যেতে হলো না। পিসীরা অনেক সাধাসাধি করলেও, আমি সেখান থেকে যেতে চাইলাম না।

এই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমি বড় হয়েছি – একটা ছোট চাকরিও করছি। এখন বড়মামা রিটায়ার করেছেন –আমার বিয়ের পাত্রীও খোঁজা হচ্ছে। তবে এতদিনের মধ্যে আমার সেই অন্ধকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিন্তু কমেনি। এখন রোজ না হলেও সপ্তাহে দুবার তো আমাকে উঠে যেতেই হয় – আর সেই অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার

বোধ তীব্র হয়ে ওঠে কোজাগরী পূর্ণিমার সময়। তখন আমি যেন আর আমাতে থাকি না – বিলীন হয়ে যাই সেই নিটোল অন্ধকারের অলিন্দে। আর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় আমারই কোন এক অবয়ব।

মাঝে মাঝেই কাগজে পড়ি –এক একটি নারকীয় হত্যার খবর। কে বা কারা যেন মানুষগুলিকে গলার নলি দাঁতে ছিঁড়ে মেরে রেখে গেছে – রাতের গভীর অন্ধকারে – যখন বিশ্বচরাচর মগ্ন কোজাগরীর চাঁদের আলোতে।

বিয়ের রাতে প্রনেতা আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে আবদার জুড়ল –"হ্যাঁ গো- হানিমুনে কোথায় যাবো?"

আমি চুপ করে রইলাম। এবাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারি না। এখানে থেকেই আমার জীবন তৃপ্ত, পরিপূর্ণ। সকালে অফিসে যাই – বিকেলেই বেরিয়ে পড়ি। সুর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ছাদের ওপর থেকে সেই অন্ধকার যেন আমার অবচেতন মন কে ডাকতে থাকে। আমি অস্থির হয়ে পড়ি – তখন কোনোকিছুই আমাকে আর দমিয়ে রাখতে পারে না। আর সেই আমাকে কিনা এই বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে? অসম্ভব।

"আচ্ছা দেখছি"– আমি মিনমিনে গলায় জানালাম।

"দেখছি কি গো? কালই আমরা ডিসাইড্ করে ফেলব – ঠিক আছে?" প্রনেতার গলায় খুশি ঝরে পড়ল।

আমার মাথা যন্ত্রণা করছে – শিরাটা দপদপ করছে। প্রনেতাকে বললাম, "ছাদে যাবে?"

"এত রাতে?" প্রনেতা অবাক, "এখন তো রাত তিনটে বাজে।"

আমার গলা থেকে যেন এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল, "এই তো সময়।"

ওর হাত ধরে ছাদে এলাম। আলসের কাছে এগিয়ে আসতেই দেখলাম, সেই গভীর অন্ধকার হাঁ করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। প্রনেতার দিকে তাকালাম – দেখলাম আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, "ওটা কি গো? ওখানে এত অন্ধকার কেন?"

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করতে বললাম। আর দেখলাম, অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আকাশের দিকে তাকালাম – কোজাগরীর রক্তচন্দ্রের লাল আভায় সারা চরাচর এক হিংস্র উন্মত্ততায় আবিল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলাম, এতদিনে দ্বিতীয় আমি মুক্তি পেল আমারই ভিতর থেকে – আর আমারই সত্ত্বার দ্বারা পরিপূর্ন হয়ে উঠেছে তার ক্ষুধিত ইচ্ছা। আমার চোখ জ্বালা করে উঠল, মাড়ির মধ্যে একটা চাপে বুঝতে পারলাম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে শ্ব-দন্ত। প্রচণ্ড ক্ষুধায় আমার শরীর জ্বলতে লাগল –

আমি জান্তব চিৎকার করে উঠলাম।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতিঃ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - ইনি সুনীল শক্তি খ্যাত সন্দীপন নন - বরং সেই প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সমনামী উপচ্ছায়া মাত্র। পেশায় চাকুরে কিন্তু নেশা লেখালেখি এবং আরও নানাবিধ।



অক্ষর জ্ঞান হবার পর নিজে নিজে যে বই প্রথম পড়তে পেরেছি তা হল ছবিতে রামায়ণ। সে বই যখন পুরোন হয়ে গেল, তখন আমার ঘরে চাঁদমামার প্রবেশ। স্কুলে তখনও ভর্তি হইনি। বাবা সপ্তাহে একদিন যেত পুরুলিয়া। হঠাৎ একদিন নিয়ে এলো একটা রঙিন পত্রিকা। চাঁদমামা। সেসময় ছোটোদের যা যা ভালো লাগতো তার সবকিছুই মজুত ছিল ওইখানে। বর্ণময় হাতে আঁকা প্রচ্ছদ - যা সবচেয়ে প্রথমে আকর্ষণ করে শিশুমনকে। তারপর পাতায় পাতায় রঙবেরঙের ছবি।

যখন বুঝতে শিখি দাম বলে একটা বস্তু আছে, যা দিয়ে পত্রিকা কিনতে হয় - তখন দেখলাম এর দাম ৩ টাকা। ১৯৯৮-এ মাধ্যমিকের বছরে একবার চোখ পড়ে গিয়েছিল পত্রিকার একটি সংখ্যায়। দাম ছিলো ১৫ টাকা। আকারে বড়। পাতাগুলি গ্লসি। অবশ্য ততদিনে জেনে গেছি চাঁদ, মামা নয়; পৃথিবীর উপগ্রহ। আর্মস্ট্রংবাবুর আগেই সেখানে পা রেখেছে টিনটিনরা।

পরবর্তী সময়ে আমার ঘর ভরেছে পত্রপত্রিকায়। শুকতারা, আনন্দমেলা, সত্যজিৎ পরবর্তী গোটাকয় সন্দেশ – সবই ভালো কিন্তু চাঁদমামার মতো শিশুতোষ আর কাউকে দেখলাম না। ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুদের আগ্রহ আর ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে এর জুড়ি ছিল না। ৪ থেকে ৬-এর ক্ষুদেরা যারা পড়তে পারতো না, বড়দের সরব পাঠ শুনেই চাঁদমামা উপভোগ করতো।

কেন এত জনপ্রিয়তা? আজ এই নিবন্ধ লিখতে বসে কিছু কারণ মাথায় আসছেঃ

১) সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক পাতায় পাতায় অসম্ভব সুন্দর সব ছবি। রঙচঙে এবং জীবন্ত। প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদ হত সেই সংখ্যার ধারাবাহিকের একটি দৃশ্য (পুরাণ কাহিনী বিশেষত)। চাররঙা। পাতায় পাতায় রঙিন ছবিগুলিও কম শিশুমনলোভা ছিল না।

২) গল্প বলার ধরন ছিল মায়াময়। দাদু ঠাকুমারা আমাদের যেভাবে গল্প বলতেন, চাঁদমামার গল্পগুলোর প্রকাশ ভঙ্গিমা ছিল ঠিক তেমনই।

৩) দেশী বিদেশী রূপকথা - লোককথার অদ্ভুত মিশ্রণ এবং অলঙ্করণের যোগ্য সঙ্গত - শিশুমনকে সহজেই আকর্ষণ করত।

বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগুসহ ১২টি ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হত চাঁদমামা। পত্রিকার সূচিপত্র থাকতো না। ভেতরের দিকে থাকতো সম্পাদকীয়। সেই সংখ্যার কোন একটি বিষয় নিয়ে আগ্রহ উদ্রেকের চেষ্টা থাকতো সেখানে। সংস্থাপক চক্রপাণি এবং প্রখ্যাত তেলেগু চিত্রপরিচালক বি নাগি রেড্ডি ১৯৪৭ সালে যে পত্রিকার সূচনা করেন পরবর্তীকালে সেটি স্পর্শ করে জনপ্রিয়তার মাউন্ট এভারেস্ট।

অন্য পত্রিকাগুলি চলে লেখকের নামে। সত্যজিৎ রায়ের জাদু কলম না ছুঁলে কি পুনরাবির্ভাবে সন্দেশ এত জনপ্রিয় হত! আ.বা.প. গোষ্ঠী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বকে দিয়ে শুরু করিয়ে ছিলেন আনন্দমেলা। সেই নীরেন্দ্রনাথ - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বাউণ্ডুলে কবিকে কিশোর সাহিত্যে আনলেন। শীর্ষেন্দুর মতো সিরিয়াস লেখক ছোটদের লেখায় এই যে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, আজও তা আনন্দমেলার মূলধন। ফেলুদার অভিযান দেশ-এর মতো খ্যাতনামা বড়োদের পত্রিকার শারদসংখ্যায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। কারণ তিনি জানতেন, পত্রিকার বিক্রি একধাক্কায় বাড়িয়ে দিতে পারেন সত্যজিতের এই সন্ধ্যা শশী বন্ধু মহাশয়। শুকতারায় শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনা ভুলে যাই কী করে?

চাঁদমামা সে পথের পথিক নয়। এই পত্রিকার জনপ্রিয় সিরিজ বেতালকথা-র লেখক কে? কে লিখতেন পৌরাণিক ধারাবাহিকগুলি? বেতালকথা লেখা হতো বেতাল পঞ্চবিংশতির ধরন অনুসরণ করে। প্রতিটি গল্পেই থাকতো নীতিকথার প্রচ্ছন্ন সুর। ছোটোদের চরিত্র গঠনে এমন উদ্যোগ আর কোনো পত্রিকা নিতে পেরেছে কি? চাঁদমামার খ্যাতনামা সম্পাদক কে.কে.রাও নিজে পৌরাণিক কাহিনীগুলি লিখেছিলেন বহুদিন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর সহজ সরল স্টাইল বজায় রাখা হত। তেলেগু সাহিত্যের এই মহীরূহ ১৯৫২ সাল থেকে আমৃত্যু ১৯৮০ পর্যন্ত ছিলেন সম্পাদক পদে। চাঁদমামার ধরনকে বেঁধে দিয়েছিলেন এক বিশেষ ঘরানায়।

এখানে লেখকের থেকে লেখা বড়ো। সম্পাদকের নামই যেখানে মুদ্রিত হয় না গুরুত্ব দিয়ে, সেখানে সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণেই হয়তো তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের দেখা যায়নি চাঁদমামার দরবারে। বোম্মানা বিশ্বনাথন একসময় নিয়মিত লিখতেন। উজ্জ্বল আগামী নামে তাঁর একটি বাংলা গল্পের বই আছে। বসুন্ধরা ছদ্মনামে লিখতেন কে? রাত্রি পতিতুণ্ডি, নিরাপদ ঘোষ, নীলরতন সর্দার, গণহরি সমাদ্দার প্রমুখের নামও কি মুখোশ? কেন অন্য পত্রিকাগুলিতে দেখা গেল না এদের? জাদু সম্রাট পরিচয় নিয়ে লিখতেন এ. সি. সরকার।

#

তবে সব সে আচ্ছা ছবিগুলি। এম.টি.ভি আচারিয়া, চিত্রা ছদ্মনামে টি.বীরা রাঘবন, ভাপা ছদ্মনামে ভাড্ডাডি পাপাইয়া, কেশব রাও, এম গোখলে, রাজি ছদ্মনামে এম কে বাশা, শক্তি দাস, পি মহেশ (মাহে) এবং চাঁদমামার প্রখ্যাত আলঙ্কারিক শঙ্কর (কে.সি শিবশঙ্করণ) সহ বহু শিল্পী নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই পত্রিকার পাতায় পাতায়।

১৯৫২ সালে সাড়ে তিনশো টাকা বেতনে নাগি রেড্ডির আহ্বানে চাঁদমামায় যোগ দিয়েছিলেন শঙ্কর। কাগজে কলমে তিনশো। কারণ সেসময়ে চাঁদমামার প্রধান শিল্পী চিত্রা ৩৫০ টাকা বেতন পেতেন। ৬০-এর দশকের কোন এক সংখ্যায় বেতাল কথা-র সেই বিখ্যাত থিম চিত্র (তরবারি হাতে বেতাল কাঁধে বিক্রমাদিত্য) এঁকেছিলেন শঙ্কর।

১৩ টি ভাষায় প্রকাশিত ২ লক্ষ প্রচার সংখ্যার পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল কেন? 'রাজা, উত্তর জানা সত্ত্বেও যদি মৌন থাকো, তবে তোমার মস্তক শতখণ্ডে বিদীর্ণ হবে।' বেতালের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সময় বড়ো বলবান বেতাল।' কর্মী সমস্যা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল চাঁদমামাকে। একসময় কথা হয়েছিলো Disney অধিগ্রহণ করবে চাঁদমামা। দেশী বিদেশী রূপকথা, লোককাহিনী, পুরাণের গল্প, ছবিতে জানা অজানা - মহাজীবন ইত্যাদির পাশাপাশি রেডিওর সঙ্গে যুক্ত হয় পত্রিকা। একুশ শতকের প্রথম দশকে খেলা - প্রযুক্তি সহ নতুন নতুন বিভাগ যুক্ত হয় পত্রিকার সঙ্গে। যাতে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে চাঁদমামা। তবু মালিক পক্ষের অনীহা বিনা নোটিশে বন্ধ করে দিল পত্রিকাটিকে। প্রথমে বলা হল ডিজিটালাইজ করা হবে পুরনো সংখ্যাগুলি। এখন সে উদ্যোগও বন্ধ। পাঠক সব পত্রিকারই কমতে থাকে। চাঁদমামার প্রচার সংখ্যা বিপুল ছিল। সুতরাং পাঠক কমে যাওয়া মালিকদের বিব্রত করে। আসলে সোনার সময় সবারই থাকে। চাঁদমামা সেটা পেরিয়ে এসেছিল।

ঋণ স্বীকারঃ

১। চাঁদমামাঃ কালেক্টর্স এডিশন
২। বি . বিশ্বনাথ রেড্ডির সাক্ষাৎকার : rediff.com
৩। শঙ্কর বিষয়ক নিবন্ধ : The Hindu
৪। ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
৫। রাহুল বিদ
কালেক্টর্স এডিশন থেকে শঙ্করের কিছু অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

সুজয় দত্তের জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ পুরুলিয়ার গড়জয়পুরে। ২০০০ এ উচ্চ মাধ্যমিক। রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই কর্মজীবন শুরু জেলার জনপ্রিয় সংবাদপত্র পুরুলিয়া দর্পণ এ। এখন প্রাথমিক শিক্ষক। কবিতার অনুরক্ত। একমাত্র কাব্যপুস্তিকা "ফাঁকা মাঠে গোল" বাংলা কবিতা জগতে হৈ চৈ ফেলতে ব্যর্থ। আগ্রহঃ রামায়ণ, মহাভারত। শখঃ বই জমানো। স্বপ্নঃ বিনা টিকিটে ভারত ভ্রমণ।



১৯৮৮-র অক্টোবর মাসে প্যারিসের সেন্ট ল্যুই হসপিটালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ওই দিন দুরারোগ্য ফ্যানকোনি অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত ম্যাথিউ ফ্যারো নামে একটি পাঁচ বছরের শিশুর শরীরে বিশ্বের প্রথম কর্ড ব্লাড প্রতিস্থাপন করা হয়। দাতা ম্যাথিউ-এর সদ্যোজাত বোন। জন্মমুহূর্তে তার কর্ড ব্লাড সংরক্ষণের কাজটি করে রেখেছিলেন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্যাল ব্রক্সমেয়ার। আজ ম্যাথিউ সম্পূর্ণ সুস্থ একজন বিবাহিত পুরুষ এবং দায়িত্বশীল পিতা।

নাড়ির টানঃ

নাড়ির টানের গভীরতা আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়। কারণ নাভিরজ্জু বা আমবিলিক্যাল কর্ড ইতিমধ্যেই গবেষক মহলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা নাভিরজ্জু বা আমবিলিক্যাল কর্ডের সাহায্যেই গর্ভস্থ শিশুর সঙ্গে সংযোগ রচনা করেন। নাভিরজ্জু তাই আদতে মা ও শিশুর জীবনসেতু। এ পথেই মায়ের শরীর থেকে সন্তানের শরীরে পুষ্টি, অক্সিজেন ও অন্যান্য জৈবিক উপাদানের পাশাপাশি স্টেম সেলের মতো অতি প্রয়োজনীয় আরও কিছু উপাদান স্থানান্তরিত হয়।

#

কর্ড ব্লাডে যা থাকেঃ

কর্ড ব্লাডে হেমাটোপোয়েটিক সেল-সহ নানা ধরনের স্টেম সেল থাকে। অপরিণত হেমাটোপোয়েটিক সেল ও স্টেম সেলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। রক্ত ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে এরা যে কোনও ধরনের কোষে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই এদের সাহায্যে হেমাটোপোয়েটিক ও জেনেটিক রোগ ছাড়াও অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। রক্তের বিশৃঙ্খলায় ভুগছেন এমন রোগীদের শরীরেও এদের প্রতিস্থাপিত করা যায়।

স্টেম সেল কী?

স্টেম সেলকে সাদা পাতার সঙ্গে তুলনা করে অনেক গবেষক দাবী করেন যে শিশুর শরীরের নানা অঙ্গে পৌঁছে গিয়ে এই কোষ সেখানকার কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঠিক সেই অঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় গল্প লিখে ফেলে। তাঁরা মনে করেন সন্তান প্রসবের পরে একবার এই নাভিরজ্জু ও তার ভেতরের রক্ত (কর্ড ব্লাড) নষ্ট করে ফেলা হলে দুর্মূল্য কিছু সেলকেও নষ্ট করে ফেলা হবে। এটা ভুললে চলবে না যে, কর্ড ব্লাডে মায়ের শরীর থেকে শিশুর জন্য তৈরি হওয়া স্টেম সেলও থাকে। তাই কোনও শিশুর কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করলে সেটি শিশুটির হুবহু সাদৃশ্যযুক্ত কোষের একটি নিশ্চিত উৎস হয়ে থাকবে। কোনও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে (যেমন, জীবনদায়ী কোনও রোগ) এই উৎস শিশুটির জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য যা করতে হবে তা হল কোনও নির্দিষ্ট হাসপাতালে এই কর্ড ব্লাড নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

স্টেম সেল শুধু কর্ড ব্লাডেই থাকে এমন নয়। কর্ড ব্লাড ছাড়াও স্টেম সেল বোন ম্যারো, পেশি, চর্বি, চুলের গ্রন্থি, শিশুর দাঁত ও পেরিফেরাল ব্লাডে পাওয়া যায়। তবে এই স্টেম সেলগুলির গুণগত মান ততটা ভাল হয় না।

কেন সংরক্ষণ?

পুনরুজ্জীবনমূলক বা রিজেনারেটিভ মেডিসিন চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অন্যতম শাখা। এই শাখায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পুনরায় জন্মদানের মাধ্যমে রোগ সারানো হয়। এই বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা স্টেম সেলের মধ্যে কিছু দারুণ সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন। কর্ড ব্লাড সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন নয়। শিশু জন্মানোর ঠিক পরে এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রসবের ঠিক পরে গর্ভফুল বা প্ল্যাসেন্টার সঙ্গে যুক্ত আম্বিলিক্যাল কর্ড বিচ্ছিন্ন করে প্ল্যাসেন্টা থেকে সূচের সাহায্যে ১০০-১৫০ মিলি পরিমাণ রক্ত একটি পাত্রে ভরে নেওয়া হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগবে না।

ক্ষতি হবে না তো !

এই পদ্ধতি বেদনাহীন এবং একটুও ঝুঁকির সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা বুঝতেই পারেন না কর্ড ব্লাড সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। কর্ড ব্লাড সংগৃহীত হলে মা ও সদ্যোজাত সন্তান কারোরই কোনও ক্ষতি হয় না। তাছাড়া নমুনা না নেওয়া হলে একে তো ফেলেই দেওয়া হত।

#

যেভাবে সংরক্ষণঃ

সংগৃহীত কর্ড ব্লাড ব্যাংকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় রক্তে কোনও সংক্রমণ আছে কিনা। হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন (এইচ এল এ) টাইপিং নামের একটা পরীক্ষাও করা হয়। বংশানুক্রমিক কোনও রোগ আছে কিনা দেখা হয় তাও। সব হয়ে যাওয়ার পরে রক্তের নমুনাটিকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করে তরল নাইট্রোজেনে (ক্রায়োপ্রিজাভেশন) সংরক্ষণ করে রাখা হয়। তাতে সেলগুলির বৃদ্ধি থমকে থাকায় এরা যেমন ছিল তেমন অবস্থাতেই থেকে যায়। সেই সঙ্গে এদের বিভিন্ন টক্সিন ও ভাইরাস থেকেও রক্ষা করা হয়। কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ প্রায় ৪০ বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং এই নমুনা ১০ বছরেরও বেশী সময় ধরে সংরক্ষণ করে রাখার পর ব্যবহার করার উদাহরণ আছে। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন তরল নাইট্রোজেনে ঠিক মতো ফ্রিজিং করতে পারলে সারাজীবনের জন্য কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ সম্ভব। মা বা পরিবারের সদস্যদের কোনও অসুস্থতার ইতিহাস থাকলে, রক্তের পরিমাণ কম হলে এবং অন্য কয়েকটি কারণে সংরক্ষণ বাতিল হয়ে যেতে পারে।

কর্ড ব্লাড স্টেম সেলের বৈশিষ্ট্যঃ

অনেক মারণ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। বোন ম্যারো থেকে স্টেম সেল নিয়ে অন্য দেহে প্রতিস্থাপনের বিকল্প হিসেবে বর্তমানে কর্ড ব্লাড স্টেম সেল ব্যবহার জোর দেওয়া হচ্ছে।

- সহজে সংগ্রহযোগ্য - কর্ড ব্লাড অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। স্টেম সেলের অন্য উৎস (যেমন, বোন ম্যারো) থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করতে গেলে বরং জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়ার করে কাটা-ছেঁড়া করতে হয়। তাতে কিছু অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি তৈরি হয়, যা কর্ড ব্লাড সংগ্রহের ক্ষেত্রে থাকে না।

- কমবয়সী, তাই নমনীয় - জীববিজ্ঞানের নিরিখে কর্ড ব্লাড স্টেম সেল, অন্য উৎসের (যেমন, বোন ম্যারো স্টেম সেল) প্রাপ্তবয়স্ক স্টেম সেলের তুলনায় বয়সে নবীন, তাই বেশি কার্যকর। অপরিণত থাকে বলে প্রতিস্থাপন করা সহজ।

- ঝুঁকি কম – কর্ড ব্লাড স্টেম সেল প্রতিস্থাপনে অন্য স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের তুলনায় ঝুঁকি কম।

- উৎকৃষ্ট ও পুনর্গঠন ক্ষমতাও বেশি - সদ্যোজাত শিশুর কর্ড ব্লাডে যে স্টেম সেল পাওয়া যায় তা বোন ম্যারো থেকে সংগৃহীত স্টেম সেল নমুনা থেকে অনেক উচ্চমানের হয়। তাদের পুনর্গঠন ক্ষমতাও অনেক বেশি।

- প্রতিস্থাপনকালীন সুবিধে বেশি - প্রতিস্থাপনের সময় বোন ম্যারো স্টেম সেলের তুলনায় কর্ড ব্লাড স্টেম সেলে অনেক বেশি সুবিধে পাওয়া যায়।

- এনগ্রাফমেন্ট হার বেশি - কর্ড ব্লাড স্টেম সেলের এনগ্রাফমেন্ট হার অনেক বেশি। তাই প্রতিস্থাপিত সেল গ্রহীতার শরীরে অনেক বেশি সংখ্যায় বিভাজিত হয়। আর তাতে উপকৃত হয় গ্রহীতা।

#

• 'অটোলোগাস ট্র্যান্সপ্লান্টেশন' – স্টেম সেলে 'অটোলোগাস ট্র্যান্সপ্লান্টেশন' সম্ভব। অর্থাৎ, অন্য আর কোনও চিকিৎসার সুযোগ নেই এমন রোগে একজনের স্টেম সেল তার নিজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

• তাৎক্ষণিক ভাবে পাওয়া যায় - ব্যাঙ্কে থাকায় তাৎক্ষণিক ভাবে স্টেম সেল মেলে। আর তাই আক্রান্ত রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ করে গোড়াতেই চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া যায় বলে দ্রুত রোগ সারে।

• কঠিন রোগ সারায় – রিজেনারেটিভ বা পুনরুজ্জীবনমূলক বলে স্টেম সেল থেকে রক্তনালি, পেশি, হাড়, কার্টিলেজ এবং স্নায়ু কোষ তৈরি হয়। ফলে অনেক কঠিন রোগ সারে।

• বয়স বাড়ে না এবং কার্যকারিতা বজায় থাকে – সংরক্ষিত থাকে বলে এই সেলের বয়স বাড়ে না। সংরক্ষণের আগে যেমন ছিল দীর্ঘদিন সংরক্ষণের পরেও তেমনই থাকে। পরিবেশ ও সাধারণ ভাইরাসের সংস্পর্শে আসে না বলে এদের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

• সরাসরি ব্যবহার যোগ্য – কর্ড ব্লাড স্টেম সেল সরাসরি ব্যবহার যোগ্য। সংগ্রহের পরে নির্দিষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেলে একে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। তারপরে প্রয়োজন পড়লে সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে সময় খরচ কম হয়। রোগী দ্রুত সেরে ওঠে।

• আংশিক সাদৃশ্যেও ব্যবহারযোগ্য - কর্ড ব্লাডের স্টেম সেলের সঙ্গে রোগীর রক্তের নমুনা সম্পূর্ণ না মিললেও চলে। এটা একটা বিরাট বড় সুবিধে। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য থাকলেই কর্ড ব্লাড স্টেম সেল ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

• নিরাপদ - বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনের তুলনায় কর্ড ব্লাড প্রতিস্থাপন অনেক নিরাপদ। রোগীর দেহ কোষ আক্রমণের বিচারে কর্ড ব্লাডের ইমিউন সেল বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনের তুলনায় একেবারেই ঝুঁকিহীন।

• সি এম ভি সংক্রমণে নিরাপদ - সাইটোমেগালো ভাইরাস (সি এম ভি)-এর মতো মারাত্মক সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষেত্রেও কর্ড ব্লাড অনেকটাই নিরাপদ। আমেরিকার একটি সংখ্যাতত্ত্ব হল – ওদেশের অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক সি এম ভি-র কেরিয়ার। তবে এরা সুপ্ত অবস্থাতেই থাকে।

যে যে রোগ সারতে পারেঃ

কর্ড ব্লাড ও কর্ড টিস্যুর যে জীবনদায়ী ও সঞ্জীবনী ক্ষমতা আছে বলে দাবী করা হয়। যত গবেষণা বাড়ছে মানুষ তত আশাবাদী হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কর্ড ব্লাড জীবন পরিবর্তন, এমন কি জীবনকে রক্ষাও করতে পারে। এই সেল অন্যান্য কোষ তৈরিতে সক্ষম বলে এরা টিস্যু ও অঙ্গ মেরামতিতে সাহায্য করে। তাই এদের অনেক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। দাবী করা হচ্ছে কর্ড ব্লাড স্টেম সেল সফলভাবে প্রায় ৮০টি মারাত্মক রকমের জীবনবিপন্নকারী রোগের

#

চিকিৎসায় কাজে লাগতে পারে। এদের অন্যতম হল ক্যান্সার, রক্তের রোগ এবং রোগপ্রতিরোধ জনিত অক্ষমতা। এখনও অবধি ৩০,০০০-এরও বেশি স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করা হয়ে গেছে।

• প্রধান প্রধান রোগগুলি - কর্ড ব্লাড যে-সব রোগ সারাতে পারে তার মধ্যে লিউকোমিয়া, অ্যাপ্লিস্টিক অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, হজকিনস লিম্ফোমা, নন-হজকিনস লিম্ফোমা এবং নিউরোব্লাস্টোমা অন্যতম। এইসব রোগের কয়েকটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রোগীকে কেমোথেরাপিও দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কেমোথেরাপির পরে স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন।

• বিপাকীয় সমস্যা - গাউচার ডিজিজ, হার্লার সিনড্রোম, ক্রাবে ডিজিজ এবং স্যানফিলিপ্পো সিনড্রোম ইত্যাদির মতো বিপাকীয় বিশৃঙ্খলায় কখনও কখনও কর্ড ব্লাড প্রতিস্থাপন করা হয়।

• নতুন আলো - স্টেম সেল চিকিৎসা বহু মানুষের জীবনে আশার আলো নিয়ে এসেছে। কর্ড ব্লাড থেকে স্কেলিটাল ও কার্ডিয়াক পেশি, লিভার ও নিউরোন প্রভৃতির টিস্যু তৈরি করা সম্ভব।

• জিন থেরাপি - এছাড়া স্টেম সেলের সাহায্যে জিন থেরাপিও সম্ভব কারণ, স্টেম সেলের পুনর্গঠনের ক্ষমতা থাকায় নষ্ট হয়ে যাওয়া কোষের জন্য প্রয়োজনীয় জিন সরবরাহ করতে পারে।

• আরও যে যে রোগ - সারা পৃথিবী জুড়ে গবেষকেরা এই চেষ্টায় লেগে আছেন যে কিভাবে স্টেম সেল ব্যবহার করে সেরিব্রাল পলসি, অটিজম, কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট, হার্ট ফেলিওর, স্ট্রোক, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি, মাল্টিপল স্ক্লেরেসিস, হিয়ারিং লস, পার্কিনসনস ডিজিজ, টাইপ-১ ডায়াবেটিস এবং অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ প্রভৃতি বিরল মারণ রোগের চিকিৎসা করা যায়। এছাড়াও ডায়াবেটিস মেলিটাস, রিউম্যাটেড অর্থারাইটিস, ক্রোনস ডিজিজ এবং সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসাস – এই সব রোগের চিকিৎসার চেষ্টাও চলছে। এমন কি কর্ড ব্লাডকে নতুন অঙ্গ তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভাঁওতা!

আলোচিত রোগগুলির কোনওটার চিকিৎসাতেই স্টেম সেলকে এখনও প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গণ্য করা হয় না। বহু বিশেষজ্ঞ পশুদের ওপরে করা গবেষণার কাগজপত্র দেখিয়ে মানুষের ক্ষেত্রেও একই রকম ফল পাওয়া যাবে বলে দাবী করতে শুরু করেছেন। এটা ঠিক নয় এবং প্রতারণার সামিল। আসলে যতদিন পর্যন্ত না মানুষের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে ততদিন এই ধরনের ঘোষণা না করাই উচিত। অন্যথায় মানুষকে ভুল বোঝানো হবে।

নিচে কয়েকটি রোগ ও শারীরিক বিশৃঙ্খলার তালিকা দেওয়া হল, কর্ড ব্লাড স্টেম সেল দিয়ে এই সব রোগের চিকিৎসা হতে পারে।

ক্যান্সার

- অ্যাকিউট লিউকেমিয়া
- ক্রনিক লিউকেমিয়া
- বোন ম্যারো ক্যান্সার
- লিম্ফোমা
- নিউরোব্লাস্টোমা
- উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন কঠিন টিউমার
- হজকিন ও নন-হজকিন লিম্ফোমা
- মায়েলোডিস্প্ল্যাসটিক সিনড্রোম

বিপাকীয় বিশৃঙ্খলা

- ক্র্যাব ডিজিজ
- হার্লার সিনড্রোম
- মেটাক্রোমাটিক লিউকোডিসট্রফি
- স্যানফিলিপ্পো সিনড্রোম
- গাউচার ডিজিজ

রক্তের বিশৃঙ্খলা

- অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া
- বিটা থ্যালাসেমিয়া
- ডায়মন্ড-ব্ল্যাকফ্যান অ্যানিমিয়া
- ফ্যানকোনি অ্যানিমিয়া
- সিকল্ সেল ডিজিজ

সুরক্ষাগত বিশৃঙ্খলা

- ক্রনিক গ্র্যানুলোমেটাস ডিজিজ
- হিস্টোসাইটিক ডিসঅর্ডার
- লিউকোসাইট অ্যাডেসন ঘাটতি
- মারাত্মক কমবাইনড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ
- উইসকট-অ্যালড্রিচ সিনড্রোম

#

সঞ্চয় বা দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্টেম সেল থেকে তালিকাভুক্ত ওপরের রোগগুলির চিকিৎসা সম্ভব। তবে বংশগত রোগের ক্ষেত্রে শিশুর নিজস্ব স্টেম সেল ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পছন্দ কোনও অন্য সহোদরের স্টেম সেল।

পুনরুজ্জীবনমূলক ওষুধের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ ডি এ) নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল স্টাডিতে নিচের কয়েকটি সমস্যায় কর্ড ব্লাড স্টেম সেল থেরাপির ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে।

- অটিজম
- সেরিব্রাল পলসি
- পিডিয়াট্রিক স্ট্রোক
- ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি
- অ্যাকওয়ার্ড হিয়ারিং লস
- ডায়াবেটিস
- কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট
- হার্ট ফেলিওর
- স্ট্রোক

এছাড়াও এফ ডি এ নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সেই ধরনের স্টেম সেল ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলিকে কর্ড ব্লাড ও কর্ড টিস্যুতে পাওয়া যায়। তবে গবেষকেরা কিন্তু এখনও নিশ্চিত নন যে, এই সব গবেষণার ফলাফল ঠিক কী হবে। এটা পরিষ্কার যে সদ্যোজাতের স্টেম সেল চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কর্ড ব্লাডের কিছু অসুবিধেঃ

কর্ড ব্লাড স্টেম সেলের সবটাই ভাল, সব কিছুই সমস্যাবিহীন এমন নয়।

- প্রয়োজনের তুলনায় কম স্টেম সেল - সদ্যোজাতের শরীর থেকে সংগৃহীত কর্ড ব্লাডের পরিমাণ খুব বেশি হয় না। তাই এতে প্রয়োজনের তুলনায় কম স্টেম সেল মেলে। সুতরাং, শিশু বা কিশোরদের জন্য কার্যকর হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা হতে পারে। সে কারণে প্রথমবারের নমুনায় কাজ না হলে অন্য দাতা থেকে আরও স্টেম সেল সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের প্রয়োজনে সংরক্ষিত স্টেম সেল অপর্যাপ্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি।
- সংক্রমণের ঝুঁকি - কর্ড ব্লাড স্টেম সেল শরীরে রোপিত হতে সময় লাগে তাই সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। এমন হলে স্টেম সেল রোপিত নাও হতে পারে। তখন সমস্যা এটাই হয় যে, চাইলেও সেই একই দাতার থেকে আর স্টেম সেল মেলে না।
- সি এম ভাইরাস জনিত সমস্যা - কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে স্টেম সেল সাইটোমেগালোভাইরাস (সি এম ভি) নামে ভাইরাসে আক্রান্ত হয় যা গ্রহীতার শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

#

- এখনও গবেষণা স্তরে - সর্বোপরি স্টেম সেল আজও বেশিরভাগ রোগের কাছে উন্মুক্ত হয় নি। অর্থাৎ, এখন পর্যন্ত ঘোষিত রোগ নিরাময় ক্ষমতার সিংহভাগ গবেষণা স্তরেই রয়ে গেছে।

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কঃ

সদ্যোজাতের আম্বিলিক্যাল কর্ড ও প্ল্যাসেন্টা থেকে সংগৃহীত কর্ড ব্লাড ভবিষ্যত চিকিৎসার প্রয়োজনে যেখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাকেই কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক বলে। আমরা আগেই জানিয়েছি, এই রক্তের নমুনাতে থাকা কোষ (স্টেম সেল) থেকে ভবিষ্যতে অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

ব্যাঙ্কের রকমফের – বর্তমানে আপনার শিশুর কর্ড ব্লাড দুই ধরনের ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

১) পাবলিক ব্যাঙ্ক – পাবলিক ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় দেওয়া কর্ড ব্লাড বিনামূল্যে সংরক্ষণ করে রাখে। তার ফলে এটি ভবিষ্যতে যে কোনও মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি রোগীদের পক্ষে খুবই উপকারী এবং বহু রোগগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসার কাজে আসতে পারে। এছাড়া এটিকে গবেষণার প্রয়োজনেও কাজে লাগানো যেতে পারে।

পাবলিক ব্যাঙ্কে কর্ড ব্লাড রাখা যেহেতু এক ধরণের দান তাই কোনও বাবা-মা যখন তাদের সন্তানের কর্ড ব্লাড পাবলিক ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করতে চান তখন তাঁদের এই মর্মে বিবৃতি দিতে হয় যে, তাঁরা রক্তের ওপর থেকে সত্ত্ব ত্যাগ করলেন এবং সংরক্ষিত রক্ত ভবিষ্যতে ব্লাড ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ, সরকার বিনামূল্যে আপনার শিশুর কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করবে। যে কারও প্রয়োজন হলে সেটা ব্যবহার করা হবে এবং প্রয়োজনে আপনার শিশুর জন্য সেটি নাও পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং, পরবর্তীকালে এই রক্ত যে ওই নির্দিষ্ট দাতা শিশু বা তার পরিবারের জন্য পাওয়া যাবেই তার কোনও গ্যারান্টি থাকছে না।

২) প্রাইভেট ব্যাঙ্ক – প্রাইভেট ব্যাংক অর্থের বিনিময়ে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করে। তবে এইভাবে সংরক্ষিত কর্ড ব্লাড কিন্তু আম-জনতার ব্যবহারের জন্য নয়। এটি শুধুমাত্র দাতা বা তার পরিবারের কোনও সদস্যদের (যেমন, বাবা-মা কিংবা ভাই) প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট পরিবারটি এই কর্ড ব্লাডের মালিক তাই এটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেই সিদ্ধান্ত তারাই নিতে পারবেন।

প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্ক যেভাবে সংগ্রহ করবেঃ

প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কই কালেকশন কিট পাঠিয়ে দেয়। সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে যে হাসপাতালে সেখানে প্রসবের আগে সেই কিট পৌঁছালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই রক্ত সংগ্রহ করবে। এবার আপনার দায়িত্ব হবে সেটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেওয়া।

প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কের খরচঃ

পাবলিক ব্যাঙ্কে কর্ড ব্লাড বিনামূল্যে রাখা গেলেও প্রাইভেট ব্যাঙ্কে কিন্তু এই ব্লাড সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ বাবদ প্রাথমিক প্রসেসিং ফি ও ব্যাংকিং ফি বাবদ খরচ আনুমানিক ৭৫,০০০-১,০০,০০০ টাকা। এছাড়া বাৎসরিক খরচের পরিমাণ প্রায় ৫,০০০-৭,৫০০ টাকা।

নিয়ন্ত্রণঃ

আমেরিকার চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ ডি এ) সমস্ত ধরনের কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিকে 'হিউম্যান সেলস, টিস্যুস অ্যান্ড সেলুলার অ্যান্ড টিস্যু বেসড প্রোডাক্ট'-এর আয়ত্ত্বাধীন বিষয় হিসেবে গন্য করে ও সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। অন্য দেশেও কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আছে। যেমন, ইউনাইটেড কিংডম-এ এই বিষয়টি দেখাশোনা করে হিউম্যান টিস্যু অথোরিটি। আমাদের দেশে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি যৌথভাবে 'ন্যাশনাল গাইডলাইনস ফর স্টেম সেল রিসার্চ' নিয়ে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ করেছে। এ-দেশে তারাই এই কর্ড ব্লাড স্টেম সেল চর্চার অভিভাবক।

যুক্তিগ্রাহ্যতাঃ

কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কিং আজ একটি চূড়ান্ত আলোচিত বিষয়। গোটা বিশ্ব জুড়েই প্রচুর সংখ্যক প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করে সংবাদপত্র-সহ নানা প্রেগন্যান্সি বিষয়ক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হিসেবে বলা হচ্ছে যে, সন্তানের শারীরিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ একটি অমূল্য সুযোগ। ব্যাঙ্কগুলি এই সংরক্ষণকে একটি 'সেল্ফ রিপেয়ার কিট' হিসেবে তুলে ধরছে। একজন অভিভাবক কিংবা বাবা-মায়ের কাছে শিশুর ভবিষ্যতের তুলনায় কোনও খরচই যে বড় নয় এটা ঠিক, তবুও যেহেতু এটা প্রমাণিত নয় যে অন্যান্য কম খরচের চিকিৎসার চেয়ে কর্ড ব্লাডের সাহায্যে চিকিৎসা বেশি লাভজনক তাই বিপুল এই খরচের যুক্তিগ্রাহ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসে। দেখা যাক, এই প্রসঙ্গে কি কি বলা হচ্ছে?

- পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন কেন? - সত্যিই যদি প্রাইভেট সংস্থাগুলিতে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণে এতটাই সুবিধে থাকে তাহলে তো মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এখানে আসবেন। চিকিৎসকরাও সেরকম পরামর্শই দেবেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দিয়ে অত অত পয়সা খরচা করে বিজ্ঞাপন করানোর প্রয়োজনটা ঠিক কোথায়? সন্দেহ দানা বাঁধে এখানেই।
- বাস্তবের বদলে ভবিষ্যতের কথা - প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে প্রচারপত্র বিলি করা হয় তাতে বর্তমানের বদলে ভবিষ্যতের কথা বেশি করে বলা হয়ে থাকে। এ যেন বাস্তব ছেড়ে অনির্দেশে পা বাড়ানো।
- এখনও গবেষণাস্তরে - একটা এমনও দাবী এমন করা হয় যে, কর্ড ব্লাড রক্তের কনিকা নতুন করে তৈরি করতে বা মেরামত করতে পারে। এছাড়া এরা নাকি নতুন টিস্যু বা অঙ্গ তৈরি করতেও সক্ষম। কিন্তু যেটা বলার তা হল, এই সমস্ত বিষয়গুলি যে হয় না, তা যেমন বলা যায় না, একই ভাবে হয়, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। আদতে গোটা বিষয়টিই এখনও গবেষণাস্তরে আছে। তাই এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকলেও

#

আদপে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় তার ব্যবহারের সুযোগ খুবই সীমিত। সুতরাং, যা বলা হচ্ছে ঠিক তেমনটাই যে হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

- ব্যবহারের সম্ভাবনা ক্ষীণ - আমেরিকা অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিকস (এ এ পি) জানাচ্ছে, ভবিষ্যতে কোনও শিশুর জমিয়ে রাখা কর্ড ব্লাড ব্যবহারের সম্ভাবনা ১ : ১,০০০ থেকে ১ : ২,০০,০০০। অর্থাৎ, ১,০০০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন থেকে ২,০০,০০০ জন শিশুর মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্ড ব্লাড ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে।
- কোনটা বেশি উপকারী – এ এ পি এমনও জানাচ্ছে যে, ম্যাচিং ডোনারের স্টেম সেলের চেয়ে ব্যক্তিবিশেষের নিজের স্টেম সেল বেশি উপকারী এমন কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।
- পাবলিক ব্যাঙ্ক থেকে স্টেম সেল নেওয়াই ভাল – ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে, যেহেতু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্টেম সেল জেনেটিক্যালি আলাদা, তাই সবার উচিত একে ব্যক্তিগত স্তরে সংরক্ষণ করা। অথচ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ড ব্লাড স্টেম সেলের ক্ষেত্রে বোন ম্যারোর মতো দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে অত সূক্ষ্ম সাদৃশ্যের দরকার নেই। আর তাই পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে অনেক সহজে স্টেম সেল নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের। তাছাড়া প্রয়োজন হলে একাধিক দাতার থেকেও তা নেওয়া যেতে পারে।
- সংরক্ষিত কর্ড ব্লাড ব্যবহৃত হয়েছে খুব কম - জানা গেছে, নিজের জন্য সংরক্ষিত কর্ড ব্লাডের নমুনা দিয়ে চিকিৎসা হচ্ছে এমন রোগীর সংখ্যা নিতান্তই কম। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সেটি হল ২,৭০০ থেকে ২,০০,০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জনের।
- স্টেম সেল সবসময় ব্যবহারযোগ্য নয় - বেশ কিছু রোগে স্টেম সেল ব্যবহার করা যায় না। যেমন, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না কারণ সেক্ষেত্রে স্টেম সেলেও ক্যান্সারের কোষ থাকার ঝুঁকি থেকে যায়।
- প্রয়োজনের তুলনায় স্টেম সেল কম থাকে - বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার জন্য মজুত নমুনার পরিমাণ চিকিৎসার প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হয় না কারণ, প্রতিটি কর্ডে খুব বেশী স্টেম সেল থাকে না। বোন ম্যারো অথবা পেরিফেরাল ব্লাড এর সঙ্গে তুলনা করলে অনেক সুযোগ থাকে, কিন্তু রক্ত এবং বোন ম্যারো তৈরি করতে যে স্টেম সেল আসলে স্থাপন করা দরকার সেটা করতে পারেনা। গোটা বিষয়টিকে অনেক বড় একটা বাগানে অল্প বীজ ছড়ানোর মতো বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কখনও কখনও যা কাজে আসে না।
- বংশগত রোগে চিকিৎসা চলে না - বিশেষ কিছু ক্ষেত্র যেমন, ইনহেরিটেড হেমাটোলজিক, ইমিউনোলজিক, জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা ম্যালিগন্যান্সিতে নিজের স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। কারণ এতে আবার সেই রোগ হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। এক্ষেত্রে আত্মীয়দের বোন ম্যারো ভালো বিকল্প হলেও নিজের স্টেম সেল ব্যবহার যোগ্য নয়।
- আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিকস-এর ঘোষণা - আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পিডিয়াট্রিকস এক কদম এগিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, এখনও তেমন কোনও গবেষণা নেই যাতে প্রমাণ করা যায় যে দাতার স্টেম সেল থেকে নিজস্ব স্টেম সেল ব্যবহার করা বেশি লাভজনক। তাদের মতে – 'বায়োলজিক্যাল

#

ইনস্যুরেন্স' হিসেবে কর্ড ব্লাডের প্রাইভেট মজুত ততক্ষণ পর্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও পারিবারিক সদস্যের স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন – এর সাম্প্রতিক প্রয়োজনীয়তা কিংবা বাস্তবিক চাহিদা থাকে।

- পাবলিক ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকেও চিকিৎসা হতে পারে - আপনি যদি ঠিক করেন যে সন্তানের কর্ড ব্লাড আদৌ সংরক্ষণ করবেন না, তাহলে পরবর্তীকালে কোনও রোগ হলেও এমন ভাববেন না যে আপনি ভুল করে ফেলেছেন। মনে রাখবেন, ম্যাচিং ডোনারের শরীর থেকে বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন এখনও একটি বিকল্প। তাছাড়া পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাংক থেকে ম্যাচিং কর্ড ব্লাডও পাওয়া যেতে পারে। আর তাই এখনও অবধি পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কের সঙ্গে ডাক্তারি মহলের সেই অর্থে কোনও বিরোধিতা নেই।
- বুঝে সিদ্ধান্ত নিন - এই বিষয়গুলি ভাল করে বুঝুন। আর তা হলেই ভয় বা ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনাকে ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না।

হয়রানির উদাহরণঃ

আমেরিকার নিউইয়র্ক স্থিত লং আইল্যান্ডের দম্পতি ট্রেসি ও ভিক্টর ডোনেস বেশ কিছুদিন আগে একটি প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মিথ্যে বিজ্ঞাপন এবং উপভোক্তাদের প্রতারণা করার জন্য মামলা করেন। আদালত তাঁদের পক্ষেই রায় দেয়।

যা হয়েছিল - সন্তান জন্মের পরিকল্পনা চলাকালীন ওই নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন দেখে তাঁরা সেখানে বাচ্চাটির কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করবেন এমন স্থির করেন। নিয়মমাফিক টাকা জমা ও অন্যান্য কাজকর্ম করে তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে কর্ড ব্লাড জমাও রাখেন। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তবে সমস্যার সূত্রপাত হয় বাচ্চার চার মাস বয়স হলে। ওই সময় বাচ্চাটির অস্টিওপোরেসিস রোগ ধরা পড়ে। এটি এমন একটি মারাত্মক রোগ যাতে হাড় গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। রোগটি দুরারোগ্যও বটে।

যা জানলেন - ভীত ট্রেসি ও ভিক্টর চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে গিয়ে জানতে পারেন রোগ সারানোর একটি মাত্র উপায়ই আছে। যদি বাচ্চাটির শরীরে স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে বাচ্চাটি সেরে উঠতে পারে। যেহেতু ডোনেস দম্পতির সন্তানের কর্ড ব্লাড প্রাইভেট ব্যাঙ্কে রাখা ছিল তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত চিত্তে সেই ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে গেলেন। তবে তাঁদের জন্য সেখানে হতাশা আর বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। ব্যাঙ্কে গিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন, তাঁদের বাচ্চার স্টেম সেল তার নিজের শরীরে ব্যবহার যোগ্য নয় কারণ, ওই সেলগুলিতে সেই বংশগত বিশৃঙ্খলা আছে যা থেকে বাচ্চাটির অস্টিওপোরেসিস হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল ব্যাঙ্কের দেওয়া বিজ্ঞাপনে কিন্তু এই ধরনের ঝুঁকির কোনও উল্লেখ ছিল না। সেখানে যা লেখা ছিল তা সবই ভাল ভাল কথা।

যা হচ্ছে - এটা সত্যি যে, গবেষণার মাধ্যমে এই চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক যুগান্তকারী আবিস্কার করা গেছে কিন্তু প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি এটা নিয়ে একটু বেশি আশার কথাই শুনিয়ে ফেলে। যার কোনও সঠিক তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি

#

সেটাকেও ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেয়। তাতে ডোনেস দম্পতির মতো অনেকেই বিভ্রান্ত হন। তাছাড়া অনেক কথা গোপনও রাখে যা স্বচ্ছ ব্যবসার পরিপন্থী।

সতর্ক করেছে যারা - তবে শুধু ডোনেস দম্পতি নয়, নিজেদের ব্যবসায়ীক স্বার্থের খাতিরে প্রাইভেট কর্ড ব্লাডের নানা ধরনের ভিত্তিহীন দাবী নিয়ে মুখ খুলেছে আমেরিকান কলেজ অফ অবস্ট্রেটেশিয়ানস অ্যান্ড গাইনকলোজিস্ট (এ সি ও জি) এবং আমেরিকা অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকস (এ এ পি)-ও। ১৯৯০ সালেই রীতিমতো বিবৃতি প্রকাশ করে এই ধরনের লাভজনক ব্যাঙ্কের বাজারি কৌশলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে এই দুই সংস্থা।

পরামর্শ - তারা সাধারণ মানুষদের এই পরামর্শ দিয়েছে যে, যদি কেউ সন্তানের কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করতেই চায় তাহলে তা যেন পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কে রাখেন। সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে রাখা এই কর্ড ব্লাড অন্য যে-কারও উপকারে আসতে পারে। বানিজ্যিকভাবে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ যে করাটা যে বৈধ নয় তা স্বীকার করে নিয়েছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংগঠনও।

নিষিদ্ধ অনেক দেশেই - গোটা বিশ্বের নিরিখে অন্য অনেক দেশের বহু সংস্থাও এই নিয়ে সরব হয়েছে। এই ধরনের ব্যাঙ্ক যে বিশেষ পরিষেবা বিক্রি করছে তা সত্যিই ভবিষ্যতে কতটা কার্যকরী তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইটালি ও ফ্রান্সে প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ইউরোপের কয়েকটি দেশেও প্রাইভেট ব্যাঙ্কে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণকে নিরুৎসাহ করা হয়।

আমাদের দেশেঃ

সারা পৃথিবীর ১৪২টি পাবলিক কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কের মাত্র ৩টি আছে আমাদের দেশে। অথচ ২৫টি প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে ৭টি শুধু ভারতবর্ষে গজিয়ে উঠেছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ব্যবসায়ী মহল এই ধরনের প্রাইভেট ব্যাঙ্ক স্থাপনে কতটা আগ্রহী। বিশ্বের বহু মানুষ পাবলিক ব্যাংকে কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ করতে চান, তবে বিজ্ঞাপনের কল্যাণে এবং কিছু অসাধু চিকিৎসকের দোষে বর্তমানে প্রাইভেট ব্যাঙ্কেরই রমরমা বেশি।

ভেবে দেখুন ভাল করেঃ

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যত অভিভাবকদের কর্ড ব্লাড সংরক্ষণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে ওপরের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার করতে পেরেছি যে, কর্ড ব্লাড সংরক্ষণ কিছু পরিবারের পক্ষে জীবনদায়ী হলেও সবার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে প্রদান করবে এমন নয়। অনেকে বলেন, গবেষণা যখন চলছে তখন এমন দিন আসতেই পারে যেদিন কর্ড ব্লাড অপরিহার্য হবে। তখন মাথা খুঁড়লেও এটি মিলবে না কারণ, জন্মমুহূর্তে সংগ্রহ করতে না পারলে এই রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। কথাটা অযৌক্তিক নয়, তবে প্রশ্ন হল, যা আজও সম্ভাবনা, সেই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্য আজ থেকেই এত খরচ করা কতটা যুক্তিযুক্ত? আজ সন্তানপালনই যেখানে ব্যয়বহুল, সেখানে বিপুল এই খরচের পরেও নিয়মিত মাসে মাসে প্রাইভেট কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্কের সংরক্ষণ বাবদ অর্থ খরচ করাটা কি নিরর্থক নয়! বরং সদ্যোজাতের কর্ড ব্লাড পাবলিক ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করুন। এতে সামাজিক দায়বদ্ধতারও প্রকাশ ঘটবে। সত্যিই যাদের স্টেম সেল প্রয়োজন তাঁরা

এই সুবিধে নিতে পারেন। তাই পাবলিক ব্লাড ব্যাঙ্কে কর্ড ব্লাড রাখলে এতে সামাজিক দায়বদ্ধতারও প্রকাশ ঘটে। প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমালোচনার বিষয়টি হল প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলিতে যে শিশুটির কর্ড ব্লাড রাখা হল সেটি যদি তার কাজেও না লাগে তাহলেও সেটি তার পরিবার ছাড়া অন্য কারও কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

আমাদের দেশে যেমন বলা হচ্ছেঃ

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি প্রকাশিত 'ন্যাশনাল গাইডলাইনস ফর স্টেম সেল রিসার্চ'-এর ভূমিকায় জানানো হয়েছে - "... স্টেম সেল গবেষণার ক্ষেত্রটি এখনও কৈশোরে। মাত্র এক দশক আগে হিউম্যান এমব্রায়োনিক স্টেম সেলের সফল পরিশীলন এবং চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হয়েছে। তার পর থেকে স্টেম সেলের মৌলিক জীবতত্ত্ব ও তাদের বিভিন্ন কোষঘটিত চারিত্রিক বৈশিষ্টের পার্থক্য নিয়ে যে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তা ঠিক, তবে পুনরুৎপাদনশীল বা রিজেনারেটিভ চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুত ক্ষমতা প্রদানকারী যুগে প্রবেশ করার জন্য এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে। .. এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই স্টেম সেলের চিকিৎসাবিদ্যাগত কার্যক্ষমতার সুরক্ষিত ও নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু ক্লিনিক দুর্ভাগা রোগীদের অসমর্থিত স্টেম সেল চিকিৎসার পরিষেবা প্রদানের কথা বলে প্রতারণা করছে। এই ধরনের প্রতারণা জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করা উচিত ..।"

কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল নির্দেশিকার শিরোনাম থেকে 'থেরাপি' শব্দটাকে বাদ দেওয়া। স্টেম সেল যে এখনও চিকিৎসা পরিষেবার নির্দিষ্ট মানদণ্ডের অংশ হয়ে ওঠেনি সেটাকে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল এই সুপারিশ প্রস্তুতির সবচেয়ে বড় কারণ। সুতরাং, চিকিৎসার কার্যকারিতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হলে কোনও নির্দেশিকা থাকতে পারে না। তাই নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিন।

(লেখাটি কলকাতার এক প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সুপ্রজননবিদের পরামর্শে তৈরি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত লেখাটি পুনঃসম্পাদিত ও পরিমার্জিত।)

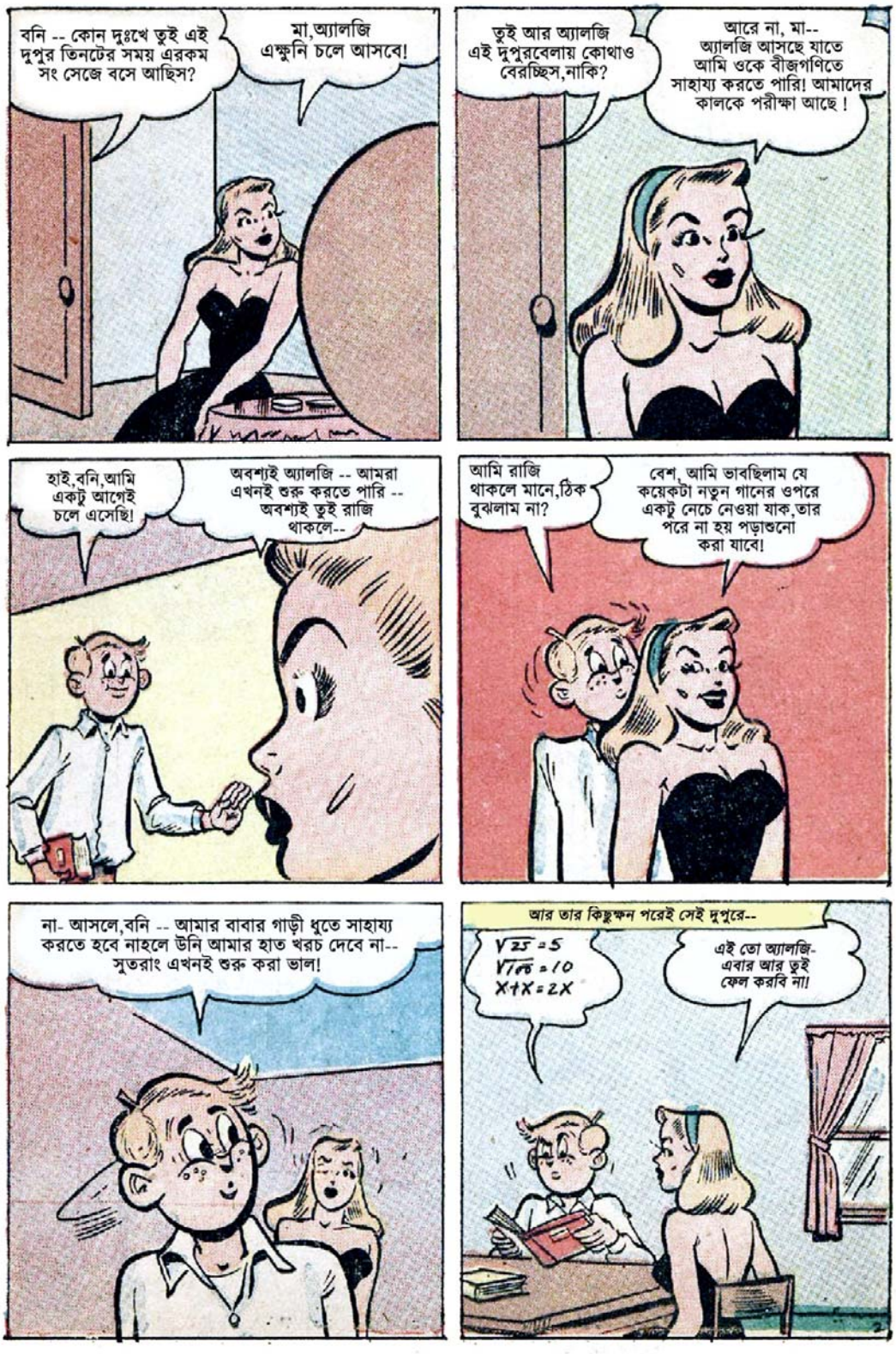
লেখক পরিচিতি

কৌশিক রায় - ভারতীয় রেলের চাকুরে। অবসরে ফ্রি-ল্যানস্ সাংবাদিকতা। দু'টি পত্রিকার সম্পাদনা সহযোগী – 'আজকাল সুস্থ' ও 'আজকাল সফর'। ছাত্রজীবনে প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা 'মুজনাই'। বিভিন্ন ছোট পত্রিকা-সহ 'আনন্দবাজার', 'প্রতিদিন', 'ওভারল্যান্ড' এবং অবশ্যই 'আজকাল' পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ভাল লাগে গান, বেড়ানো, ছবি তোলা, বই কেনা ও আত্মজ পাবলোকে আজও বই পড়ে শোনাতে।

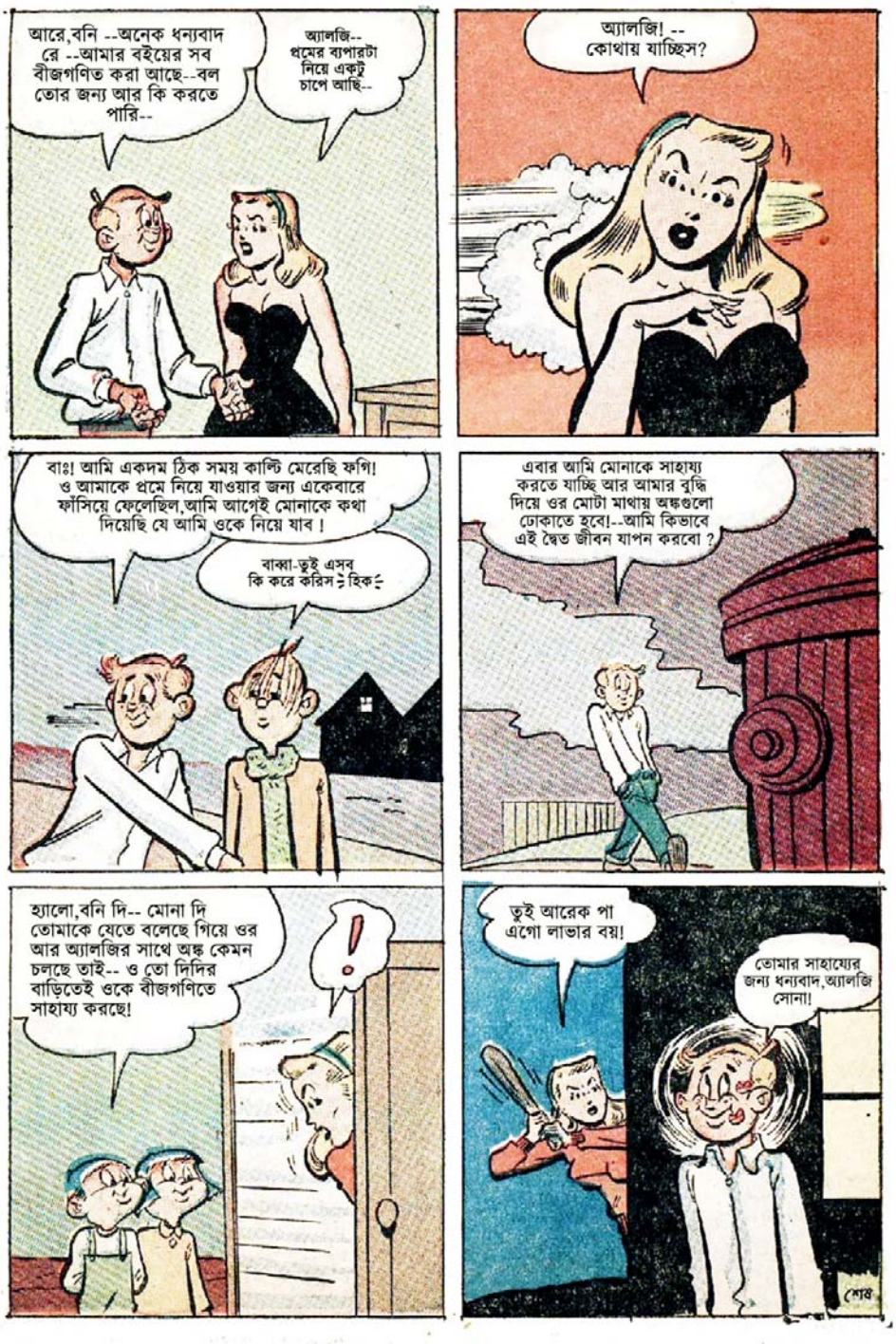
#


অ্যালার্জি
উভয় সঙ্কট
বনি আমি তোমাকে তোমার বীজগণিতের হোমওয়ার্ক গুলো সুন্দরভাবে করার জন্য অভিনন্দন জানাই- সামনের পরীক্ষার জন্য তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকো!
তুই কিভাবে পরিক্ষায় পাশ করবি,কিছু ভাবলি অ্যালজি?
চিন্তা করিস না আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে বনি তো বেশ স্মার্ট -- তাই আমি আজ দুপুরে ওর বাড়ি যাবো আর ওর কাছ থেকে বীজগণিত গুলো দেখে নেব !
বেশ তবে ও যেন না জানতে পারে যে তুই মোনাকে কথা দিয়েছিস যে আজকে ওকে বীজগণিতে সাহায্য করবি !
এই অ্যালজি ! -- আমি তোকে অবশ্যই সাহায্য করবো আর দুপুরে কেন তুই এক্ষুনি চলে আয় না !

#


বনি -- কোন দুঃখে তুই এই দুপুর তিনটের সময় এরকম সং সেজে বসে আছিস?
মা,অ্যালজি এক্ষুনি চলে আসবে!
তুই আর অ্যালজি এই দুপুরবেলায় কোথাও বেরচ্ছিস,নাকি?
আরে না, মা-- অ্যালজি আসছে যাতে আমি ওকে বীজগণিতে সাহায্য করতে পারি! আমাদের কালকে পরীক্ষা আছে !
হাই,বনি,আমি একটু আগেই চলে এসেছি!
অবশ্যই অ্যালজি -- আমরা এখনই শুরু করতে পারি -- অবশ্যই তুই রাজি থাকলে--
আমি রাজি থাকলে মানে,ঠিক বুঝলাম না?
বেশ, আমি ভাবছিলাম যে কয়েকটা নতুন গানের ওপরে একটু নেচে নেওয়া যাক,তার পরে না হয় পড়াশুনো করা যাবে!
না- আসলে,বনি -- আমার বাবার গাড়ী ধুতে সাহায্য করতে হবে নাহলে উনি আমার হাত খরচ দেবে না-- সুতরাং এখনই শুরু করা ভাল!
আর তার কিছুক্ষন পরেই সেই দুপুরে--
$\sqrt{25}=5$
$\sqrt{100}=10$
$X+X=2X$
এই তো অ্যালজি- এবার আর তুই ফেল করবি না!

#



লেখক পরিচিতি

অ্যানিমেশানে স্নাতক রূপক ঘোষ পেশায় একজন কম্পিউটার গ্রাফিক আর্টিস্ট এবং CG আর্টিস্ট হিসাবেই কাজ করেছেন বেশ কিছু বাংলা ও হিন্দি সিনেমাতে। কমিক্স পাগল এই ছেলেটির অবসর কাটে অবশ্যই নানা ধরনের কমিক্স পড়ে ও সিনেমা দেখে। এছাড়া ছবি আঁকা, বিভিন্ন কমিক্স অনুবাদ, পুরনো কমিক্স সংগ্রহ করা আর ছোটোখাটো গল্প লেখা এইসব নিয়েই সারাক্ষন মেতে থাকতে পছন্দ করে সে।

#

একটু গল্প একটু রান্না

চুপি গুপ্তা

টুকটাকঃ

দুপুরের বা রাতের খাবার করা যতটা সহজ, এই জলখাবার বা বিশেষতঃ "টুকটাক" খাবারের আইডিয়া ততটাই জটিল। আমার গৃহকর্তা বিকেল থেকেই অন্তত কুড়িবার ফ্রিজ খুলে বিশেষ টুকটাক খাবারের খোঁজ করেন; আর এই খোঁজ চলে মাঝরাত অবধি। সত্যি কথা বলতে "টুকটাক" খাবার তেমন কিছু বানানো হয় না। ফ্রিজের মাথায় সার বেঁধে যে কৌটোগুলো রাখা থাকে, যেমন চিপস, বাদাম ভাজা, ওয়েফার বিস্কুট, নারকোল নাড়ু - এগুলোই কাজ চালাবার মতো টুকটাক, কিন্তু মনের মতো নয়। মনের মতো টুকটাক খাবারের সংজ্ঞাও ভারী জটিল - হাল্কা অথচ সুস্বাদু; ভাজা নয় অথচ সেদ্ধও নয়; একটু অন্যরকম। বৃহস্পতিবার একটু সাহস সঞ্চয় করেই বানিয়ে ফেললাম এক চাইনীজ জলখাবার। মোমো বা ডাম্পলিঙের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে "স্টীমড বান" খুব একটা নতুন নয়। জলখাবার ও মিডনাইট স্ন্যাক হিসেবে আদর্শ। গরম গরম খেতে খুব ভাল লাগবে, যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাইক্রোওয়েভে ১৫-২০ সেকেন্ড গরম করলেই টাটকা তাজা হয়ে যাবে।

স্টীমড্ বান তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে ১ টা বড় বাটিতে ২ কাপ (১ কাপ = ২৫০ মি.লি.) ময়দা ও ১/২ কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে ২ ১/২ টেবল চামচ অ্যাকটিভ ড্রাই ঈস্ট, ৪ টেবল চামচ চিনি, ২ টেবল চামচ সাদা তেল ও প্রয়োজন মতো ঈষদুষ্ণ (১২০-১৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) দুধ দিয়ে নরম করে মায়দা মেখে বাটিটা ভেজা মোটা কাপড় ঢাকা দিয়ে দাও। এবার এর ওপর একটা টাইট ঢাকনা দিয়ে কোনো গরম জায়গায় রেখে দাও, যেমন রান্না ঘর বা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে প্রী-হীট করা আভেনের ভেতর। ২.৩০-৩.০০ ঘন্টার জন্য মাখা ময়দাটা রেখে দাও। আড়াই-তিন ঘন্টা পর যখন ঢাকা খুলবে, দেখবে মাখা ময়দা ফুলে দ্বিগুন হয়ে গেছে।

পুরের জন্যঃ ১ কাপ (২৫০ মি.লি.) চিকেন ব্রেস্টের মিহি কিমা, ১/২ চা চামচ আজিনামোটো, ৪ টেবল চামচ অয়েস্টার সস, ১ টেবল চামচ আদা কুচি, ১ টেবল চামচ রসুন কুচি, ১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১/২ চা চামচ ডার্ক সয়া সস, ১ চা চামচ চিনির গুঁড়ো, ১ চা চামচ সাদা মরিচের গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন - একটা বাটিতে এই সমস্ত উপকরণ একত্র করে ভাল করে মেখে নাও। তারপর ১ টেবল চামচ সাদা তেল দিয়ে আবার ভাল করে মেখে নাও। ম্যারিনেট করার দরকার নেই, ম্যারিনেট করলেই জল ছাড়বে। পুর বেশ শুকনো শুকনো হবে, খুব রসালো হবে না। পুর তৈরী করেই খোলে ভরে ফেলতে হবে।

#

এখন মাখা ময়াদার তালটা নিয়ে ভাল করে মাখতে হবে, যাতে ভেতরে জমে থাকা হাওয়া সব বেরিয়ে যায়। এবার আন্দাজ মতো নুন দিয়ে আবার ভাল করে মেখে নিয়ে ছোট ছোট লেচি কেটে নাও। মাখার সুবিধের জন্য ময়দা বা সামান্য তেল ব্যবহার করতে পারো। ছোট ছোট লেচিগুলো একটি বেলে নিয়ে ভেতরে চিকেনের কাঁচা পুর ভরে লেচির মুখ একটু জল দিয়ে চেপে বন্ধ করে দাও। এভাবে সব লেচিগুলোর ভেতরে পুর ভরে বন্ধ করে ডাম্পলিংগুলোর ওপরে একটু তেল মাখিয়ে রেখে দাও। স্টীমারে জল বসিয়ে তার ওপর জালি রাখো। জালিটার গায়ে আগে থেকে একটু তেল মাখিয়ে রাখবে। এই ডাম্পলিংগুলো জালির ওপর একটু জায়গা ছেড়ে ছেড়ে বসিয়ে দাও, কারণ এগুলো ফুলে দ্বিগুন হয়ে যাবে। স্টীমার ঢাকা দিয়ে জোর আঁচে বসিয়ে দাও। যখন স্টীমারের ওপর থেকে ধোঁয়া ছাড়বে, অর্থাৎ জল বেশ টগবগ করে ফুটছে, তখন থেকে ৪৫-৫০ মিনিট স্টীম করবে। আঁচ একদম কমাবে না। ৫০ মিনিট হয়ে গেলে স্টীমারের ঢাকা খুলে দাও, ডাম্পলিং বসানো জালিটা বাইরে এনে একটু ঠাণ্ডা করে একে একে গরম গরম ডাম্পলিংগুলো তুলে প্লেটে রেখে দাও। খুব গরম অবস্থায় ডাম্পলিংগুলো তুললে ভেঙে যাবে, তাই একটু ঠাণ্ডা করে তুলো। গরম গরম ডাম্পলিং হট-সুইট সস বা সুইট-সাওয়ার সস দিয়ে পরিবেশন করো। ইডলী স্ট্যান্ডেও এই বানগুলো বানানো যায়। উপাদানের পরিমাণ স্বাদের তারতম্য অনুযায়ী পরিবর্তন করতে পারো।

পুর বেশী থাকলে একটু ডিমের গোলা দিয়ে মেখে গোল গোল করে প্যাটির মতো গড়ে নাও। তারপর সাদা তেলে মিডিয়াম-লো হীটে শ্যালো ফ্রাই করে সস সহযোগে গরম গরম খেয়ে নাও।

চাইনীজ রান্নায় টুকটাকের কথা বলতে গেলে মনে পড়লো ঝাল নুডলসের কথা। স্বাদে একটু ঝাল, বা ঐ চটপটা বলতে যা বোঝায়। গৃহকর্তা ঝাল ঝাল করেও দেখলুম কড়াই থেকে তুলে তুলে খাচ্ছে। বুঝলুম, ঝাল হলেও ভালোই হয়েছে খেতে। তাই এই রান্নার কথাটাও জুড়ে দিলুম।



স্টীমড্ বান

ফটাফট চিলি গার্লিক নুডলসঃ

চিলি গার্লিক নুডলসের আসল ফ্লেভারিং এজেন্ট হল তেল। আর এই তেলটা আগে থেকেও বানিয়ে রাখা যায়। ১ কাপ (২৫০ মি.লি.) সাদা তেলে ১৫-২০ টা গোটা লাল শুকনো লঙ্কা ও ২০ কোয়া রসুন একটু কেটে আধখানা করে ঢিমে আঁচে বসিয়ে রাখো। মনে রাখবে লঙ্কাগুলো খুব লাল হওয়া চাই, না হলে তেলে রং আসবে না। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে এটা ঢিমে আঁচে থাকতে থাকতে দেখবে তেলের রং আস্তে আস্তে বদলে গেছে ও রসুনের গন্ধ ছাড়ছে। লঙ্কাগুলোও বেশ কালচে হয়ে গেছে। এবার আঁচ নিভিয়ে তেলটা ভাল করে ঠাণ্ডা করে নাও। তারপর, কোনো শুকনো এয়ার টাইট শিশিতে তেলটা ভরে রাখো।

নুডলস বানাতে গেলে নুডলসটা একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে নাও। পুরো সেদ্ধ করার দরকার নেই, এতে নুডলস গলে যাবে। তারপর জল ঝরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে নুডলসগুলো ধুয়ে বড় ছাঁকনিতে রেখে ভাল করে জল ঝরিয়ে নাও। কড়াইতে চিলি-গার্লিক অয়েল গরম তেলটা কড়াইয়ের গায়ে ভাল করে মাখিয়ে নাও। এবার এতে সরু লম্বা করে কাটা গাজর, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম দিয়ে জোর আঁচে ১ মিনিট নেড়েই নুডলসটা দাও। এবার একটু আজিনা মোটো, সামান্য চিনি ও স্বাদ মতো নুন দিয়ে ভাল করে ১ মিনিট টস করে নামিয়ে নাও। সব্জী খুব বেশী দেবে না, অল্পই দেবে। তেলও খুব বেশী দিও না, ঝাল হয়ে যাবে। রান্নার সময় সমস্ত উপকরান হাতের কাছে রাখবে, এইটা চাইনীজ রান্নার একটা বড় বৈশিষ্ট্য, কারণ জোর আঁচে চাইনীজ রান্না করতে হয়, উপকরণ খুঁজতে গেলে রান্না পুড়ে যাবে।

মুখোরোচক ডিনারঃ

আমাদের পাশের বাড়ীতে এক বাচ্চা এসেছিল। উচ্চতায় খুবই ছোট, মাঝে মাঝে একটু একটু হাসে, গুড়গুড় করে হাঁটে, জানলার পর্দা সরিয়ে দেখে কে এলো আর কে গেল। তার বিশেষ কৌতুহল আমাদের পোষ্যটিকে নিয়ে। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু না, বেশীরভাগ বাচ্চারাই একই দলে পড়ে। গৃহকর্তা চান এমন একটা খাবার তাদের খাওয়াতে, যেটা বাচ্চাটিরও ভাল লাগবে। এই খাবারটির টার্কিশ নাম পিডে, কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে ফাতেয়ার হিসেবেও বিক্রী হয়।

পিডে বানাবার পদ্ধতিঃ

স্টীমড বানের জন্য যেভাবে ময়দা মাখতে শিখিয়েছি, ঠিক সেই ভাবেই পিডে বা যেকোনো রকম নরম পাঁউরুটির জন্য ময়দা মাখতে হয়। তবে পিডের খোল একটু শক্ত তাই এতে দুধ বা খুব বেশী তেল দেওয়া যাবে না এবং কর্নফ্লাওয়ারও দিতে নেই।

প্রথমে ১ টা বড় বাটিতে ২ কাপ (১ কাপ = ২৫০ মি.লি.) ময়দা ও ২ টেবল চামচ অ্যাকটিভ ড্রাই ঈস্ট, ৩ টেবল চামচ চিনি, ১ টেবল চামচ সাদা তেল ও প্রয়োজন মতো ঈষদুষ্ণ (১২০-১৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) জল দিয়ে নরম করে ময়দা মেখে বাটিটা ভেজা মোটা কাপড় ঢাকা দিয়ে দাও। এবার এর ওপর একটা টাইট ঢাকনা দিয়ে কোনো গরম জায়গায় রেখে দাও, যেমন রান্নাঘর বা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে প্রীহীট করা আভেনের ভেতর। ২ ঘন্টার জন্য মাখা ময়দাটা রেখে দাও।

#

পুর তৈরীর জন্যঃ

কড়াইতে খুব সামান্য সাদা তেল গরম করে ৩ টেবল চামচ রসুন কুচি হাল্কা করে ভেজে নাও। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে, ১/২ কাপ পেঁয়াজের কুচি দিয়ে হাল্কা করে ভেজে নাও। ২ কাপ মাটনের মিহি কিমা দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাল করে নেড়ে কষতে থাকো। এবার এতে একে একে ১ টাবল চামচ শুঁঠ পাউডার বা শুকনো আদার গুঁড়ো (না থাকলে আদা বাটা), ১ ১/২ চা চামচ জীরের গুঁড়ো, ১ ১/২ চা চামচ ধনের গুঁড়ো, ১ চা চামচ শুকনো লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ৩ টেবল চামচ টমেটো পেস্ট (না থাকলে ১ টা বড় টমেটো বেটে নাও), স্বাদ মতো নুন ও ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দাও। মাঝারি আঁচে সমস্ত উপকরণ নেড়ে ভাল করে মিশিয়ে নাও। ইচ্ছে হলে এই সময় একমুঠো গাজরের কুচিও দিতে পারো, না থাকলে ছেড়ে দাও। কিমার জল শুকিয়ে এলে ১ কাপ তাজা পার্সলি পাতার কুচি কিমার মধ্যে দিয়ে ভাল করে কষে জল শুকিয়ে নাও। পুর বানাবার সময় একদম জল দেবে না। আঁচ নিভিয়ে পুরটা পাখার নীচে রেখে একেবারে ঠাণ্ডা করে ফেল।



পিডে

মাখা ময়দাটা ২ ঘন্টা পর বের করে ভাল করে ঠেসে মেখে নাও। আন্দাজ মতো নুন ও সামান্য তেল দিয়ে মাখবে। সুবিধের জন্য একটু ময়দাও মিশিয়ে নিতে পারো। এবার মাখা ময়দার তাল থেকে মাঝারি মাপের লেচি কেটে লম্বা জিভের মতো করে বেলে নাও। খুব পাতলা করে বেলবে না, তাহলে পুর ভরার পর তুলতে পারবে না। একটু মোটা করে বেলবে। বেলা লেচির মাঝখানে পুর দাও, ধার থেকে ১/২ ইঞ্চি মতো ছেড়ে মাঝ বরাবর পুরটা ভরবে। বেলা লেচির ধারগুলো নৌকোর আকৃতিতে মুড়ে নাও। পিডের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, কেমন ভাবে মুড়তে হবে। মোড়া ধারগুলোর ওপর সামান্য ডিমের গোলা ব্রাশ করে দাও, যাচে বেকিংয়ের পরে লাল হয়ে যায়। ওপর থেকে একটু সাদা তিল ছড়িয়ে দাও। ময়দা থেকে এক একটা লেচি কাটার সময় বাকি ময়দা ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে বা এয়ারটাইট কৌটে

ভারে রাখবে, না হলে ময়দা শুকিয়ে যাবে। এবার একটা বড় বেকিং ট্রে-তে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বিছিয়ে তার ওপর একটু তেল মাখিয়ে গ্রীজ করে রাখ। ফয়েলের চকচকে দিক ওপরে থাকবে। এবার এক একটা পিডে গড়ে নিয়ে ফয়েলের ওপরে রাখ। একটু ছেড়ে ছেড়ে রাখবে, তাহলে পিডে ভাল ভাবে বেকড হবে; গাদাগাদি করে দেবে না। ১৯০-২০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে আভেন প্রীহীট করে পিডেগুলো ২০-৩০ মিনিট মতো বেক করে নাও। পিজ্জা প্যানেও বেক করতে পারো, তাতে আরও ভাল হবে। পিডে চৌকো, তিনকোনা নানান আকৃতিতে বানানো যায়। ইচ্ছে হলে গরম পিডের ওপরে একটু চীজ কুরেও ছড়িয়ে দিতে পারো। পিডে সাধারণত ল্যাম্ মীট দিয়েই বানায়, না পেলে পাঁঠার কিমা দিলেও হবে। যদি একান্তই কেউ রেডমীট না খেতে চায়, চিকেন কিমা দিয়েও পিডে বানানো যেতে পারে।

তাহিনি সস্ দিয়ে পিডে আমার বেশ ভাল লাগে। তাহিনি মানে তিল। তাহিনি সস বানানো খুবই সহজ।

তাহিনা সস বানানোর পদ্ধতিঃ

২ কাপ সাদা তিল নিয়ে ঢিমে আঁচে শুকনো খোলে ৩-৫ মিনিট ভাজতে থাকো। যখন কাঁচা গন্ধটা কেটে যাবে ও তিলগুলোতে হাল্কা খয়েরী রং ধরতে শুরু করবে, আঁচ নিভিয়ে তিলগুলো শুকনো কোনো ছড়ানো পাত্রে ঢেলে একেবারে ঠাণ্ডা করে নাও। মিক্সারে সেঁকা সাদা তিল ও ১/৪ কাপ সাদা তেল বা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে ভাল করে পিষে নাও। এটাকে তাহিনা পেস্ট বলে। পরিষ্কার ও শুকনো কাচের জারে ভরে এই তাহিনা পেস্ট রেখে দিতে পারো, রুটি দিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে।

এবার তাহিনা সস বানাতে গেলে, ১ কাপ এই তাহিনা পেস্ট, ১/৪ কাপ পাতিলেবুর রস, ১ টেবল চামচ রসুন কুচি, ২/৩ কাপ জল, স্বাদ মতো নুন, ২ টেবল চামচ কুচি করা পার্সলি, ১/৩ চা চামস প্যাপরিকা বা কাশ্মীরী লঙ্কার গুঁড়ো - সব একসঙ্গে মিশিয়ে নাও। তাহলেই তাহিনা সস তৈরী হয়ে যাবে।

আমাদের যখন কফি গ্রাইন্ডার ছিল না, সুপার মার্কেট থেকে টিনে করা তাহিনি বা তাহিনা পেস্ট কিনে এনে বাড়িতেই সস বানিয়ে ফেলতুম। টোস্ট করা পাঁউরুটির সঙ্গে খেতেও বেশ ভাল লাগে।

কুলফী ও বোমাতঙ্কঃ

আমাদের বাড়ীতে এক অতিথির আসার কথা ছিল। তখন জুন মাস। মারাত্মক গরমে মরুভূমির অবস্থা অনেকটা কনভেকশন আভেনের মতো। সরাসরি সূয্যিমামার তেজ, তার ওপর বেলা যত বাড়ছে বালি তেতে গিয়ে গরম তত বেড়েই যাচ্ছে। বিকেল ৫.৩০ এও জলে হাত ঠেকানো যাচ্ছে না। এমনই এক সন্ধ্যেতে বৃহস্পতিবার এক অতিথি আসবেন বলে সব ঠিক। মিষ্টি বানানো বড়ই পরিশ্রমসাধ্য, তাই ঠিক করে ছিলাম ২ দিন আগে কুলফী বানিয়ে মিষ্টির শূন্যস্থানটা পূরণ করে দেবো। বৃহস্পতিবার এসে গেল। বুধবার রাত থেকে দেখে আসছি কার পার্কে একটা অন্য গাড়ি। আমাদের আশেপাশে যারা থাকে তাদের জিজ্ঞেস করতে তারাও বলে জানি না। অগত্যা পুলিশে ফোন করা হল। পুলিশ, বম্ স্কোয়াড সব এল; প্রায় বিকেল থেকে রাত অবধি নানান তল্লাশি চলল। সকলকে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরুতে বারণ করল, বাইরের লোক ঢুকতে দেওয়া হল না। দু'টি জার্মান শেপার্ড এসেছিল, তাই বুঝতে পেরে আমাদের পোষ্যটি একটু গলাবাজি করার চেষ্টা

করছিল। অনেক ধমক টমক লাগিয়ে চুপ করালাম। তারপর বুঝলাম গাড়ীটা বাইরের কেউ রেখে গেছিল, যেটা আইনত অনুচিত। কিন্তু সান্ধ্যভোজের সেই কুলফী মালাই আর সেদিন খাওয়া হল না। সেই কুলফী মালাইয়ের রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, এমন সহজ কুলফির রেসিপি আর কোথাও পাবে না।

সহজে কুলফী বানানোর পদ্ধতিঃ

১ ক্যান কনডেন্সড মিল্ক (৩৯৫ গ্রাম), ২ ক্যান কার্ডামম ফ্লেভারের ইভাপোরেটেড মিল্ক (১৬০মি.লি. প্রতিটি ক্যান), ৩০০ গ্রাম ফ্রেশ হেভী ক্রীম, ১/৩ কাপ পেস্তা কুচি, ১/২ চা চামচ কেশরের গুঁড়ো, ২ টেবল চামচ ফুল ক্রীম দুধ (যে হামান-দিস্তেতে কেশর গুঁড়ো করবে, সেটা ২টেবল চামচ দুধ দিয়ে ধুয়ে পরে মিক্সারে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে), ২-৩ স্লাইস সাদা স্যান্ডুইচ ব্রেড (খয়েরী অংশ কেটে বাদ দিয়ে দাও)। ব্রেড গুলোর খয়েরী অংশ বাদিয়ে সাদা অংশ গুলো কুচিয়ে নাও। এবার মিক্সারের জারে কনডেন্সড মিল্ক, ইভাপোরেটেড মিল্ক, ক্রীম, কেশরের গুঁড়ো, হামান দিস্তে দুধ দিয়ে ধোয়ার পর অবশিষ্ট কেশর গোলা দুধ, ব্রেড সব দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করো। এরপর পেস্তা কুচি দিয়ে আরেকবার ব্লেন্ড করে পরিষ্কার ও শুকনো কুলফী মোল্ডে ঢেলে নাও। ১২ টার মতো ছোট ছোট কুলফী হবে। মোল্ডের ঢাকনা টাইট করে এঁটে ২০ ঘন্টা ফ্রীজারে রেখে জমিয়ে নাও। কার্ডামম ফ্লেভারের ইভাপোরেটেড মিল্ক না পেলে ছোট এলাচের গুঁড়ো কুলফীর মিশ্রণে ব্লেন্ড করার সময় মিশিয়ে দাও।



কুলফি মালাই ফালুদা

কুলফীর সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ফালুদা। সিমাইয়ের মতো তবে একটু মোটা ও সাদা। ফালুদা বানাতে গেলে সেও মেকার বা সেও মোল্ড প্রয়োজন। না হলে বানানো আসম্ভব। কুলফী মোল্ডের ভেতরটা একটু সাদা তেল দিয়ে গ্রীজ করে নাও। একটা বড় বাটিতে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল ও বেশ কয়েকটা বরফ রেখে দাও। একটা বাটিতে ১ কাপ কর্নফ্লাওয়ার ও ৩ কাপ জল দিয়ে ভাল করে মেশাও যাতে কোন রকম ডেলা না থাকে। মাঝারি আঁচে কর্নফ্লাওয়ার গোলাটা বসিয়ে ক্রমাগত খুব ভাল করে নাড়তে থাকো যতক্ষণ না ঘন হয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে ও স্বচ্ছ হচ্ছে। তারপর আঁচ নিভিয়ে গরম

মগুটা কুলফী মোল্ডে ঢেলে খুব ছোট ছিদ্রযুক্ত ঝাঝরি আটকে মোল্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরফ জলের মধ্যে ফালুদাগুলো ফেলো। এইভাবে তৈরী ফালুদাগুলো ফ্রিজে ২-৩ দিন ঢাকা দিয়ে রাখতে পারবে।

পরিবেশনের সময় কুলফীর ওপর একটু মালাই (হেভী ক্রীম চিনি দিয়ে একটু ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিলেই মালাই তৈরী) ও ফালুদা বা সেমাই দাও। তার ওপর রুহ আফজাহ্ বা ভালো গোলাপের সিরাপ ঢেলে পরিবেশন কর।

একটু মিষ্টি থাকলে ভালো হতোঃ

রাত বারোটায় হঠাৎ প্রশ্ন "মিষ্টি নেই? একটু মিষ্টি থাকলে ভাল হতো..." এরকম অবস্থায় কি বানাই? বাড়ীতে ডিম, দুধ, চিনি, মাখন, পাঁউরুটি আর সদ্য পেরিয়ে যাওয়া গণপতি পুজোর জন্য কিছু ড্রাই ফ্রুটস ছিল। তাই দিয়েই বানিয়ে ছিলুম ব্রেড পুডিং। খুব সহজ পদ্ধতি। ৪ টে সাদা স্লাইস ব্রেড নিয়ে ধারের খয়েরী অংশগুলো কেটে বাদ দাও। এবার একটু দুধ দিয়ে ব্রেড স্লাইসগুলো ভাল করে মেখে পেস্টের মতো করে নাও। একটা পাত্রে ১ কাপ দুধ, ১/২ কাপ চিনি ও ২ টো ডিম ভাল করে ফেটিয়ে নাও। এবার এতে ঐ পাঁউরুটির পেস্ট ও সামান্য খাবার হলুদ রং (ফুড কালার থাকলে দিও, না হলে বাদ দাও) দিয়ে আবার ভাল করে ফেটিয়ে নাও। বেকিং ট্রে-তে মাখন মাখিয়ে একটু ময়দা দিয়ে সমান ভাবে ডাস্ট করে নাও। পাঁউরুটির মিশ্রণটি বেকিং ট্রে-তে ঢেলে ওপর থেকে ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে দাও। ১৮০ ডীগ্রী সেলসিয়াসে আভেন প্রীহীট করে বেক করে নাও। ২০-২৫ মিনিট পরে একটা কাঠি (শিক কাবাবের শিক বা উডেন স্কিউয়ার) মাঝবরাবর ঢুকিয়ে দেখ, কাঁচা থাকলে কাঠিতে লেগে থাকবে, তৈরী হয়ে গেলে কাঠি পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসবে।



ব্রেড পুডিং

Crème veloutée au poulet et champignons:

এখন যে রান্নাটা শেখাবো, এটা একটা ফ্রেঞ্চ রান্না। মাশরুম ও চিকেন সহযোগে করা হয়। এই রেসিপিটার নাম হল "Crème veloutée au poulet et champignons"। সৌরভ'স প্যাভেলিয়নের শেফ ড্যানিয়েল গোমসের শেখানো। খুব একটা ঝামেলা নেই এই রান্নাটি করতে।

১৫০-২০০ গ্রাম বোনলেস স্কিনলেস চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে ধার থেকে সমান ভাবে কেটে নিতে হবে। প্রথমে বাটার ফ্লাইয়ের মতো করে কেটে তারপর আলাদা করে নিতে হবে। তারপর দু'টি টুকরোকে স্টেক হ্যামার বা ছুরির বাঁট দিয়ে একটু মেরে ফ্ল্যাট করে নিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে, মাংস যেন ছিঁড়ে না যায়। এবার সামান্য নুন ও সাদা মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে চিকেন ব্রেস্টগুলো ১ ঘন্টা ম্যারিনেট করে নিতে হবে। এর পর রান্নাটা দুই ভাবে করা যায়। প্রথম পদ্ধতি হল ম্যারিনেট করা ব্রেস্টগুলোকে চিকেন স্টকে পোচ করে বাকি রান্নাটা করা যায়; দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ম্যারিনেট করা চিকেনের ব্রেস্টগুলো ভেজেও বাকি রান্না করা যায়। কলকাতায় ভেজে রান্না করাটাই বেশী চলে, তাই এখানে সেই পদ্ধতিটাই বলে দিচ্ছি। শুকনো ময়দাতে ম্যারিনেট করা চিকেনের ব্রেস্টগুলো একে একে ডাস্ট করে নিতে হবে। ফ্রাইং প্যান আঁচে বসিয়ে প্রায় ৫০ গ্রাম মতো মাখন গলিয়ে ডাস্ট করা চিকেনের ব্রেস্টগুলো একে একে প্রায় ৫-৬ মিনিট ধরে নিম্ন-মাঝারি আঁচে হাল্কা করে ভেজে নিতে হবে। ভাজার পর চিকেনের গুলো রং লাইট গোল্ডেন ব্রাউন হবে। এবার ঐ প্যানেই ১/২ কাপ চিকেনের স্টক (বা গরম জলে ১ টা চিকেন বুলিয়ন গুলে নিয়ে দেওয়া যায়) দিতে হবে। ঢিমে আঁচে খানিকক্ষণ চিকেনের পিসগুলো সাবধানে উল্টেপাল্টে রান্না করে নেওয়ার পর স্ট যখন ঘন হয়ে আসবে, তখন ৫ টি বাটন মাশরুমের স্লাইস, ১/২ চা চামচ আদা কুচি, ১ চা চামচ পেঁয়াজ কুচি দিতে হবে। আরও কিছুক্ষণ রান্না করে স্টক ঘন করে নিতে হবে। ১ কাপ হোয়াইট সস ও স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিয়ে আবার ৩-৪ মিনিট চিকেনগুলো রান্না করতে হবে। পুরো রান্নাটাই ঢিমে আঁচে হবে। ৫০ গ্রাম ক্রীম দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ক্রীম দেবার পর ৩০ সেকেন্ডের বেশী আঁচে রাখবে না, আর জোর আঁচে ক্রীম দেবার পর গ্রেভী ফোটাবে না, তাহলে ক্রীম কেটে যাবে। সস খুব ঘন বা পাতলা হবে না, মাঝামাঝি হবে। পরিবেশনের সময় প্লেটে চিকেনগুলো তুলে ওপর থেকে সসটা ঢেলে একটু পার্সলি পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।



Crème veloutée au poulet et champignons

ইলিশ কথকতাঃ

আমাদের এখানে সাধারণত দুই ধরনের ইলিশ সারা বছর পাওয়া যায়। একটা হলো বার্মার ইলিশ, আরেকটি হলো পদ্মার ইলিশ। বার্মার ইলিশগুলো একটু ছোট হয়, টেনেটুনে ১ কিলো মত। পদ্মার ইলিশ একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়। আসল ইলিশের স্বাদ পেতে পদ্মার ইলিশের তুলনা হয় না। কিন্তু এই গরমে সর্ষে বাটা হজম করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। ইলিশ মাছে আবার খুব বেশী মশলাও চলে না। তাই বাঙালী মতে সহজপাচ্য ইলিশের পোলাও আমাদের বাড়ীতে বেশ ফেভারিট আইটেম। রান্নাটাও মোটেই ঝামেলার নয়। ১ কাপ চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখ। ৪ পিস ইলিশে গাদা-পেটি ধুয়ে আঁশ ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নুন-হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রাখো। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মাছগুলো খুব হাল্কা করে ভেজে নাও, ভাজার পর মাছের রং একটু গাঢ় হলুদ হবে, এর থেকে বেশী না। ইলিশ বেশী ভাজতে নেই; মোট ১ মিনিট লাগবে দু'পিঠ ভাজতে। ভাজা মাছগুলো সাবধানে তুলে একটা আলাদা পাত্রে রাখ। এবার ঐ ইলিশ ভাজা তেলেই ১ চা চামচ কালোজীরে, ৪-৫ টা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ভেজানো চালের জল ঝরিয়ে কড়াইতে দাও। মাঝারি আঁচে রান্না করবে। এখন এতে একটু হলুদ, কাশ্মীরী লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন দিয়ে একটু নেড়ে ২ কাপ গরম জল দাও। আঁচ বাড়িয়ে দাও। জল খুব ভাল ভাবে ফুটতে শুরু করলে একবার একটু চালটা নেড়ে ভাজা ইলিশের পিসগুলো দিয়ে ভারী ঢাকা টাইট করে দিয়েই আঁচ একেবারে কমিয়ে দাও। ৩০-৩৫ মিনিট এভাবে ঢিমে আঁচে দমে রান্না কর। ভাত তৈরী হয়ে যাবে, মাছও রান্না হয়ে যাবে। এর পর ওপর থেকে কাঁচালঙ্কা আধখানা করে ভেঙে ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন কর।



ইলিশের পোলাও

#

দেশে থাকতে ইলিশের একটা রান্না আমাদের বাড়ীতে হতো। সেটা ইলিশের ঝাল। তবে একটু অন্যরকম। ৪ পিস ইলিশে গাদা-পেটি ধুয়ে আঁশ ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে নুন-হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রাখো। ৫ টেবল চামচ কালো সর্ষে, ৫ টেবল চামচ সাদা সর্ষে, ৫ টা কাঁচালঙ্কা একটু নুন দিয়ে মিহি করে বেটে নাও। এবার এর সঙ্গে ১ কাপ ঘন টক দই মিশিয়ে ফেটিয়ে নাও। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে এই সর্ষে বাটার মিশ্রণটা দাও, ভাল ভাবে ফুটতে শুরু করলে ইলিশের টুকরোগুলো দিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট ঢিমে আঁচে রান্না কর। ১০ মিনিট পর ইলিশগুলো উল্টে আবার ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট রান্না কর। ওপর থেকে কাঁচা সর্ষের তেল ও কাঁচালঙ্কা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন কর।

টিফিনের চিন্তাঃ

আমাদের এদিকে অফিস শুরু হয় ভোর সাড়ে ছ'টায়, আর ছুটি হয় দুপুর আড়াইটেতে। যাদের দু'টো শিফ্টে কাজ, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু অত ভোর বেলা উঠে টিফিন বানানো অসম্ভব। তাই আগের দিন রাত্তিরেই টিফিনের পর্বটা শেষ করে রাখি। জুন, জুলাই, অগাস্ট, আর সেপ্টেম্বরের কিছুটা - এই ক'দিন ভীষণ গরম থাকে। স্যালাড বা টক দই খাওয়া সব থেকে ভাল। কিন্তু টিফিন এমন দিতে হবে, যাতে অন্তত আড়াইটে অবধি ক্ষিদে না পায়। পুষ্টিকর ও হাল্কা একটা স্যালাডের রেসিপি দিচ্ছি, যাতে ক্ষিদেও পায় কম। একটা বাটিতে ১ মুঠো ভাত নাও, তার সঙ্গে ২ মুঠো লেটুস পাতার কুচি, ২ মুঠো শশা কুচি, ১ মুঠো বাদাম ভাজা, ১ মুঠো সেদ্ধ করা চিকেনের কুচি বা সসেজ কুচি বা ডিম সেদ্ধ কুচি দিয়ে ভাল করে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নাও। সামান্য নুন, গোল মরিচের গুঁড়ো দাও। এবার ২ টেবল চামচ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে আবার সব ভাল করে মিশিয়ে নাও। তৈরী হয়ে গেল ভাতের স্যালাড। ভাত যারা খায় না কুসকুস বা দালিয়া দিয়েও এরকম স্যালাড করা যায়।



রাইস স্যালাড

#

আজ সকালবেলা বেরোবার কথা ছিল। অনেক দূর যেতে হবে। প্রায় ১২৫ কি.মি। তবে এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে যাবার জন্য এক ঘন্টা বা সোয়া ঘন্টাতেই গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এখানে সকলেই বাড়ীতে অনেক সসেজ কিনে রাখে। কারণ বড় সুপার মার্কেট প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। কাছাকাছি যে সুপার মার্কেট আছে, তাতে অনেক সময় খালি আলমারীতেই তালা চাবি দিয়ে রাখতে দেখা যায়। আজকে চটজলদি যে জলখাবারটা বানালুম, তার বিবরণটা দিয়ে দিই। হয়তো কোনোদিন কাজে লেগে যেতে পারে।

সসেজ (ফ্র্যাঙ্কফুর্টার) ডিফ্রস্ট করে গরম জলে ১০ মিনিট ভিজিয়ে তুলে নাও। তারপর সসেজের গায়ে লেগে থাকা জল ন্যাপকিন দিয়ে মুছে ফেল। যতগুলো সসেজ নেবে, ততগুলোই স্যান্ডুইচ ব্রেডের স্লাইস নেবে। একটা স্যান্ডুইচ ব্রেড নিয়ে ধারের খয়েরী অংশগুলো কেটে বেলনের সাহায্যে চেপে বেলে নাও, দেখবে ছোট চৌকো রুটির মতো হয়ে গেছে। এবার এর মাঝখানে অর্ধেক স্লাইস চীজ ও একটা সসেজ রেখে রোল করে নাও। এভাবে সব রোলগুলি গড়ে নাও। রোলের জোড়া দিকটা একটু চেপে দাও, যাতে না খোলে। ফ্রাইং প্যান আঁচে বসিয়ে মাঝারি আঁচে প্যান গরম করে রোলগুলো একে একে সাজিয়ে দাও, জোড়া দিক নীচের দিকে থাকবে। তেল বা মাখন দেবার দরকার নেই। ১-২ মিনিট পর একদিক গোল্ডেন ব্রাউন করে সেঁকা হয়ে গেলে রোলগুলো ঘুরিয়ে উল্টো দিকটাও গোল্ডেন ব্রাউন করে সেঁকে নাও। গরম গরম পরিবেশন কর। পরিবেশনের সময় একটু মাখন লাগিয়ে দিতে পারো। সস দিয়েও ভালোই জমে যায়।

পদিপিসীর বোমার ফর্মূলাঃ

সেদিন ফেসবুক চ্যাটে পদিপিসীকে ধরেছিলুম। বললুম পিসী, একটা চটপটা রান্না বাৎলাও। রোজকার একঘেয়ে রান্না আর ভাল লাগে না। পিসী এমন একটা রান্নার ফর্মূলা বললো, যাতে রান্নার দরকারই নেই, উপরন্তু এক থালা ভাত অনায়াসেই উঠে যাবে - ঝটপট রান্না, কিন্তু তুখোড় স্বাদ। পিসীর মামিশাশুড়ী এই রান্নাটা পিসীকে শিখিয়েছিলেন। ছোট এক ডেলা তেঁতুল অল্প জলে ভিজিয়ে একটু রসটা বের করে নাও। মিক্সারে একবাটি (২৫০ মি.লি মাপের বাটি) নারকোল কোরা দাও, এতে ৪-৬ টা রসুনের কোয়া ও স্বাদ মতো কাঁচালঙ্কা দাও। এবার মিক্সারে তেঁতুল ভেজেনো জলটা দাও। খুব বেশী তেঁতুলের জল দিও না, বেশী টক এতে ভাল লাগবে না। স্বাদ মতো নুন ও চিনি দিয়ে মিক্সার চালিয়ে ভাল করে বেটে নাও। এবার বাটা মিশ্রণটায় কাঁচা সর্ষের তেল দাও। ভাল করে মিশিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করো। মিশ্রণটা বেশ থকথকে হবে, খুব বেশী জোলো বা শুকনো হবে না। আমাদের পিসেমশাইয়ের এই খাবারটি বিশেষ প্রিয়। তোমরাও করে দেখ বাড়ীতে।

ছবিঃ লেখিকা

লেখক পরিচিতি

চুপি গুণ্ডা। মাফিয়া দলের নেত্রী। যিনি দশ হাতে সমানবেগে বোমা, বন্দুক, ছুরি, ছোরা, কাঁচি ইত্যাদি প্রভৃতি চালাতে পারেন।



কোতলপুর থানার দারোগা সিংহমশাই। পুরো নাম বিহঙ্গ সিংহ; কত সাধই না ছিল সিনেমার হিরো হবে। সেই ছোট্টবেলা থেকেই উত্তমকুমারের ফ্যান ছিল বিহঙ্গ। মনে মনে ভাবত -'গুরুর পরে মহানায়কের স্থান আমিই পূর্ণ করব।' উত্তমকুমারের চুলের স্টাইল করে ঘুরে বেড়াত; লোকে বলতও জুনিয়র উত্তম। ছোট ছেলে, কিন্তু যেখানে 'গুরু'-র সিনেমা সেখানেই বিহঙ্গ। তবে সিনেমা দেখে বেড়ালেও পড়াশোনাতে মন্দ ছিল না সে; ক্লাসে মোটামুটি ভালভাবেই উতরে যেত।

একবার স্কুলের নাটকের আগে হঠাৎ সহপাঠী হারু অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিহঙ্গ চান্স পেল হারুর বদলে সেনাপতির ভূমিকায় অভিনয় করার। রাজা সেজেছে সহপাঠী গজেন। রাজা কাঁদছে, কারণ পাশের রাজ্যের শাসক দূত মারফত হুমকি পাঠিয়েছে রাজ্য দখলের।

তখন সেনাপতির ডায়ালগ ছিল, "হে রাজন্! ভাঙ্গিয়া পড়িবেন না অযথা। একবার দেখুন মোর মুখপানে। কি সুদৃঢ় চাহনি! এই নয়নের রোষানলেই শত্রুরে করিব কুপোকাত! আর তখন(সঙ্গে হাসি) হাঃ হাঃ হাঃ আপনি ওই দুষ্ট রাজার স্কন্ধে চাপিবেন। তাই বলিতেছি, হে ধরিত্রীঅধিপতি, মুছিয়া ফেলুন অশ্রুজল।"

এই পর্যন্ত ঠিকঠাকই বলেছিল বিহঙ্গ, কিন্তু শেষে একটি মারাত্মক সংযোজন করে বসল। একটু থেমে, ঘাড় কাত করে বলল, "রাজন্! আই হেট টিয়ার্স!"

'নিশিপদ্ম' ছবির এই ডায়ালগ শুনে সারা হলের উপস্থিত ছাত্ররা সিটি আর হাততালিতে ভরিয়ে তোলে। প্রথম সারিতেই বসেছিলেন 'দুর্বাসা' নামে খ্যাত হেডমাস্টারমশাই রাখালবাবু। তিনি তো হাতের ছড়ি নিয়ে স্টেজে উঠে বিহঙ্গর কান পাকড়াতে গেলেন। তার আগেই বিহঙ্গ যে পালিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু যাওয়ার আগে বলে গেল, "রাখালবাবু! ছবি বিশ্বাসের পর তাঁর খালি জায়গা একমাত্র আপনি-ই নিতে পারেন!" ছাত্রদের হাসি থামতে ঠিক কতক্ষণ লেগেছিল কেউ জানেনা! এরপর সপ্তাহখানেক রাখালবাবুকে রাস্তাঘাটে বেশ কয়েকবার 'ছবি বিশ্বাস' নামে অনেকেই ডেকেছিল!

যাক গে সে কথা! আবার ফিরি বিহঙ্গর কথায়।

রাশভারী দারোগা দিগম্বর সিংহের ছেলে বিহঙ্গ। বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়েই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গিতে নিজেকে দেখত। দেখত আর অবাক হয়ে যেত নিজের অভিনয় ক্ষমতায়। কি প্রেমের দৃশ্যে, কি মারামারি; সবেতেই নিজের চোখে সে স্টার।

তবে তার অভিনয় করার প্রধান অন্তরায় ছিল দিগম্বর দারোগা। বিহঙ্গর মনে হত তার বাবা যেন ছায়াছবির কমল মিত্র! তা সত্ত্বেও, বিহঙ্গর অভিনয় সাধনা গোপনে চলতেই লাগল। মনে মনে ভাবে যদি কোনদিন উত্তমকুমারের সঙ্গে দেখা হত তাহলে বলত, "গুরুদেব! আমি আপনার একলব্য।" ধীরে ধীরে স্কুল পাশ করে একলব্য, থুড়ি বিহঙ্গ কলেজে ঢুকল। হিরো হবে বলে চেহারাটাও বেশ বানিয়েছিল। কিন্তু, অকস্মাৎ বজ্রপাত! একদিন সকালবেলা রেডিয়োয় শুনল মহানায়কের মহাপ্রয়াণের সংবাদ।

কঠিন দুঃখের মধ্যেও ভাবল, 'এই সুযোগ! গুরুর শিষ্য হিসাবে সিনেমার জগৎ তোলপাড় করে দেব!' কিন্তু, মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক!

এদিকে বাবা দিগম্বর সিংহ ফরমান জারি করলেন ছেলেকে পুলিশই হতে হবে। বাপের কথা অগ্রাহ্য করার সাহস তার ছিল না, অতএব কলেজ পাশ করেই পুলিশে চাকরীর জন্য পরীক্ষা এবং আজ, উত্তম-একলব্য বিহঙ্গ কোতলপুরের মত একটি পাণ্ডববর্জিত গ্রামের দারোগা! বাড়িতে গিন্নীর খিটখিট, দুই ডানপিটে ছেলে ঘোঁচা আর পচার অত্যাচার..আর...আর রাতদিন পুলিশের ডিউটি। এর মধ্যে কোথায় হিরো হওয়ার স্বপ্ন! মাঝে মাঝেই চোখের জল আর আটকে রাখতে পারে না কোতলপুর থানার দারোগাবাবু।

সেদিনও থানায় বসে নানা কাজের ফাঁকেও চশমার কাচ মুছতে মুছতে এইসব কথাই ভাবছিল সে। এমন সময়ে থানার বিশ্বস্ত ইনফর্মার নেংটি এসে খবর দিল কুখ্যাত স্মাগলার হাল্লু চৌবে নাকি আজ রাতে কোতলপুর সংলগ্ন প্রাচীন কবরখানায় চোরাই মাল লুকাতে আসবে। বিহঙ্গ ভাবল, "আজই শুভক্ষণ! রিটায়ারমেন্টের আগে একে ধরতে পারলে আমার খুব নামডাক হয়ে যাবে। কিন্তু কাজটা খুবই চুপিচুপি করতে হবে।"

আসলে, বছর দুয়েক আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত কুখ্যাত এই চোরাচালানকারীকে বিহঙ্গ গ্রেপ্তার করলেও কি জানি কি করে সে জেল ভেঙে পালিয়েছিল। আর তার ফলশ্রুতি স্বরূপ বিহঙ্গর পদোন্নতিও গিয়েছে থমকে! তাই পুরনো শত্রুকে এত সহজে তো ছাড়া যাবে না। ব্যস! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রাত দশটায় কালো চাদর পরে আর সার্ভিস রিভলবার নিয়ে বিহঙ্গ উপস্থিত হল কবরখানায়। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। ডাকাবুকো বিহঙ্গরও যেন গা টা ছমছম করে উঠল! প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেল, কিন্তু হাল্লুর আর দেখা নেই! পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে মশার কামড়। কিন্তু, না অভিষ্ট লক্ষ্য তাকে পূর্ণ করতেই হবে, কোনভাবেই ফিরে যাওয়া যাবে না। আসলে বাবার আদেশে পুলিশ হতে হলেও সে যে ভিতরে ভিতরে একেবারেই শিল্পীসুলভ! হাল্লুকে ধরার চিন্তা না থাকলে সে হয়তো দু-চারটে কবিতা-টবিতাও ইতিমধ্যে লিখে ফেলত।

সহসা, ও কে? গুটিগুটি পায়ে, র‍্যাপার গায়ে কে এগিয়ে আসছে কবরখানার পিছনের গেট দিয়ে? এই তো,এই তো হাল্লু! তবে রে ব্যাটা! আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন! পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল বিহঙ্গ, পিছন থেকে জাপটে ধরলেই কেল্লাফতে! 'রে রে পামর! তোরে ঘাড়ে দিব আমি কামড়!', বলেই ঝাঁপ দিল বিহঙ্গ।

ঝটাপটি নড়াচড়া করছিল আগন্তুক। এক ঝটকায় র‍্যাপারের ঘোমটা খুলতেই মনে হল বিহঙ্গর মাথা ঘুরছে! চারিদিক দুলে উঠল। ওরে এটা কে রে? বীভৎস, কুৎসিত এই মুখ হাল্লুর? গোরিলার মত মুখ আর নেকড়ের মত লম্বা লম্বা দাঁত! এ তো হাল্লু নয়! বিহঙ্গর ভীত অবস্থা দেখে আগন্তুক হেসে উঠল। সে কি হাসি! অট্টহাসি! চোর ধরতে এসে কি শেষে প্রেতাত্মার শিকার হবে দারোগা?

"চাকরী যায় যাক! আমি আর থাকছি না! ওরে বাবা রে!"- বলে বিহঙ্গ দৌড়তে শুরু করল। পিছন থেকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভেসে এল রক্তজল করা হাসি।

পুলিশ কোয়ার্টার থেকে কবরখানা প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব। অর্ধেকটা পৌঁছে সিংহমশাইয়ের মনে হল- 'এই রে! ঝটাপটিতে সার্ভিস রিভলবারটা মনে হয় কবরখানাতেই পড়ে আছে। কি হবে?' সার্ভিস রিভলবার হারালে তো আবার বড়কর্তার কাছে জবাবদিহি করতে করতে নাজেহাল হতে হবে। একদিকে কবরখানার প্রেতাত্মা, অন্যদিকে বড়সাহেবের মেজাজ! কে যে বেশী ভয়ঙ্কর ভাবতে বসলে থিসিস লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু, না ভূত-প্রেত যাই থাকুক রিভলবার না খুঁজে পেলে বিহঙ্গকে এই বয়সে সাসপেন্ড হতে হবে যে! 'জয় মা' বলে আবার উলটোপথে দৌড়তে শুরু করল বিহঙ্গ।

কবরখানায় পৌঁছে এবার আরও কঠিন কাজ। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মত গোরস্থানে বন্দুক খোঁজা! ধুর! বাবার কথা শুনে পুলিশ না হয়ে হিরো হলে আজ সে কোথায় থাকত! ভাল্লাগে না! মনে মনে সাহায্যের জন্য স্বর্গতঃ বাবাকেই সে ডাকতে লাগল। ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই জায়গাতে পৌঁছতেই বিহঙ্গর চক্ষু চড়কগাছ!

চারিদিকে জ্যোৎস্না ছাপিয়ে এক অপার্থিব আলোয় ভেসে যাচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর প্রেতটা হাওয়ায় ভাসছে, আর সেই আলোর মধ্যে কে যেন তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে! এখন হাসির বদলে তার মুখে কাকুতিমিনতি- 'হুজুর! ছোড় দিজিয়ে মুঝে! মাই বাপ!' আর দুনিয়া কাঁপিয়ে কে যেন হাসছে! এ হাসি যে বিহঙ্গর বড় চেনা। প্রেতের কাকুতি আর এই অট্টহাসি; বিহঙ্গর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

"ওরে খ্যাঁদা! এই নে তোর শিকার হাল্লুকে!"- কে যেন সজোরে ছুঁড়ে দিল সেই প্রেতকে বিহঙ্গর দিকে আর দুঁদে দারোগা বিহঙ্গ ক্রিকেট বলের মত টুক করে লুফেও নিল!

বিহ্বল বিহঙ্গ দেখল প্রেতের বিভৎস মুখোস খুলে ঝুলছে আর ভিরমি খেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে হাল্লু চৌবে!

কিন্তু সেই অশরীরী কণ্ঠস্বর? খ্যাঁদা নামে তো পৃথিবীতে বিহঙ্গকে একমাত্র ডাকত তার বাবা দিগম্বর দারোগা! তবে কি... তবে কি? বিহঙ্গর সামনে ভেসে উঠল দিগম্বরের ভাসা ভাসা উজ্জ্বল মূর্তি। চারিদিক এক অদ্ভূত সুগন্ধে ভেসে যাচ্ছে!

"বাবা!"- হাল্লুকে ফেলে দুহাত তুলে ছুটে গেল বিহঙ্গ।

"সত্যি খ্যাঁদা! তোর মার সঙ্গে স্বর্গে বসে একটু গপ্পো করছিলাম, তাতেও শান্তি নেই। এত ভয়! তোর এই বয়সেও এত ভয়!"- স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে বিহঙ্গকে আদর করে ধমক দিলেন দিগম্বর সিংহ।

"বাবা গো!"- কেঁদে কেঁদে বিহঙ্গর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরল না। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেল।

বিহঙ্গর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন দিগম্বর দারোগা। সেই আদরে যেন বিহঙ্গর সারা শরীরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল।

"চলি রে খ্যাঁদা, আবার দেখা হবে! উপর থেকে তোর মা আর আমি সবসময় তোকে নজরে রাখি"- এই বলে অদৃশ্য হওয়ার আগে ছেলের সার্ভিস রিভলবারটা বিহঙ্গর হাতে ফেলে দিল দিগম্বর দারোগা। আনন্দের চোটে বিহঙ্গর মনে হল এই কবরখানাতেই একটু নাচ করে নেয়। সত্যি বলতে কি এইভাবে বাবার দর্শন পেয়ে হাত পা ছুঁড়ে বিহঙ্গ নাচতে লাগল।

এর পরের ঘটনা?

হাল্লুকে ধরিয়ে দিয়ে বিহঙ্গ পুরস্কৃত হল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরপরে থানায় অভিযোগ জানাতে এসে এক ভদ্রলোক আচমকাই বিহঙ্গকে নিজের প্রযোজিত ছবি 'হাসির আসামী'-তে রাশভারী জমিদারের রোল অফার করে বসলেন। ছবি মুক্তি পেতে বিহঙ্গর অভিনয়ে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল! পরপর, আরও দু-দুটো ছবিতে চান্স পেয়ে গেল সিংহ মশাই! আজকাল তো এমন অবস্থা হয়েছে, পুলিশের বড়কর্তা পর্যন্ত বিহঙ্গর ফ্যান! চিরদিনের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবায়িত হওয়ায় বিহঙ্গ আনন্দিত তো বটেই, আর মনে মনে চুপিচুপি ভাবে ভাগ্যিস বাবা দারোগাগিরিতে ঢুকিয়েছিল!

হঠাৎ প্রবল হর্নের আওয়াজ!

"দারোগাবাবু! ও দারোগাবাবু! উঠবেন নে? আজ তো আপনার শুটিং! আপনাকে থানা থেকে নিয়ে যেতে ডিরেক্টরবাবু যে গাড়ি পাঠায়ে দিসে! থানার সামনে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কতক্ষণ ধরে হর্ন মারতিসে!", চমকে উঠে বিহঙ্গ দেখল কোতলপুর থানার কন্সটেবল কালো ঘোষ তাকে ডাকছে। সত্যি, নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে

#

থানায় বসে বিহঙ্গর চোখ লেগে গিয়েছিল! লাফাতে লাফাতে শুটিং-এর গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল জনপ্রিয় অভিনেতা-কাম-পুলিশ বিহঙ্গ সিংহ!

অলঙ্করণঃ শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতিঃ

শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ গায়ক, লেখক, চিত্রশিল্পী। সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইলেকট্রনিক্স সায়েন্সে স্নাতকোত্তর। নেশা বই পড়া এবং ছবি আঁকা।



এটি একটি কাহিনী মাত্র। বাস্তবের কোনও ব্যক্তি বা স্থানের কথা লেখা হয়নি। বিভিন্ন অরণ্য এবং ঘটনাবলীর মিশ্রণে একটি একক কাল্পনিক স্থান, ঘটনাবলি এবং কাল্পনিক ব্যক্তিদের সমাবেশ করা হয়েছে। ছবিগুলি বিভিন্ন অরণ্যের; গল্পে বাস্তবতার ছোঁয়া দেবার জন্য উদাহরণ মাত্র।

পটকথাঃ

লেখক হবার কোনও সম্ভাবনা আমার মধ্যে যে নেই সেটা বুঝতে কৈশোর থেকে যৌবনের একটা গোটা ধাপ লেগেছিল; আর সব শেষে শক ট্রিটমেন্টের মতো একটা ঘটনাও ঘটেছিল। অনেক পরে বুঝেছিলাম এতে আমার মোটের ওপর ভালই হয়েছে।

আমার লেখা গল্প উপন্যাসের চরিত্রদের একজন শ্রুতিলেখক হয়ে আমি এখন মহানন্দে আছি। লেখকের নামের জায়গায় আমার নাম থাকে বটে কিন্তু এগুলো একটাও আমার লেখা নয়, কাহিনীর চরিত্রদের বলা কথা শুনে শুনে লেখা।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মানব-মানবী সমেত পুরো প্রাণী জগত, নদী, জঙ্গল, পাহাড়, অদৃশ্য অশরীরী বন্ধুরা, এরাই সেই সব চরিত্র। এরা নিজেদের মধ্যে অথবা একে অন্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে, একটা নতুন চরিত্র হয়ে যা বলতে থাকে তা শুনে নিয়ে লিখে ফেলাই আমার কাজ আর সেই সব শ্রুতিলিখনই আমার লেখা গল্প আর উপন্যাস। সামান্য কয়েকজন দয়া করে সে সব পড়েন, তবে অনেকেই এক বার চোখ বুলিয়েই বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন।

এসবে আমার এখন আর কোনও দুঃখ হয় না। লেখা পাতাগুলো পুরোটাইতো আমার সঙ্গে থাকা চরিত্রদের বলা কথার ডিকটেশনের পাতা মাত্র ।

#

আমি যখন লেখক ছিলামঃ

"আমি লেখক হব" এই অলীক স্বপ্নটা দেখার জন্য দায়ী খড়গপুরের ভারতীয় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরে বাদলদার দোকানের হ্যামলেট আর ফিশরোল। কলেজের র‍্যাগিং পিরিয়ডে আমার লেখা প্রেমপত্রের মুসাবিদার নকল করে দুই সিনিয়র দাদা তাঁদের নিজ নিজ প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁরাই খুশি হয়ে আমাকে বাদলদার ক্যান্টিনের মেনু তালিকায় সবার ওপরে থাকা দুটো জবরদস্ত আইটেম খাইয়েছিলেন। গোল অমলেটের পুরো জায়গা জুড়ে হ্যাম আর চিজের স্লাইসের ওপর আর একটা ফেটানো ডিম দিয়ে তৈরি হয় হ্যামলেট। এর সঙ্গে মাখনের চেয়ে নরম ফিশরোল খেয়ে আমার মন আর পেট দুইই কানায় কানায় ভরে গেছিল সেদিন। এই হ্যামলেট আর ফিশরোলের বিনি পয়সার ভোজের লোভেই হয়ত একের পর এক অর্ডার নিতে থাকি লাভ লেটার লেখার। এমন কি এম টেক পড়তে আসা জেসিবি হলের (খড়গপুরে হোস্টেলকে বলা হয় হল) দাদা- দিদিরাও।

অন্যদের প্রেমপত্র লিখে দেবার সঙ্গে স্থানীয় সাপ্তাহিকে নিয়মিত লেখা আর কিছু নাটকের স্ক্রিপ্টও লিখে ফেলি আর ভাবতে থাকি নীরস খনিজ অনুসন্ধান নিয়ে বনে জঙ্গলে জীবন কাটিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। ভগবান আমাকে যে প্রতিভা আর কল্পনা শক্তি উপহার দিয়েছেন তাতে আমার নামজাদা লেখক হবার কথা। খড়গপুরে আমাদের ক্যাম্পাসের সব স্তরের মানব-মানবীদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ, বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম, ভালবাসা এই সব নিয়ে সেই সময়ে একটি উপন্যাসও লিখে ফেলেছি আর হন্যে হয়ে সহৃদয় নামী প্রকাশক খুঁজছি।

স্থানীয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন কলকাতার এক নামী প্রকাশনা সংস্থা আর দৈনিক-সংবাদ মাধ্যমের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে। নাম বলা যাবে না, তিনি এক মান্যগণ্য ভি আই পি লোক।

তাঁর নাম, ধরে নেওয়া যাক যতীনদা। এই নামী সংস্থায় দৈনিক সংবাদপত্রে বার্তা সম্পাদকের উঁচু পদে থাকা ছাড়াও উত্তরাধিকার সুত্রে ওঁর নিজের মালিকানাধীন প্রকাশনার সংস্থাও ছিল। বেশ কয়েকবার যতীনদার দুই অফিসে যাওয়া-আসা করার পর একদিন সত্যিই শিকে ছেঁড়ে আমার ভাগ্যে, তবে এক শর্তে। আমার উপন্যাস হয় তাঁর নিজের প্রকাশনা কিম্বা সেই নামী প্রকাশনা থেকে ছেপে বেরতে পারে কিন্তু তার আগে নিজেকে শিক্ষানবিস সাংবাদিক হবার যোগ্য করে তুলতে হবে।

এটা যদি পারি তবে আমার বাকি লেখাগুলোও এক এক করে নামকরা বাংলা ম্যাগাজিনগুলোতে বেরোতে থাকবে। লেখক হবার যে স্বপ্ন আমি দেখতাম সেটা তাহলে সত্যি হবার দোরগোড়ায়।

উনি কয়েকজন দিকপাল লেখকের সঙ্গে আমার আলাপও করিয়ে দিলেন। এঁরা সবাই একসময় এখানে শিক্ষানবিস সাংবাদিক ছিলেন। এখন সংবাদ মাধ্যমে থেকে অথবা না থেকে একের পর এক উপন্যাস বা গল্প লিখে যাচ্ছেন আর সেগুলো ছাপা হতেই গরম সিঙ্গাড়ার মত বিক্রি হচ্ছে।

লেখার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন। তার জন্য নিজের জাত, কুল, মান সব কিছু ছেড়ে দিতে তৈরি। এমন কি ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে পাওয়া মোটা মাইনের সরকারি চাকরিও।

ফলিত ভূবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের শেষ সেমিস্টারের শুধু মৌখিক পরীক্ষাটুকু বাকি তখন। তার আগে গোয়াতে খনিজ অনুসন্ধানের শিক্ষানবিস কাজ করেছি তিন মাসের ওপর। সেই সময় অনুসন্ধানের কিছু কাজ দ্রুত করবার জন্য হাতে কলমে নতুন পথের পরামর্শ দিয়ে একটি রিপোর্ট লিখেছিলাম। শিক্ষানবিস পদে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সরকারী মালিকাধীন কোম্পানির হেডঅফিসে সাক্ষাতের পরীক্ষায় সি এম ডি এই রিপোর্টটির খুব প্রশংসা করেছিলেন। এর দরুনই হোক অথবা ভাগ্যের টানেই দেশের বৃহত্তম খনিজ অনুসন্ধান কম্পানিতে শিক্ষানবিশ খনি ভূতত্ত্ববিদের লোভনীয় পদে মনোনীত হই। সেটা আবার এই শিক্ষানবিস সাংবাদিকের মাইনের চারগুণ।

তবু প্রেমে অবিচল থাকার জন্য সরকারি চাকরিতে যাব না বলে একটা চিঠি এক বন্ধুকে রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে দিয়ে চলে এসেছিলাম শিক্ষানবিস সাংবাদিকের চাকরীতে।

কয়েকদিন শিক্ষানবিসি করবার পর আমাকে বলা হল চিড়িয়াখানা গিয়ে বেশ জমিয়ে একটা প্রতিবেদন লিখতে। একটা পুরো রবিবার কাটালাম সেই কাজে। আমার চোখে পড়লো সেখানের পশুদের দেখাশুনোর কাজে নিদারুণ অবহেলা আর অবৈজ্ঞানিক পরিচালনা যার শিকার নিরীহ বন্যপ্রাণীরা। ঘুরতে আসা শিশুদের আর তাদের সঙ্গে থাকা অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুখেও সেই কথা শোনা গেল। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ছাড়া বাকি সবাই চাইছিলেন এই অব্যবস্থার অবসান। তাঁদের মুখপাত্র, প্রধান বনপালকে এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমার চোখে পড়া জিনিসগুলোর বেশ কিছু উড়িয়ে তো দিলেনই আবার কিছু প্রশ্নের জবাব সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। আমার মনের রাডারে আগাম বিপদ সঙ্কেত আসতে থাকল। প্রতিবেদনটা নিয়ে ঝড় উঠতে পারে।

অবশ্য আমার কাছে সবার কথা রেকর্ড করা আছে, ছবিও অনেক ক্যামেরাবন্দী করেছি। এই রকম বিবাদজনক নিউজ স্টোরিতে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য এসব খুব দরকারি জিনিস। কয়েক দিনের শিক্ষানবিসিতে এটা বুঝে নিয়েছি।

অফিসে ফিরে ঝড়ের গতিতে প্রতিবেদনটা লিখে ছবি সমেত সোজা বার্তা সম্পাদকের সহকারীর হাতে দিয়ে এলাম। আমাকে সেই রকমই বলা হয়েছিল।

শিয়ালদহতে যে মেসে আমি থাকতাম সেখানে পৌঁছে দেখি আমার নামে একটা চিঠি এসেছে। যে বন্ধুর কাছে সরকারি চাকরিতে যাব না বলে রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠাতে দিয়ে এসেছিলাম সে শেষ অবধি সেটা ডাকে না দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। সরকারী চাকরিতে জয়েন করবার জন্য হাতে এখনো সময় আছে। অনুরোধ করেছে আমি যেন সেই অবসরে আরও বিবেচনা করে তবেই কিছু করি।

পরদিন টিফিনটাইমে নিজে পোস্টঅফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রিডাকে চিঠিটা দিয়ে আসবো এই ঠিক করে খামটা তখনি অফিসের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিই। সেদিনটার কথা আজও ভুলতে পারি নি।

অফিসে পৌঁছাতেই বার্তা-সম্পাদক অর্থাৎ যতীনদার ঘরে ডাক পড়ল। তাঁর পুরাতন সুভদ্র আচরণ অনুযায়ী বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই আছি আর তিনি কোনও ফাইলে চোখ নামিয়ে বেশ ব্যস্ত। আমাকে যেন হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো আর বললেন, "তোমাকে কি জন্য যেন ডেকেছিলাম? ও হ্যাঁ, তোমার চিড়িয়াখানার স্টোরিটা!"

আড়চোখে দেখি আমার লেখাটা ইন ট্রে-তে আছে, কিন্তু সামনের পাতাটাতেই আর সব কটা ছবির ক্লিপিং-এ লাল রঙের কাটা চিহ্নের দাগ। এসব দৃশ্য আমার মত ভীতু লোকের বুকের মধ্যে ঢাক বাজানোর জন্য যথেষ্ট।

উনি বেশ উঁচু গলাতেই বলতে থাকলেন, "তোমাকে বলেছিলাম চিড়িয়াখানা নিয়ে একটা হাল্কা কিছু লেখার জন্য। শুরুতেই হেলে না ধরে একেবারে কেউটের কামড় খাবার সখ কেন? চিড়িয়াখানাতে আর কিছু দেখ নি? লেকের ধারে কপোত-কপোতী দেখ নি? বাচ্চাদের হুটো-পাটি, এসব দেখ নি? তাদের মুখ দিয়ে শুধু পাকা পাকা কথা বলিয়ে নিয়েছ?"

মিনমিনে গলায় আমি বললাম, "যতীনদা, এই রকম রোগা, ঝিমিয়ে পড়া বাঘ-সিংহ আপনি কোথাও পাবেন না। শিম্পাঞ্জিকে যে যা খুশি খেতে দিয়ে যাচ্ছে কেউ দেখার নেই। আর জলহস্তী? বেচারি খিদের জ্বালায় জল ছেড়ে শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝে বিশাল হাঁ করে খাবার চাইছে। ওর দেখভাল করার লোক পাঁচিলে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে দেখছে। এ সবেরই ছবি আমি নিয়েছি। জলহস্তীর দেখভাল করার লোকটি আমায় যা বলেছে সে সব রেকর্ড করা আছে আর সেই সঙ্গে স্কুলের বাচ্চা আর শিক্ষকশিক্ষিকাদের কথা। আর আপনি নিজের কানেই শুনে নিন একজন বিদেশি সাহেব যিনি মানেকা গান্ধীর আমন্ত্রনে এসেছেন তিনি কিরকম ছি-ছি-কার করছেন। তাঁরও ছবি দিয়েছি।"

"ওঃ! এরই মধ্যে নিজেকে কি বরুণ সেনগুপ্ত মনে করতে লেগেছো ছোকরা? এসব লেখার জন্যে যে এলেম লাগে তার জোগাড় হয়েছে?" ছবি সমেত আমার লেখাটা প্রায় ছুঁড়েই দিলেন আর আমি ক্যাচ লোফার মত সেটা মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাতে ধরে ফেললাম।

দরজার দিকে এগোতে যাব যতীনদার ফ্যাসফেঁসে গলা বেজে উঠল, "শোনো রবিবারে একটা ভ্রমণ সংক্রান্ত ট্যাবলয়েড বেরোবে। তাতে তোমারও একটা লেখা থাকবে। তবে এরকম মারমুখী লেখা নয় বেশ জম্পেস করে একটু রসালো ধরনের লেখা, যেটা পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে যে একবার চিড়িয়াখানা ঘুরে আসি। আর এর সঙ্গে লাগসই সব ছবির ক্লিপিং আমার কাছে আছে। কপিটা ট্যাবলয়েডের ফ্রন্ট পেজে ধরিয়ে দেব। দেখবে তুমি কি রকম সবার নজরে পড়ে গেছ। যাও, তাড়াতাড়ি কর, তোমার হাতে আর ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। লেখাটা ব্রতীকে দিয়ে যেও।"

ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনে হল শুধু ব্রতী কেন আরও অনেকেই যেন আড়চোখে আমাকে দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে।

নিজের ডেস্ক অবধি পৌঁছাবার আগেই মনে হল আমি যেন চিড়িয়াখানার সেই ক্ষুধার্ত বাঘ হয়ে গেছি, আমার গলা দিয়ে যেন তার গর্জন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

তাহলে আমাকে এই করতে হবে বাকি জীবনটা? সামনে প্রমাণ-সমেত অন্যায় দেখলেও সেটা এড়িয়ে গিয়ে মিথ্যে মশলাদার চটুল লেখা লিখতে হবে? লেখক হবার জন্য আমাকে এতটা সমঝোতা করে নিতে হবে?

তখনও অবধি এই চাকরির কোনও লিখিত চুক্তি বা নিয়োগপত্র পাইনি কিন্তু আমার উচিত কাজ আমি স্থির করে ফেললাম। নিজের হাতে লেখা পদত্যাগপত্র খামে ভরে যতীনদার সহায়িকা ব্রতীকে দিয়ে আসার সময় মনে হল আমার

#

উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপিটা তো ওঁর কাছে। আমাকে সেই দিকে যেতে দেখে ব্রতী কঠিন গলায় বলে উঠল, "এখন যাবেন না, স্যার এখন খুব ব্যস্ত।"

আমার গলায় তখন কি একটা যেন ভর করছে, "আমার তাড়া আছে।" এই বলে আমি সোজা বার্তা সম্পাদকের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। কাউকে বোধ হয় ফোন করতে যাচ্ছিলেন যতীনদা আমাকে দেখে কপাল কুঁচকে নামিয়ে নিলেন।

উনি ঘাগু লোক, আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করে নিয়েও সেটা সুকৌশলে চাপা দিয়ে হাঁড়িচাচা গলায়, নিমপাতা চেবানো মুখের ভঙ্গিমাতে খিঁচিয়ে উঠলেন।

"কাজে ব্যস্ত আছি। কি চাই তোমার এখন?"

"আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা ফেরত চাই।"

"অ! বুঝেছি এখন। তা যাকেই দাও, এ লাইনের লোক যদি হয়, ছাপা তো দূরের কথা, কয়েক পাতা পড়েই বুঝে নেবে যে এ লেখা শুধু পোকায় কাটবে, পড়বে না কেউ। বড্ড তাড়াতাড়ি শঙ্কর হবার খোয়াব দেখছ। তা সেই মাল তো আমার বাড়িতে। বিকালে পাবে।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ডেস্কে পৌঁছে ব্যাগটা নিয়ে যেন কোনও কভারজে যাচ্ছি এই ভাবে বেরিয়ে পড়লাম ।

গেট পার হতেই মনে হল আমি যেন বাঘ থেকে আবার ইঁদুরে পরিণত হচ্ছি আর সেটা একটা ভয়ার্ত নেংটি ইঁদুর। "এ লেখা শুধু পোকায় কাটবে, পড়বে না কেউ" -কানের কাছে আমার প্রথম নভেল নিয়ে যতীনদার গলার হাঁড়িচাচা আওয়াজ ফাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলল।

খবরের অফিস থেকে বার হয়ে সামান্য এগিয়ে গেলেই রাস্তার দুধারে সারি সারি চটজলদি টিফিনের গুমটি। ওরই মধ্যে বেশ কিছু ভাতের আর দুপুরের খাবারের দোকান আর সবার শেষে পোস্টঅফিস। পোস্টঅফিসের কথায় খেয়াল হল রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানোর আর সরকারি চাকরির কথা। সত্যিই তো, আমার হাতে তো এখনও সরকারি চাকরির সেই অফারটা আছে।

মাসকাবারি-বাঁধা খাবারের দোকানে, প্রতিদিনকার মত মাছ-ভাতের অপেক্ষা করছিলাম। সরকারি চাকরির ছাপা নিয়োগপত্রটা আরেকবার পড়তেই মনে হল গোল আয়না লাগানো ওয়াশবেসিনের কাছে হাতটা আর একবার ধুয়ে নেবার অছিলায় ঘুরে আসি। আমার মত এত বড় আহাম্মকের থোবড়াটা একবার নতুন করে দেখি ।

সরকারি এই চাকরিতে শুধু যে চারগুণ বেশি মাইনে তাই নয় তার ওপর সুবিধে অনেক। মেডিক্যাল পুরো পরিবারের জন্য ফ্রি, বছরে একবার এল টি সি, মোট বাৎসরিক ছুটি পঁয়তাল্লিশ দিন।

এ সব ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান ছাড়াও আমি এটা ভাবিনি যে আমাকে জিওলজিষ্ট বানাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর দেওয়া ট্যাক্স থেকে প্রচুর টাকা খরচা করেছে। সেটা তো মুচমুচে মসালা নিউজ স্টোরির সাংবাদিক হবার জন্য নয়।

খাওয়া শেষে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে আয়নাতে নিজের মুখটা আর একবার দেখে মনে হল নিজেকে আর ভয়ার্ত নেংটি ইঁদুর মনে হচ্ছে না, আবার সেই বাঘ মনে হচ্ছে।

এতবার বাঘের মুখের কথা কেন মনে হচ্ছে? তখন কি আর জানতাম যে চারদিক খোলা উইলিজ জীপে ফিল্ড ক্যাম্পে যাবার প্রথম দিনই একদম ঘোর সন্ধেতেই বাঘের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে!

নিয়োগ পত্রে লেখা ছিল প্রোজেক্টে আসার আগে সিনিয়র জিওলজিস্ট দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে জানাতে হবে আসার তারিখ। কয়েকবার চেষ্টার পর যোগাযোগ হতেই ও প্রান্তের অফিসের সিনিয়র বসের গম্ভীর গলা নয়, শুনলাম খোলামেলা মনের এক দাদার সাদর আহবান। এক সময়ের প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছাত্র, ভালোবাসেন রবীন্দ্র সংগীত শুনতে আর শোনাতে এছাড়া কবিতা আর ছোটগল্পও লেখেন।

আমাকে ধরণী দ্বিধা হও বলার অবকাশ না দিয়েই বলে উঠলেন "সাপ্তাহিক ...তে তোমার লেখা পড়েছি। ভাল লেখ তুমি।"

"না স্যা..."

উনি কিন্তু এ বার স্নেহের ধমকের সুরে আমাকে ঠিক করে দিলেন, "স্যার নয়, দীপঙ্করদা। দেখছ না আমি কখন থেকে আপনি ছেড়ে তুমিতে নেমে এসেছি। রিজার্ভেশন নিশ্চয় করা নেই। তুমি আজ বিকালের কোরাপুট এক্সপ্রেস ধরে নাও। কোরাপুটে নেমেই দেখবে তোমাকে লোহাপাহাড় বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসার জন্য জীপ অপেক্ষা করছে ষ্টেশনের বাইরে।"

এবারে খেয়াল হল, কোরাপুট এক্সপ্রেস ধরতে গেলে আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা পাবার জন্য বিকেল অবধি অপেক্ষা করলে তো হবে না। আবার ওটা ফেলে রেখেই বা যাই কি করে?

এখন বুঝলাম পঙ্গু সন্তানের জন্ম দিলেও তার মা তাকে কেন ছাড়তে পারে না? মনে পড়ল, একবার তো যতীনদার বাড়ি এসেছিলাম। তখন সারাটা দিন ধরে অনেক রিপোর্ট ঘেঁটে একটা লেখা ওঁর ঘরে দিয়ে এসেছিলাম।

উনি সেটি বক্তিমে করবেন কোথাও হয়ত, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। লেখাটি ছোঁ দিয়ে যেন ছিনিয়ে নিলেন কিন্তু সাবেকি লাল রঙের তিন মহলার সেকেলে বড়োলোক বাড়ির বর্তমান মালিক যতীনদা নিজের সহকর্মীকে ভেতরে আসবার সৌজন্য দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সেই বাড়ি এখান থেকে বেশি দূরে নয় তবে বাড়িতে তাগড়া অ্যালশেশিয়ান কুকুর আছে। সেবারে আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল। উনি এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

#

কুকুরে আমার তখন খুব ভয়, কিন্তু সে তো যতীনদার কথার খুব বাধ্য। নিজেকে এই সব বুঝিয়ে ওঁর বাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে এগোলাম। সাবেক আমলের বাড়ি। খড়খড়ি দেওয়া জানালাগুলোই এখনকার বাড়ির দরজার প্রায় সমান-সমান। খড়খড়ি দিয়ে বোধহয় আমাকে আগেই দেখে নিয়েছিলেন। কিন্তু গলার স্বরটা এখন একটু চাপা বলে মনে হলেও ধমকে উঠলেন, "কি চাই এখন?"

আমার মধ্যে তখন বাঘ ভর করেছে গর্জে ওঠা গলায় বললাম, "আমার হাতে সময় খুব কম আমার পাণ্ডুলিপিটা..."

"অ! পাখা গজিয়েছে দেখছি, উড়তে শুধু বাকি। তা পাঠিয়ে দিচ্ছি, দু' মিনিট অপেক্ষা কর।"

সারা জীবন ধরে একটা চিরসত্য দেখেছি। সুখ, আনন্দ, হাসি এরা সবাই আসি আসি করে একটু দেরিতেই আসে। তবে দুঃখ, অপমান, কান্না এরা অনেক সময় আসি বলারও অপেক্ষা করে না। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না।

এক মিনিটের আগেই এসে হাজির হল আমার পাণ্ডুলিপিটা। তবে সেটা যতীনদা যে ভাবে পাঠালেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বস্তুত পক্ষে প্রথমটায় আমি দেখেছিলাম যে একটা অ্যালশেশিয়ান কুকুর তেড়ে আসছে আমার দিকে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে আমার মাথার যন্ত্রগণক বলে দিল পালাবার দরকার নেই।

অনেক উঁচু গেট, তাও তালা দেওয়া আছে। কুকুর লাফাতে চাইলেও পারবে না। যে দূরত্ব থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিলে গেট টপকানো যেতে পারে বাড়ির দরজা থেকে গেট অবধি তার জায়গা নেই ।

এতক্ষণে নজরে পড়লো যে কুকুরটার মুখে একটা চেনা রঙের খাতা। তবে কি এটা আমারই পাণ্ডুলিপি! আর তার এই দুর্দশা? সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন বয়স্ক লোকের এই রকম রুচি?

সুশিক্ষিত কুকুর, গেটের সামনে এসে একবার আমার দিকে তাকিয়ে গেটের গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ছুঁড়ে দিলে অতি অযত্নে রাখা আমার পাণ্ডুলিপিটা। কুকুরের নাল-ঝোল মাখা সেই পাণ্ডুলিপি ধুলিস্নান করতে লাগল।

একজন কৃষ্ণকায় স্বাস্থ্যবান যুবক, বোধ করি গৃহসেবক, তার ধারণা অনুযায়ী বিলিতি কুকুরকে ইংরেজিতে কাম ব্যাক বলতেই সে লাফিয়ে ফিরে গেল।

ওপরের ঘরের খড়খড়ি দেওয়া জানালা সশব্দে বন্ধ হবার আগেই যে মুখটা দেখা গেল সেটা যতীনদারই।

নামকরা প্রকাশনা সংস্থার দৈনিক খবরের কাগজ, যে কাগজ আমরা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলি, না পড়লে পিছিয়ে পড়ি, তার বার্তা-সম্পাদক নিজে বা নিজের গৃহভৃত্যের বদলে পোষা কুকুরের মুখে আমার পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে যে বার্তাটা আমাকে দিলেন, তাতে আমি এগিয়ে বা পিছিয়ে না পড়ে কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম।

গলা দিয়ে জোর আওয়াজ বেরোতে চাইছিল কিন্তু হল না। তবে আমার ভাগ্য ভাল যে সে সময় ইট কেন একটা নুড়ি পাথরও চোখে পড়ে নি। সে সব হাতের কাছে পেয়ে গেলে ওঁর গাড়িবারান্দার ওপরের বারান্দার রঙিন কাচগুলোর

#

একটাও আস্ত থাকত না। আর ওঁর মত ভি আই পি লোক আমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে আমাকে শ্রীঘরের দিকে ঠেলে দিতে দেরি করতেন না।

শেষ অবধি, কুকুরের জিভের লালাভেজা, আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কেন জানি না খুব জোরে জোরে হেঁটে অনেকটা প্রায় দৌড়েই হোটেল পৌঁছেছিলাম।

ভুল-ঠিক যাই হোক, মনে হচ্ছিল সারা শরীরের বিছুটি পাতার জ্বালা বোধ হয় দৌড়ালে কমে যাবে।

খানিক পরে হাওড়া স্টেশন ছেড়ে কোরাপুট এক্সপ্রেস অনেকটা এগিয়ে গেছে, তবুও মনে হচ্ছিল আমি দৌড়ে চলেছি। দৌড়ে চলেছি নিজের সত্ত্বার এক অংশকে পেছনে ফেলে রেখে।

এটা আমার সত্ত্বার সেই অংশ, যে অন্যের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়া অনুভব করতে পারে আর সেইসব অনুভুতি আরও অনেকের কাছে জানানোর জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যায়।

প্রাক-অরণ্যবাসের দিনগুলিঃ

চুড়োয় চুড়োয় আটকে থাকা মেঘ আর কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে জন্মাবধি দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গলে ঘেরা পৃথিবী বিখ্যাত আকরিক লোহা-পাথরের সারি।

এই পাহাড়শ্রেণীর সবচাইতে উঁচু পাহাড়ের নাম লোহাপাহাড়। এই পাহাড়ের নামেই বত্রিশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পুরো জায়গাটার নাম। এমন কি রেলষ্টেশনের নামও লোহাপাহাড়, বিশাখাপত্তনম বা কোরাপুট থেকে আসা বাসের সামনেও এই নাম লেখা।

পাহাড়তলিতে তীব্র স্রোত বুকে নিয়ে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে সরু রুপালি পাতের মত নদী। এই নদী পাহাড়তলির গভীর শাল সেগুনের জঙ্গল আর লোহাপাহাড় শ্রেণীকে দু-ভাগে চিরে দিয়েছে।

দু দিকের পাহাড়চুড়ো থেকে দুটি বড়ো মাপের জলপ্রপাত ঝাঁপ দিয়ে মিলেছে উপত্যকা দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীতে। সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক নয়ন মনোহর স্বর্গের দোর-গোড়ায় চলে এসেছি।

মনে হচ্ছে আমি যেন কোনও কঠিন অসুখে থেকে সেরে উঠবার পর ভাগ্যের নির্দেশে হাওয়া বদলের জন্য কোথাও এসেছি।

তবে অসুখ আমার পুরোপুরি সারে নি। আজও আছে পোষা কুকুরের মুখে আমার লেখা ফেরত পাঠাবার সেই দগদগে ঘায়ের জ্বলুনি।

সময়টা অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বেরের প্রথম সপ্তাহ। দলছুট কিছু মেঘ বেশির ভাগ জলকণা মাটিতে ফেলে দিয়ে জোয়ান থেকে বৃদ্ধ হয়ে কালো রঙ হারিয়ে সাদা হয়েছে। কিন্তু কেউ যেন তাদের পাহাড় চুড়োতে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে।

#



লোহাপাহাড়

বৃষ্টি আর পাহাড়ী জলপ্রপাতের অকৃপণ জলদানে ফুঁসছে নদী। এপাড়ে সারি সারি সাদা কাশের ঈশ্বরের বাগানবাড়ি। সারা দিনের প্রশিক্ষণ ক্লাস সেরে বেস ক্যাম্প ছুঁয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীর ধারে বসে এসব দেখে যাই আমি।

আগের রাত থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা সে দিনটা ছিল ছুটির দিন। বেলা একটু হতেই কুয়াশা বিদায় নিল। সেই সময় দেখি পাহাড়ের গুহার কাছে হাজার হাজার প্রজাপতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাইনোকুলারে আরও স্পষ্ট করে দেখি তাদের উজ্জল রঙ, ডানাতে ডানাতে ঈশ্বরের আঁকা কোলাজ চিত্রকলা। উঠতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু গেস্ট হাউস রক্ষক বুধিরামের লাঞ্চ খেয়ে নেবার তাড়াতে নদী-ধার ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হলাম।

বুধিরাম স্থানীয় আদিবাসী। খাওয়ার পর সে শোনালো এই নয়ন মনোহর প্রজাপতিদের নিয়ে একটি আদিবাসী রূপকথা। প্রজাপতিদের দলে দলে আসবার আগে ঘন কুয়াশা পড়ে। ঘন কুয়াশা এই অঞ্চলে এই সময়ে প্রায়ই হয়। তবে এই কুয়াশা অন্য ধরনের। মানুষের আগে এই এলাকার পাখ-পাখালি, মোষ, গরু, ছাগল টের পায়। বিকেল হতেই যে যার আস্তানাতে ঢুকে চুপ হয়ে যায় আর এদের দেখাদেখি এই এলাকার মানুষও। পাহাড়ী নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পাহাড়ের ঢালে আছে এক গোপন গুহা। গুহামুখ পাথর দিয়ে ঢাকা। ঠিক এই জায়গাতে গভীর রাতে কুয়াশা রঙ বদলায়।

#

আমি অবাক হয়ে বলি, "কুয়াশা রাত্রে রঙ বদলায়?"

বুধিরাম বলে, "হ্যাঁ সেই সময় মাটি কেঁপে ওঠে।"

আমি বলি, "আর তোমরা মাটির ঘরের ভেতরে থেকে যাও? বিপদ হতে পারে এতে।"

আমাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বুধি বলে, "এটা ভুমিকম্প নয়। ভুমিকম্প আমরা জানি। এটা আলাদা। অনেক বছর আগে এই সময় কথা না মেনে একজন সাহস করে বেরিয়েছিল আর দেখেছিল পুরো নিষিদ্ধ দৃশ্যটা। মারা যায় সে রক্তবমি করে।"

"কি দেখেছিল সে?"

"কুয়াশার রঙ বদল হতেই মাটি কাঁপিয়ে পাহাড়ী নদীর বুক থেকে ভেসে উঠলো এক বড় ঝিনুক আর তার ডালা খুলে বেরিয়ে এলো পরমাসুন্দরী রানীপরী। তার দুই হাতের বিশাল দুটি ডালাতে অসংখ্য সাদা নিটোল গোল গোল সাদা মুক্তো।"

"তারপর কি দেখল সে? ঝিনুক নৌকাতে পরীর নাচ?"

আমার দিকে তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি হেনে সে বলে, "ওহ! নাচ গান নয়। তখন নদীর ওই পারে পাহাড়ের ঢালে এক জায়গাতে পাথর সরে গেল। বেরিয়ে এলো রঙ বেরঙের খুদে খুদে পরী। এরা রানীপরীর ডালা দুটো থেকে মুক্তোগুলোর কিছু গুহাতে রেখে, তার থেকে কিছু নিয়ে উড়ে গেল। এদের ওড়বার আগেই রানীপরী তাদেরকে হুকুম দিল, 'আজ রাতেই, এই মুক্তোগুলো চুপি চুপি রেখে এসো মানুষদের মনের আনাচ-কানাচে স্বপ্ন হয়ে জন্মাবার জন্য। রাত ভোর হবার আগেই ফিরে এসো। যারা তা পারবে না তাদের এই গুহাতে স্থান হবে না। প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াবে।' এই সময় আমাদের গ্রামের লোকটি ধরা পড়ে যায় আর রানীপরী তাকে সাজা দেয়।"

এ ছাড়াও কানে আসে এক উপজাতীয় প্রাচীন প্রেম কাহিনী। এক রাখাল বালক কালো মোষের পিঠে চড়ে এ দেশের রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে যায়। সে দিনের স্মরণে শরৎ পূর্ণিমার দিন মেলা বসে। আদিবাসী প্রেমিক তার প্রেমিকার কপালে সিন্দুর দিয়ে বিয়ে করে। মোষ তৈরিই থাকে। তার পিঠে চড়ে পালায় দু'জনে। তাদের পেছন পেছন গ্রামবাসীরা তাড়া করে যাবার অভিনয় করে।

মনে ভাবি এত মনোরম প্রাকৃতিক শোভা চারপাশে, কানেও এই অঞ্চলের অতীত বর্তমানের অনেক কিছু কাহিনী শুনি। আগের সময় হলে এই সব নিয়ে কত গল্পই না লিখে ফেলতাম। কিন্তু তীর বেঁধা পাখি যেমন আর গান গাইতে পারে না; চূড়ান্ত অপমানের তীর বেঁধা হয়ে আমি পাতার পর পাতা ভূতাত্ত্বিক রিপোর্ট লিখছি কিন্তু কোনও গল্পকাহিনী লিখতে চাইলেও পারছি না।

তবু মাঝে মাঝে মনের ভুলে, যা দেখি বা কানে শুনি তা লিখে ফেলার জন্য কলম ধরেই ছুঁড়ে দিই। কখনো আবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি টেকনোলজি ক্যাম্পাস উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটার দিকে। কুকুরের জিভের লালা মেখে

সেদিনের ধুলো-বালি এখনো সেঁটে আছে তার গায়ে, ঠিক যেন আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মত সেঁটে থাকা লাঞ্ছনা আর অপমানের স্মৃতির মত।

লোহাপাহাড়ের চুড়োর কাছে ক্যাম্পের নাম লোহাপাহাড় হিল টপ ক্যাম্প আর পাহাড়তলির ক্যাম্প হল লোহা-পাহাড় বেস ক্যাম্প। বেস ক্যাম্প থেকে হিলটপ ক্যাম্প যেতে হলে পাহাড়ী নদীর ওপর লোহার দড়ির সেতু পেরিয়ে গভীর জঙ্গলের বুক চিরে কালো পিচের পাকদণ্ডী রাস্তা ধরে পাহাড়ে চড়তে হয়।

তবে পিচ রাস্তাটা মাত্র বারো কিলোমিটারের আর বাকি চড়াই রাস্তাটা কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়। বলা বাহুল্য যে নিজের অভিজ্ঞ চরণের কুশল ক্ষমতায় বলীয়ান সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকি সবার জন্য এই রাস্তা ধরে হিলটপ ক্যাম্পে যাবার একমাত্র উপায় কোম্পানীর গাড়ি।



লোহাপাহাড় যাবার কাঁচা রাস্তা

সে সময়টায় আকরিক লৌহ-খনিজের ভূতাত্বিক অনুসন্ধান চলছে পুরো পাহাড়শ্রেণী জুড়ে। কোথাও প্রাথমিক সমীক্ষা চলছে তো কোথাও একদম চূড়ান্ত স্তরে পাথর ভেদ করে পাহাড় থেকে অনেক গভীর নিচ থেকে নমুনা আনার

জন্য ড্রিলিং চলছে। সব পাহাড়েই আলাদা আলাদা ক্যাম্প থাকলেও এই সব ক্যাম্পগুলোর মূল নিয়ন্ত্রণ হয় লোহা পাহাড়ের কোলে, পাহাড়ী নদীর ওপারে, বেসক্যাম্প থেকে।

বেস ক্যাম্পের অফিসে বসেন মুখ্য ভূতত্ত্ববিদ্ দীপঙ্করদা আর অনান্য প্রবীণ প্রযুক্তিবিদেরা। সদ্য কলেজ থেকে পাস করা আমরা যারা একদম আনকোরা, তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের আর থাকা খাবার ব্যবস্থাও এই বেস ক্যাম্পে।

পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবার অত্যাধুনিক বিশাল রসায়নগার এইখানে। এছাড়া খনিজ অনুসন্ধান এবং খননের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্রপাতি, ট্রাক, জীপ এসবের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড় মাপের ওয়ার্কশপ আছে এই বেস-ক্যাম্পেই। প্রায় প্রতিদিনই থাকে লোহাপাহাড়ের কোনও না কোনও অনুসন্ধান ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারির সঙ্গে বেস ক্যাম্পের কর্তাব্যক্তিদের আলোচনাচক্র।

এসবের জন্য পাহাড়ের ওপর সেই সব ক্যাম্প থেকে ট্রাক, ডাম্পার আর চারদিক খোলা শুধু মাথায় এক টুকরো সবুজ তেরপলের ছাদ লাগানো উইলিজ জীপের আনাগোনা সারাদিনই চলতে থাকত। এই রকম একটি জীপে, প্রশিক্ষণের মাঝপথেই, প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে বেস ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হল লোহাপাহাড় হিলটপ ক্যাম্পে। দারুণ সব অজানা ব্যাপার জানছিলাম আর শিখছিলাম যেগুলো নিজের কাজ ভালো করে করতে হলে জানা খুব জরুরি। আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য খনিজ অনুসন্ধানে পোড় খাওয়া ভূতত্ত্ববিদেরা তো ছিলেনই এছাড়া মাইনিং, ড্রিলিং, সার্ভের অভিজ্ঞ লোকেরা ছিলেন। এদের সবার ওপরে ছিলেন একজন প্রাক্তন বনপাল অভিক শর্মা। উনি বলতেন বেশির ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ লুকিয়ে আছে গভীর অরণ্যে। সেই কারণে আমাদের কাজের বেশিটাই গভীর অরণ্যে। এই সম্পদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা অনেক অসুবিধের কথা বলি এমন কি কাজের জায়গা ছেড়ে পালিয়েও যেতে চাই। এই সব কিছুর আসল কারণ হচ্ছে অরণ্যকে নিয়ে ভয়। আমরা সবাই প্রতিবাদে ফেটে পড়লাম। অবশ্য সেই দলে আমি ছিলাম না। আমি তো সবেতেই ভীতু।

উনি শান্ত কণ্ঠে বলে চলেন "শুধু অরণ্য নয় আমরা প্রতিটি অজানা জিনিসকে ভয় পাই। অজানা যখন জানা হয়ে যায় তখন আর আমরা তাকে ভয় পাই না। ভয় কেটে গিয়ে তখন আসে ভালবাসা।" ক্লাসে নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

পরের ক্লাসে উনি পুরো লোহাপাহাড় অরণ্যের প্রতিটি পাহাড়, এক মাত্র নদীর রকমারি বাঁক, জংগলের গাছের সারি, দুই পারের জ্যামিতিক চরিত্রের টোপোগ্রাফিক ম্যাপ আর উপগ্রহ চিত্রগুলো দেখিয়ে হাতেকলমে দেখিয়ে দিলেন যে প্রতিটি অরণ্যের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

সেটি বুঝতে গেলে সেই অরণ্যের ছোট-ছোট নদী নালা থেকে পাহাড়, গাছ, ঝোপ, ঘাস বন, জঙ্গল চিরে যাওয়া আঁকা বাঁকা শুঁড়ি পথ এবং তার শাখা প্রশাখাকে প্রথম প্রথম টোপোগ্রাফিক ম্যাপের সাহায্যে মনের মধ্যে বসিয়ে নিতে হবে।

এটা পুরো হলেই জঙ্গলের সব জায়গা যেমন চেনা হয়ে যাবে, অরণ্যকে নিয়ে ভয় ও অনেকটা কেটে যাবে।

কিন্তু অরণ্যে ভয় আমরা পাই আরও অনেক কিছু থেকে যা না জানলে, সেই নিয়ে সতর্ক না হলে বা বিধিনিষেধ না মানলে প্রাণঘাতী বিপদ ঘটতে পারে।

সেই নিয়ে আলোচনা পরের ক্লাসে হবার কথা ছিল, হয়েও কিন্তু আমার আর শোনা হয় নি। আমি তখন আমার প্রথম ফিল্ড পোস্টিং হিলটপ ক্যাম্পের পথে।

পরের ক্লাসে অভিক শর্মা কি বলতে পারেন সেই নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়েই আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। এমন সময় আমার জরুরী ডাক এল দীপঙ্করদার অফিস থেকে।

আমি যেতেই দীপঙ্করদা বললেন, "কাল হিলটপ ক্যাম্প ইনচার্জ নায়ারবাবুর সঙ্গে তোমাকে ওখানে যেতে হবে।"

লোহা-পাহাড় হিলটপ আসলে এক সুবিশাল চ্যাপ্টা মালভুমি। হিলটপের চুড়ো থেকে একটি ঝর্না বয়ে গেছে।

এই ঝর্নার অকৃপণ জলধারার কারণেই হয়তো সেখানে গভীর অরণ্য আর তাতে হিংস্র আর অহিংস্র বন্যপ্রাণীর ছড়াছড়ি। দীপঙ্করদার সুবিশাল ডেস্কে সেই সব বন্যপ্রাণীদের চার পাঁচ জনের ছবি দেখতে দেখতে কাঁপা গলায় আমি জিগ্যেস করলাম, "এখানে তাহলে কবে ফিরে আসবো? আমাদের ট্রেনিং তো এখন শেষের দিকে, তারপর পরীক্ষাও তো আছে।"

দীপঙ্করদা আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "হিলটপ থেকে তোমার যাওয়া আসা তো লেগে থাকবেই। আর পরীক্ষার জন্য চিন্তা করতে হবে না। অভিককে আমি বলে দেব। তোমার ট্রেনিং এখন হিলটপ ইনচার্জ নায়ারবাবুর কাছে হবে।"

আমাকে তাহলে লোহা পাহাড় হিল টপ ক্যাম্পে পোস্টিং করা হচ্ছে। ফিল্ড পোস্টিং আমারই সবার আগে হল আর বেছে বেছে সব চাইতে ভয়ঙ্কর জঙ্গলে।

বুঝলাম, জানলাম, সবই। জিজ্ঞাসা করে আর কিছু লাভ নেই। তবু একবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করবার জন্য বলি, "তাহলে কি হিলটপ ক্যাম্পে আমার ফিল্ড পোস্টিং হতে যাচ্ছে?"

দীপঙ্করদার জায়গায় অন্য কেউ হলে বিরক্ত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিতেন কিন্তু উনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে চায়ের অর্ডার দিলেন। আমি যে মহাভীতু সেটা উনি জানতেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে উনি বললেন, "সবচাইতে ভালো আর নিরাপদ সাইট লোহাপাহাড় ড্রিলিং ক্যাম্প আর কাজ শিখবার সব চাইতে ভালো গুরু নায়ার স্যার।"

নায়ারস্যারের নাম এখানে চীফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে মেকানিক, কর্মী, প্রশাসন, একাউন্টস সবার মুখে মুখে ফেরে। একটা লোকের মাথায় এতোগুলো বিভাগ মাখনের মত খেলে। সিনিয়র, জুনিয়র সবাই ওঁর কাছে পরামর্শ নেয়, ওঁকে গুরু বলে মানে। এটা ঠিক যে কাজ শিখতে গেলে ওঁর আগে আর কেউ নেই। কিন্তু যে ক্যাম্পের চারপাশের জঙ্গলে বাঘ,

#

হায়না, জংলি শুয়ার, শঙ্খচূড় আর পাইথনের ছড়াছড়ি সেটা যে নিরাপদ সাইট নয় তা সদ্যজাত শিশুও বোঝে। অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতায় পরে জেনেছিলাম যে বন্যপ্রাণী থেকে বেশিরভাগ আক্রমণই ঘটে মানুষের নিজের অসাবধনতা, অজ্ঞতা আর সতর্ক থাকবার উপদেশগুলোর অবহেলা থেকে।

অভিক স্যারের ক্লাসে আমার আর যাওয়া হয় নি। তবে আমি সেই পরের ক্লাসের পড়ানোটা জেনেছিলাম বা শিখেছিলাম নায়ারবাবুর তত্ত্বাবধানে হাতেকলমে। একটু একটু করে সেই শিক্ষা হয়েছিল, প্রতিদিনের কাজে বেরিয়ে প্রকৃতির ক্লাসরুমে।

ফুলের ঠিক নিচেই যেমন কাঁটা; গভীর জঙ্গলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে বিপদ যা সামান্য ভুলের বা হঠকারিতার জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে।

একটু অসাবধান হলেই বাঘ, ভালুক বা জংলি শুয়ারের কবলে পড়ে কিংবা পাহাড়ী নদীর বালিচরে চোরাবালির ফাঁদে পড়ে চিরতরে নিখোঁজ তালিকায় নাম ঠাঁই পেতে পারে।

এক হিসেবে অভিক স্যারের ক্লাসে না যেতে পেরে হয়তো ভালই হয়েছিল। প্রাণঘাতী জঙ্গলের বিপদের কথাগুলো ক্লাসরুমে শুনলে সে সময়ের মহাভীতু আমি হয়ত সব ছেড়েছুড়ে পালিয়েই যেতাম।

অরণ্যের প্রথম পাঠঃ

প্রতি বুধবার নায়ারস্যার লোহা-পাহাড় হিলটপ থেকে বেস ক্যাম্পে আসেন সাপ্তাহিক মিটিং-এর জন্য। ঠিক হল, ফেরার সময় উনি তার জীপে আমাকে লোহা-পাহাড় নিয়ে যাবেন। আগেই শুনেছিলাম নায়ারস্যার বেশ নিয়মনিষ্ঠ কড়া লোক, তবে রেগে না গেলে খুব ভালো মানুষ। কপাল দোষে, বুধবার সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই যা সব ঘটনা একের পর এক ঘটে চলল, তাতে মনে হচ্ছিল বিকালে বেসক্যাম্প ছাড়ার সময়েও উনি বেশ রেগেই রয়েছেন।

বেসক্যাম্প স্টোর থেকে পেছনে কানায়-কানায় ভরতি ট্রেলার নিয়ে, সামনে পেছনে হুড খোলা পুরানো মডেলের উইলিজ জীপ, দুপুর একটার জায়গায় বিকেল চারটের পরে বেস ক্যাম্প মেন গেট পার হয়ে লোহাপাহাড়ের রাস্তা ধরল।

নিয়মিত ড্রাইভারের জায়গায় স্টিয়ারিং হুইলে বসে লোহা-পাহাড় ড্রিলিং ক্যাম্প-ইন-চার্জ নায়ারস্যার অনেক কারণেই ভেতরে-ভেতরে রাগে ফুটছিলেন। ওঁর পাশে বসে আমি সেই রাগের আঁচ টের পাচ্ছিলাম। দফায়-দফায় লম্বা মিটিং, স্টোরের অলস সহকর্মী, গ্যারেজের মেকানিক এরা সবাই মিলে দেরি করিয়েছে। এমন কি তাঁর সঙ্গে আসা নিজের অধস্তন সহকর্মীরাও টিফিনের নামে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি করিয়ে এল। দূর থেকেই ওদের দিকে একবার শ্যেন-দৃষ্টি তাকিয়েই জীপের পেছনের সিটে বসবার ইশারা করলেন।

নায়ারস্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অন-ডিউটিতে এসবের জন্য একদিন এদের চাকরি যাবেই। আমার ড্রাইভারটা এসব ছাইপাঁশ গেলে না। আজ দেখছি এও ওদের সঙ্গে আছে।"

চারদিক উঁচু পাহাড়ে ঘেরা জায়গাতে সন্ধে নামার অনেক আগে আলো অনেক কমে যায়। আঁকা-বাঁকা সরু পাহাড়ী রাস্তা তার ওপর চড়াই রাস্তা, দিনের আলো চলে গেলে, হেডলাইটের ভরসায় গাড়ি চালানো বিপদজনক হতে পারে। শুধু যে গাড়ি চালানোই বিপদজনক তাই নয় আরও একটি বিপদও যে পাহাড়ী জঙ্গলে ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করে আছে তার আশঙ্কাও ছিল নায়ারস্যারের মনে। এই আশঙ্কা আর উদ্বেগই যে তাঁর রাগের আসল কারণ আমি সেটা বুঝলাম আর একটু পরেই। এই জীপে তখন দলবল সমেত আমরা পাহাড়ী রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে গেছি লোহাপাহাড়ের রাস্তায়। পাহাড়ী নদীর ওপর পাকা সেতুর আগে বাম্পের ওপর নায়ারস্যারের মত পাকা ড্রাইভার বোধ হয় ইচ্ছে করেই ব্রেক প্যাডালে একটু কম চাপ দিলেন। মনে হল গাড়িতে হাল্কা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে আরোহীদের নেশাগ্রস্ত ভাব কাটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ কাজটা যে উনি কতটা অপছন্দ করেছেন তার একটা বার্তা দিলেন।

ব্রিজের পর লোহাপাহাড় যাবার একুশ কিলোমিটার পিচ রাস্তা, কালো সাপের মত পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একদম ওপরে উঠে গেছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিও পেরিয়ে গেছে। বিকেলের হাল্কা রোদ, সন্ধের আঁধারকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর নিজে উঁচু পাহাড়ের বনের গাছের মাথা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের কোলে খুব ঘন জঙ্গল, কালো পিচ রাস্তা তাকে মাঝ বরাবর চিরে এগিয়ে গেছে। এই রাস্তায় আসতেই নায়ারস্যার হেডলাইট অন করে অভ্যাস মতো ভগবানের উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়েই একটা বাঁক দেখে স্টিয়ারিং হুইল আর গিয়ার লিভারে হাত ঠেকালেন।

জোসেফ এ গাড়ির নিয়মিত ড্রাইভার, সে মালয়ালিতে নায়ারস্যারকে কিছু একটা বলল। নায়ারস্যার গম্ভীর গলায় জোরে মাথা নেড়ে একবার "ক্যাট!" বলেই আমার দিকে চেয়ে বাকি কথা না বলে চুপ করে গেলেন। কিন্তু জীপের পেছনে বসা বাকি লোকরা বোধহয় সেই বিষয়েই আলোচনা শুরু করে দিল। ভাগ্যিস এদের কথাগুলো মাতৃভাষা মালয়ালিতে হচ্ছিল। একটু হিন্দি মিশিয়ে বললেই সামনে পেছনে হুড খোলা এই জীপে বোধহয় প্যান্টেই কিছু একটা করে বসতাম।

পাহাড়ী রাস্তায় প্রথম বাঁক শুরু হবার আগে, নায়ার স্যার ক্লাচে পা দিয়ে গিয়ার বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় বেড়াল নিয়ে আলোচনা বন্ধ করার জন্য সবাইকে এমন ধমকানি দিলেন যে চড়াই পথে জীপের ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু মিনিটখানেক পরে ঘন পাতা ঝোপের আড়ালে যাকে দেখা গেল জোসেফ আর বাকিরা কি তাকেই "ক্যাট" বলছিল?

প্রথম বাঁকটা পার হবার পর বেশ অনেকটা রাস্তা সমতলের মত, চড়াই-উতরাই নেই। জীপের ড্রাইভিং সিটের দিকে মানে নায়ারস্যারের দিকে মানুষ-সমান উঁচু ঝোপ আর আমার দিকটায় ঢালু উপত্যকা। দূরে সমতলে বেস-ক্যাম্পের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ কিছু একটা দেখে নায়ারস্যার জোরে ব্রেক দিয়ে জীপ থামিয়ে দিলেন। জীপের পেছন দিক থেকেও সবাই সমস্বরে কিন্তু চাপা আওয়াজে কিছু বলে উঠল। সবাই কিছু একটা দেখেছে আর আমি সামনের আসনে নায়ারস্যারের পাশে বসে তা টেরই পেলাম না?

#

ম্যাথিয়াস আমার পেছনেই বসে ছিল। আজ সকালে নায়ারস্যার ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর মনে হচ্ছিল ড্রিলিংক্যাম্পে আমার যাওয়াটা ওর অপছন্দ। নায়ারস্যারের পরেই ওর জায়গাটা আর থাকবে না বলে কি? সেই মাথিয়াস, তার এক হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে বললে, "একদম চেঁচাবে না। আমরা যা করতে বলব তাই করবে।" অন্য হাতের আঙ্গুল তুলে আমাকে আবার বললে, "দেখতে পাচ্ছ? একদম তোমার সামনেই।"

আমি এতক্ষণ যেদিকে তাকিয়েছিলাম সেই ঢালু উপত্যকার দিকেই তো ও আঙ্গুল উঁচিয়ে কি দেখাতে চাইছে? আমাকে কি জীপ থেকে ওইদিকে ঠেলে ফেলে দেবে? নায়ারস্যারও চুপ, মানে এরা সবাই মিলে একজোট হয়েছে! তাহলে কি করি আমি তাহলে এখন?

নায়ারস্যার আমার দিকে একবার তাকিয়ে বুঝলেন আমি এখনো দেখিনি কিছুই। উনি ফিসফিস করে বললেন, "আমার আঙ্গুল বরাবর ঝোপের দিকে তাকাও। এবার ঠিক ওইখানটায় যেখানে ঝোপ একটু নড়ছে বলে মনে হচ্ছে দেখতে থাকো আর ম্যাথিয়াস যা বলছে তাই করো, নইলে তোমার জন্যে সবার বিপদ হতে পারে।" ও হরি! আমি তো এতোক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম উপত্যকার দিকে।

নায়ারবাবুর কথা মতো ঝোপের দিকে চাইতেই, বড়োজোর পঞ্চাশ মিটার দূরে, একজোড়া জলন্ত আগুনের ভাঁটার মতো কি একটা দেখলাম। মুহূর্তকয়েক সেদিক তাকাতেই বেশ বড়সড় একটা ডোরাকাটা মাথা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে এনে আমার হাতে রেখে হাতটা কানের কাছে নিয়ে এল। ঠিক এই সময়, যাত্রাতে রাজা যখন স্টেজে ঢোকে ঠিক সেই চালে, জঙ্গলের রাজা এবার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। পালা এবার শুরু হবে আর আমি যেন সবচাইতে দামী আসনে একদম সামনে বসে সেই পালা দেখছি।

জীপের জ্বলন্ত হেডলাইটের দিকে একবার তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়েই মুজরার আসরে রাজামশাই যেভাবে বসেন, তেমন ভাবে সরু কালো পিচ রাস্তাটার ওপর আধ শোয়া হয়ে, ঘাড়টা একবার আমাদের দিকে ঘুরিয়ে আবার একবার তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি হেনেই মাথাটা উল্টো দিকে সরিয়ে নিলে।

অবাক কথা, সামনে পেছনে হুডখোলা জীপের সামনের আসনে বসে পঞ্চাশ মিটারের কম দূরে জঙ্গলের বাঘকে দেখে আমার মত মহাভীতুও যেন ভয় পেতেই ভুলে গেল। এই ঘটনার পর টানা তিন বছর গভীর জঙ্গলেই কাটিয়েছি। বাঘ, পাইথন, ভালুক এই সব হাড়হিম করে দেওয়া জন্তু জানোয়ারদের সামনা-সামনি পড়েছিও বেশ কয়েকবার কিন্তু ভয় আর পাই নি। জঙ্গলের একটা বহুল প্রচলিত মুখে- মুখে ফেরা কথা, এই সব বিপদে বারবার পরখ করে নিয়েছি, "প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর বিপদ যখন তোমার চোখের সামনে আসবে তখন তুমি ভয় পেতে ভুলে যাবে।"

নায়ারস্যারের মত পোড় খাওয়া লোক আমার দিকে তাকিয়ে এটা বুঝতে পেরে ম্যাথিয়াসকে আমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিতে বললেন। লক্ষ্য করলাম নায়ারস্যার তাঁর দুটো পা ব্রেক আর ক্লাচ প্যাডে রেডি রেখেছেন যাতে গাড়ি যে কোনও সময়ে দৌড়াতে পারে। এরকম একটা বিপদের সামনে পড়ে নায়ারস্যার বা সদ্য নেশা করে আসা তার সহচরদের কাউকেই নার্ভ হারাতে দেখিনি, কাউকে একটা টুঁ শব্দ করতে শুনলাম না এবং আমিও তাই করলাম। অবচেতন

#

মনে এই শিক্ষণীয় ব্যাপারটা যে অনেক গভীরে রেখাপাত করে গেল সেটা অনেকদিন পরে এইরকমই সব ঘটনাগুলোর সামনে এসে বুঝলাম। গাড়ির আলো আর ইঞ্জিনের শব্দ কি রকম যেন ঠেকছিল।

নায়ারস্যার ফিসফিস করে জোসেফকে বললেন, "বেসক্যাম্প গ্যারেজের মেকানিককে ফ্যান বেল্ট আর ডায়নামো বদলাতে বলেছিলে?"

"জী সাব"

"ফুয়েল ইঞ্জেকশানটা আর টিউনিং?"

"ঠিক করে দেবে বলেছিল সাব।"

"ফাঁকি মেরেছে সে আর তুমি তো বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের না অন্য কিছুর দোকানে ব্যস্ত ছিলে। নিজের চোখেই দেখ, ডায়নামো ব্যাটারিকে চার্জ করছে না, টিউনিংও ঠিক করে নি, এয়ার নিচ্ছে এঞ্জিন।"

ম্যাথিয়াস বলল, "জী সাব, হেড লাইট তো হলুদ হয়ে আসছে, আর ইঞ্জিনের চাল এখন ভালো না।"

নায়ারস্যার ফিসফিসিয়েই হুকুমের স্বরে বললেন, "বাজে কথা একদম বন্ধ করো সবাই। সিটের তলা থেকে হাতিয়ার বের করে তৈরি রাখ। যে কোন সময় দরকার হতে পারে।"

এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। বেআইনি হলেও প্রাণ রক্ষার জন্য চোরাগোপ্তা বন্দুক-টন্দুক আছে তাহলে। নয়ত এই অবস্থায় ব্যাটারি জবাব দিলেই অন্ধকার নেমে আসবে। সেই সঙ্গে এয়ার নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলেই আর দেখতে হবে না।

শব্দ আর আলো দুটোই নেই দেখলেই রাজামশাই বিনা দ্বিধায় হুড খোলা জীপে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পেছন থেকে ডিজেলের গন্ধ নাকে আসতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ম্যাথিয়াস আর তার সঙ্গীসাথিরা সিটের তলা থেকে একপ্রান্তে অনেকটা মোটা কাপড় বাঁধা বেশ কয়েকখানা কাঠের লাঠি বের করছে।

নায়ারস্যার তাড়া দিচ্ছেন, "নিকাল লিয়া হাতিয়ার সব? ম্যান্টল টাইট করে নিয়ে ডিজেলে চুবিয়ে তৈরি রাখ।" তাহলে এই হল হাতিয়ার! এ দিয়ে তো রাস্তার নেড়ি কুকুরও তেমন ভয় পাবে না।

লাঠির আগাতে যে মোটা কাপড় বেঁধে রেখেছে ম্যান্টল না কি জানি বলছে এ দিয়ে কি করবে? বাঘের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে যেতে বলবে? চিড়িয়াখানাতে পিঁজরাতে রাখা বাঘের সঙ্গে এ রকম রসিকতা চলতে পারে। তাই বলে যে জঙ্গলি বাঘ মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে রাস্তায় আধশোয়া হয়ে নরম নোনতা নরমাংসের অপেক্ষা করছে সে কি এসব রস-রসিকতার ধার ধারবে?

হেডলাইট মাঝে মধ্যে দপ দপ করছে আর বেশ হলুদ হয়ে আসছে। ইঞ্জিন একটু বেচাল হলেই এক্সেলেটর দাবিয়ে নায়ারস্যার তাকে উস্কে দিচ্ছেন। এমন সময় মহারাজা আলো অথবা এঞ্জিনের ব্যাক-ফায়ারের ফাটা আওয়াজে

#

বিরক্ত হয়ে এবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে বিশাল মুখ খুলে সব কটা দাঁত দেখিয়ে একটা হাই তুলল। হেড লাইটের হলুদ ম্লান আলোতেও তার চোখ দুটো আর দাঁত যেন ঝলসে উঠল।

নায়ারস্যার আমার কাঁধে টোকা দিতেই চমকে উঠলাম। ওঁর হাতে ধরা মাথার দিকে কাপড় বাঁধা একটা লাঠি আর একটা গ্যাস লাইটার আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি কাপড় বাঁধা দিকটা হাতে ধরেছি দেখে আমাকে ঠিক কিভাবে মশাল ধরতে হবে দেখিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে নায়ারস্যার বললেন, "এটা মশাল। কাপড়-বাঁধা দিকটাতে লাইটার দিয়ে জ্বালালেই জ্বলে উঠবে। মশাল আর লাইটার হাতে তৈরি রাখো আর আমাদের ইশারার জন্য তৈরি থাক। বিপদ আঁচ করতে পারা মাত্র আমি বা ম্যাথিয়াস তোমার কাঁধে হাল্কা টোকা দেব।"

আমি ভয়ার্ত স্বরে খুব ফিসফিসিয়ে বললাম, "তারপর?"

নায়ারস্যার মনে হল খুবই বিরক্ত হলেন আমার কথা শুনে, "তারপর আর কি! আমরা সবাই জীপ থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ব আর মুহূর্তের মধ্যে যে যার মশাল জ্বেলে নেব। কিন্তু আমাদের ইশারার অপেক্ষা না করে নিজে কিছু করলেই আমরা সবাই বিপদে পড়ব।"

নায়ারস্যারের কথাটা শেষ হয়েছে কি হয় নি, ঠিক সেই সময় ইঞ্জিন দু তিন বার কাশতে কাশতে চুপ করে গেল। তার একটু পরেই হেড লাইটের আলোও নিভে গেল। চাঁদের আলো আছে কিন্তু সেটা পূর্ণিমার অর্ধেকের অর্ধেক, তার ওপর মেঘের আনাগোনাতে কাস্তের ফালি চাঁদ মাঝেমাঝেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে। সেই হাল্কা আলোতে রবারঘসা পেন্সিল স্কেচের মত বসে থাকা বাঘের আবছা অবয়ব বেশ কষ্টের সঙ্গে ঠাহর করা যাচ্ছে।

জীপের ইঞ্জিন বন্ধ হবার পর নিস্তব্ধতা ঘিরে এল। শুধু মাঝে মাঝে হাওয়াতে ভেসে আসছে কাছের একটা পাহাড়ী ঝর্নার জলনূপুর। তার সঙ্গে তাল ঠুকে সুস্বাদু নরমাংসের তোফা জলযোগ নেচে চলেছে বাঘের কপালে।

নায়ারস্যার ফিসফিসিয়ে বললেন, "কেউ নড়বে না, অপেক্ষা কর একটুক্ষণ।" একটু পরে কিন্তু অবস্থাটা আরও বিগড়ালো। মেঘগর্জনকে ছাপিয়ে এবার বাঘের ডাক শোনা গেল, কিন্তু আওয়াজটা শেষ হবার আগে বোঝা গেল এটা নিচে খাদের দিক থেকে। তাহলে আরও একটা বাঘ হয় মানুষের গন্ধ পেয়ে গেছে নয়ত এই সামনের বাঘটি হালুম হুলুম চিৎকার করে খবর পাঠিয়েছে তার বন্ধুকে। এতোগুলো মানুষ দিয়ে একসঙ্গে দুজনে মিলে ডিনার সারবে। ভালো খাবারের খবর পেয়ে তারও আসার দেরি নেই আর।

চিৎকার- চেঁচামেচির তো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু দেখলাম আমার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুই পা থেকে একের পর এক ঠাণ্ডা স্রোত আছড়ে পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছে যেন এখানের কুখ্যাত ম্যালেরিয়া আমাকে ধরে ফেলল নাকি। বাড়ির সকলের মুখগুলো একবার ভেসে উঠল। একটু জল হাতের কাছে থাকলে বড় ভালো হত, গলা আর ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। পেছনে দুটো বড় বোতলে জল আছে, ঘাড় ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে সবার নির্লিপ্ত মুখভাব দেখে একটু অবাক হলাম। বোতলে হাত লাগাতে যাবার আগেই আবার খাদের ধার থেকে বাঘের ডাক শোনা গেল, এটা কিন্তু

#

আগের থেকে আরও জোরে আর স্পষ্ট শোনা গেল। জীপের বাকি সবাই কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে সমস্বরে হিন্দিতে বলে উঠল, "জয় বজরঙবলি, বাঁচা গেল।"

শিয়রে জোড়া শমন আর এরা বলছে, "বাঁচা গেল" কিন্তু দেখি নায়ারস্যারও একগাল হেসে বললেন, "হ্যাঁ মনে হচ্ছে রাস্তা এবার জলদি সাফ হয়ে যাবে।"

আমি মনে মনে বললাম, "হ্যাঁ তা আর বলতে, আমরা এখন নিজেরাই সাফ হয়ে যাব বাঘের পেটে গিয়ে।"

দেখি এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে থাকা বাঘ এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এত কাছ থেকে বাঘের পিলে চমকানো আওয়াজ শুনিনি আগে। তাই একবার মনে হল একসঙ্গে অনেক মেঘ গর্জে উঠছে।

একটা জোর ঝাঁকুনিতে আমার জ্ঞান ফিরে এল। এই ঝাঁকুনিটা ডিজেল জীপের ইঞ্জিন চালু হবার। রাজামশাই খাদের ঢালের আড়ালে অদৃশ্য হতেই আমার অসমসাহসি সহচরেরা বিদ্যুৎ গতিতে জীপ থেকে নেমে জোর ঠেলা লাগিয়ে আবার উঠে পড়েছে।

স্টিয়ারিং হুইলে নায়ারস্যার শ্যেন দৃষ্টি রেখেছিলেন খাদের দিকে। এই জন্য, আমার এক-আধ মিনিটের জ্ঞান হারানো এবং আবার ফিরে আসা, ওঁর নজর এড়িয়ে গেল নইলে পরে সবার হাসির খোরাক হতাম। কমজোরি হেডলাইটেও, একের পর এক চুলের কাঁটার মত পাহাড়ী পাকদণ্ডি রাস্তা, নায়ারস্যার কুশলী হাতে স্টিয়ারিং সামলে অনায়াসে পার করছিলেন।

লোহাপাহাড় হিলটপে পৌঁছাবার অর্ধেকের বেশি রাস্তা পার হয়ে এসেছি। কিন্তু এখনো খাদের বাঘের পর পর দুটো ডাক নিয়ে আলোচনা চলছেই। ডাকটা বাঘের না বাঘিনীর এই নিয়ে জোরালো তর্ক চলছে। মনে হচ্ছে আচমকা বাঘের সামনে পড়ে যাওয়া নয়, কোনও সদ্য সমাপ্ত টি-২০ ম্যাচ খেলে ফিরছি আমরা আর নায়ারস্যার কুশলী পোড় খাওয়া অধিনায়কের মত ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাচটা সবাইকে দিয়ে জিতিয়ে আনালেন।

জোসেফ আমাকে দলে টানবার জন্যে বললে, "সাহেব, খাদের ধার থেকে আওয়াজটা বাঘিনীর ডাক বলেই আমাদের সামনে রাস্তা জুড়ে বসে থাকা বাঘটা আর বিলম্ব করতে সাহস পেল না। নয়তো আমাদের ছাড়া পেতে আরও সময় লাগত।"

জোসেফের পাশে যে বসেছিল সে মানতে রাজি নয়, "কিন্তু বাঘিনীর আওয়াজ এতো জোরে পিলে চমকানো হয়?"

জোসেফের বন্ধু মাধবন বলে, "কেন তুই কি ভেবেছিলি বাঘিনী বলে তার গলা দিয়ে বাঁশির সুর বেরোবে? এই তো সবে দুমাস হল এসেছিস আরও শোন তবে না বুঝবি।"

ম্যাথিয়াস আমাকে বললে, "সাহেব, বাঘ আদতে বাউণ্ডুলে প্রকৃতির কিন্তু বছরকার এই কয়েকটা মাস সে তখন ফ্যামিলি ম্যান হয়ে যায় আর বাধ্য স্বামীর মত বউয়ের ফাই ফরমাস খাটে। আমরা যখন খাদের ধার থেকে বাঘিনীর ডাক শুনতে পাই তখনই বুঝে নিয়েছিলাম রাস্তা জুড়ে এই বাঘ আর বেশিক্ষণ নয়।"

আমি বলি, "কিন্তু বাঘ আর বাঘিনীর আওয়াজ আলাদা হয় নাকি?"

জোসেফ বলে, "স্যার, শুনতে শুনতে আপনিও আমাদের মত বুঝতে পেরে যাবেন।"

তার মানে এখানে আরও অনেকবার তাহলে... রিপোর্টে যা লেখা আছে সেসব তাহলে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

আমার মুখের দিকে চেয়ে নায়ারবাবু বললেন, "যে বাঘ দেখা যায়, সে অতটা ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু সে যখন শিকারি হয় তখন তার শিকার তাকে দেখে একদম শেষ সময়ে। অনেক সময় সে সুযোগও বাঘ দেয় না। আরও জেনে রাখুন বাঘ নরখাদক না হলে মানুষকে এড়িয়েই চলে।"

মনে হচ্ছে আর একটা বাঁক পেরোলেই লোহাপাহাড় চুড়ো। ড্রিলিংক্যাম্প সেই চুড়োর ঠিক কোলে অনেকটা সমতল জায়গা জুড়ে। বোধকরি ক্যাম্পে ঢোকবার আগেই আমার জন্যই এখানের আরণ্যক প্রকৃতি একটা হাতেকলমে শেখবার ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার সাথীরা আমাকে অনেকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মত করে দেখিয়ে দিলেন যে অরণ্যে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিভাবে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

আমাদের জীপ বাঁক পেরোতেই চোখে পড়ল এক বিশাল গেট আর চারদিক উঁচু দেওয়ালে ঘেরা হিলটপ ক্যাম্প। দেয়ালের ওপর আরও বেশি সুরক্ষার জন্য মিটার খানেক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

ম্যাথিয়াস সেদিকে দেখিয়ে আমাকে বললে, "এই দেওয়াল ছাড়াও চারদিকে রয়েছে পাহারাদারেরা। এরা সবসময় কড়া নজর রাখে। নায়ার স্যার পুরো ক্যাম্পটা দুভাগে ভাগ করেছেন; পাহাড়ধার আর খাদের ধার। আপনার তাঁবু কোনদিকে খাটাবো?"

জোসেফ বললে, "পাহাড়ধারে একটু গরম বেশি তবে এই জীপের আমরা সবাই সেখানেই আছি। এছাড়াও অন্য আরও সবাই মিলে বেশ জমজমাট। আড্ডা ফুর্তি তাসখেলা এমন সব নিয়ে অবসর সময় কিভাবে কেটে যায় বোঝা-ই যায় না।"

"আর খাদের ধারে?"

"ওদিকে থাকতে চাইলে আপনার তাঁবু হবে ওইদিকে সবার শেষে, একটা নতুন সারিতে। এমনিতে খুব সুন্দর জায়গা। সবসময় হাওয়া বইছে আর রোদের তেমন জোর নেই তবে..."

"তবে কি?"

#

জোসেফ বলে, "মাঝ রাত থেকে একটু ঘুমের অসুবিধে হতে পারে। খাদের ধারের জঙ্গল থেকে হায়েনা আর শেয়াল প্রহরে প্রহরে ডেকে যায়। এছাড়া কখনো কখনো বাঘের ডাকও শোনা যায়। আপনার কোনও কারণে যদি ভয় লাগে তো আমাদের তাঁবুগুলো একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে।"

নায়ারস্যার বিরক্ত হলেন বোধকরি ভয়ের কথা শুনেই। ভুরু কুঁচকে ম্যাথিয়াসকে বললেন, "উনি আপাতত গেস্ট হাউসেই থাকুন। দু-এক দিন ওঁকে সময় তো দাও।"

অরণ্যের অশরীরীরাঃ

গেট তো নয় কোনও রাজবাড়ির সিংহদুয়ার যেন। সেটা পার করতেই বিশাল এক দোতলা কাঠের বাড়ি, দুটো তলাতেই প্রশস্ত বারান্দা আর তাতে জায়গায় জায়গায় বেলজিয়াম কাচের দেওয়ালগিরির স্ফটিক থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। কেমন যেন একটা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ছাপ পুরো বাড়িটাতে।

নিচের তলায় প্রধান অফিস আর স্টোর। নায়ারস্যার সেখানে বসেন আর ওপরে দশটি ঘর নিয়ে অতিথি নিবাস। আজ সেখানে আমি ছাড়া আর কোনও অতিথি নেই। রাত দশটার পর বনবিভাগের নির্দেশে জেনারেটর, ট্রানজিস্টার রেডিও বা টেপ রেকর্ডার চালানো নিষেধ। খুব প্রয়োজন ছাড়া টর্চ বা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালানোতেও আপত্তি আছে।

আমার জন্য রাতের খাবার নিয়ে এসেছিল অতিথিনিবাস রক্ষক, অসম রাইফেলসের প্রাক্তন নায়েক সুবেদার মনিরাম সিং। বাংলাটা ঝরঝর করে বলতে পারে। তার মুখেই এই সব শুনে ঝটপট খেতে বসে গেলাম। বহুদিন পর টাটকা সবজি, মাছের ঝোল আর জুঁই ফুলের মত সাদা ভাত দেখে মন আনন্দে ভরে উঠলো। ঠিক বুঝলাম না এই জঙ্গলে এত টাটকা সবজি বা মাছ পেল কোথা থেকে?

মনিরাম বলছে, "সব কিছু লোকাল!"

এই গহীন অরণ্যে নিশ্চয় আশেপাশে গ্রামও নেই আর কোনও হাটও বসে না। ব্যাপারটা কাল ম্যাথিয়াসদের জিগ্যেস করতে হবে। মনিরাম সিং যাবার সময় দোতালার বারান্দা থেকেই ওর তাঁবু দেখিয়ে দিল। কোনও দরকারে ডাক দিলেই ও দৌড়ে চলে আসবে। সারাটা দিন বিরক্তি ক্লান্তিতে কেটেছে। তারপর সন্ধের একটা অংশ তো কেটেছে ভয় আর উত্তেজনার মধ্যে। এসব মিলিয়ে- মিশিয়ে এমন একটা অবস্থায় আছি যে ঘুম আসছে না।

সামান্য একটু তন্দ্রার মত আসি আসি করছিল কিন্তু মনে হল পাশের ঘরে কি একটা ফিস-ফাস স্বরে কথা চলছে। পাশের ঘরে যেন অনেকেই আছে। আমার ঘরের দেওয়ালের কাছে এসে কান পাতলাম। আর কোনও আওয়াজ নেই।

বিছানায় আবার ফিরে যাচ্ছি, এই সময় মনে হল আমার ঘরের লাগোয়া ওয়াশরুমে কেউ যেন আছে। প্রথমবার কানে যেতে বিশ্বাস হয়নি। ক্ষণেক পরেই আবার শুনি সেই আওয়াজ। এবার আর ভুল হল না। এটা নুপুরের আওয়াজ।

ব্যাপারটা কি? এই ঘরে আমি আসার পর একবার হাল্কা হতে ওয়াসরুমে গেছি। আর কেউ এটা ব্যবহার করছে এমন কোনও চিহ্ন চোখে তো পড়ে নি। জামাকাপড় বদলে এই ঘরের বাইরের বারান্দায় পাতা ডেক চেয়ারে কিছুক্ষণ গা এলিয়ে পায়চারি করেছি বারান্দায়। বারান্দার রেলিঙের ধারে গিয়ে দূরে বয়ে যাওয়া নদীর আওয়াজ আর নদীর অন্য পারে লোহাপাহাড়ের আর একটি বাহুর দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলাম। হয়তো সেই সময় কেউ আগের অভ্যেস মতো ঢুকে গিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু ওয়াশরুম থেকে আসা নূপুরের আওয়াজ বলছে তাঁর নারী হবার সম্ভাবনাই বেশি। ঘন অরণ্যের মাঝে, ফিল্ডক্যাম্পে পুরুষ নর্তক হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

কিন্তু পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে কোনও মহিলা অতিথিনিবাসে ঢুকে গেল আর লুকাল কি না আমারই রুমের ওয়াশ-রুমে? ব্যাপারটা আমাকে বদনাম করার জন্য কোনও পাতা ফাঁদ নয়ত?

ব্যাপারটা যাই হোক আমার আর এই রুমের মধ্যে থাকা উচিত নয়। চান-ঘরে কে আছে দেখতে গেলে কোনও ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়তে পারি।

দরজার কাছেই একটা প্রমাণ সাইজের মোটা লাঠি নজরে এল। সেটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি যে বাইরে বেরিয়ে গেছি সেটা জানান দিতেই দরজাটা বেশ সশব্দে খুলে বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি জানান দেবার জন্য ইচ্ছে করে জোরে জোরে পা ফেলে নেমে যাবার শব্দ করলাম। কাঠের সিঁড়িতে একটু জোরে পা ফেললেই বেশ আওয়াজ হয়। কেউ যদি কোনও নিরীহ কারণেই ঢুকে থাকে তাকে যেতে দেবার একটা সুযোগ তো দেওয়া উচিত।

দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। জেনেরেটরের আওয়াজ বন্ধ হওয়ায় এখন ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ আর থেকে থেকে পাহাড়ী নদীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিক থেকে ফিরে আমার রুম পার করে একদম কোনের দিকে মিসকালো অন্ধকারে ঘাপটি মারার মত করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আকাশে এখনো সন্ধ্যের দুর্বল একফালি চাঁদের ওপর চলন্ত মেঘ ছোঁ মেরে তার নিস্তেজ আলো কেড়ে নিচ্ছে আবার যাবার সময় দয়া করে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

সে যাই হোক, মেঘের সঙ্গে চাঁদের এই আলো-আঁধারির ছেলেখেলাতে, পুরো বারান্দার ওপর নজরদারি করাটা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে কেউ অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু সে আদৌ গেল কি না সেটা জানা আমার জন্য খুব জরুরি। এইজন্যই এবার নজর চারদিকে ছড়িয়ে দিতেই হচ্ছে। সেটা করতে গিয়েই একটা গা শিরশির করা রোমহর্ষক দৃশ্য নজরে এল। এটা আজ অবধি সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বা মেনে নিতে পারিনি।

চারদিক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা গেস্ট হাউসের সামনের মান্ধাতা আমলের গেট এখন বন্ধ। গেস্ট হাউসের থেকে সামান্য দূরেই তিন মানুষ উঁচু সিংহ-দুয়ার ধাঁচের মেন গেট। নিরাপত্তা কর্মীরা সেই গেট বন্ধ করে এখন

#

গেট থেকে সামান্য দূরেই ওয়াচ টাওয়ার থেকে পুরো ক্যাম্পের ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে চোখ সামান্য সরাতেই নজরে চলে গেল খাদের দিকে। ভাসন্ত মেঘের দল বিদায় নেওয়াতে চাঁদের আলো এখন কিছুটা স্পষ্ট।

জলের প্রবল স্রোত নিয়ে পাহাড়ী নদীর আওয়াজ আসছে। পাহাড়ী নদী লোহাপাহাড়ের অন্য বাহুকে ছুঁয়ে গেছে।

সেই দিক থেকে চোখ সরিয়ে এবার আর এক বার আমার রুমের আর সিঁড়ি রাস্তার দিকে নজর দিতে যাব এমনি সময়েই যা দেখলাম তাতে সব কিছু ভুলে গিয়ে লোহাপাহাড় সেই বাহুর চুড়োর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখতে বাধ্য হলাম। নদীর পাশের পাহাড়চুড়োতে এখন আলো জ্বলছে বেশ অনেকগুলো। কিছুক্ষণ আগেই চাঁদের ক্ষীণ আলোতে নদীর পাশের পাহাড়চুড়ো দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে তখন এই আলোগুলো ছিল না। অন্ধকারে আলো দেখা গেলে তা নজরে আসতে বাধ্য। পাহাড়চুড়ায় কোনও পুকুর বা জলা জায়গাতো হতেই পারেনা। তা হলে এগুলো আলেয়ার আলো বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জন-মানবহীন এই সব দুর্গম খনিজ আকরিকের চড়াই পাহাড়ে রাখালেরাও পশু চরাতে যায় না। তাহলে এই গভীর রাতে এতোগুলো ছোট ছোট আলো ওখানে কে বা কারা জ্বালিয়েছে?

একসঙ্গে কেউ এতোগুলো ছোট ছোট উনান ধরায় না। তাহলে কি এগুলো দীপের শিখা? তবে কি ওখানে কোনও তান্ত্রিকের সাধনা শুরু হয়েছে? আমি এই রকম কিছু অনেক আগে পড়েছি তন্ত্রসাধনার কোনও বইতে। সবেমাত্র আমি এই কথা ভাবছি ঠিক সেই সময় যা দেখলাম তাতে গা শিউরে উঠলো।

দীপশিখার সারির ঠিক মাঝখানের দুটি দীপ একটু ওপরে উঠেই অনুভুমিক ভাবে একে অন্যের বিপরীত দিকে সরে গেল। এরপর দুটি দীপই একসঙ্গে প্রায় সাত আট ফুট সোজা ওপরে উঠে আবার পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে খুব কাছাকাছি চলে এল। মনে হল যেন একটা সাত আট ফুটের মানুষ দুটো দীপ জমি থেকে দুই হাতে তুলে নিয়ে ওঠাল তার মাথার ওপর রাখবে বলে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। বাকি দীপগুলোও ঠিক সেইরকম ভাবে উঠে এল তবে চার পাঁচ ফুটের মত। এই রকম প্রায় সাত জোড়া দীপ দেখা যাচ্ছে।

সামনের দীপজোড়া সাত আট ফুট উঁচুতে। তার পিছের দীপজোড়াগুলো ক্রমান্বয়ে একটু একটু করে কম উচ্চতার। সব চাইতে পেছনের দীপজোড়া মাটি থেকে প্রায় দু তিন ফুট উচ্চতায়।

যখন তান্ত্রিকের ক্রিয়া শুরু হয় সেই তন্ত্র-সাধনার বইতে এইরকমেরই কিছু অনুষ্ঠানের কথা লেখা আছে বলে আবছা আবছা মনে পড়ল। জ্বলন্ত চোদ্দ প্রদীপের নড়াচড়া দেখছি আর মনে আনতে চেষ্টা করছি এরপর সেই বইটাতে আর কি লেখা ছিল।

যদি আমি ধরে নি যে এগুলো তান্ত্রিকের ক্রিয়া তাহলে এরা দলে মোট সাতজন প্রতেকের মাথায় দুটি করে দীপ।

সামনে সাত আট ফুট লম্বা কাপালিক আর তার পেছনে তার চেলারা। একজন ছাড়া বাকিরা সবাই চার থেকে পাঁচফুটের। যারা চার পাঁচ ফুটের তারা হয়ত পূর্ণবয়স্ক। কিন্তু সবার শেষে যে আছে সে কিন্তু দু তিন ফুটের মানে সে হয়ত বালক। হয়ত কোনও তান্ত্রিকক্রিয়ার জন্যই এই বালক ওখানে আছে।

হঠাৎ সেই তন্ত্রসাধনার বইটার একটা পাতা যেন চোখের সামনে ভেসে এল। আর সেটা মনে হতেই গায়ের সব লোম শিউরে উঠলো। ব্যাপারটা এই রকমও হতে পারে।

ওই পাহাড়ে এক কাপালিক আর তার চেলা- চামুণ্ডারা তান্ত্রিকক্রিয়া শুরু করবার বিধান অনুযায়ী মাথায় জোড়া দীপক নিয়ে একসারিতে দাঁড়িয়েছে। সেই সারিতে সবার শেষে আছে মাথায় দীপক নিয়ে এক বালক যাকে সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে নরবলির জন্য।

হ্যাঁ আমি শতকরা একশো ভাগের বেশিই নিশ্চিত যে তন্ত্রসাধনার সেই বইটাতে এইরকমই কিছু লেখা ছিল। হঠাৎ ওই পার থেকে একপাল শেয়াল কেঁদে ওঠার মত করে খুব জোরে উঁ উঁ উঁ করে ডেকে উঠলো। সেই শুনে খাদের ধার থেকে কর্কশ আওয়াজে, "ট্যাঁ, ট্যাঁ ট্যাঁ" ডাক দিয়ে একটা বড় পাখি উড়ে গেল নদীর দিকে। এর আগে অনেকক্ষণ ধরে টুই টুই করে একটা রাতজাগা পাখি ডাকছিল। ভয় পেয়ে সেও এবার চুপ করে গেল। একটা কিছু যে নিষ্ঠুর কাণ্ড হতে যাচ্ছে তা এরাও টের পেয়েছে।

এবার পাহাড়ের দিকে নজর ফেলতেই দেখি সেই কাপালিকের দল এবার বালকটিকে তাদের মাঝে রেখে পাহাড় থেকে নিচে নামছে একসারিতে বেশ দ্রুত পদক্ষেপে। নিচে নামলেই তো খরস্রোতা নদী। তবে কি নদীতেই বালকটিকে স্নান করিয়ে সেখানেই নরবলি দেওয়া হবে? এরপর মুণ্ডহীন বাকি ধড় ভাসিয়ে দেবে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর জলে?

এসব দেখে আমি ওয়াচ টাওয়ারের দিকে চিৎকার করে ডাকলাম রাতের প্রহরীদের। প্রথমবার গলা দিয়ে শুধু ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোলো। পরের বারের চেষ্টায় শুকিয়ে যাওয়া গলা থেকে তেমন জোর আওয়াজ হল না।

"নদীর ওপারে কাপালিকের দল একটা বাচ্চাকে বলি দিতে যাচ্ছে। চল সবাই, দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচাই।"

বড় ওয়াচ টাওয়ারে থেকে কোনও সাড়া নেই। আমার এই চিৎকারে তেমন জোর হয়ত ছিল না। কিন্তু নিস্তব্ধ এই রাতের অরণ্যে বহু দূরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আর রাতজাগা পাখির থেকে থেকে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে বড়ো জোর পঞ্চাশ মিটার দূরে ওয়াচ টাওয়ারের লোকগুলো আমার আওয়াজ শুনতে পেল না? রাতে চারদিকে নজর রাখাই যাদের কাজ, অত উঁচু ওয়াচ টাওয়ারে থেকে নদীর ওপারের পাহাড়ের জ্বলন্ত দীপের সারি তাদের নজরে এল না? তাহলে রাতে পাহারার সময় ওয়াচ টাওয়ারে চড়ে কখনো- সখনো একটুআধটু শুধু ঢুলে পড়া নয় পাহারার নামে এরা বেশ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

ঠিক এইসময় আমার রুমের দরজার কাছে স্পষ্ট নূপুরের আওয়াজ শুনলাম। রাস্তার কালো পিচের চাইতে বেশি গাঢ় অন্ধকারে নিজের গায়ের লোমই ঠাহর হচ্ছে না। নূপুরের আওয়াজ আমার দরজা থেকে একটু এগিয়েই বন্ধ হয়ে গেল। নাঃ আর নয়, যেইই হোক আর আমার কপালে যা লেখা থাকে থাকুক, এর একটা হেস্তনেস্ত এখুনি করতেই হবে। নিজের রুম থেকে বেরবার সময় যে প্রমাণ সাইজের লাঠিটা হাতে নিয়েছিলাম সেটা বেশ শক্ত করে আঁকড়ে চেপে রেখে চ্যালেঞ্জের সুরে হিন্দিতে বললাম, "কে, কে ওখানে? উত্তর দাও নয়ত লাঠির বাড়ি পড়বে?"

#

এটা বলেই বুঝলাম একটু আগে সন্ধ্যাবেলায় বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করে সাহস আর গলার আওয়াজ দুটোই বেড়েছে আমার। শুধু তাই নয় আমি চোস্ত হিন্দিতে কথা বলতে পারছি।

ও পাশ থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই।

এবার মারমুখি আওয়াজেই বললাম, "উত্তর দে নয়তো মরবি এবার আমার লাঠির বাড়ি খেয়ে।"

হাতে লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়ে নিজের রুমের দরজা আন্দাজ করে মারলাম এক বাড়ি, তবে হাল্কা করে। ভয় পাইয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেউ ককিয়ে উঠলো না বা পালিয়ে গেল না।

এবার দ্রুত পদক্ষেপে নিজের রুমে এসে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বালিশের তলায় রাখা টর্চটা হাতে নিলাম। গোয়াতে ট্রেনিং নেবার সময় কেনা এই বিদেশি টর্চের পেছন দিকের বোতামে একটু জোরে চাপ দিলে অনেকটা সাইরেনের মতো আওয়াজ হয় আর সেই সঙ্গে জোরালো ব্লিঙ্কারও আছে। সুইচ টিপতেই দুধসাদা আলো এসে পড়ল বাথরুমের খোলা দরজায়। সেটা দেখেই বুকের মধ্যে দামামা বেজে উঠলো। আমি অতিনিশ্চিত ভাবে জানি যে বাথরুমের দরজাটা আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছিলাম। তবে ওখান থেকে নূপুরের আওয়াজ পাবার পর টর্চ ফেলে দেখি নি যে সেটা সেই রকমই আছে কি না। টর্চ আর লাঠি হাতে নিয়ে রুম থেকে বাইরে বেরিয়েই দেখি টর্চ আর জ্বলছে না। বারান্দায় কেউ আছে বলে মনে হল না। কি মনে হল টর্চের অ্যালার্মের বোতামটা টিপলাম।

বিকট আওয়াজ করে সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর আলো জ্বালানো নেভানো করতে থাকল। আমার রুমের দরজায় কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু টর্চ সিঁড়ির দিকে ঘোরাতেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। কাঠের সিঁড়ি থেকে নূপুরের আওয়াজে মনে হচ্ছে কেউ যেন দ্রুত গতিতে কিন্তু ছন্দের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

আমি আলোটা সেই দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই মনে হল সার্চ লাইটের মত এক জোড়া তীব্র নীল আলো আমার দিকে একবার দেখল। এরপরই আমার টর্চের ব্লিঙ্কার আর সাইরেনের আওয়াজ ক্ষীণ হতে লাগলো। এবার মনে হচ্ছে যেন কেউ ঘুরে দাঁড়ালো। ওই নীল আলো যেন আসলে তারই চোখ আর সেই চোখ এগিয়ে আসছে ক্রমশই আমার দিকে। আমি এবার খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম "বাঁচাও, বাঁচাও"। কিন্তু চিৎকার শেষ করার আগেই দেখি নীল চোখজোড়া এবার আমার থেকে হাতখানেক দূরত্বে ।

আমার মুষ্টিতে জোর করে চেপে ধরা লাঠিটা আর অন্য হাতে ধরা টর্চটা কেউ যেন কেড়ে নিল আর সেগুলো সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে লাগলো। এইটুকু বুঝতে পারলাম যে আমি এবার লুটিয়ে পড়ছি বারান্দার মেঝেতে আর সিঁড়িতে এবার অনেকগুলো ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেই আওয়াজে নীল চোখজোড়া যেন সরে যাচ্ছে।

ভোরের আলো আর দোয়েলের শিষ ঘুম ভাঙ্গিয়ে গেল। চোখ খুলে দেখি আমি আমার রুমের বিছানায় নেই। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি আছি গেস্টহাউসেই তবে আমার আগের রুমের পর একটা রুম ছেড়ে। আমার কালকের রুমের পরের রুমেই তো অনেক লোকের ফিসফাস শুনেছি।

#

সেই রুমে এখন বিশাল তালা ঝুলছে। তালাটাও কিম্ভুতকিমাকার। আমি এমন তালা আগে দেখিনি। রুমের সামনেটায়, দরজায় এমন কি সেই কিম্ভুতকিমাকার বিশাল পেতলের তালার ওপরেও প্রচুর ধুলো।

সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে বহুকাল যেন এই রুমের দরজা খোলা হয় নি। কিন্তু তা তো হতে পারে না। আমি তো কাল রাতেই এই রুমের মধ্যে অনেক লোকের ফিস-ফাস, কাচের বাসনের তুং তাং, এমন কি এক দুটো গেলাস ভাঙবার আওয়াজও শুনেছি।

ঘরটা দেখে বাইরের বারান্দার দিকে ফিরব ফিরব করছি, দেখি, মনিরাম সিং টিকোজি দিয়ে ঢাকা এক পট চা এনেছে। একটু আগে কালকের রাতের আমার অজ্ঞান হবার পরের বৃত্তান্ত ওর মুখে শুনে নিয়েছি। ও আর ওয়াচ টাওয়ারের লোকজনেরা দৌড়ে না এলে আমি হয়তো অজ্ঞান অবস্থাতেই বারান্দাতেই পড়ে থাকতাম কতক্ষণ কে জানে? কিম্ভুত-কিমাকার তালা দেওয়া ঘরটার দিকে ইশারা করে আমি জিগ্যেস করলাম, "সুবেদার জী ওই ঘরে কেউ আসেনি নাকি অনেক দিন?"

সুবেদার মনিরাম চা ঢালছিলো, সেটা পেয়ালা ছাড়িয়ে প্লেটের বাইরেও ছলকে পড়ল। সে সব কিছু ঠিক করতে করতেও সেই তালাবন্ধ রুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই রুম কোনও গেস্টকে দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয় এই রুমের দরজা খোলা বা তার আশপাশেও হাত লাগানোও বারণ আছে।"

কিন্তু আমি এই রুম থেকেই কালকের রাতে যে অনেক লোকের ফিসফাস আর কাচের বাসনের আওয়াজ শুনেছি সেই কথা মনে হতেই একটা শীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়ায় উঠে আসছিল। সেটা চাপা দিয়ে যেন কিছুই হয় নি এই ভাবে আমি জিগ্যেস করি, "কি ব্যাপার সুবেদার? এই ঘরে কেউ কি গলায় দড়ি দিয়েছিল নাকি?"

মনিরাম নিঃস্পৃহ গলায় বলে, "স্যার একটু পরে আপনাদের মিটিং আছে ডি এফ ও সাহেবের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন সাহেবও আসবেন। কালকের রাতের ব্যাপার নিয়ে উনি তো আপনার সঙ্গে কথা বলবেনই। ওঁকেই জিগ্যেস করবেন।"

ক্যাম্প প্রশাসক ক্যাপ্টেন প্রতাপের নাম আগেও শুনেছি। সামরিক বাহিনী থেকে অবসরের পর এটাই প্রথম সিভিল পোষ্টিং। শুনেছি উনি নায়ারস্যারের ডান আর বাঁ হাত দুটোই। মিটিঙের বেশি দেরি নেই। মন পড়ে রইল মিটিঙের পরে কিভাবে ক্যাপ্টেনকে একা পাওয়া যায় আর তালা দেওয়া রুমের রহস্যটা জানা যায়।

কাল দুরের পাহাড়ে মাথায় এক জোড়া জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে কারা নামছিল? গেস্ট হাউসের আমার রুমের লাগোয়া স্নান-ঘরে সেই নর্তকী কে? ক্যাপ্টেন কি এদের দেখেছে বা কারো কাছে এদের কথা শুনেছে? এরা শরীরী না অশরীরী সেটা কি ওর বা এই ক্যাম্পের কারো জানা আছে?

#

অরণ্যে আবাসঃ

বিদেশে মানুষ থাকে কিন্তু দেশে ফেরবার সুযোগ পেলেই তার মন প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু তার আদি বাসভুমি অরণ্যে ফিরে যেতে হলে উল্টোটাই হয়।

তার আদি বাসভুমিকে সে কি তাহলে ভালোবাসেনি? শুধু তাই নয় নিজের স্বার্থের জন্য সে এখান থেকে অনেক নিয়েছে বিনিময়ে তাকে ধংস করে সেই শূন্য স্থানে নিজের আবাস বা চাষবাসের জমি বানিয়েছে।

মানুষ ছাড়া আর যেসব প্রাণীর মাতৃভূমি অরণ্য তারা কিন্তু অরণ্যেই আছে। তারা সেখানে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করে। অরণ্যকে ধংস করে না। ছোট ছোট পাখি থেকে বাঘ সিংহ হাতি সবাইয়ের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য।

এই কথাগুলো নতুন ডি এফ ও সাহেব আমাদের ক্যাম্প ভিজিটে এসে বলছিলেন। কাজে যোগদান করেই চলে এসেছেন সোজা আমাদের কাজের জায়গা ড্রিলিং সাইটে। সেখানে কোনওকিছু ভুলচুক না পেয়ে চলে এসেছেন আমাদের থাকবার জায়গা, ক্যাম্পে।

লোহাপাহাড় পর্বতশ্রেণীর বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত অরণ্য। আমাদের কাজের জায়গা তা থেকে সামান্য বাইরে হলেও এখানেও আসে অরণ্যের আদিম প্রাণীরা। তারা হিংস্র বা অহিংস্র, মাংসভোজী বা তৃণভোজী যাই হোক না কেন তাদের ক্ষতি তো দুরের কথা কোনও ভাবেই বিরক্ত যেন করা না হয় বা কোনভাবেই অরণ্যক পরিবেশের কোনও ক্ষতি না হয় এই কড়ারেই রীতিমত আইনি মুচলেকা দিয়েই কেবল মাত্র খনিজ অনুসন্ধানের জন্য লোহাপাহাড়ের কাজের অনুমতি পাওয়া গেছে। নায়ারবাবুর কড়া তত্ত্বাবধানে সেই ব্যাপারে কোনও ফাঁকফোকরও ধরতে পারেননি ডি এফ ও বা তার চেলাচামুণ্ডারা।

তবে নায়ারস্যার পরিবেশসংক্রান্ত আইন গুলে খেয়েছেন। আইনও আছে তার ফাঁক ফোঁকরও আছে। গাছ কাটা যাবে না কিন্তু কাজের জন্য বনবিভাগের লোকজন দিয়ে গাছের ডাল কেটে ফেললে তাতে আপত্তি নেই। বনবিভাগের প্রশংসা বা নেক-নজর পাবার জন্য বনের মাঝে জায়গায় জায়গায় পুকুর খুঁড়ে তার পাড়ে নুনের বস্তা রেখে দিয়েছেন তিনি ও তাঁর লোকজনেরা। অকৃপণ মৌসুমি বর্ষায় আর মাটির নিচের আর্টেজিয়ান ঝর্নার দানে বছরভর সেই সব পুকুর ভরা থাকে। এতে প্রাণীরাও তৃষ্ণা আর নুনের চাহিদা মেটায়, ক্যাম্পের আর ড্রিলিং-এর কাজের জলের কিছুটা যোগানও এই পুকুরগুলো থেকেই হয়।

ড্রিলিং ক্যাম্পে কাজ যেমন ভারি হয় তেমনি লোকও অনেক বেশিই লাগে অন্যান্য খনিজ অনুসন্ধানি কাজের তুলনায়। এখানে ড্রিলিং ছাড়াও ভূত্বাত্তিক অনুসন্ধান, কোর-লগিইং, জমি-সার্ভে, ছোট ল্যাব আর কেমিস্ট, মেকানিক, বিদ্যুৎকর্মী এই সব মিলে কাজ চালাতে হলে কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক তো দরকার। বনবিভাগের আপত্তি সংখ্যায় নয়, এতজন লোক একসঙ্গে থাকা নিয়ে। এত লোক এক সঙ্গে থাকলে তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার মিলিত হল্লার সঙ্গে প্রত্যেকের রেডিও বা টেপরেকর্ডারের আওয়াজ অনেক দূর থেকেও শোনা যাবে। এ ছাড়া সপ্তাহান্তে বা অন্য কোনও সময়ে পানীয়ের সঙ্গে হই হল্লা তো লেগেই থাকবে। এসব আওয়াজে ভয়ে চমকে পালিয়ে যাবে সব বন্যপ্রাণী আর গাছ-

#

গাছালিতে বাসা বেঁধে থাকা পাখির দল। ভয় পাবার তালিকায় শুধু হরিণের পাল বা খরগোশের দলগুলোই নয়, আমরা যাদের নাম শুনলেই ভয় পাই সেই বাঘ, জংলি শুয়ার, ভালুক এরাও আছে। আমরা এদের যতটা ভয় পাই, তার চাইতে শতগুণ ভয় পায় মানুষকে এই তথাকথিত হাড়হিম করা ভয়ঙ্কর প্রাণীরা এই সব কথাগুলো আমাকে বলছিলেন ক্যাম্প প্রশাসক ক্যাপ্টেন প্রতাপ।

ডি এফ ও বিদায় নেবার পর ক্যাম্প-প্রধান নায়ারবাবু, এঁকেই বলেছিলেন আমাকে ক্যাম্প পুরো ঘুরিয়ে আনতে। তবে আমার মনে হল নায়ারবাবু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শুধু ক্যাম্প দেখতেই আমাকে পাঠালেন এইরকম নয়। ক্যাম্প দেখে নেওয়া ছাড়াও আরও কিছু ব্যাপার আছে।

এই ক্যাম্পের চারদিক পুরানো কালের শক্ত গাঁথনির উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা তার ওপরেও মিটার খানেক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। এখানে আমার তো হারিয়ে যাবার বা বন্য প্রাণীদের জলখাবার হয়ে যাবার তো কিছু নেই।

প্রশ্ন জাগে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই রকম পুরানোকালের মতো পাকা গাঁথুনির উঁচু দেওয়াল কি করে হয়? ক্যাপ্টেন কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে? এই প্রশ্ন পরে করবো ভেবে স্থগিত রাখলাম।

লোহাপাহাড় চুড়োর ঠিক আগে এই জায়গাটা পুরোপুরি সমতল নয় সামান্য ঢাল নিয়ে একটু একটু করে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। ক্যাপ্টেন জানালেন তাঁবুগুলো দুই ধারে ভাগ করা, পাহাড় ধার আর খাদের ধার। প্রতিটি ধারে পাঁচ পাঁচ করে মোট দশটি করে টেন্টের সারি। আর দুই-ধারের এই সারিকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে চলে গেছে নিচ থেকে ওপর অবধি যাবার রাস্তা। এই দুই সারি তাঁবুর পর অনেকটা জায়গা ছাড়বার পর অন্য সারি। লোকজনের বেশি আওয়াজে যাতে বনবিভাগ থেকে আপত্তি না আসে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। বর্ষার সময়ে যাতে রান্না বিঘ্নিত না হয় সেজন্য ক্যাম্পের মধ্যে সবার উঁচুতে খাদের ধারে সাঞ্ঝা-চুলা বা সামুদায়িক রান্নাঘর। ফিল্ডের কাজ চালাবার জন্য এই ঘরটি একটি অন্যতম জীবন-রেখা। ক্যাম্পের আবাসিকেরাই পালা করে দলে ভাগ হয়ে একে চালিয়ে থাকেন। রান্নাঘরের গুরুত্ব সেদিন বুঝতে পারি নি। সাঞ্ঝা চুলায় তাঁবুর জায়গায় টালির ছাদ আর মাটির দেওয়াল। দেওয়ালে সার সার বাঁক লাগানো আছে। ফিল্ডের কাজে বেরিয়ে যাওয়া প্রায় সব দলগুলো কাজের জন্য আলাদা আলাদা জায়গায় যায়। কিন্তু দুপুরে আগের থেকে ঠিক করা কোনও পাহাড়ী ঝোরার বা লোহাপাহাড়ের প্রায় সব জায়গাতেই বহমান এক এবং অদ্বিতীয় পাহাড়ী নালা 'পুরনা পানির' কোনও নির্দিষ্ট জায়গাতে সবাই চলে আসে।

সাঞ্ঝা-চুলা থেকে একটা দল বাঁকে করে সেইখানেই দুপুরের খাবার নিয়ে আসে।

রাত নটার একটু পরেই এই জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের মধ্যে কারো কারো রোঁদে বেরবার সময় হয়ে যায়। একসঙ্গে অনেক লোক বসে খাবার খেলে তার হল্লা এবং আলোতে বন্যপ্রাণীদের চলাফেরাতে অসুবিধে হতে পারে। এ জন্য রাতের খাবার সাঞ্ঝাচুলার লাগোয়া কুঁড়েঘরে কিন্তু রাত নটার মধ্যে। এই একই কারণে রাত দশটার পর জেনেরেটর বন্ধ, কোনোরকম আলো বা আগুন জ্বালানো বা হল্লা হাঙ্গামা করা নিষেধ। আজ ছুটির দিন, সাঞ্ঝাচুলাতে আজ লোকজন সকাল থেকেই ব্যস্ত এমন কি যাদের রান্নার ডিউটি নেই তারাও আজ স্বেচ্ছাসেবী।

#



পুরনা পানি

জঙ্গলের পুকুর থেকে তেলাপিয়া আর পাহাড়ী নদী থেকে এসেছে পাঙ্গাস মাছ। লম্বা পাঙ্গাস মাছের পেট পরিষ্কার করে তেল মশলা মাখিয়ে তাদের ফাঁপা বাঁশের মধ্যে চালান করে সেই বাঁশের ওপর আর নিচের খোলা মুখে কাঠের লম্বা টুকরো দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফুট-খানেক গভীর আর প্রায় সেইরকমই চওড়া গর্তের এই রকম অনেকগুলো ভাঁটি আছে সাঞ্ঝাচুলার বাইরে। এক একটা ভাঁটিতে এইরকম তিন চারটে, পাঙ্গাস মাছ ভরতি ফাঁপা বাঁশের নল ভাঁটিতে ঢুকিয়ে পুরো ভাঁটি কাঠ-কয়লা দিয়ে ভরে ওপরে ও নিচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

কাঠকয়লার ধিকি-ধিকি আগুনে পাঙ্গাস মাছের নিজের তেল আর মাখানো মশলার মাখামাখির খেলার শেষে বাঁশগুলো বের করে আনা হয়। বাঁশ পুড়ে গেলেও মাছ পোড়ে না। পরম উপাদেয় এই খাদ্যটি ঠিক পরিবেশনের আগে বাঁশ থেকে বার করা হয়।

এরপরেই ওই ভাঁটিতেই হবে মুরগি কিন্তু সেটা হবে মাটির সরায়। মাটির সরাতে তেল মাখিয়ে মশলা মাখানো মুরগির টুকরো রেখে সেটা ঢেকে দেওয়া হবে ঠিক ওই রকম আর একটা মাটির সরায়। দুটো সরার মাঝে জোড়ের ফাঁক মাটি দিয়ে লেপে বন্ধ করে সোজা চালান করে দেওয়া হবে ভাঁটিতে আর ভাঁটির নিচ থেকে ওপর অবধি কাঠকয়লা দিয়ে ঢেকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। বেশি পরিমাণ দরকার হলে এক সেট সরার ওপর আর এক সেট দেওয়া হয়।

কাজের দিন কিন্তু ভাত, রুটি, ডাল, সবজি তাড়াতাড়ি বানিয়ে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সাঞ্ঝাচুলোর দল সেদিনের ঠিক করা দুপুরের আহারের জায়গায়। জায়গাটা যদি পুরনা পানির কোনও পাড় হয় তবে খানিকআগে পৌঁছে সঙ্গে রাখা

#

জাল বা গামছা দিয়ে ধরা মাছ পরিষ্কার করে সামান্য তেল মাখিয়ে একধরনের জংলি গাছের পাতার মধ্যে মুড়ে আগুনে ঝলসে নেওয়া হয়। পাতা পুড়ে গেলেও মাছ পোড়ে না, খেতেও খুব স্বাদু হয়।

ক্যাপ্টেন প্রতাপ সাঞ্ঝাচুলার কিছু মেরামতি কাজের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন। ভি. নাইডু ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর দলের ওপর এই মাসের জন্য সাঞ্ঝাচুলা চালাবার ভার পড়েছে। এতক্ষণ নাইডু আমাকে সাঞ্ঝাচুলার নিত্য কাজকর্ম এবং আজকের রান্নার প্রতিটি পদ বিস্তারিত ভাবে বলছিল। ওর সঙ্গে পরিচয় না হলে ওর বর্তমান বেশভূষা আর হাবভাব দেখে পেশাদার রাঁধুনি ভেবে নিতাম। ও বলে নায়ারস্যারের আদেশে প্রতেককেই এই সাঞ্ঝাচুলাতে বছরে দু-তিনবার কাজ করতে আসতেই হবে। এই নিয়ম নায়ারস্যার নিজেও পালন করেন।

নাইডু বলছিল, "সব প্রদেশের লোকেরা আছেন এই ক্যাম্পে কিন্তু নায়ারস্যারের আদেশে রান্নার ব্যবস্থা এক জায়গায়। এতে দলগত ভাব বা টিম স্পিরিট পুষ্ট হয়।"

আমি নিজে এখন পর্যন্ত কখনো চা বানাই নি। নাইডু অভয় দেয় যে আনাড়িদের প্রথমে সহজ কাজ দেওয়া হয়। এখানে অন্যদের দেখাদেখি অনেক কিছু নিজের থেকেই শিখে নেয়। আরও পরে এই রান্নার কাজ নিঁখুতভাবে করে নেয়। ওর নিজেরও তাই হয়েছে। দম বিরিয়ানি চড়তে যাচ্ছে দেখে নাইডু এখুনি আসছি বলে সেখানে ব্যস্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বিরিয়ানির সুগন্ধে চার দিক ভরে গেলেও আমাকে টানছিল অন্য জিনিস। কাল রাতে যা দেখেছি সেই জায়গাগুলো একবার দিনের আলোতে দেখে নিতে চাই। বাইনোকুলার নিয়েই বেরিয়েছিলাম। সাঞ্ঝাচুলা ঘরের কাছে খাদের ধার থেকে সামান্য দূরে এসে সেটি চোখে লাগাতেই উপত্যকার গভীর জঙ্গল আর বাঁকা রুপোলী পাতের মত পাহাড়ী নদী পরিষ্কার ভাবে দেখা গেল।

পুরো লোহাপাহাড়-শ্রেণী ওলটানো ইংরাজি Y এর মতো। শুরুর দিকে একটু এগিয়েই মাঝে এক বিশাল উপত্যকার ব্যবধান রেখে দুই বাহুতে ভাগ হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

উপত্যকার মাঝ বরাবর বয়ে গেছে পাহাড়ী নদী। এর অপর পারে সামান্য দুরেই লোহাপাহাড়ের আর এক বাহু, লোহাপাহাড় পশ্চিম। কাল রাতে এই পাহাড়ের কোথাও দেখেছি সেই সারি সারি জ্বলন্ত প্রদীপ আর কাপালিকের দল। কথাটা মনে আসতেই শরীরের সব কটা লোম আবার শিউরে উঠল। আমাদের ক্যাম্প লোহা পাহাড় পূর্বে। কিন্তু আমার কাজ প্রথমেই লোহাপাহাড় পশ্চিমে। পাহাড়ী নদী আর ঘন জঙ্গল পার করতে হবে রোজই। হতে পারে এই ঘন জঙ্গলেই কোথাও কাপালিকদের আস্তানা। বুঝতে পারলাম আমাকে শুধু হিংস্র বন্যপ্রাণীই নয় হিংস্র নির্দয় মানুষদের সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হবে।

আমার দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন প্রতাপ বললেন, "আপনার কাজের জায়গা দেখে নিচ্ছেন? ঘন জঙ্গল দেখে চিন্তা করবেন না। প্রতিদিন আপনার সঙ্গে যাবে আমাদের জঙ্গলবাহিনী আর তাদের নেতা মংলু সর্দার। এই জঙ্গলবাহিনীতে অন্যদের সঙ্গে সেনা থেকে অবসর নেওয়া কয়েকজন সুদক্ষ সৈনিকও আছেন যারা যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেদের লোকজনদের নিরাপদে রাখতে পারে।"



পাহাড়ী নদী

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে আমাদের সঙ্গে কাস্তে, বড় তরোয়াল, গাইঁতি নিয়ে তিনচারজন লোক থাকে ঝোপ-ঝাড় সাফ করবার জন্য।

আমি বললাম, "কিন্তু জঙ্গলবাহিনী লাগবে এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে?"

ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনাদের মতো বিজ্ঞানীরা নিজেদের কাজে এতটাই ডুবে থাকেন যে নিজের নিরাপত্তার কথাটা প্রায়ই ভুলেই যান। এই জঙ্গলবাহিনী আপনাদের কাজের অসুবিধে করা ঝোপ-ঝাড়গুলো সাফ করে আর বিপজ্জনক প্রাণীর উপস্থিতি টের পেয়ে আপনাদেরও সতর্ক করে দেয়।"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা এরা কিভাবে টের পায়? কোনও মন্ত্র-তন্ত্র জানে নাকি?"

"সে সব কিছু নয়। আন্দাজ-অনুমান বা ঘ্রাণশক্তি। নিজেদের অভিজ্ঞতা আর সতর্ক থাকার উপদেশ।" ক্যাপ্টেন বললেন, "ওই কাঁটাতারের বেড়া ছাড়া এই ক্যাম্পের অনেক কিছুই পুরানো রাজার শিকার বাড়ি বা জঙ্গল মহল।"

অবাক হই আমি, "মানে এটি আগে ঢোলপুর কাকটিয় রাজবংশের সম্পত্তি ছিল।"

ক্যাপ্টেন মৃদু হেসে বলেন, "ছিল নয় এখনো আছে।"

"সেটা কি করে সম্ভব। অরণ্য তো সরকারি সম্পত্তি।"

#

ক্যাপ্টেন দূরের পাহাড়ের দিকে নিজের ছড়ি তুলে দেখিয়ে বললেন, "আমাদের এখানের ক্যাম্পই নয়, দূরের ওই পাহাড়ের আগের উপত্যকা পর্যন্ত এখনো রাজবাড়ীর সম্পত্তি।"

আমার মাথা নাড়া দেখে ক্যাপ্টেন বলেন, "ইংরেজের সঙ্গে মহারাজার যে সন্ধি হয় তাতে আপনাকে যে অংশ দেখালাম সেটি মহারাজার সম্পদ যা স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকারও ভারতভুক্তির শর্ত হিসাবে মেনে নেয়।"

আকাশের দিকে বারবার তাকিয়ে ক্যাপ্টেন কি দেখছিলেন কে জানে? আমাকে সে দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে উনি বললেন, "ড্রিলিংক্যাম্পে একটু বেশি জায়গার সঙ্গে চাই স্টোরের জন্য একটা পাকা বাড়ি যাতে মেশিনের পার্টসগুলো ভালো থাকে। কিন্তু খনিজ-সন্ধানে পাকা বাড়ির অনুমতি হয় না। এসবের জন্য মহারাজের এই পরিতক্ত্য শিকারবাড়িটি সবদিক দিয়ে আদর্শ। ঢোলপুরের মহারাজের বর্তমান উত্তরাধিকারী কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।"

নায়ারস্যারকে আসতে দেখে সেদিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলেন, "নায়ারস্যার বর্তমান মহারাজার রোলস রয়েস গাড়িটি ঠিক করে দেন। এরপরেই এই শিকারবাড়ি সমেত তাঁর নিজের খাসজমির প্রায় পুরোটাই লিজে দেবার জন্য আমাদের কোম্পানির বহু পুরানো প্রস্তাবে মহারাজা কিছু শর্তে দিতে রাজি হন।"

বিরিয়ানির সুগন্ধ বয়ে নাইডু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। শর্তের কথা শুনে বললেন, "শিকার বাড়ি আর তার চারপাশের কোনও পরিবর্তন করা চলবে না। এই কারণেই এখনো সন্ধেতে দেওয়ালগিরি জ্বলে বা সেই আমলে মেনগেট যা ছিল তাই আছে। মহারাজের পরিবার যখন খুশি এই গেস্ট হাউসে এসে থাকতে পারেন। এছাড়াও ..."

নায়ারস্যার আমাদের কাছে চলে এসেছিলেন। উনি বললেন, "গেস্ট হাউসের ওপরের একটা ঘরে রাজ আমলে খানাপিনা এমন কি নাচের আসরও বসতো। এই ঘরটি কোনও মতেই খোলা যাবে না বা কোনো অতিথিকে দেওয়াও যাবে না।"

ক্যাপ্টেন বললেন, "মহারাজা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে শুধু বিশ্বাসই করতেন না, নিজেও তন্ত্র সাধনা করতেন। গেস্ট হাউসের প্রধান ফটকের পাশেই একটা জঙ্গলে ঘেরা জায়গা আছে। সেখানে পঞ্চবটীর পাশে মহারাজা প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। এই মন্দিরে নিত্যপুজা এবং বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা এবং খরচ লিজের শর্তানুযায়ী কোম্পানি বহন করে।"

নায়ার স্যার বললেন, "অনান্য কালী মন্দিরের মত এখানে ভৈরব নেই। কালীমূর্তির পাশেই একটি কালো বিশাল পাথর আছে। এই পাথরও পুজিতা হন একসঙ্গে।"

ক্যাপ্টেন বললেন, "স্থানীয় আদিবাসীরা বলেন পঞ্চবটীর তলায় এই শিলা প্রাচীনকাল থেকে ছিল। ইনিই আদি দেবী।"

"তবে" নায়ার স্যার বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। কি ভেবে বলতে শুরু করলেন, "লোহাপাহাড় পশ্চিম মানে পাহাড়ী নদীর পশ্চিমপাড়ের পাহাড়চুড়োতে এক শিব মন্দির আছে। আদিবাসিরা বলে সেই শিবই হলেন এখানের দেবীর ভৈরব।"

#

নায়ারস্যার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আকাশে কিছু একটা দেখে বলে ওঠেন, "ক্যাপ্টেন দেয়ার দে কাম।"

দুজনে মিলে এক বিশেষ তালে আকাশের দিকে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে হাতজোড়াকে এদিক ওদিক করতে করতেই আকাশ থেকে নেমে আসে একটি বাজ আর তার দেখা দেখি এক ঝাঁক সাদা রঙের গোলা পায়রা। বাজটা নায়ার স্যারের কাঁধে এসে আর পায়রাগুলো সাঞ্ঝাচুলোর আঙ্গিনায় বসে। বাজের জন্য মাংস আর পায়রাদের জন্য গম আর শস্যদানা আঙ্গিনায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাঝেই ওদের প্রতেকের পায়ে বাঁধা তাড়া-তাড়া খাম খুলে নিয়ে নায়ারস্যারের কাছে দেওয়া হল। বাজ বা পায়রা চিঠি নিয়ে আসে এসব এত দিন সিনেমায় দেখেছি। সেগুলো চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে আমার চোখদুটো ছানাবড়ার মতো বড় হয়ে উঠলো। ম্যাথিয়াস আমার অবস্থা দেখে বলে, "স্যার এই মেলগুলো এসেছে দশ নম্বর পাহাড় থেকে। কিছুদিন হল ওদের অয়ারলেস সেট খারাপ। এই বাজ, আর তার কড়া পাহারায় একঝাঁক পায়রা ভোরবেলা দশ নম্বর পাহাড়ে গিয়ে ওদের কাছ থেকে রিপোর্ট আর খুব দরকারি কতগুলো জিনিসের লিস্ট নিয়ে ফেরত এসেছে।"

ক্যাপ্টেন প্রতাপ পাখিগুলোর কাছ থেকে এসে বললেন, "এখানের পাহাড়চুড়োগুলোর আট জায়গাতে সার্ভে আর ম্যাপ বানাবার জন্য ছোট ছোট ক্যাম্প আছে। এদের কারো রেডিও সেট বিগড়ে গেলে তখন এই বাজ আর পায়রাগুলো তাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসে। অনেক সময় শুধু কাজের কথা নয় আরও জরুরি কথাও থাকে। যেমন দশ নম্বর পাহাড়ে এখন জেনেরেটর বিগড়েছে, তাদের রেশনও নেই। আমরা বাজের পা থেকে খাম খুলে এটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও মেসেজ করে দিয়েছি বেসক্যাম্পকে। তারা হয়ত এতক্ষণে ট্রাকে মেকানিক আর রেশন পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নায়ারস্যার রিপোর্টগুলো তার সহকারির হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমাকে বলেন, "আহত হয়ে এই বাজটা আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। সেরে ওঠার পর আর ফিরে যায় নি নিজের দলে। সেইসময় ওয়্যারলেস সেটগুলো খুব বিগড়ে যেত। বিভিন্ন পাহাড়ের খবরাখবর, রিপোর্ট পাওয়া নিয়ে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন আর তার লোকজন এই বাজ আর তার সঙ্গে একঝাঁক পায়রাকে ডাক নিয়ে আসার জন্য ট্রেনিং দেয়। এরা মানুষের চাইতেও তাড়াতাড়ি শিখে নেয় আমাদের ইশারা যে সকালে কোন ক্যাম্পে গিয়ে ডাক আনতে হবে।"

সেই সময়ে প্রত্যন্ত জায়গাতে অয়ারলেস সেট ছাড়া যোগাযোগের আর কোনও উপায় ছিল না। মোবাইল তো অনেক দূরের কথা, সাধারণ টেলিফোনই ছিল না। আমাদের কথায় কথায় দুপুর নেমে আসে। ক্যাম্পের অধিবাসীরা অনেকেই সাঞ্ঝাচুলা ঘরে আসতে শুরু করছেন আহারের জন্য।

ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ক্যাম্পের ডাক্তার আর ল্যাবরেটরির কেমিস্টের। ডাক্তার গম্ভীর মানুষ। নেহাত চাকরির দায়ে এই জঙ্গলে এসে বদলীর দিন গুনছেন। তবে বুনো শুয়ারের আঁচড় খাওয়া দুই তিনজন ক্যাম্পের অধিবাসীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে বাঁচিয়েছেন।

প্রকৃতিপ্রেমী কেমিস্ট মনসুখ দারুণ হাসিখুশি, বললেন, "মহুয়া ফুল আর লেবু থেকে সুধা আর সালফির রস থেকে বিয়ার বানিয়েছি। পাহাড়ে সারাদিনের নামাওঠার পর এই সুধা খেলে গায়ের ব্যথা আর থাকে না। আজ সন্ধেয় পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে। আপনার তাঁবু কোনদিকে?"

#

মনসুখের কথায় মনে পড়ে গেল ম্যাথিয়াস একটু আগেই বলে গেল নায়ারস্যার ওকে বলেছেন যে আমার আপত্তি না থাকলে আমার তাঁবু খাদের ধারে নতুন সারিতে হতে পারে। নতুন সারি মানে আমার প্রায় পঞ্চাশ মিটার পেছনে পুরানো সারি এবং আমার আগে আর কোনও তাঁবু নেই।

নিজের অজান্তেই যে একটা দারুণ ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি সেটা বুঝলাম রাত যখন গড়িয়ে গভীর হল। পরিষ্কার আকাশে তারার সামিয়ানার তলায় টেন্টের লাগোয়া উঁচু গাছের মগডালে টাঙ্গানো হ্যামকের দোলনা বিছানা থেকে পাহাড়ী ঝোরার গর্জনের সঙ্গে আরও অনেক কিছু শোনা আর দেখা গেল। সবই অবশ্য নাইট ভিসন দূরবীনের সৌজন্যে। রাতের অরণ্যের এই মায়াবী পরিবেশ ক্যাম্পের আর অন্য কোথাও তাঁবু লাগালে হয়ত পেতাম না।



খাদের ধারে আমার তাঁবু

দু বছর ধরে সেই খাদের ধারেই নিভৃত এক কোনে আমার তাঁবু লাগানো ছিল এবং তাই বলেই বোধ হয় আমার জীবনে এই প্রথমবার এক গভীর প্রেমের তুফান বয়ে যায়। সে প্রেম আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে। নদী, ঝর্না আর পাহাড় দিয়ে তৈরি তার প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে। তবে এই সঙ্গে মুখোমুখি বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেছে গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত পাইথনের সঙ্গে, মানকচু বা খামআলু খুঁড়তে আসা বুনো শুয়ার বা মহুয়া তলায় ভালুকের সঙ্গে। একবার এক নরখাদক বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় প্রাণ বাঁচিয়ে ক্যাম্পে ফিরেও এসেছি। অরণ্যের সঙ্গে আমার গভীর প্রেম দেখে ভয় আর আসে নি। সেই প্রেম এখনো চলছে আমার সঙ্গে।

মৈনাক পাহাড়ের কালীয় দমনঃ

গোয়াতে খনিজ অনুসন্ধানের জন্য আমার প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কিছুটা উলটো পায়ে চলার মতো প্রথমে খনিজ পাথর আর সাধারণ পাথরের সীমারেখাটি খুঁজে নিয়ে সেটি ম্যাপে বসিয়ে সার্ভে আর ড্রিলিং বিভাগের কাজ শুরু করিয়ে দেওয়া হয়। এই পর্বে খনিজ অনুসন্ধানের সব কটি বিভাগ একই সঙ্গে করে বলে প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলা যায়। কিন্তু গোয়ার চাইতে এখানে প্রকৃতি অনেক বেশি দুর্গম এবং বিপদসংকুল। ক্যাপ্টেন প্রতাপ এবং নায়ারস্যার স্থির করলেন কাজ শুরু করার আগে আমাকে এখানের ভূপ্রকৃতি খুব ভালো করে চিনে ফেলতে হবে। তাহলে কষ্ট আর বিপদ কিছুটা কম হবে। তাই আমার উচিত হবে এখানের মৈনাক পাহাড়ের চুড়া থেকে বেশ কয়েক দিন ধরে এখানের ভূপ্রকৃতি মনের মধ্যে বসিয়ে নেওয়া। মৈনাক পাহাড়ের চুড়ো থেকে যে শুধু লোহাপাহাড় শ্রেণীর সবকটি চুড়োই যে দেখা যাবে তাই নয় এখানের পাহাড়ী নদীর বেশ কয়েকটা বাঁক সমেত তার আশপাশের ঝোপ, জঙ্গল আর ঘাসবনগুলো ও দেখে নেওয়া যাবে।

আমার কাজে পাহাড়চুড়ো থেকে ঘাসবন সবই আছে। বেশির ভাগ পাহাড়ই এখানে খাড়াই উঁচু। এসব পাহাড়ে চড়া বেশ কষ্টের আর ভয়ের। তবে এর চাইতে বেশি কষ্ট আর ভয় ওঁত পেতে বসে আছে পাহাড়ী নদী, তার আশেপাশের ঝোপঝাড় আর মানুষ প্রমাণ উঁচু ঘাসবনে।

নায়ারস্যার আর ক্যাপ্টেন প্রতাপ অনেক ভেবেচিন্তে মংলু সর্দার আর তার দলকে আমার সঙ্গে দিলেন। মংলু সর্দার স্থানীয় লোক। লোহাপাহাড়ের পশ্চিম ঢালের পর সুরগুঞ্জা গ্রামের মোড়ল। আশৈশব লোহাপাহাড়ের জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে। পুরো বনটাই নিজের তালুর চাইতেও ভাল চেনে।

এই অরণ্যে কাজের সময় শুরু হয় সূর্য ঠিকঠাক উঠে পড়ার আগেই। তারও আগে সুরগুঞ্জা থেকে মংলু সর্দার আর তার দুই সাথি বেরিয়ে পড়েছিল ক্যাম্পের দিকে। তাদের পেশীবহুল মজবুত শরীরের কাঁধে মোটা দড়ি-দড়া ছাড়াও কাঁধে তীর-ধনুক আর হাতে বেশ ধারালো টাঙ্গিও আছে।

মংলু সর্দারের পরনে মিলিটারি উর্দি, পায়ে হাঁটুর নিচ অবধি লম্বা জঙ্গল বুট। তার দুই বন্ধু এখানকার বাকি আদিবাসীদের মত মিশকালো রঙের হলেও মংলু সর্দার বেশ গৌরবর্ণ, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, নাক টিকালো, ওর চুলও অন্যদের মত কোঁকড়ানো নয়। বেশ নজরকাড়া সুপুরুষ চেহারা। মংলু বাকি আদিবাসীদের থেকে কি করে আলাদা হল সেটা অবশ্য পরে জানলাম। ওর হাতে কোনও অস্ত্র দেখলাম না। আমাদের সবারই পিঠে বেশ বড় হ্যাভারস্যাক। অত ভোরে বেরিয়েও মৈনাক পাহাড়চুড়োর কাছাকাছি আসতে আমাদের প্রায় দশটা বেজেই গেল। এই পাহাড়ের বেশিটাই খাড়াই উঁচু। প্রায় রক ক্লাইম্বিং করে চড়তে হয়। তার আগে পেরিয়ে আসতে হয়েছে পাহাড়তলির ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গল পার হতে গিয়েই বেশ দেরি হল। কিছুটা জঙ্গল সাফ করে রাস্তা বানাবার জন্য, কিছুটা শিকারের জন্য আর বাকিটা উঁচু গাছের আড়ালে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে থাকা এক সাক্ষাৎ যমদুতের জন্য।

পাহাড়তলির উর্বর মাটি আর তাকে ছুঁয়ে যাওয়া এখানের পাহাড়ী নালা পুরনা পানির জলের বদান্যতায় হাতখানেকের কম দূরে বিশাল সব গাছ, আর তাতে আড়াআড়ি জড়িয়ে আছে লতাপাতা। এই সব লতাপাতা কিছুটা না

#

কাটলে এগোনো অসম্ভব। মুস্কিল আসানের জন্য মংলু সর্দারের দুই সহচর হ্যাভারস্যাক থেকে রামদা আর তরোয়াল দিয়ে কেটেই চলেছে লতাপাতা আর ঘন ঝোপঝাড় যাতে কোনোমতে পা ফেলবার রাস্তাটুকু হয়। এই জঙ্গলে পেয়ারা, কলা, বাতাবি ও মুসুম্বির গাছ প্রচুর। মংলু সর্দার বলে যে এই সব মহারাজের আমলের। ওর মুখে সে আমলের শিকার খেলার একটা গল্প তখন মাঝপথে। আমিও সেসব কথা শুনে সবেমাত্র ভাবতে শুরুই করেছি যে এই মংলু সর্দারের কাছে সেই রাতে লোহাপাহাড়ের পশ্চিমের চুড়োর কাছে জ্বলা প্রদীপের সারি আর পাহাড় থেকে দেখা কাপালিকদের সম্বন্ধে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে।

ঠিক সেই সময়, মংলু হঠাৎ একটা চিৎকার করে আমায় জাপটে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল আর নিজেও শুয়ে পড়ল। আর তার পরমুহূর্তেই প্রায় আমার কানের কাছ দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দ করে একটা কিছু বেরিয়ে গেল আর সেটা গিয়ে সোজা যেখানে লাগলো সেখান থেকে রক্তের ফোয়ারা এসে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া শীতের ঝরা পাতা আর ঘাসকে রঙ্গিন করে তুললো। এতক্ষণে দেখি আমি একটু আগে যে গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তার তলায় শুকনো পাতার স্তুপে ঝড় তুলে স্টিলেটো ধরনের ছুরি গাঁথা একটা রক্তাক্ত পাইথন ঢেউ ওঠানামার মত ছটফট করছে। মংলুর দুই সঙ্গি ততক্ষণে তাদের ধনুক থেকে বেশ কয়েকটা তীর সাপটার শরীরে বিঁধিয়ে তার শরশয্যা তৈরি করে দিয়েছে।

পাইথনের নেতানো মৃতদেহ থেকে স্টিলেটো ধরনের ছুরি একটানে বার করে জংলি পাতায় রক্ত মুছে সেটা নিজের লম্বা জঙ্গল বুটের বাইরের খাপে রাখতে রাখতে মংলু বলে ওঠে, "এবার বোঝা গেল, আমাদের গ্রামের মোড়লের তিন চারটে ছাগল এই জঙ্গলে চরতে এসে নিখোঁজ কি করে হল। এই শয়তান কালীয়টার কাজ। মোড়ল খুশি হবে কালীয় দমন শুনে আর রাখাল ছেলেটার সাজা মকুব করে দেবে।" এখানের আদিবাসীরা পাইথনকে কালীয় বলে।

মৈনাক পাহাড়ের চুড়ার কাছে পৌছাতে দেরি হলেও সেখান থেকে লোহাপাহাড়ের উপত্যকার অনেকটা অংশ আর পাহাড়ী নদীর বেশ কয়েকটা বড় বড় বাঁক চিনে নেওয়া গেল। এখনকার মত সেই সময়ে কিন্ত জি পি এস ছিল না। উপগ্রহ চিত্র ততটা সহজলভ্য ছিল না। কোনও রকমে পেলেও তার মধ্যে অনেক অসুবিধে যা এখনকার সময়ে ভাবাই যায় না। কোনও রকমে জোগাড় করা উপগ্রহ চিত্র, স্থানীয় ভূত্বাত্তিক ম্যাপ আর কিছুটা নিজের অনুমান এই সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল যে সাধারণ পাথর আর লৌহ-খনিজের সীমারেখা মৈনাক পাহাড় থেকে দেখা ওই সব জায়গাতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু লোহাপাহাড় পশ্চিমেও খুঁজে পেতে হবে ওই সীমারেখাকে। তবেই এই কাজ পুরো হবে।

দূরবীনের সর্বশেষ শক্তি বা ম্যাগ্নিফিকেসন দিয়ে লোহাপাহাড়ের পশ্চিমে সেই পাথর খুঁজতে খুঁজতে চোখে এসে পড়ল একটা বহু পুরানো ভগ্নপ্রায় মন্দিরের চুড়ো। জঙ্গলের গাছের পাতাগুলো তাকে ঢেকে রেখেছে প্রায়। এইটাই কি সেই ভৈরব মন্দির? কাল গেস্টহাউসের আমার রুমের লাগোয়া বারান্দা থেকে এই জায়গাতেই কি চোদ্দটা জ্বলন্ত প্রদীপ আর কাপালিকদের দেখেছি? এইসব চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি। এমন সময় মংলু সর্দারের তাড়া আসায় এবার সেদিনের মত কাজ শেষ করতেই হল।

পাহাড়ের খাড়াই বাহু দিয়ে চড়েছি কিন্তু নামব ঢালু বাহু দিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি। কিন্তু তার আগে সামান্য কিছু পেটে না পড়লে আর তো শরীর চলে না। এখনি যদি নামতে শুরু করি তাহলেও অনেক দেরি হয়ে যাবে পুরনাপানির

#

কাছে বসে থাকা সাঞ্চাচুলোর খাবারের দলের কাছে পৌঁছাতে। আজ আমাদের কাছে যা আছে তাই দিয়েই কিছুটা খিদে মেটানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমার হ্যাভার স্যাক থেকে বেরোলো বিস্কুট আর সাঞ্চাচুলো থেকে আনা দু'ডজন ডিমসেদ্ধ। ওরা বাড়ি থেকে এনেছিল লঙ্কা আর মটরসেদ্ধর পুর দেওয়া পুরন পুরি আর ভেলি গুড়। এছাড়াও ছিল দুটো ব্যাগে ভরতি জঙ্গলের পেয়ারা, কলা, মুসুম্বি। কলাপাতায় সব খাবার ঢেলে আমরা খাওয়া শুরু করার কিছু পরে দেখি এক ঝাঁক চিল নেমে আসছে। খাবার ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এই ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি।

আমাকে আশ্বস্ত করে ওরা সমস্বরে বলে, "ওরা এসেছে ক্রিয়া কর্ম করতে।"

আমি বুঝতে পারি নি দেখে মংলু সর্দার বলে, "নিচে কালিয়টার দেহ এবার টুকরো টুকরো করে পেটপুরে ভোজন করবে চিলের দল। জঙ্গলে কোনও বড় প্রাণী মারা গেলে এভাবেই তার সৎকার হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় জঙ্গলের অনেকেই সেখানে হাজির হয়ে যায়।" মংলুর এক সাথি বলে, "যার সে ক্ষতি করেছে আর যার করে নি এরকম সবাই এসে যায়।"

খাওয়া আমাদের শেষ হতেই মংলু বলে, "সাহেব আপনার বোধহয় বিশ্বাস হয় নি। একবার আসুন এই খাদের ধারে এলেই দেখতে পাবেন যেখানে এখনো বোধ হয় কালীয়টার দেহের অংশবিশেষ পড়ে আছে। ওই দেখুন এখনো অনেকেই আসছে। হরিয়াল আর পাহাড়ী ময়নার একটা দল নামছে আকাশ থেকে। পাহাড়তলির জঙ্গল ভেদ করে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে কয়েক জোড়া নীলগাই।"

এই ভর দুপুরে, সেই গাছগুলোতে, যেখানে একটু আগে কালীয় দমন হয়েছে, সন্ধেবেলার মত পাখিতে পাখিতে ছয়লাপ। গাছের নিচে একদল হরিণ, আরও দূরে মনে হচ্ছে শেয়ালের পাল সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে সামান্য দূরে একটা গাছ। মনে হচ্ছে তার ডালপালা সব ভেঙে পড়বে অজস্র বাঁদরের ভারে। সেই গাছের নিচেই চলছে সৎকার পর্ব। প্লাটুন প্লাটুন চিল নেমে পড়েছে। পাইথনটার দেহ নিয়ে কাটা-ছেঁড়া চলছে।

মংলু আর তাঁর সঙ্গিদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কিছু আলোচনার পর; ও মাথা নেড়ে ইশারা করতেই এক জন বাঁদরের গলার আওয়াজে খাদের দিকে মুখ নিচু করে কি যেন বলে উঠলো।

মিনিটখানিক পরে দেখি গাছে গাছে দোল খেতে খেতে এক পাল বাঁদর বাহিনী এসে হাজির। ব্যাগের অবশিষ্ট পেয়ারা আর কলা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিতেই লুফে নিল।

এক বড় বীর হনুমান, মনে হয় ওদের দলপতি, নেমে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ কয়েকটি ডিগবাজি দিয়ে আমাদের সামনে এসে খি খি করে মনে হল হেসে উঠলো। সেই দেখে ওদের দলের বাকি সদস্যরাও নেমে এল। সবাই এক বার করে ডিগবাজি খায় আর খি খি করে হাসে।

মংলুর সহচর একজন বলল, "এই দলে বাচ্চা বাঁদরের সংখ্যা কমে গেছিল ওই কালিয়টার অত্যাচারে। ওরা বুঝে গেছে যে আজ কালিয় নিধন আমাদেরই হাতে হয়েছে। সেজন্য আমাদের দেখে এই সমবেত ডিগবাজির নাচ আর এতো হাসি।"

#

আমি পুরো ব্যাপারটা দেখছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম। বারবারই মনে হচ্ছিল জংলি প্রাণী বলে আমরা যাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি তাদের সম্পর্কে আমরা কত কম জানি। আবেগ, রাগ, দুঃখ, শোক সব আমাদেরই মত। এরপর প্রায় পুরো সপ্তাহটা মংলু আর তার দলের সঙ্গে কাটিয়েছি। অরণ্যকে নিজের কাজের খাতিরে যতোটা জানা-বোঝা-চেনা উচিত মংলু আর তার দুই সহচর আমাকে তার চাইতে অনেক বেশি দেখিয়ে-শিখিয়ে দিয়েছে।

লোহাপাহাড়ের পূর্ব আর পশ্চিমের শৃঙ্গগুলো, পাহাড়ী ঝর্না, পুরনাপানির দুই ধার, ঘাস বন, বনের মধ্যে পায়ে চলা শুঁড়ি পথ আর তাদের শাখা প্রশাখা, সব মোটামুটি দেখে-চিনে নিয়েছি। পশ্চিমের শৃঙ্গ থেকে সামান্য দূরে একটা মাঝারি আকারের জলপ্রপাত দেখে উল্লাসে মন নেচে উঠলো। কিছুটা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য আর কিছুটা আমার প্রস্তাবিত মডেল অনুযায়ী এক বড় আকারের ভূত্বাত্তিক আলোড়নের সাক্ষী মিলে যাবার জন্য।



লোহাপাহাড় পশ্চিমের কাছে জলপ্রপাত

সেই সময়ের উপগ্রহ চিত্রে এটি আশ্চর্যজনক ভাবে হয় ধরা পড়ে নি নয়তো গ্রীন ফিল্টার ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু জঙ্গলের এরাই সব নয় অনেক বন্যপ্রাণীও আছে। এদের মধ্যে বেশি পরিচয় হয়ে গেছে এক পাল সোনালি হলদে চিতল হরিণ আর বাঁদরবাহিনীদের সঙ্গে। তথাকথিত হিংস্র বা বিপদজনক প্রাণী যেমন জংলি শুয়ার, ভালুক বা বাইসন এরা সবাই জঙ্গলের এক একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে থাকে। খাবারে ভাগ না বসালে বা এদের সন্তান সন্ততির পক্ষে বিপদজনক মনে না হলে সাধারণত এরা তেড়ে এসে মানুষকে আক্রমণ করে না। এমনকি বাঘও না। কপাল নেহাত খুব খারাপ না হলে এরা সবাই মানুষকে এড়িয়েই চলে। এরা সব্বাই ভয় পায় মানুষকে আর তার হাতে যদি আগুন থাকে তবে তো আর কথাই নয়। কোনও কারণে মরিয়া না হলে বা নিতান্ত প্রাণভয়ে এরা শেষ কামড় দেবার মত মানুষকে আক্রমণ করে।

প্রতিদিন জঙ্গল চিনতে মৈনাক পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে কিম্বা ফেরার পথে ওরা এই সব কথা আমাকে বলতে বলতে যেত। এক আধবার হাতেকলমে ও দেখিয়ে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি বাইসনের পাল আমাদের দেখে তেড়ে এল না, দূর থেকে লক্ষ্য করছিল আমরা কী করি।

জঙ্গলে মাটির তলায় বিশাল আকারের খামআলু পাওয়া যায়। এক দু'দিন দুপুরে এই খামআলু পোড়া খেয়েছি ওদের সঙ্গে। অজানা খাবার খেতেও ভালো পেটও ভরল। একদিন এই খামআলু খুঁড়ে বার করার সময় জংলি শুয়ারেরা তাড়া করে এল। তবে গাছে থাকা বাঁদরের দল আমাদের সময় মত সাবধান করেই দেওয়ায় কিছু একটা আসছে ভেবে আমরাও ব্যাগ থেকে মশাল নিয়ে তৈরি ছিলামই। আগুন দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে পালাল শুয়ারেরা কিন্তু যাবার সময় দলের এক দুজন আমাদের তুলে রাখা খামআলু নিয়ে পালাল।

মংলু আমাকে একটা দারুণ জিনিস শিখিয়ে দিল। প্রায় সব অরণ্যে বাঁদরবাহিনী থাকেই আর এদের সঙ্গে দোস্তি করে নিলে বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যও সময় পাওয়া যায়। এরা গাছের মগডালে মগডালে ঘুরে বেড়ায় আর বিপদের গন্ধ বুঝে নেবার জন্মগত ক্ষমতার অধিকারি। কোনও বিপদ বা হিংস্র জানোয়ার আশেপাশে থাকলেই বহু আগেই তার জানান দিয়ে দেয়।

ঘাস বনে শিকারের জন্য ওঁত পেতে থাকা বাঘের শিকার বিগড়ে দেয় নানাবিধ আওয়াজ করে।

পাহাড়ী নালা পুরনা-পানির একটা ছোটোখাটো জল প্রপাত আমাদের ক্যাম্পের ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যায়।



ক্যাম্পের কাছে পুরানাপানির জলপ্রপাত

ক্যাম্পে ফেরবার আগে আমরা এই জল প্রপাতের ধারে প্রতিদিন কিছুক্ষণ বিশ্রাম আর স্নানের জন্য থেকে যাই। জিরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটু গল্পগাছাও হয়। ঢোলপুরের মহারাজা এই অরণ্যে শিকার করতেন আর কখনো কখনো বিশ্রামের জন্য পাহাড়তলির গ্রামেও ঢুকে পড়তেন। গ্রামে ঢোকবার পথে কোনও গ্রাম্যসুন্দরীকে চোখে লেগে থাকলে

#

বিবাহ করতেন। মংলু সর্দারের ঠাকুরদা সেইরকম এক বিবাহের সন্তান। এদের অবয়বে রাজবংশের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও রাজা এদের রাজকুমারের মর্যাদা দেন নি। তবে কিছুটা নিষ্কর জমি, এক পাল গরু-মোষ দান করেছিলেন। রাজবংশের লোকেরা চিরকাল এদের ঘৃণার চোখেই দেখে এসেছেন। স্থানীয় আদিবাসীরাও এদেরকে নিজেদের জাতভাই বলে মনে করে না। এদের ঘরে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

মংলু বলে, "রাজার এই রকম অনেক বংশধর আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরে দূরে। অনেকটা বাধ্য হয়েই নিজেদের রক্তের সম্পর্কেই আমাদের বিয়ে হয়।"

সেদিন এই সম্পর্কে আর আমাদের মধ্যে কথা না হলেও এর কিছুদিন পরে এই ঝর্নার ধার দিয়ে টকটকে লাল কাপড়পরা একটি লোককে ক্যাম্পের মেন গেটের দিকে চলে যেতে দেখে মংলু বলে ওঠে, "ইনি হলেন মালাং সিঙ্গা মানে প্রধান পুরোহিত। আজ অমাবস্যা, ক্যাম্পের মেন গেটের পাশে রাজার যে কালী মন্দির আছে সেখানে মাঝরাতে পুজো করবেন ইনি।"

আমি বলি, "কালী মূর্তি আর পঞ্চবটীর নিচে পাওয়া শিলা দুজনেরই পূজা হয়?"

মংলু বলে, "আমরা ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করি না। শিলা বা গাছকেই দেবতা বলে মনে করি।"

আমি বলি, "ভোগী, শিকারি রাজা বদলালেন কি করে?"

মংলু বলে, "আমার ঠাকুরদার মুখে সেই সময়ের বেশ কিছু কথা শুনেছি। সেইসময় মহারাজার এক তান্ত্রিক গুরু ছিল। এক বার সেই তান্ত্রিক, রাজার সঙ্গে এই শিকার বাড়িতে এসে পঞ্চবটী দেখতে পায়। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে মারাং বম্মাই মানে বর্তমান শিলাটি পান।"

রাজা ওই তান্ত্রিকের পরামর্শ মত এই শিলা আর পরে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তির পুজো শুরু করে কিন্তু প্রতিবারই পুজো শুরু করলেই নানারকম অলৌকিক উৎপাত শুরু হত। তান্ত্রিক গুরু তার কাটান করতে এখানে আবার আসে।"

আমি বলি, "তাহলে এই পুজোর সঙ্গে কোনও তান্ত্রিক আচার মানে নরবলি ইত্যাদি হয়েছিল নাকি?"

"মারাং বম্মাই-এর থানে পায়রা বলি পর্যন্ত কখনো হয় নি।"

আমি বলি, "তান্ত্রিক কিন্তু মারাং বম্মাইকে সন্তুষ্ট করেছিল মনে হয়। কেন না শুনেছি দেবীপূজাটা বর্তমান মহারাজের দুই পুরুষ আগেকার এবং সেটা তো এখনো নির্বিঘ্নে হয়।"

"আমার শোনা কথাটাও সেইসময়কার। মহারাজের তান্ত্রিক গুরুদেব পঞ্চবটির আসনে ধ্যানে বসে বুঝতে পারলেন যে মারাং বম্মাই-এর ভৈরব দেবীকে পঞ্চবটির আসন থাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেন নি। সেই কারণে মারাং বুরু থেকে উনি অন্ধকার পক্ষে নেমে আসেন নি। দেবীও পুজো নেন নি।"

আমি কিছুই বুঝতে পারি নি দেখে মংলু বলে, "লোহাপাহাড় পশ্চিম হল মারাং বুরু যেখানে মারাং বোঙ্গা বা ভৈরব থাকেন তার থানে। দেবীর আহবানে প্রতি অন্ধকার পক্ষে উনি নেমে আসেন মারাং বুরু থেকে।"

আমি বলি, "তান্ত্রিক কীভাবে দেবী বা ভৈরবকে আবার তুষ্ট করলেন?"

"তান্ত্রিকের চেষ্টায় কিছুই হয় নি দেখে মহারাজ নিজেই চেষ্টায় লেগে গেলেন। উনি নিজেও অল্পসল্প তন্ত্র-মন্ত্র জানতেন। উনি শুনেছিলেন দেবদাসীদের নাচে ভৈরব আকর্ষিত হন। মহারাজার লোকজন কোনও এক গ্রামের মন্দির থেকে জোর করে এক দেবদাসীকে নিয়ে রাজার শিকার বাড়ি, এখন যেটা কোম্পানির গেস্ট হাউস, সেখানে ওপরের দোতালায় মহারাজের নাচঘরে বন্দিনী করে রাখে।"

গেস্ট হাউসের দোতলার নাচঘর মানে এটাই তাহলে সেই সেই ঘর যা কাউকে দেওয়া হয় না। গেস্ট হাউসের আমার ঘরের সেই পাশের ঘরটা না?

বিস্মিত ভাব চেপে বলি, "তাহলে দেবদাসীর নাচেই সন্তুষ্ট হয়ে ভৈরব মেনে নেন মারাং বম্মাইকে পঞ্চবটি থেকে মন্দিরে নিয়ে আসা?"

মাথা নেড়ে মংলু সর্দার বলে, "দেবদাসী, মহারাজ বা তার অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে রাজি হলেও মন্দিরে ভৈরবকে নাচে আকৃষ্ট করা মহাপাপ বলে রাজি হয় না। নাচঘরের পাশের ঘরের চোর-কুঠুরিতে বন্দিনী নর্তকীকে জোর করে এখানের মন্দিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তিতে সে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়।"

খুব সম্ভবত এই চোর-কুঠুরিকেই হয়তো পরে গেস্ট হাউসের আমার সেই ঘরের লাগোয়া চান ঘর বানানো হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মংলু বলে, "সেই সময়ের মালাং সিঙ্গাকে (প্রধান পুরোহিত) ভৈরব স্বপ্ন দিয়ে জানান যে উনি নর্তকীর ঘটনায় ব্যথিত হয়েছেন। এবার থেকে উনি আগের মত প্রতি অন্ধকার পক্ষে দেবীর আহ্বানে মারাং বুরুতে নিজে থান থেকে নেমে আসবেন।"

আমি বলি "তোমাদের মধ্যে কেউ কি দেখেছে ভৈরবের নেমে আসা?"

মংলু বলে "মালাং সিঙ্গা দেখেছে এক বার তাও স্বপ্নে। ভৈরব তার নন্দি ভৃঙ্গী নিয়ে নামবার আগে চার দিকে নিদালী ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে, নয়ত স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে থাকে।"

এই কারণেই কি সেই রাত্রে আমার চিৎকার ওয়াচ টাওয়ারের কেউ শুনতে পায় নি।

কিন্তু আমি কি তাহলে জেগে স্বপ্ন দেখছিলাম? মংলুর মুখেই শোনা যাক তাদের মালাং সিঙ্গা স্বপ্নে কি দেখেছে?

মংলু বলে, "বাবা ভৈরবের নন্দিভৃঙ্গীর দলে মোট ছয় জন। সবার পিছনে থাকেন ভৈরব। নামার আগে এরা প্রত্যেকে মাথায় এক জোড়া করে জ্বলন্ত প্রদীপ ..." বাকি কথা আর আমার কানে ঢুকলো না।

#

সে রাত্রে স্বপ্নেই হোক আর জেগেই হোক আমি যাদের নামতে দেখেছি সেটা কোনও কাপালিকের দলবল নয়। তবে সেটা ভৈরবের দল বলে এখনই মানতে পারছি না।

কিন্তু গেস্ট হাউসের স্নানঘরে নূপুরের আওয়াজ বা আমার টর্চের আলো সিঁড়িতে পড়তেই যে এক জোড়া জ্বলন্ত নীল চোখ আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল তা তো অস্বীকার করতে পারি না। সেই অশরীরী সত্ত্বা কি কিছু বলতে চাইছিল?

আমার কাজের সঙ্গীরাঃ

লোহাপাহাড়ের অরণ্যের ভূগোল খানিকটা মনের মধ্যে গেঁথে নেবার পর এবার ভূতাত্বিক সমীক্ষার পালা। মংলুর সঙ্গে পুরো অরণ্যের সবকটা কম্পার্টমেন্ট ঘোরার পর মনে হয়েছে যে লোহা খনিজের পাথর আর সাধারণ পাথরের সীমারেখার বেশীটাই আছে পাহাড়ী নদীর অপর পাড়ে লোহাপাহাড়-পশ্চিমের পাহাড়তলিতে। তাই আমার কাজের একটা বড় সময় লাগবে লোহাপাহাড় পশ্চিমে।

কাজের জায়গা দেখে নায়ার স্যার আর ক্যাপ্টেনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ওদের উদ্বেগের ব্যাপারটা আমিও জানি। ক্যাপ্টেন প্রতাপ একটা পুরো দিন আমার সঙ্গে কাটালেন রুট নিয়ে। আমি কোন পথে যাব আর ফিরব, ঠিক কটার সময় কাজ বন্ধ করবো এটা স্থির হল।

চুরুট ধরিয়ে, ক্যাপ্টেন ম্যাপে ঘাসবনগুলো দেখিয়ে বললে, “এগুলো পার হতে যেন কিছুতেই দুপুর না গড়িয়ে যায়। মনে রাখবেন ম্যানইটার বাঘের হাত থেকে একবার বেঁচে ফিরে এসেছেন এবং সেটা এই ঘাসবনেই।”

পাহাড়ী নদীতে মাছ ধরা আর নদীর চরে আনারস বন থেকে আনারসের লোভে আমাদের বিকেল গড়িয়ে গেছিল।

ঘাসবনে একটা বড় আকারের নড়াচড়া একটু অস্বাভাবিক দেখেই মংলু আর তার দেখাদেখি আমরা সবাই মুহূর্তের মধ্যে নিজের নিজের মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম। হয়তো তাই দেখেই একটু দূরে একটা ডোরাকাটা মুখ এক ঝলক দর্শন দিয়েই আর নিজের গর্জন মেলাবার আগেই পালিয়ে গেছিল। আমি এবং আমার সাথিরা সেদিন ঘাসবনের সামনে আনারস আর মাছের লোভে বেশিসময় কাটিয়ে নরখাদক বাঘকে নিজের শিকার বাছবার যে কতটা সুযোগ দিয়েছিলাম সেটা মনে করিয়ে দিলেন নায়ারস্যার আর ক্যাপ্টেন দুজনেই। নায়ারস্যার আরও মনে করিয়ে দিলেন ডি এফ-ও সাহেবের সতর্কতা নির্দেশ। সমীক্ষা বা নমুনা নেবার কাজে কোনও গাছ যেন কাটা না পড়ে বা বনের পরিবেশ যেন নষ্ট না হয়। বোধ করি ব্যাপারটা আমাকে হাতে কলমে বোঝানোর জন্য নায়ার স্যার ম্যাথিয়াসকে আমার সঙ্গে দিলেন।

ম্যাথিয়াস এর আগে অরণ্য বিভাগে কাজ করেছে আর এই অরণ্যকে নিজের হাতের তেলোর চাইতেও বেশি চেনে। ও আমার সঙ্গে কিছুটা গিয়ে নিজের কাজে অন্য জায়গা চলে যাবে। তবে দুপুরে আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে পুরনাপানির ঝর্নার কাছে। সাঞ্চাচুলোর লোকজন আজ খাবার নিয়ে ওখানেই আসবে।

লোহাপাহাড়ের ক্যাম্প দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা বিশাল উপত্যকাতে। এক সঙ্গে তিন চারটে ফুটবল মাঠ মিলিয়ে যতটা জায়গা হয় এটা তার চাইতেও বেশি।

সকাল সাতটা বাজার আগেই এই ক্যাম্পের প্রধান তাঁবুর কাছে ক্যাম্পের সবাই চলে আসে। এরপর কাজের রকমফের অনুযায়ী নিজের নিজের দলে ভাগ হয়ে যায় সবাই। সমীক্ষার কাজ শুরু করবার দিন প্রধান তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখি সার্ভের টিমের লোকজনের ছাড়াও প্রায় জনা ত্রিশেক লোকের একটা দল ম্যাথিয়াসের সঙ্গে। আমার কাজে সার্ভে টিমের লোকজন, মংলু সর্দার আর তার দু'জন আর জঙ্গলবাহিনীর দুজন লোক চাই। ম্যাথিয়াস যে কাজে যাবে তাতে ওর বড়ো জোর চারজনের বেশি লাগার কথা নয়। এইসব মিলিয়ে মেরেকেটে দশ এগারো জনের বেশি লাগার তো কথা না।

তখন তো জানি না রোমাঞ্চকর একটা ঘটনাবহুল পুরো দিন অপেক্ষা করে আছে, অজানা অদেখা সম্ভার নিয়ে যাতে নতুন করে বুঝতে পারব বন্যপ্রাণীদের, দেখতে পাব তাদের মধ্যে বাঁচা মরার এক লড়াইও। আমার কাজে যে এই তিরিশ-বত্রিশ জনের লোকবল যে লাগবে না সেটা ম্যাথিয়াসকে বলতেই ও বলে, "ও নিয়ে আপনি এখন ভাববেন না স্যার। একটি অদরকারি লোকও আপনার দলে নেই। দিনের শেষে সে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।"

দরকারের অতিরিক্ত লোকবল ব্যাপারটা আমাকে চিন্তায় রাখল। বলা যায় না এই নিয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। দিনের শেষে মাস্টার রোলের তলায় সইটা আমারই হবে।

লোহাপাহাড় এক জায়গাতে এসে পশ্চিম আর পূর্ব এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে লোহার আকরিকের বেশিটাই আছে পশ্চিম পাহাড়ে। পুবের পাহাড় লাল রঙের মাটিপাথরে গড়া, তার অনেকটাই নেড়া।

দুই প্রান্তের দুটি জলপ্রপাত, ঘন জঙ্গল আর চুড়োয় চুড়োয় ভেসে চলা সারি সারি মেঘ আর বন্দী কুয়াশার ধোঁয়া পশ্চিমপাহাড়কে দিয়েছে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। আমার কাজও এই পশ্চিমপাহাড়কে নিয়ে।

জঙ্গলে মানুষ চলে চলে শুঁড়ি-পথ তৈরি হয়েছে। সেই পথে ম্যাথিয়াস আমাকে নিরাপদ আর শর্টকাট রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এল পশ্চিমপাহাড়ের উপত্যকায়। ভূপ্রকৃতির সঙ্গে বিধিনিষেধ না লঙ্ঘন করে কিভাবে খনিজের নমুনা নেওয়া হবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে চারজন সহকারী সমেত নিজের কাজের জায়গায় চলে গেল।

পশ্চিমপাহাড়ের পাহাড়তলিতে এসে সার্ভেয়র মুরমু তার সারভে স্টেশন খুঁজে বের করে আমার কাজের জন্য আরও কিছু স্টেশন তৈরি করে আমাকে বললে, "আপনি একবার দেখে নিন স্যার। এই স্টেশনগুলোতে আপনার কাজে সুবিধে হবে তো? আমরা পশ্চিমপাহাড়ের সার্ভেতে এইগুলোর সাহায্য নেব।"

থিওডিলাইটের দূরবীনে স্টেশনগুলো একের পর এক দেখতে গিয়ে চোখ পড়ে গেল দুটো স্টেশনের মাঝখানে কিছুটা খেজুর গাছের মত দেখতে এক লম্বা গাছের দিকে। দেখি শুধু এই গাছটা নয় এর আশেপাশেও আরও এই রকমের গাছে আমাদের দলের বেশ কয়েকজন চড়েছে। এরা গাছের মগডালের কিছু অংশ চেঁছে নিয়ে সেখানে মাটির হাঁড়ি টাঙ্গিয়ে দিচ্ছে ঠিক যে ভাবে খেজুররস নেওয়া হয়। এরা কাজের সময় এই সব কেন করছে? তবে আমি নিজেও তো একজন শিক্ষানবিস। খনিজ সমীক্ষার ব্যাপারে কলেজে পড়া বিদ্যে ছাড়া তেমন কিছু জানি না। হতে পারে, পরে এদের দিয়ে কোনও কাজ হবে।

#

আজ প্রথম দিনে নিজের কাজের রকম-ফেরটা বুঝে নিয়ে তারপর নায়ারবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে বসতে হবে। তবু কেন জানি মনে হল সার্ভেয়র মুরমু আমাদের দলের লোকজনের সংখ্যা নিয়ে আমার সন্দেহের কথাটা বুঝতে পেরেও কোনও কারণে ভেতরের কথা আমাকে বলতে চাইছে না। পশ্চিম পাহাড়ের পাহাড়তলির পরের বেশ কিছু অংশে কষ্টকর চড়াই পার হতে হয়। ভূতাত্ত্বিক কারণে এরপরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে সমতল। একটু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়াও এখানের অবস্থান মিলিয়ে নিতে হবে নিচে লাগানো স্টেশনগুলোর সাহায্যে।

এখান থেকে আমাদের ক্যাম্প আর নিচের নদীকেও দেখা যাচ্ছে তবে সেজন্য থিওডিলাইটের শক্তিশালী দূরবীনে চোখ রাখতে হচ্ছে। দূরবীনে নদীর কাছে কিছু লোকজন দেখে আমি আমার বাইনোকুলারে চোখ রাখলাম। এই লোকগুলোকে দেখে মনে তো হচ্ছেই যে এরা আমারই বিশাল দলের একটা অংশ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আমার সঙ্গে সার্ভের লোকজন আর জঙ্গলবাহিনীর লোক ছাড়া আরও ছয়জন আছে। বাকিরা গায়েব। গায়েব মানে কেউ খেজুরগাছের মত দেখতে সালফি গাছে রসের হাঁড়ি টাঙ্গাচ্ছে আর নয় তো অন্য কিছু করছে।

হারাধনের দশটি ছেলের মত এখন আমার সঙ্গে থাকা ছ'জনের মধ্যে দুজন লোক পাথরের নমুনা নেবার কাজে লাগবে কিন্তু আর বাকি চারজন? এই চার জনের কাঁধে দেখি তীরধনুক আর হাতে শাবলও আছে। মুরমু তার কাজ শেষ করে গাছের ছায়াতে বসেছে। ব্যাপারটা একবার ওকে চেপে জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে এবার।

আমি বললাম, "মুরমু, একটু আগে আমি বাইনোকুলারে দেখলাম আমাদের ক্যাম্পের লোকেরা নদীর ধারে কিছু খোঁড়া-খুঁড়ি করছে। ওরা কি আমাদের টিমের লোক?"

"হ্যাঁ, ওরা নদীর ধারে পিঁপড়ে আর উইপোকার ডিম খুঁড়ে বার করছে। এছাড়া ওর আশেপাশে অনেক চারাগাছের শেকড়ও আছে।"

নিজের প্রতিক্রিয়া সামলে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এসব দিয়ে কী হবে? তাছাড়া ওদের তো এখন আমাদের সঙ্গে ঠিক এইখানে থাকার কথা।"

মুরমুর প্রধান সহকারী সোমরা বলে, "সাহেব পিঁপড়ের ডিম, চারাগাছের শেকড় আর মহুয়া খোল দিয়ে দারুণ মাছের টোপ তৈরি হয়। বড়শীর আগায় সামান্য খানিক দিয়ে আর বাকি আশেপাশে একটু চারিয়ে দিলেই আর দেখতে হবে না। আধঘণ্টার মধ্যেই চুপড়ি ভরে যাবে মাছে।"

আমি খুব কষ্টে রাগ সামলে বললাম, "মুরমু, তার মানে ওই লোকেরা নদীতে মাছ ধরার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল?"

মুরমু বলে, "স্যার শুধু ওরাই নয় আরও কয়েকজন এখন আমাদের সঙ্গে নেই।"

#

হচ্ছেটা কি? তিরিশজনের দলে কাজ করার জন্য শুধু মুরমু আর তার সার্ভের লোক আর আমার সঙ্গে দু'জন লোক নমুনা নেবার জন্য। তিরিশজনের মধ্যে একটু আগেও আমাদের সঙ্গে তো সঙ্গে আরও ছ'জনার মত ছিল। ওদের কেউ কেউ আবার তীর-ধনুক, শাবল হাতে নিয়ে ঘুরছিল।

মুরমু বলে, "স্যার ওই চারজন যারা একটু আগে আপনার সঙ্গে ছিল? ওরা গেছে জঙ্গলের ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম) তুলে আনতে আর দু'জন খামআলু খুঁড়ে আনতে।"

আমি বললাম, "এরা কি আর এখানে ফিরবে? ফিরলেও তো আমাদেরকে পাবে না, আমরা তো পশ্চিম লোহাপাহাড়ের চুড়োর দিকে যাচ্ছি।"

সোমরা হেসে বলে, "স্যার খামআলু আর মাশরুম জোগাড় করতে করতে ওরা ক্যাম্পের কাছেই পৌঁছে যাবে।"

আমি এবার ঠিকই করে ফেললাম আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে তাদের মাস্টাররোলেই সই করবো। কিন্তু এই রকম ব্যাপারটা কেন চলছে সেটাও জানতে হবে।

লোহাপাহাড় পশ্চিমের দিকে চড়াই পথে শুরু করলাম আমরা। এই পাহাড়ের শিখরটি সবার চাইতে যেমন উঁচু, চড়া ততটাই কষ্টের। লোহাপাথর আর সাধারণ পাথরের সীমারেখাটিও এখানে দেখা গেল। মুরমুর দল আর আমি সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়লাম এই সীমারেখাকে মানচিত্রে দেখাবার জরীপের কাজ করতে। ভূতাত্ত্বিক কারণে চ্যুতির জন্য এখানে যেমন একটি বড় জলপ্রপাত হয়েছে ঠিক সেইজন্যই লোহা পাথরের সঙ্গে সাধারণ পাথরের সীমারেখা পশ্চিম পাহাড়ে এতো পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। এই অকাট্য প্রমাণ আজ আমি নিজের চেষ্টায় খুঁজে পেয়ে আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম। এখান থেকে যেতে মন চাইছিল না।

মধ্যদিন প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমাদের এই পাহাড়ের পূর্বের ঢালে চুড়োতে পাওয়া সীমারেখার জরীপের কাজ বাকি রয়েছে এবং নিরাপত্তার কারণে বিকালের আগে ক্যাম্পের কাছে চলেও আসতে হবে। তবে এখন কাজ হল নিচের দিকে নামা আর নামতে নামতে খনিজ পাথর আর সাধারণ পাথরের সীমারেখাটি চট-জলদি জরিপ করে নেওয়া।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই কি ঘাসবন হয়? আমরা পথ- সংক্ষেপ করতে গিয়ে পড়লাম এক কাঁধ সমান লম্বা ঘাসবনের কাছে। লম্বা লম্বা গাছ মাঝে মাঝেই ঘাসবন ফুঁড়ে আকাশের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আমি অবোধ শিশুর মত আসন্ন বিপদটা যে কি তা না বুঝেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মুরমু আমার হাত টেনে ধরে ইশারায় থামতে বলে। মুরমুর পুরো দল আর আমার সঙ্গে থাকা পাথরের নমুনা নেবার দু'জন যারা আসলে জঙ্গলবাহিনীর লোক লম্বা লম্বা গাছগুলোর প্রতি শাখা-প্রশাখাকে চিরুনি তল্লাসি দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস স্বরে কিছু বলছে।

এদের মধ্যে সব চাইতে আনাড়ি আমি। কি হয়েছে বা হতে পারে, চেষ্টা করেও মাথা মুণ্ডু কিছু না বুঝলেও এটা মনে হল এরা এই ঘাসবন পার হতে চাইছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয় এইরকম কিছু একটা ভাবছে।

#

তবে কি ওরা সন্দেহ করছে কোনও হিংস্র প্রাণীর যা এই ঘাসবনের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। সেটা যে কী প্রাণী হতে পারে তার একটা আন্দাজ পেলাম, তবে ওদের মত আমিও এখন নির্বিকার হতে শিখে গেছি। বাইনোকুলার দিয়ে পুরো ঘাসবনটার যেখানে যেখানে সম্ভব সেই সব জায়গাতে তল্লাসি করে দেখার মত দেখতে থাকলাম।

আমার বাইনোকুলার এবং ওদের অভিজ্ঞ চোখে প্রায় একইসঙ্গে দেখা গেল যে ঘাস বনের পূর্বদিকে একটা ঝড় ঢেউ-এর মত ওঠানামা করতে করতে আমাদের থেকে হাত তিনেক দূরে লম্বা গাছগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি শঙ্কিত হলেও দেখি আমার সঙ্গীদের মুখে চাপা আনন্দ। তবে কি ওরা এখানে ক্যাম্পের কোনও টিমের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘাসবন থেকে জোরে লাফ দিয়ে যারা গাছের ডালে ডালে উড়ে এসে জুড়ে বসলো তারা হল এক বড় বাঁদরবাহিনী।

সার্ভে টিমের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল এই দুই দল প্রাণের বন্ধুর যেন বহুদিন পরে দেখা হল। এইবার বুঝলাম একটা বড় হ্যাভার স্যাক ভরতি কলা, পেয়ারা, বাতাবি আর নাসপাতি ওরা কাউকে না দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেই ওরা যে ভাবে ক্যাচ ধরছিল তাতে সাউথ আফ্রিকার জন্টি রোডসও লজ্জা পেয়ে ট্রেনিং নিতে চলে আসবে। এর মাঝে ওদের দলপতি আর কিছু সদস্য গাছ থেকে নেমে সাম্বা আর সালসা মিশিয়ে মাটিতে ডিগবাজি খেয়ে মনের খুশি দেখিয়ে গেছে। কিন্তু গাছে উঠে ওরা এমন জোরে হুপ-হাপ আর কিচ কিচ করে কি সব বলছিল যে আমরা কোনও বিপদসঙ্কেত ভেবে এগোই নি। ঘাসবনে দূর থেকে লাল ধুলোর ঝড় তুলে কে বা কারা আসছে? ঘাসবনে ঢুকে পরা কাউকে চিতা তাড়া করে আসছে না তো?

একটু পরেই আমাদের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে ধুলোর ঝড় তুলে যে এল সেকোনও চিতা নয়, একপাল চিতল হরিণ, বা বলা ভালো চিতল এক্সপ্রেস। গাছের ওপর কপিবাহিনী দেখতেই থেমে গেল তারা। আমাদের থেকে পাওয়া ফলগুলো থেকে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছিল চিতলহরিণ বন্ধুদের জন্য। সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন করল আর ওরাও সানন্দে লাফিয়ে সেগুলো গ্রহণ করল। আমরাও বেশ কতগুলো পাকা পেয়ারা চিতলদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। কপিবাহিনী সেই দেখে আনন্দে কিচ কিচ করে উঠলো।

সবার পরে পৌঁছাল এক জোড়া চিতল দম্পতি। তাদের দিকে পেয়ারা ছুঁড়তেই ডুয়েট নাচের ভঙ্গিতে দুজনেই অনেকটা উঁচুতে এক সঙ্গে লাফিয়ে সেগুলো কামড়ে ধরল। এই দেখে আমরা সবাই দু'দলের দিকেই সবার ব্যাগ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাকি ফলগুলোও ছুঁড়ে দিতে থাকলাম। এবার শুরু হয়ে গেল হরির লুঠের মত মাটিতে গড়িয়ে পড়া ফলগুলো কুড়াবার বা সোজা মুখে ফেলে দেবার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। এরমাঝে দু'পক্ষের যৌথ নাচও হচ্ছিল। বাঁদরেরা দুপায়ে হেলেদুলে। কখনো ডিগবাজি খেয়ে। হরিণেরা সামনের দু'পা জোড়া দিয়ে আকাশের দিকে তুলে পেছনের পায়ের খুরে ভর দিয়ে হেলেদুলে অথবা কখনো স্প্রিঙের মত লাফিয়ে শরীরকে সামান্য ভাসিয়ে দিচ্ছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। এ জিনিস আমি তো নয়ই, বহু বছর বনেজঙ্গলে জরীপের কাজে ঘোরা সার্ভে টিমের কেউ দেখে নি। হঠাৎ করে কি হল, রেফারি যেমন খেলা শেষের বাঁশি বাজায়, সেভাবে হনুমান দলপতি মুখে একটা অদ্ভুত সুরে হিপ হাপ করল। মুহূর্তের মধ্যে মাঠ ফাঁকা করে দুদলই বিদায় নিল। হরিণের দল ঘাসবনের ফাঁকে শুঁড়িরাস্তায় আর কপিবাহিনীও সেইদিকে তবে

#

আকাশ পথে, গাছের শাখায় শাখায় দোল খেতে খেতে। তবে হ্যাঁ, যাবার আগে কপিবাহিনীর পক্ষে বীর হনুমান আমাদেরকে তাদের সঙ্গে যাবার ইশারা করল রীতিমতো ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে। এসব কে এদের শেখালো কে জানে?

এতক্ষণ যেন আবিষ্ট হয়ে ছিলাম। সেই ঘোরটা কাটতেই মনে হল ঘাসবন পার হতে গিয়ে আমরা অনর্থক অতটা সময় ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছি। শুঁড়ি পথে যেতে যেতে আমি মুরমুকে এই নিয়ে কথা বলতেই ও সবিনয়ে বলে, "স্যার লাঞ্চের সময়ে নায়ারস্যারকে এটা জিজ্ঞেস করবেন। এখন আমাদের জলদি জলদি ভ্যালিতে নেমে গিয়ে সেখানের কাজ শেষ করে পুরনাপানির ঝর্নার কাছে পৌছাতে হবে। নায়ারস্যার দেরি হয়ে গেলে রাগ করেন।"

নায়ারস্যার তাহলে সবাইকে ফিল্ডে পাঠিয়ে নিজে ক্যাম্পে বসে থাকেননা, উনিও ফিল্ডে বেরিয়ে পড়েন। উপত্যকার শুরুর একটু আগেই পুবের ঢালে থিওডোলাইট বের করে জরীপের কাজ শুরু হয়ে গেল। উপত্যকায় এক এক পর্বের কাজ শেষ করে এবার আমাদের সারাদিনের কাজ মিলিয়ে নেবার পালা। কাজ শেষ কিন্তু মুরমু তার থেওদলাতের টেলিস্কোপে কিছু একটা দেখে মেশিন গুটিয়ে নেবার জন্যও তার লোককে বল্লেও না। আমি ঢাল বেয়ে নিচের দিকে যাচ্ছি দেখে মুরমু বলে, "স্যার একটা জিনিস দেখে তবেই যাবেন।" সারাদিনের কাজের ধকলের পর এবার নিচে নেমে ভ্যালির গাছের তলায় একটু জিরিয়ে নেব ভাবছিলাম। মুরমুর কথায় বিরক্তি আর চাপতে পারলাম না, "কি মুরমু কাজ তো শেষ হয়ে গেছে এখন আবার কি হল? ও কাল হবেখন।"

মুরমু বলে, "স্যার একটু দেখেই যান টেলিস্কোপে। দেখলে পরে আর এগোতে পারবেন না।"

মুরমু-র থিওডোলাইট টেবিলের কাছে এসে ওর মেশিনের টেলিস্কোপে একবার দেখেনি ব্যাপারটা কি?

উপত্যকার ঘাসে আর ঝোপের বনে এক জায়গাতে জোর আলোড়ন হচ্ছে। উপত্যকাতে জায়গায় জায়গায় পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার ফলে এখানে ঘাস আর ঝোপের জঙ্গল সব জায়গাতে নেই। আমি এবার টেলিস্কোপে সেদিকে ভিউ করতেই দেখি কোথা থেকে এক বড়সড় নেউল পাথরের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। এর পরের দৃশ্য দেখাবার আগে দেখি পুরো টিমের সব্বাই আমাকে আর থিওডোলাইটের টেলিস্কোপ ঘিরে দাঁড়িয়েছে। টেলিস্কোপটা ওদেরকে দেখতে দিয়ে নিজের দূরবীনের ভিউ ফাইন্ডারে দেখি অ্যানাকোণ্ডা সাইজের এক বিশাল গোখরো সাপ। নেউল তো ওর কড়ে আঙ্গুলের থুরি লেজের সাইজের এক ভাগও হবে না।

মুরমু আমাকে বলে, "স্যার এটা হল রাজ গোখরো। মনসা পুজোর সময় ওর পাঁচটা মাথা হয়।"

আমার মনে হল এটি শঙ্খচূড়, এই জঙ্গলে এরা বেশ অধিক সংখ্যায় আছেন। আজ এর একটিকে দেখা গেল।

দেখা গেল বুদ্ধিতে আর রিফ্লেক্সে নেউলের কাছে এই সাপ তেমন এঁটে উঠতে পারছে না। নেউলে ঝোপ আর পাথরের সুযোগ নিয়ে একবার ঝোপের দিকে যায় তো একবার পাথরের দিকে। সাপ বিরক্ত হচ্ছে আর বার বার ব্যার্থ ছোবল মারছে। নেউলে সাপকে দেখিয়ে দেখিয়ে দুই পাথরের ফাটলের কাছে এসে স্থাণুবৎ হয়ে রইল। আমরা যারাই দেখছি তারা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছি এবার কি হয় কি হয়! সাপ এবার ছোবল মারল ঠিক সেই পাথরের ওপর। ওর মাথাটা পাথরে আঘাত করতেই নেউল কোথা থেকে এসে সাপের মাথার এক মোক্ষম জায়গাতে নিজের দাঁত চালিয়ে

#

দিয়েই বিদ্যুৎ গতিতে সটকে পড়ল। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে সাপ মাটিতে মাথা রাখতেই মুহূর্তের মধ্যে নেউলটা ওর মাথার বেশ অনেকটা অংশ কেটে ফেলল।

তিন চারটে নেউলে আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে ছিল। বড় নেউলে সাপটার এই দশা করতেই ওরা সাপের ওপর লাফিয়ে পরে বাকি কাজটা শেষ করে সাপের বিশাল দেহটা নিয়ে টানতে টানতে ঘাসবনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উপত্যকার পথে জোর কদমে পা চালিয়ে আমরা সবাই বেশ দ্রুতগতিতেই চলছিলাম। দূরে পুরনাপানির ঝর্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। পুরো এক বোতল ঠাণ্ডা আর স্বাদু ঝোরার জলেও ঠোঁট আর গলার শুকনো ভাবটা গেল না। নায়ার স্যার আমার অবস্থা দেখে ঝোরার পাশেই পাথরের ছায়ার তলে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সেখানেই বসিয়ে দিলেন। আর একটা জলের বোতলের জন্যও ব্যাগটা হাতড়ে বেরাচ্ছি দেখে নায়ার স্যার অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। শ্যাম বর্ণের দীর্ঘদেহী একজন খেজুর রসের হাঁড়ির মত দেখতে একটা পাত্র নিয়ে এসে নায়ারস্যারকে দিলো।

নায়ার স্যার আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আরও একটা বোতল জল অথবা এই পাত্রের রস এক গেলাস যেটা খুশি খাও। তবে আমার অভিজ্ঞতা বলে যে আরও একটা বোতল জল খাবার পরও তৃষ্ণা বা অবসন্ন ভাব কোনোটাই যাবে না। কিন্তু এই সালফি রস এক গ্লাস খেলে শরীরটা অনেক তাজা হয়ে ওঠে।"

গ্লাসের রসে খানিকটা বিয়ারের স্বাদ খানিকটা আখের রসের স্বাদ কিন্তু মনে হল যেন প্রাণ ফিরে এল। এতক্ষণে বিভিন্ন দলগুলো যারা সকালে ক্যাম্প থেকে নিজের নিজের কাজে বেরিয়েছিল তাদের ফেরা শুরু হয়ে গিয়েছে এই ঝোরার ধারে। আজ সবাইকে লাঞ্চের জন্য এখানেই আসতে বলা হয়েছে। শ্যামবর্ণের লোকটি আর তার দলের লোকেরা বেশ অনেকগুলো রসের হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজ ফেরতা দলের তরফে কেউ একজন এক একটা রসের হাঁড়ি নিয়ে গাছের ছায়ার তলায় নিজের দলের কাছে ফিরে আসছে।

নায়ার স্যার বলেন, "সালফি অনেকটা খেজুর গাছের মত দেখতে। তবে এর রস পাতলা। কিছু জৈবিক পদার্থ থাকার ফলে এটি খুব হাল্কা মাত্রায় গেঁজে ওঠে। ক্লান্তি কাটাবার জন্য এই অঞ্চলের জনপ্রিয় নির্দোষ পানীয়।"

নায়ার স্যারের শুনতে শুনতে সালফি রসের দলের দিকে তাকাচ্ছিলাম। ওই ঢ্যাঙ্গা কালো মত লোকটা যে একটু আগে আমাকে সালফি দিলো তাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ওঃ হো, আজকের দিনের কাজ শুরু করার সময় আমার দূরবীনে তো শুধু এই লোকটিকেই কেন এখন ওর পাশে বসে থাকা পুরো দলটাকেই তো দেখেছি গাছে চড়ে রসের হাঁড়ি টাঙাতে। যাই হোক সালফি রসের সত্যি অনেক গুণ। সারাদিনের পাহাড়ে ওঠা নামা আর রোদেপোড়ার ধকলে মাথা তো ধরেছিলই শরীর থেকে মনে হচ্ছিল কে যেন সব কিছু নিংড়ে নিয়েছে। এখন নিজেকে বেশ চাঙ্গা আর তাজা মনে হচ্ছে।

ম্যাথিয়াস ফিরে এসেই আমাকে দেখতে পেয়ে বলে, "স্যার সব ঠিক তো?"

আমি বুড়ো আঙুল উঠিয়ে ইশারা করতেই ও বলে, "ছ'জন লোকের সালফি রসের পার্টি। রসের হাঁড়ির সঙ্গে সবার জন্যে দুপুরের খাবারও বয়ে এনেছে।"

আমি বলি, "এই এতো লোকের খাবার এরা রান্নাও করেছে আবার চড়াই পেরিয়ে বয়ে নিয়েও এসেছে?"

ম্যাথিয়াস বলে, "না পুরোটা তাই নয়। তবে রস নেওয়া ছাড়া ওদের আরও কাজ থাকে।"

আমি বলি, "ঠিক বুঝলাম না।"

মাথিয়াসের এক বন্ধু মাসা সর্দার বলে, "সালফি গাছ অনেক উঁচু। ওরা রস নেওয়া ছাড়া পুরো দল আর জঙ্গলের ওপর নজর রাখে। জঙ্গলে কোথাও অস্বাভাবিক নড়া-চড়া বা তেমন কিছু দেখলে ওরা সঙ্গে থাকা ছোট ঢোলের বোল বাজিয়ে থাকে। এই ঢোলের বোল শুনেই দূরে দূরে কাজ করতে যাওয়া দলগুলো বিপদ থেকে সাবধান হয়ে যায়।"

ম্যাথিয়াস বলে, "দলগুলো আর দেখা না গেলে ওরা নিচে নেমে চলে যায় সোজা নদীর ধারে।"

আমি বলি, "আমি কাজ করতে করতে বাইনোকুলারে তাহলে এদেরই দেখেছি নদীর ধারে।"

নায়ারস্যার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে যাওয়া দলগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের কাছে এলেন। উনি আমার কথা শুনে মাথা নেড়ে বলেন, "এরা সেখানে পৌঁছানোর অনেক আগেই নয়জন লোকের একটা দল সেখানে নদী থেকে মাছ ধরতে নেমে গেছে।"

মাসা সর্দার বলে, "ওরা আসবার আগেই নদী থেকে আমাদের মাছ ধরা হয়ে যায়। এইবার ওরা ছ'জন আর আমরা ন'জন মিলে দুপুরের খাবার তৈরি করতে লেগে যাই। এতোজন লোকের রান্না শেষ করে ঠিক সময়ে খাবার জায়গায় বাঁকে করে পৌঁছে দিতেও হয়।"

এখানে আসার আগে আমি শুনেই ছিলাম নায়ারস্যারের কথা। এই দুর্গম অরণ্যে তিনি সবার শুধু কাজ করাই নয় কাজটা করতে গেলে যা যা লাগে, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা সবেরই যে সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা সত্যি শেখার মত।

পুরনাপানির ঝর্নার জলে স্নানের পর ফুরফুরে মেজাজে কলাপাতায় গরম গরম ভাত, ডাল, সবজি, নদীর টাটকা মাছের ঝোল খেতে খেতে মনে হচ্ছিল আমার পুরানো সেই ক্ষত, সেই অপমান, যন্ত্রণা এই সব বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই অরণ্য, এই রূপসী প্রকৃতি তার স্রোতস্বিনী নদীর স্রোতে আমার সব দুঃখকে মুছে দিয়ে আমাকে, আমার সত্তাকেই আবার নতুন ভাবে তৈরি করবে।

ক্যাম্পে আসতে আসতে নায়ারস্যার বলছিলেন, "দেখলে তো ভাই এই কপিবাহিনী কিভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে সব অসহায় প্রাণীদের রক্ষা করে। ওই ঘাসবনে ওরা হরিণদের পার করিয়ে তার পিছে পিছে তোমাদেরও পার করিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। ওদের জন্য ওই ঘাসবনে এখন হিংস্র প্রাণীদের উৎপাত অনেক কম।"

নায়ারস্যারের কথা শুনে আমি ভাবছিলাম আমার তো এখন অনেক শেখা বাকি। কয়েক ঘণ্টা আগে আমি ভাবছিলাম যারা আমার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল শুধু তারাই কাজ করছে। বিকেলের ম্লান আলোতে নিজের তাঁবুতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম কাজ আমরা সবাই করি। কেউ সামনে থেকে, কেউ দূরে সালফি গাছে চড়ে আমাদের নিরাপত্তার দিকে নজর রেখে আর ফেরবার পথে তৃষ্ণা মেটানোর ব্যবস্থা করে, দুপুরের খাবারে নদীর টাটকা মাছের জোগাড় করে। সবাই ফিরে এসেছে শেষ দলটা ফিরতেই হই হই পড়ে গেল। এটা সেই ছয়জনের দলটা পাহাড়তলীর উত্তর কোনে গেছিল যারা ফিরে এসেছে চুপড়ি ভরতি খামআলু, মাশরুম আর ফাঁদে ধরা এক ঝাঁক বনমুরগি নিয়ে। আজ রাতের খাবারের জোগাড় ভালই দেখছি।

শ্রুতিলেখকের এই অরণ্যঃ

অরণ্যে বেশ কয়েকদিন কাটানোর পর আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম আমার মধ্যে কিরকম একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। আমি আর আগের মত লাজুক, মুখচোরা, মহাভীতু নই। এই গভীর অরণ্যে আর তারমধ্যে থাকা হিলটপ ক্যাম্পের লোকজনই নয়, এখানের বাঘ, ভালুক, হায়েনা, ময়াল, নেউল, বাঁদর, চিতল হরিণ, ঝর্না আর ছোট নদী এদের সবার সঙ্গে খনিজ অনুসন্ধানের কাজের ফাঁকে দেখা হতে লাগল।

ভয়তো পেলামই না বরং এদের সবাইকে ভালোবেসে ফেললাম। তবে সব চাইতে বেশী জমে গেল এক পাল বাঁদর আর সোনালী হলুদ রঙের চিতল হরিণদের। এরা দূর হতে আমার কাজ দেখে কিংবা আমাকে দেখে। ভুল ঠিক বুঝতে পারিনি তবু কেমন জানি মনে হল এরা সবাই, এই পুরো আরণ্যক প্রকৃতি আর সব জীব-জন্তু, আদিবাসী মানুষেরা কথা বলছে আমার সঙ্গে। তাদের সুখদুখের কথা আমায় শোনাচ্ছে কিন্তু পুরানো যুগের নির্বাক চলচ্চিত্রের মত শুধু ঠোঁট নড়ছে, সে কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।

তবে এটা নিশ্চিত বুঝি যে ওরা সবাই আমাকে ভালবাসে আর অনুরোধ করে আবার কলম ধরবার জন্য। ওদের কথা, সবার কথা লেখবার জন্য। কি করে বোঝাই ওদের যে আমি পারি না এখন। আমার লেখকসত্তাকে আমি এখানে আসবার আগে, কোরাপুট এক্সপ্রেসে চড়বার ঠিক আগে ছেড়ে এসেছি। সেই সত্তা কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি হাত গুটিয়ে রেখেছিলাম।

অরণ্যে দিন আর রাত সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। প্রতিদিন বিকেল গড়াবার আগেই রোজকার কাজ বন্ধ করে ক্যাম্পের মধ্যে যে যার তাঁবুতে ফিরে যাই। ডি এফ ও-র কড়া হুকুমে পুরো ক্যাম্প নিঃশব্দ হয়ে যায়। কারণ একটাই। এখানের আলো বা শব্দ জঙ্গলের রাতচরা পশুদের ভয় পাইয়ে দিতে পারে। কিন্তু একজনের আওয়াজ বন্ধ করা ডি এফ ও সাহেবের নাগালের বাইরে। সেটি হল বড় নালার ঝর্নার আওয়াজ।

এই বড়নালা আসলে এক ছোট নদী। বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। এই নালাতে, এক জায়গায় পাথর হঠাৎ বেশ খানিকটা নীচে নেমে গিয়ে সিঁড়ির খাড়াই ধাপের মত হয়ে একটা জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। একটা গুহাও আছে এর ঠিক পেছনে। এই বড় নালার জলপ্রপাতের শোঁ শোঁ আওয়াজ আমাদের ক্যাম্পের এক প্রান্ত থেকে শোনা যায়।

#

জলপ্রপাতের আওয়াজ ভালো করে শুনবো বলে আমার তাঁবু আমি আগের থেকে আরও দূরে, খাদের ধারের ক্যাম্পের শেষ সীমানায় সরিয়ে নিয়ে গেছি। কিছু দিন এখানে থাকার পর আমার মনে হয়েছে দিনের বেলাতে একটু অস্পষ্ট হলেও প্রায় সব রাত্রে পাহাড়ী জলপ্রপাতের আওয়াজ হাওয়ার সঙ্গে খেলে নূপুরের মত বাজে ছম ছম করে। আমার আরও মনে হয় এই পাহাড়ী ঝর্নার আওয়াজ আবহ সঙ্গীতের মত সময় আর জঙ্গলের মন মেজাজের সঙ্গে সঙ্গত করে চলে। অনেক সময় ক্যাম্পে ফিরে বা গভীর রাত্রে হ্যামকের বিছানায় শুয়ে আমি ঝর্নার জল পড়ার তাল থেকে আন্দাজ করেনি আর একটু পরে বা কিছু আগে এই অরণ্যের মধ্যে কি হতে চলেছে বা কি হয়ে গেছে।

প্রত্যেকেরই টেন্টের সামনে লম্বা গাছে হ্যামক টাঙ্গানো আছে। কেমিস্ট মনসুখের সৃষ্টিশীল প্রতিভায় সালফি গাছের রসের সঙ্গে বার্লির মিলনে গেঁজে ওঠা ফেনিল পানিয়ের নাম ও দিয়েছে শার্লি। গোয়ার কাজু ফেনির কথা মনে পড়ে যায় বটে তবে শার্লির আকর্ষণ জীবনের প্রথম প্রেমের মত। আবার ক্যাম্পের কোনও কোনও বিবাহিত লোকের মতে এর নাম হওয়া উচিত ছিল শালী।

টেমি জ্বালিয়ে সাঁঝবেলাতেই রাতের আহার সেরে কয়েক বোতল শার্লি সঙ্গে নিয়ে তারার সামিয়ানার তলায় গাছের ডালে বাঁধা হ্যামকের দোলনা বিছানায় আধশোয়া হয়ে নাইট ভিসনে চোখ লাগাই। জোনাকির টুনি বালবে সাজানো বড় গাছের তলায় হরিণের দল আসে নেচে নেচে। গাছের ডালে ঘুমোয় শিকারি পেঁচা আবার কখনো আকাশে আলো করে আসে যায় ধুমকেতু। এসবের ফাঁকে ফাঁকেই এক দুটো বোতলও খালি হয় আর একসময়ে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যায় স্বপ্ন। তার নিশিবাসর থেকে ছাড়া পেয়ে যখন চোখ মেলি প্রায় ভোর হয়ে আসে সেই সময়।

আজ পূর্ণিমার রাত। পরিষ্কার আকাশ থেকে চাঁদ তার মায়াবী আলোয় প্রকৃতির এই আরণ্যক পরিবেশের চারপাশ ভরিয়ে দিয়েছে। রাতের খাওয়ার সঙ্গে আমার তাঁবুতে বসে শুনতে পাচ্ছি জলপ্রপাতের নূপুরে আজ যেন মুজরোর মন মাতাল করা ছন্দ। নিস্তব্ধ ক্যাম্প, নেশাতে অচেতন সবাই। প্রকৃতির আজ রাতের মুজরোর শ্রোতা ও দর্শক শুধু আমি। সব ভুলে গিয়ে, দেওয়ালগিরির হাল্কা আলোতে পড়ছি আমার হৃদয় নিংড়ে লেখা টেকনোলজি ক্যাম্পাস নভেলের পাণ্ডুলিপি। পড়ছিলাম এক মনে। কেমন যেন মনে হল এই মুজরো তে আমি আর একা নেই আরও কারা কারা যেন আসছে। ঝর্নার জল পড়বার আওয়াজে যেন কাদের উদ্দেশে বিপদের আগাম সতর্ক সঙ্কেতধ্বনি।

আমার তাঁবুর সামনের গাছগুলোর শাখাতে হঠাৎ দোলন কাঁপন দেখে নাইট ভিশন বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই বুঝলাম শাখামৃগেরা দলে দলে চলেছে ঝর্নার দিকে। আর একটু চারপাশ চাইতেই দেখলাম শাখামৃগের বন্ধুরাও অর্থাৎ চিতল হরিণের দলও চলেছে ঝর্নার দিকে।

নাঃ! হরিণের দল একটা নয়, পশ্চিম পাহাড়ের কোল দিয়ে একটা শুঁড়ি পথ এসেছে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে। সেখান দিয়েও আসছে আরও হরিণের পাল। দেখে মনে হবে যেন ব্রিগ্রেডের কোনো জনসভাতে লোক চলেছে দলে দলে।

তবে কি আজ এই রাতে সত্যি সত্যি পরীরা আসবে ঝিনুকনৌকায় চড়ে আর ঝর্নার কাছে এসে নাচগান করবে আর তাই দেখতে এরা সবাই আসছে? এদের যদি বারণ না থাকে বা রক্তবমি না হয়ে থাকে তবে মানুষও তো এক প্রকারের প্রাণী, তার বেলায় কেন দোষ হবে?

আমার এই তাঁবুতে একটা অতিরিক্ত সুবিধে আছে। তাঁবুর পাশেই একটা বড় গাছে ওয়াচ টাওয়ার মানে একটা মানুষের প্রমাণ সাইজের খাঁচা বানানো হয়েছিল। তাতে সহজে চড়বার জন্য একটা মই আর তারপর মগডালের কাছে পৌঁছানোর জন্য শক্ত দড়ির সিঁড়ি লাগানো ছিল। রাতের অরণ্যের শোভা দেখার জন্য বহু সন্ধ্যায় আমি এখানে নাইট ভিশন বাইনোকুলার নিয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। সে রাতেও আর দেরি না করে হ্যামকের বিছানাতে না শুয়ে চলে এলাম ওয়াচ টাওয়ারে।

একটা জিনিস অবাক করল আমায়। এই জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে ঝর্নার ধারে যেন বন্য পশু আর নিশাচর পাখিদের মেলা বসেছে। তাদের চেঁচামেচি এত দূরেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাঁদররা কিন্তু সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ একটা দলছুট একলা হরিণ কর্কশ অদ্ভুত আওয়াজে কিছুটা কুকুরের আওয়াজের মত ডেকে উঠলো, পরপর তিন-চারবার। এই ডাক শোনা মাত্র একটা হুড়ো-হুড়ি পড়ে গেল পশুদের সেই মেলায়। অনেকটা শোলে সিনেমায় গব্বর নিজে হামলা করলে গ্রামবাসীদের পালানোর মত পশুরাও দিক বিদিক শূন্য হয়ে পালাতে লাগলো। কিছু তো আমাদের ক্যাম্পের একদম নিচে এসে চেঁচামিচি শুরু করল। ঠিক এই সময় আমি শুধু এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেলাম একদম আমাদের ক্যাম্পের কাছে। নালা পার হবার জন্য আমরা একটা লোহার দড়ির সেতু বানিয়েছিলাম। রাতের ঠাণ্ডা জলে জোরালো স্রোতের ওপর পার হয়ে আসার কষ্ট আর জলের ওপর নিজের পায়ের আওয়াজ বাঁচিয়ে চতুর বাঘটা ওই লোহার দড়ির সেতু চুপিসাড়ে পার হয়েছে। নাইট ভিশনে পরিষ্কার দেখা গেল একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ লোহার সেতুর ঠিক তলায় এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের পলক ফেলবার আগেই একটা চাপা হুঙ্কার আর তারপর ঝটাপটির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে একটা বুক চেরা আর্তনাদ একবার হয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল সেই অসতর্ক দলছুট মৃগশিশুর মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ আর সে আর্তনাদ বিলাপ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রথমে বাঁদরদের গলায় তারপর বাঘ ছাড়া বনের বাকি পশুদের। জঙ্গলের হাওয়া কিছুক্ষণ শোকার্ত হয়ে স্তব্ধ ছিল, তারপর সে কেঁদে উঠলো হু হু হু করে।

কোথা থেকে উড়ে এল এক বেশ বড়সড় কালো মেঘ। পূর্ণিমার চাঁদকে গিলে খেল বাঘটার মত আর দমকা হাওয়া এবার মাত্রা বাড়িয়ে ঝড়ের রূপ নিল। গাছের এই ওয়াচ টাওয়ারে থাকা উচিত হবে না, কোনও রকমে সিঁড়ি বেয়ে নামতেই আমার তাঁবু থেকে পোড়া গন্ধ পেয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি আর এক মৃত্যু। সে মৃত্যু আমার এক আত্মজের।

দমকা হাওয়াতে দেওয়ালগিরি উলটে নিভে গেছে আর তার পেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল কেরোসিন আর তাতেই আগুন লেগে যায় আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির। অপমানিত, ধর্ষিত হয়ে শেষ অবধি এই পথ সে বেছে নিল? দমকা হাওয়াতে একটু সরে গেলেই তো তাকে আগুনে পুড়ে মরতে হত না।

একটু আগে হরিণ শিশুর প্রান যাওয়ায় শোকস্তব্ধ ছিলাম আমি। এবার আমি নিজে সেই হরিণ মায়ের মত বুক ফাটা আর্তনাদে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আর সেই কান্না শুনতে পেয়ে জঙ্গলের পশু পাখি নদী ঝরনা সবাই যেন সবাই আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। সবাই বলে তোমার এ চরম ক্ষতি, তবু বলি কেঁদো না তুমি, শান্ত হও।

নতমস্তকে জঙ্গলের হাওয়া বলে, "তোমার পাণ্ডুলিপিকে আমি সরিয়ে নিতে গেছিলাম, কিন্তু ও বাধা দিল। আর সেই মুহূর্তে চতুর হিংস্র বাঘটার মত ভেজা কেরোসিন বেয়ে আগুন এসে ওকে গ্রাস করল। তবুও দোষী আমি, দাও আমাকে যা শাস্তি দেবার।"

জঙ্গলের দমকা হাওয়া রূপ বদলে এখন মৃদুমন্দ হয়ে গেছে। ঝর্নার জল পাথরের ওপর বেহাগ রাগের করুণ স্বর বাজিয়ে চলেছে। আমাকে চুপ থাকতে দেখে বাতাস আর অশ্রুভেজা স্বরে ঝরনা বলে, "আমি এখন থেকে সবাই যা কথা বলে তা তোমার কানে পৌঁছে দেব, তুমি শুনতে পাবে সবার কথা।"

আরে সত্যিই তো আগে তো আমি এই জঙ্গলের পশু-পাখি-নদী এরা কথা বলছে কিন্তু আমি নির্বাক চলচ্চিত্রের মত ঠোঁট নড়াই দেখতাম। এখন তো, এইতো একটু আগেই শুনতে পেয়েছি সবার কথা আর কান্না, বেশ স্পষ্ট শুনেছি।

পরদিন কাঁদতে কাঁদতে নদীর বুকে বিসর্জন দিয়ে এলাম পোড়া পাণ্ডুলিপির ছাই। ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়, বীর হনুমান নিজে এসেছে এক কাঁদি কলা নিয়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে হরিণেরা, খরগোসেরা। ফিঙ্গে, টিয়া, পাহাড়ী ময়না আরও কত সব আমার বন্ধুরা; এমনকি পাহাড়তলির লোহাগাঁয়ের সর্দার প্যাটেল সেও এসেছে এক হাঁড়ি ছাং আর মহুয়া নিয়ে।

এই মাত্র প্রকৃতি আমায় বলে গেল এই অরণ্য পাহাড়ের, ঝর্নার, নদীর, হরিণের, বাঁদরের, সব সব বন্য প্রাণীদের, অরণ্যের মানুষের আর; আমার, এই সদ্যজাত শ্রুতিলেখকের।

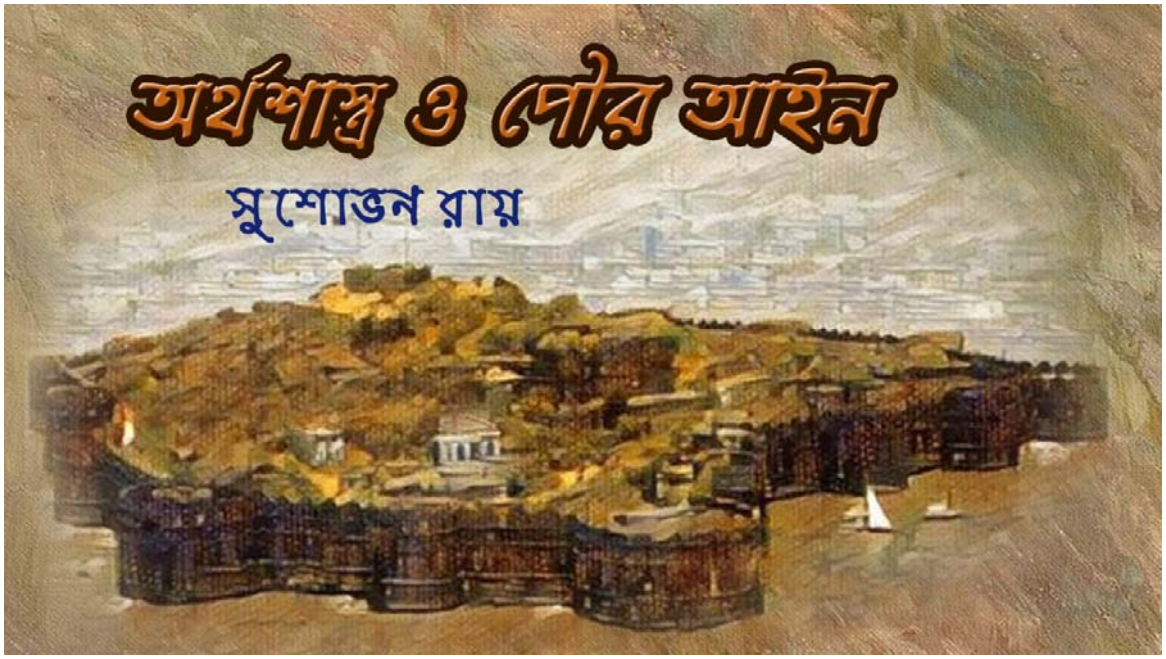
সেই থেকে মানব, মানবী, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, বন্যপ্রাণী সবাই তাদের ইচ্ছে হলে আমাকে তাদের কথা শোনায়। তারা নিজেরা যা কথা বলে নিজেদের সুখ দুঃখ বেদনা চাওয়া পাওয়া সব কিছু আমাকে শোনায়। লেখক হবার আর দরকার পড়ে নি। এই অরণ্যে থেকে আমার চারপাশের চরিত্রদের শ্রুতিলেখক হওয়া শিখে ফেলেছি আমি।

এই সব শ্রুতিলেখন দিয়ে কোনোটা হয় গল্প, আবার কেউ হয়ে যায় উপন্যাস। বিগত কুড়ি বছরে আমার নামে সব গল্প ও একটা উপন্যাস এর একটাও আমার লেখা নয়, গল্পের বা উপন্যাসের চরিত্রদের বলা কথামাত্র। লেখালিখি নিয়ে সেই থেকে আমি খুব আনন্দে আর সুখে আছি।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতিঃ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস পেশায় ভূতত্ত্ববিদ্, নেশায় চারপাশে পাওয়া চরিত্রদের শ্রুতিলেখক। পেশার তাগিদে ঘুরেছেন পৃথিবীর বহু জায়গায়, যেমন ব্রাজিল, আমাজন অরণ্য, গায়ানা, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, ইরান, জিম্বাবয়ে, জাম্বিয়া, সাউথ আফ্রিকা আর নিজের দেশের পুরোটাই। এই সব জায়গার গভীর অরণ্য, সমুদ্রতট, মরুভুমি, পাহাড়-পর্বতে থেকেছেন দীর্ঘ সময় আর শুনেছেন প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে জীবজন্তু, মানব মানবীদের কথা। এরাই লেখার চরিত্র, যারা নিজেদের মধ্যে অথবা শ্রুতিলেখককে নিজেদের কথা যা বলে উনি তাই লেখেন। এভাবেই শ্রুতিলেখন চলেছে, কিছু গল্প আর একটি প্রকাশিত উপন্যাসের (A TREK TO UNKNOWN – BIBLIOPHIL- 2013) রূপ ধরে।

#



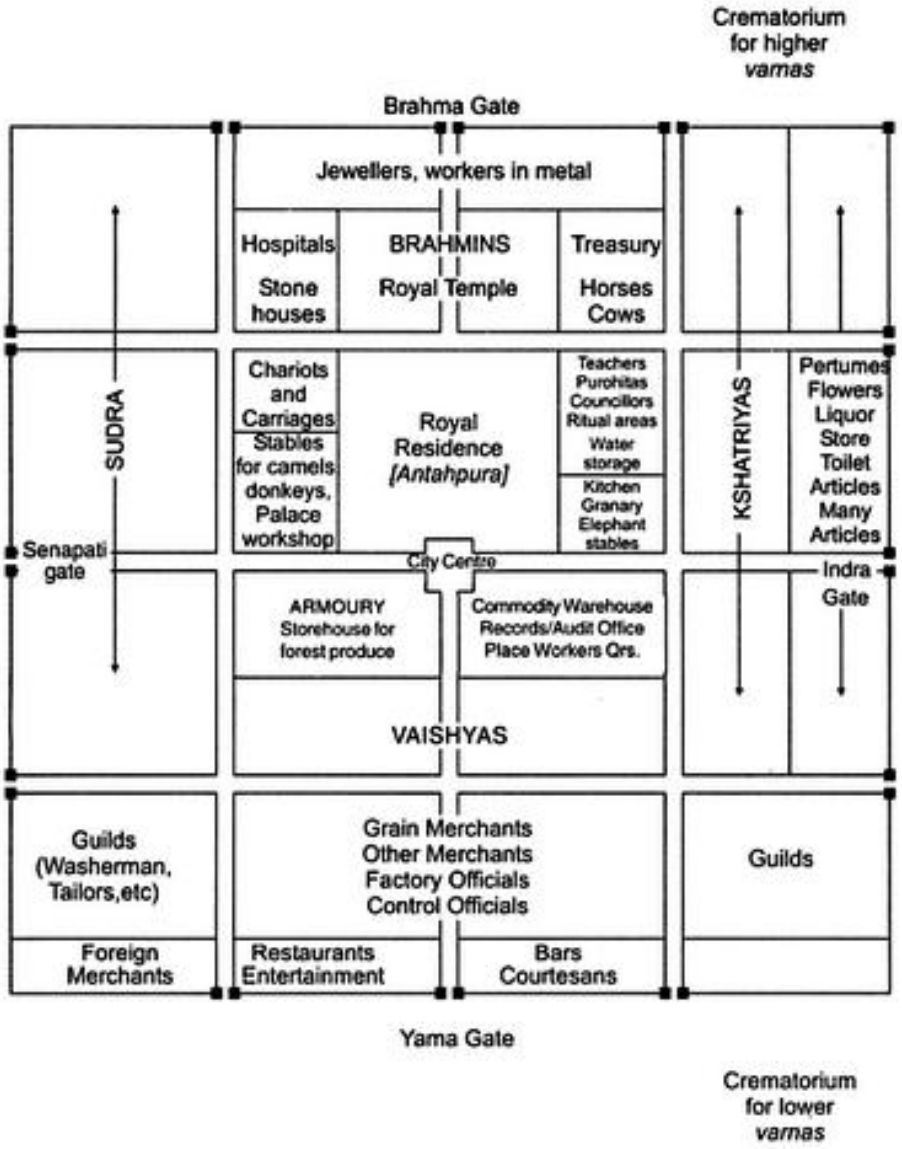
नीतिशास्त्रामृतं धीमान[2]•र्थशास्त्र महोदधेः ।
समुद्दध्रे[3] नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ ६ । ১১

পঞ্চতন্ত্র। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী পড়েনি বা শোনেনি এমন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ মনে হয় বিরল। এই বিখ্যাত গ্রন্থ সৃষ্টির পেছনে যে কারণ বলা হয় তা হল, তিনজন পড়াশোনায় বিমুখ রাজপুত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা। বর্তমানে "নীতি" শব্দের অর্থ হল নিয়ম, কিন্তু প্রাচীন কালে নীতি শব্দের অর্থ ছিল রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি। আর যে শাস্ত্র বা বই থেকে রাষ্ট্রনীতি বা রাজ্য পরিচালনার শিক্ষা পাওয়া যেত তাকে বলা হত নীতিশাস্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্য ঘাঁটলে বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে প্রচুর নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও তাদের উপদেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রের লেখক হলেন প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ চাণক্য ওরফে কৌটিল্য। মহামতি কৌটিল্য বেশ কয়েকটি কারণে সবার কাছে পরিচিত। প্রথমত তিনি অত্যাচারী নন্দবংশের মূলোৎপাটনকারী এবং মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাকারী। দ্বিতীয়ত প্রাচীন ভারতের চারটি রাজনৈতিক নীতি যথা সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ নীতির সফল ব্যবহারকারী। তৃতীয়ত তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি দুহাজার বছরের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও তাতে উল্লেখিত নিয়মকানুন আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতেও কতটা প্রযোজ্য তা বোঝাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অর্থশাস্ত্র ও কৌটিল্য উভয়েই রাজনৈতিক দর্শনে জন্য বিখ্যাত। এই জন্য আধুনিককালের রাজনীতিজ্ঞেরা তাকে মধ্যযুগের ইতালির বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ নিকোলো মেকিয়াভেলীর সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক চিন্তাভাবনা ছাড়াও একটি রাষ্ট্র চালাতে আরও যা যা প্রয়োজন হয় তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে

আলোচিত হয়েছে তাঁর বইয়ে। এর মধ্যে আছে ফৌজদারি আইন ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, পৌর আইন, ময়নাতদন্তের পদ্ধতি, রেশন পদ্ধতি, শহর ও দুর্গ নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে বিশদে আলোচনা।

এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র শহর নির্মাণ ও তার সমস্যার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।



Schematic Plan of Fortified City

অর্থশাস্ত্র থেকে বিশদে জানা যায় একটি আদর্শ দুর্গ শহর কেমন হওয়া উচিৎ। রাজভবন বা অন্তঃপুর থাকবে শহরের ঠিক মাঝখানে। শহরটি কোনও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাশয়ের কাছে অবস্থিত হতে হবে, যাতে জলপথে ব্যবসার সুবিধা থাকে। শহরটা পরিখা দিয়ে ঘেরা থাকতে হবে যাতে শত্রুরা আক্রমণ করতে না পারে। আর পরিখাটি কোনও

#

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সঙ্গে যেন যুক্ত থাকে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পরিখায় থাকে। পরিখা ছাড়াও দুর্গ প্রাচীরের উল্লেখও কৌটিল্য করেছেন শহর রক্ষার জন্য। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩. শ্লোক ৩-৬]

শহরে প্রবেশের জন্য চারদিকে থাকত চারটি প্রধান ফটক বা দরজা, যথা উত্তরে ব্রহ্মা ফটক, দক্ষিণে যম ফটক, পূর্বে ইন্দ্র ফটক, আর পশ্চিমে সেনাপতি (কার্ত্তিক) ফটক। আর শহরের মধ্যে ব্যবহারে জন্য ছিল সাত ধরনের সড়ক। সেগুলো হলঃ ১) রাজমার্গ ২) প্রাদেশিক সড়ক (ভিন্ন ভিন্ন রাজভবনের যোগাযোগের রাস্তা) ৩) হস্তিপথ (হাতি চলাচলের জন্য রাস্তা) ৪) রথপথ (রথ চলাচলের জন্য রাস্তা) ৫) পশুপথ (গরু, মহিষ ইত্যাদি বড় প্রাণীর যাতায়াতের জন্য পথ) ৬) ক্ষুদ্র পথ (ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি ছোট প্রাণী চলাচলের জন্য রাস্তা) ৭) মনুষ্য পথ (জনসাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তা)। রাস্তাগুলির প্রস্থ বিভিন্ন রকমের, যেমন রাজপথ, প্রাদেশিক পথ, শ্মশান ও বন্দরগামী পথগুলির প্রস্থ হত ৫৪ ফুট, হস্তিপথের প্রস্থ সাড়ে ১৩ ফুট, রথপথের প্রস্থ সাড়ে ৭ ফুট, পশুপথ ও ক্ষুদ্র পথের প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ৩ ফুট এবং ৩ ১/৪ ফুট।

জনবসতি থাকলে সমস্যা থাকবেই, একথা অনস্বীকার্য। আর যে ব্যাপারগুলি কৌটিল্যিয় সমাজের দুর্গ শহরগুলির অন্যতম সমস্যা ছিল তা কমবেশি আজকের দিনের আধুনিক ভারতের, অন্তত পক্ষে বর্তমান সময়ের কলকাতার অন্যতম সমস্যা। তার সমাধানে কৌটিল্য যে আইন চালু করেছিলেন তা আজও এই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রযোজ্য। প্রথম সমস্যা হল যত্রতত্র ময়লা ফেলা অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ, আর তার ফলে মহামারির সৃষ্টি। আসুন তাহলে দেখা যাক আপনি যদি কৌটিল্যের যুগের একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে পরিবেশ দূষণ করতেন তাহলে কি কি শাস্তি আপনি পেতেন।

যদি সাধারণ রাস্তায় ময়লা ফেলতেন তাহলে আপনার জরিমানা হত ১/৮ পন, যদি সেখানে আপনার জন্য জলকাদা জমত (বর্ষায় কলকাতার তুল্য) তাহলে জরিমানা দাঁড়াত ১/৪ পন। এই একই দোষ যদি আপনি রাজপথে দাঁড়িয়ে করতেন, তাহলে আপনার জরিমানা হত যথাক্রমে ১/৪ ও ১/২ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২৬-২৭]

এরপরের সমস্যা হল যেখানে সেখানে মুত্রত্যাগ। এই বদঅভ্যাস তখনও ছিল আর তার জন্য ছিল জরিমানাও। তবে তা স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন – কোন পবিত্র জায়গায় মুত্রত্যাগ করলে তার জরিমানা ছিল ১/২ পন, কোনও জলাশয়ে করলে ১ পন, কোন মন্দিরের ভেতর করলে ১ ১/২ পন, কোনও রাজভবনে করলে ২ পন। বর্তমানের শহরের মানুষ খানিকটা যে সভ্য হয়েছে তা মানতেই হয় কারণ গ্রামাঞ্চলের মানুষের যত্রতত্র মলত্যাগের অভ্যাস থাকলেও শহরের মানুষের তা নেই এবং গ্রামাঞ্চলেও তা কমে আসছে। কিন্তু সে যুগেও এই বদ অভ্যাসটা ছিল। আর তার জরিমানা ছিল এইরকমঃ কোন পবিত্র জায়গায় মলত্যাগ করলে তার শাস্তি ছিল ১ পন, কোন জলাশয়ে করলে ২ পন, কোনও মন্দিরে করলে ৩ পন, আর কোন রাজভবনে করলে জরিমানা হত ৪ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২৮]

এর পরের তালিকাটি হল যত্রতত্র মৃতদেহ ফেলে আসার জন্য জরিমানার তালিকা, যা কিনা কোনরকম মহামারী রোগজীবাণু ছড়ানোর অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, যেকোনো রকমের মৃতদেহ প্রাচীন ও মধ্যযুগের দুর্গ আক্রমণের পরোক্ষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত, মহামারী ছড়ানোর জন্য। জরিমানার তালিকাটি নিম্নরূপঃ [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ৩০]

মৃত প্রাণী	জরিমানার অর্থ
কুকুর, বিড়াল, বেজি, সাপ	৩ পন
গাধা, খচ্চর, উট, ঘোড়া বা অন্য গবাদি পশু	৬ পন
মানুষ	৫০ পন

এছাড়া মৃতদেহ বহনের জন্য তৈরি রাস্তা দিয়ে মৃতদেহ না নিয়ে গেলে বা তার জন্য অনুমোদিত ফটক দিয়ে মৃতদেহ না নিয়ে গেলে তার জন্য জরিমানা ধার্য ছিল ৪৮ থেকে ৯৬ পন, শ্মশানভূমি ছাড়া অন্য কোথাও দাহকার্য করলে জরিমানা ছিল ১২ পন। যে দারোয়ানের এই সমস্ত মৃতদেহ সংক্রান্ত নিয়মকানুন রক্ষার দায়িত্বে থাকত তিনি কাজে গাফিলতি করলে তার শাস্তি ছিল ২০০ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ৩২-৩৩]

দূষণ নিয়ন্ত্রণের পরে আসে মনুষ্যকৃত বিপর্যয়ের মোকাবিলার কথা। আর সেই তালিকায় একমাত্র বিপর্যয় ছিল অগ্নিকাণ্ড। তার কারণ সেই সময়ের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ছিল কাঠ, খড় বা অন্য দাহ্য পদার্থের তৈরি। তাই আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌটিল্য অনেকগুলি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলি নিম্নরূপঃ

১) যাদের পেশার মূল বিষয় হল আগুন (যেমনঃ রেস্তোরাঁ, কামারশালা ইত্যাদি), রাজ্যপাল যেন তাদের সবাইকে শহরের একটি জায়গায় বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। যাতে আগুন লাগলে ছড়িয়ে না পড়তে পারে। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২০]

২) গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে কোনওরকম আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেন, আর একান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দেন এবং এই নিয়মভঙ্গকারীর জরিমানা ছিল ১/৮ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ১৫-১৬]

৩) রাত্রিবেলা প্রত্যেক বাসিন্দা যেন তাদের ঘরের মূল প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি ঘুমায়। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২১]

৪) প্রতি বাড়িতে কিছু জিনিসগুলি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এই "কিট" যে বাড়িতে থাকবে না সেই বাড়ির মালিকের জরিমানা হত ১/৪ পন। জিনিসগুলি হল যথাক্রমে ৫ টি জলপাত্র, ১ টা কলসি, ১ টা ডাবা, মই, কুঠার (দরজা, জানালা ভাঙার জন্য), একটা কুলো (বাতাস করে নেভানর জন্য), একটা বড় সাঁড়াশি, আংটা বা অঙ্কুশ (ভারী জিনিসপত্র টেনে সরানোর জন্য) এবং এইসব জিনিস রাখার জন্য একটি চামড়ার থলে। অনেকটা আজকের সময়ের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যাপরবর্তীকালীন অবস্থায় টিকে থাকার জন্য বিপর্যয় মন্ত্রক নির্ধারিত 'কিট'-এর মত।

এরপরেও যদি কোনও বাড়িতে আগুন লেগে যেত এবং তদন্তে প্রমাণিত হত যে সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছে, তাহলে তার শাস্তি ছিল সেই আগুনেই তাকে পুড়িয়ে মারা। আর কারো গাফিলতি বা উদাসীনতা আগুন লাগার কারণ হলে জরিমানা ছিল ৫৪ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২৪-২৫]

#

আগুন লেগে যাওয়ার পর দ্রুত আগুন নেভাতে না গেলেও জরিমানা হত জ্বলন্ত বাড়ির মালিক হলে ১২ পন আর ভাড়াটে হলে তার অর্ধেক অর্থাৎ ৬ পন। [পুস্তক ২. অধ্যায় ৩৬. শ্লোক ২৩]

দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত নিয়মাবলী থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে এই দুটি জিনিস তৎকালীন দুর্গ শহরগুলির কাছে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল, আর সেই সঙ্গেই এটাও বোঝাচ্ছে যে কৌটিল্য তাঁর সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ভেবেছিলেন, যে তাঁর পৌর আইনের অনেকগুলি আজও ব্যবহারযোগ্য।

এরপরে আসে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয় ও তার জন্য নির্ধারিত আইন। কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে যাতে অন্য কোন নাগরিক অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে, তা গোড়া থেকেই, অর্থাৎ ঘরবাড়ি তৈরির সময় থেকেই নজরে রাখা হত। দুটি বাড়ির মাঝের সীমানার দূরত্ব থাকত প্রায় ১ গজ। প্রত্যেক বাড়িতে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিরজলনিকাশি ব্যবস্থা থাকত, সেই জল বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোন বাড়ি নোংরা করলে জরিমানা দিতে হত। নিকাশিব্যবস্থা না থাকলে ১২ পন আর জল অন্য সম্পত্তিকে নোংরা করলে ১২ পন। আবার ধরুন, আপনার গাড়ির গ্যারেজ বা আপনার রান্নাঘর আপনার পড়শির বাড়ির খুব কাছে তৈরি করেছেন যাতে তার অসুবিধা হচ্ছে, তাহলেও আপনি জরিমানায় দণ্ডিত হবেন, মুল্য ২৪ পন।

আপনি যদি কারো বাড়ির কোনও দেওয়ালে সামান্য আঘাত করেন তাহলেই আপনার সাজা হবে ৩ পন, আর যদি রাগের বশে ভেঙেই ফেলেন তাহলে আপনাকে সেই দেওয়াল তো তৈরি করে দিতেই হবে, সঙ্গে আরও ৬ পন জরিমানা দিতে হবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবন খুব সন্মানীয় ছিল, কোন তৃতীয় ব্যক্তি যাতে কোন ব্যক্তিগত মুহূর্তের সাক্ষী না হতে পারে তার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল যে, কোনও ২ টি বাড়ির দরজা বা জানালা কখন একে অপরের মুখোমুখি না হয়, এই নিয়ম একমাত্র তখনি লঙ্ঘিত হতে পারত যখন ঐ দুই বাড়ির মাঝখান দিয়ে কোনও রাজপথ (৫৪ ফুট প্রশস্ত) থাকতো। তারপরেও ঘরে যখন কেউ থাকবে সেটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এরপরেও কোন নাগরিকের দ্বারা অন্য কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন বিঘ্নিত হলে জরিমানা হত ১০০ পন।

এতক্ষণ ধরে আপনারা কৌটিল্য প্রবর্তিত পৌর আইনের কিছু অবাক করা তথ্য জানতে পারলেন। কিন্তু জরিমানার যে লম্বা লিস্টের গুরুত্ব বুঝতে তৎকালীন সময়ের সাধারণ মানুষের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এতে শাস্তির গুরুত্ব ও অপরাধের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

অর্থশাস্ত্র অনুসারে সেই সময়ে তিন ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল যথাঃ পন, মাশাক, কাকানি। মুল্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে ছোট মানের মুদ্রা ছিল কাকানি।

মুদ্রার বিভাগটি ছিল নিম্নরূপঃ

৪ কাকানি = ১ মাশাকা

১৬ মাশাকা= ১ পন

মাশাকা ও কাকানি তৈরি হত তামা দিয়ে এবং পন তৈরি হত রুপো দিয়ে।

সেই যুগের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাইনে ছিল যথাক্রমে ৪৮০০০ পন ও ৬০ পন প্রতি বছর অর্থাৎ ৪০০০ পন ও ৫ পন প্রতিমাসে। সর্বোচ্চ মাইনে পেতেন যথাক্রমে রাজপুরোহিত, যুবরাজ, প্রধান রানী, রাজার মা, প্রধান সেনাপতি প্রমুখ। কৌটিল্য এই সর্বোচ্চ মাইনে প্রসঙ্গে বলেছেন "এই পরিমাণ অর্থ তার প্রাপকদের শত্রুর প্রলোভন থেকে এবং বিদ্রোহী হওয়া থেকে বিরত রাখবে"। [পুস্তক ৫. অধ্যায় ৩. শ্লোক ১]

সর্বনিম্ন মাইনে প্রাপক ছিলেন বিভিন্ন শ্রেনীর ভৃত্যেরা ও রাজার নিজস্ব দেহরক্ষীরা। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাইনে ছাড়াও অর্থশাস্ত্র থেকে যে বেতনের নমুনা পাওয়া যায় তা নিচে দেওয়া হলঃ

প্রাপক	প্রতি বছরে বেতন (পন)
রাজপুরোহিত, রাজমাতা, যুবরাজ, প্রধান সেনাপতি	৪৮০০০
প্রধানমন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ	২৪০০০
রাজপুত্র (যুবরাজ ছাড়া), রানী (প্রধান রানী বাদে), রাজ্যপাল, সীমান্ত রক্ষাকর্তা	১২০০০
চতুরঙ্গ সেনার প্রতিটি প্রধান বিচারপতি ,বিভাগের প্রধান সেনাপতি	৮০০০
গজবনাধ্যক্ষ, সেনার বিভাগীয় সেনাপতি ,চতুরঙ্গ ,বনাধ্যক্ষ	৪০০০
প্রথম শ্রেণীর গণিকা	৩০০০
দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিকা, গজ প্র ,রাজ চিকিৎসক ,রাজার সারথিশিক্ষক ,অশ্ব প্রশিক্ষক, প্রধানবাস্তকার ইত্যাদি	২০০০

এছাড়া ১০০০, ২৫০, ১২০ ও ৬০ পন প্রতি বছর হিসাবে বিভিন্ন পেশা ছিল। আয়ের পর এবার ব্যয়ের কথা। তখন সাধারণ সাদা সুতির কাপড় ধোওয়ার জন্য খরচ পড়ত ১ বা ২ মাশাকা। দামি পোশাক হলে সেই খরচটা হত ১ পন। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৪৩ নং শ্লোক অনুযায়ী প্রতিমাসে ৫ পন আয় করে এমন একজন পুরুষ প্রতিদিন প্রায় ১ "আধাকা" পরিমাণ খাদ্যশস্য পেতে পারে তার দৈনিক রেশন হিসাবে, যা আজকের ওজনের হিসাবে প্রায় আড়াই কেজি।[২] এইসব বিবেচনা করে অর্থশাস্ত্রের অনুবাদক L N Rangarajan লিখছেন "The Pana was,indeed, a Valuable coin; the kakani and the mashakas were, Perhaps, the coin which most people ever saw or used. (পন নিঃসন্দেহে একটি মুল্যবান মুদ্রা। সম্ভবত কাকানি এবং মাশাকাই হল সেই মুদ্রা যা বেশিরভাগ মানুষ দেখতে পেত বা ব্যবহার করত)। আয় ও ব্যয়ের হিসাবের মাধ্যমে সহজেই অনুমেয়, যে একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে জরিমানাগুলি সামান্য অর্থের ছিল না। আর তার ফলে সে নিশ্চয়ই এই নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করত।

আশা করি পাঠকদের কৌটিল্য প্রবর্তিত পৌর আইনের কার্যকারিতা ও তা বর্তমান সময়েও কতটা কার্যকারী সে সম্পর্কে একটা ধারনা দিতে পারলাম। ভবিষ্যতে এরকম আরও বর্তমান যুগে ব্যবহার উপযোগী কিন্তু প্রাচীন যুগে বলা হয়েছে, এমন বিভিন্ন বিষয়ে বলার ইচ্ছে নিয়ে আমার লেখা শেষ করলাম।

#

তথ্যসুত্রঃ

1) The Arthashastra By Kautilya (Translated By L. N . Rangarajan, Penguin Publication)
2) The Arthashastra By Kautilya.(Traslated By R Shamashastry)
3) The Nitisara By Kamandaki (Translated By Dr. Sisir Kumar Mitra, The Asiatic Society)
4) Essensials Of Ayurveda By Priyabrata Sharma

লেখক পরিচিতি

সুশোভন রায় মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বি টেক পাঠরত। নেশা- বিভিন্ন ধরনের বই পড়া, বিশেষ করে ইতিহাস বিষয়ক বই। আর এই লেখাটি তার প্রথম প্রচেষ্টা।



বিতর্কের বিষয়টি আগ্রহজনক। আমার মনে পড়ে যায় বছরখানেক আগে এক প্রখ্যাত লেখিকা অকালে মারা যান রাত্রিবেলায়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ইন্টারনেট প্রায় জ্যাম হবার জোগাড় শোকের বহিঃপ্রকাশে। আমি বিশেষ ওঁর বই পড়তাম না। শুরুর দিকের লেখা পড়েছি। ওঁর লেখার উপর নির্মিত সিনেমা দেখেছি। পরে আমার গল্প উপন্যাস থেকে প্রবন্ধ বেশি পড়তে ভাল লাগত বলে ওঁর লেখা আর বেশি পড়া হয়নি। আমার ধারণা ছিল উনি একজন দারুণ লেখিকা, কারণ খবরের কাগজের বেস্ট সেলার লিস্টে ওঁর নাম দেখতাম। ওঁর মৃত্যুর পর বুঝলাম গড়বড়টা। নেট দুনিয়াটাই দেখলাম দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। কেউ কেউ বলছেন - অসাধারণ লেখিকা ছিলেন বটে, প্রচুর লিখেছেন। আবার প্রায় ৫০% মানুষ বলছেন - নানা একদম খাজা লেখিকা। স্রেফ নামে কাটতেন। একি ধরণের একঘেয়ে লেখা। এর মানেটা কি? আমার মনে হয় লেখক লেখিকাদের একটা ফ্যান সমাজ থাকে, তাদের কাছে ওঁদের সব লেখাই ভাল। যার সেই ফ্যান সমাজ যত বড়, তিনি তত বড় লেখক বা লেখিকা। ফ্যান সমাজ আমার মতে কেবল লেখার গুণে হয় না। কেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপনা করছেন তার উপরেও নির্ভর করে। ফেসবুক, টুইটার -এর যুগে লেখক বা লেখিকা যত সহজভাবে তাঁর পাঠক সমাজের সঙ্গে মিশবেন তাঁর তত কদর। লেখাটাও অবশ্য তার সঙ্গে চালাতেই হয়। নইলে নতুন নতুন বিষয়ের আকাল পড়বে যে ফ্যানদের কাছে। ঠিক এক রকম আমার লাগে বাংলাদেশের এক লেখিকার ব্যাপারে যিনি অনেক লিখেছেন এবং লিখছেনও। নারীবাদী। স্পষ্টভাবে নিজের বক্তব্য রাখেন নেটে ও নিজের লেখাতেই। লেখা পুরস্কারও পায়। অবাক কাণ্ড - অনেক মহিলার কাছেই উনি বিশেষ জনপ্রিয় লেখিকা নন - নারীবাদী হয়েও। কারণ তাদের মতে উনি নিজেকে যেভাবে দেখাতে চান ওঁর লেখাতে, নিজে তা নন, বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব আছে। ফেলুদার জনককে তো

ফরমায়েসি ফেলুদার গল্প প্রতি বছর লিখতে হত। অমন জনপ্রিয় লেখক। ৮০-র দশকের শেষের কাহিনীগুলি কি জমেছে? অথচ উনি আজও জনপ্রিয় লেখক, মৃত্যুর এত বছর পরেও। এবার আসি প্রবন্ধের উদাহরণে। ৮০-র দশকে একজন প্রচুর লিখলেন রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রদের নিয়ে। লেখার ভাষা খুব উঁচুমানের নয়, শুধুমাত্র বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য উনি এক ঝটকায় জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। নামের আগে ডঃ ছিল। সেটা সুবিধে হয়েছিল হয়ত। এক দশক পরে এলেন আরেক ডঃ। এঁর ভাষা সুন্দর, বিষয় অনেক বিশ্লেষণ ধর্মী। জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে শুরু করল। আগের ডঃ কে মানুষ ভুলেই গেছে বোধ হয়। ওঁর লেখার ধরণ একই আছে। পাবলিক খেলো না এই যা। সব শেষে আসি দুজন লেখকের কথায়। ওনাদের নাম নিয়েই বলছি। স্বপনকুমার আর পৃথ্বীরাজ সেন। দুজনেই অসম্ভব জনপ্রিয়। একবার ঠাণ্ডা মাথায় দেখুন তো ওঁদের লেখাগুলো। কোনোদিক থেকে উন্নত মানের মনে হয়? অথচ কি কাটতি! বইমেলাতে এডিশনের পর এডিশন বের হয়। অথচ অতীতে যারা সোনা ঝরিয়েছেন তাঁদের অনেককেই মানুষ ভুলে গেছে।

অতএব আমার ধারণা, জনপ্রিয় লেখা মানেই ভাল লেখা হতেই হবে তার মানে নেই। অনেকে গাঁজাখুরি গল্প লিখেও মিথ-এ পরিণত হয়েছেন। ধারাবাহিক ভাবে বাজে লিখলেও বিষয়ের জোরে বেরিয়ে গেছেন। ধারাবাহিক ভাবে ভাল লিখলেও বর্তমান দিনে পাঠক সমাজের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ না স্থাপন করলে জনপ্রিয়তা পাওয়া যায় না। এবং সে জন্যেই অনেক জনপ্রিয় লেখককে গরমাগরম সাক্ষাৎকার বা বাইট দিতে হয় বাজার ধরে রাখতে - শুধুমাত্র নিজের লেখার উপর ভরসা না করে।

~কৌশিক রায়



কৌশিকদা একের পর এক লেখকের নাম করে মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন যে জনপ্রিয় লেখক মানেই ভালো লেখক হবেন তার কোনো মানে নেই।

কিছুটা মেনে নিলেও জনপ্রিয় লেখকদের একদম খাজা লেখক বলে দেগে দেওয়াটা ঠিক না। এই বিতর্কের "বিষয়বস্তু"-তে একটা কথা আছে, যে যিনি ধারাবাহিকভাবে ভালো লেখেন তিনি লেখক এবং তাঁর লেখা জনপ্রিয় হতেই হবে।

প্রথমেই আসতে হয়, ভালো খারাপের সংজ্ঞা কি? সাহিত্যের কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তার কি কোনো মাপকাঠি আছে? অশ্লীলতার দায়ে-তে নারায়ণবাবু দেখিয়েছিলেন- অশ্লীলতা ব্যাপারটা সাহিত্যে বা শিল্পে ফেলনা নয়, বহু সাহিত্য তৎকালীন সামাজিক বিচারে অশ্লীল হলেও তা পরবর্তীকালে কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। সেরকমই ভালো লেখা না খারাপ সেটা বিচার করেন পাঠকেরা – যে লেখক তার বইয়ের সঙ্গে পাঠককে আঠার মতো আটকে রাখতে পারেন তিনি তো জনপ্রিয় হবেনই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কমলকুমার মজুমদার নামী সাহিত্যিকদের বিচারে হয়ত বিরাট সাহিত্যকর্মী, কিন্তু তাঁর লেখার সঙ্গে কটা মানুষ পরিচিত। লেখক লেখেন তাঁর পাঠককুলের জন্য নিজের অন্তর্লীন চিন্তাধারাকে যিনি পাঠকের মননের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন, তিনিই তো সফল লেখক।

এখানে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয়।

একঃ তাহলে লেখক কি শুধু পাঠকের জন্য লেখে? নিজের মনের চিন্তাধারাকে কাগজ কলমে শিল্পসুষমায় অমরত্ব দেওয়ার নাম কি সাহিত্য নয়? সে কে পড়ল, না পড়ল, শিল্প কি তার জন্য বসে থাকবে? ভারমিয়র, রেমব্রান্ট, ভ্যান গখ এঁরা কি নিজের আমলে জনপ্রিয় ছিলেন?

দুইঃ গুণগ্রাহীর চাপে পড়ে শিল্প বড্ড একমুখী হয়ে পড়ে। তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করার পথ হয়ে পড়ে রুদ্ধ। তাই জনপ্রিয় লেখকেরা বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে যান না। তিনি যে ধরনের লেখা লিখে জনপ্রিয়, সেদিকেই ঝোঁকেন বেশী।

তিনঃ জনপ্রিয় লেখা অধিকাংশই হয় একবার পড়ার জন্য (One Time Read)। কিন্তু সাহিত্যধর্মী লেখা সেদিক থেকে কালজয়ী।

এবার উত্তরে আসি এক এক করে –

এক - লেখক লিজের মনের মনিকাঞ্চন সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেই পারেন, কিন্তু সেটি পদবাচ্য কিনা, সেটি বিচার করবেন পাঠকেরাই। তাই যিনি নিজের সুখের জন্য লেখেন, তিনি বরং হিলাময়ে যান। কালিদাস অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন, তাই বলে তাঁর পরম সমালোচকও বলতে পারবে না যে তাঁর লেখা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সত্যজিতের লেখা তো আমার দারুণ লাগে, এক নিশ্বাসে বার বার পড়ে ফেলার মতো। আশির দশকের পরে তাঁর অনেক লেখাই জনপ্রিয়- আর এটাও মনে রাখতে হবে যে তিনি পরিচালক আগে, লেখক পরে।

দুই – শীর্ষেন্দুকে ধরা যাক। তিনি তো মোটামুটি একই ধরনের শিশুসাহিত্য লেখেন, "অদ্ভুতুড়ে" সিরিজের ৪২ টি গল্প বেরোনোর পরও এখনো বেরোচ্ছে, কিছুমাত্র আকর্ষণ কমেছে কি? শরদিন্দুর আসল জনপ্রিয়তা কিন্তু তাঁর ব্যোমকেশ – পরে তাঁর ছোটগল্প। আমার তো বনফুলের উপন্যাসকে ভীষণ দুর্বল লাগে, তাঁর ছোটগল্পের সামনে। বিখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ মশাই তো চাপে না পড়লে লিখতেই পারতেন না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা আর মেজোকর্তা ছাড়া আর গল্প মনে পড়ে কি? এক একজন লেখকের এক একটি সিগনেচার সৃষ্টি থাকে – তা সে চেতন ভগত হোন বা শোভা দে। চেতনের বইগুলি পড়লে সাহিত্য সমালোচকেরা যতই নাক কোঁচকান না কেন, তাঁর জনপ্রিয়তা কমেনি। কারণ, তিনি আজকালকার মানুষের মন পড়ে ফেলেছেন এবং সেই কমন আশা ভরসা, ভালোবাসায় সুড়সুড়ি দিয়ে তিনি লেখেন। বই নিয়ে বসলে সত্যি ওঠা যায় না, লেখার এমনই গুণ। একেও শুধু সাহিত্যের দোহাই দিয়ে খাজা বলা যায় না।

তিন – একজন মানুষ সারাজীবন ধারাবাহিক একটানা ভালো লিখতে পারেন না, সেটা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু সেই বিচার বিভিন্ন পাঠকের চোখে বিভিন্ন রকম। যেমন সুনীল গাঙ্গুলির বঙ্কিমের লেখা মোটেই ভালো লাগেনি। তিনি একটি প্রবন্ধে নানা যুক্তি বিস্তার করে দেখিয়েছেন যে বঙ্কিম খুব একটা ভালো লেখক ছিলেন না – কিন্তু সত্যিই কি তাই? শরৎ সাহিত্য আমার বড্ড প্যানপ্যানে লাগে, কিন্তু তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন এবং অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন। নামী নামী সাহিত্যিকরা তাঁর নামে মাথা নিচু করেন। তাহলে, আমি কি ভুল?

#

এইখানে এসে যায় শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ। আমার যেটা ভালো লাগে, সেটা ওর ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু তাই বলে তাকে "রদ্দি" বলে দেগে দেওয়া ঠিক না। যে লেখক জনমানসের মন বুঝে, সেভাবে ধারাবাহিক ভাবে লিখতে পারেন, তিনি জনপ্রিয় এবং ভালো লেখক হতেই হবে। তাঁর লেখা সাহিত্য পদবাচ্য কিনা, সেটা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতেই পারে, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা পাওয়া, বড় কঠিন ব্যাপার – সেটা যেমন তেমনরা পায় না- পেতে পারে না।

এ বিষয়ে লেনিনের একটা কথা মনে পড়ছে, "কিছু মানুষকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কিন্তু অনেক মানুষকে বেশীদিনের জন্য বোকা বানানো যায় না।" – তাই জনপ্রিয় লেখক মানেই খাজা লেখক নন।

~বিদ্রোহী ভৃগু



প্রথমত, আমি শুরুতেই বলে নিতে চাই যে, আমি কোনভাবেই উক্ত ধারণার পক্ষে নই। কারণ, আপনারা অনেকেই জানেন যে, বাজারে এমন অনেক লেখকেরই বই পাওয়া যায়, যাদের বইয়ের কাটতি বেশ ভালোই, পাঠকের সংখ্যাটাও নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু আপনি আমি যদি সেগুলো ঘাঁটতে যাই, তাহলেই বুঝতে পারবো আসল ব্যাপারখানা কী? কেন ওসব বই এতো বেশি চলে বাজারের আর দু-চারটে বইয়ের চাইতে?

আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে, বইয়ের বাজার কিংবা কাটতি (যেটাই বলুন না কেন) মূলত নির্ভর করে মূলত দু'টো বিষয়ের ওপরে - একঃ বইয়ের বিষয়বস্তু; দুইঃ লেখকের (বা, রচয়িতার) লেখনীর শৈলী। দুঃখজনকভাবে, ইদানীংকালে দ্বিতীয় বিষয়টা আর তেমন গুরুত্ব বহন করে না সাধারণ পাঠকমহলের নিকটে। যার অন্যতম প্রধান একটা কারণ হল, আজকাল যেমন রূচিশীল সুপাঠ্য বইয়ের চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে, ঠিক তেমনি সত্যিকার সমঝদার পাঠকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে যেটা দাঁড়াল সেটা হলো, বইয়ের কাটতি বাড়াতে হলে, এখন আসলে ওই বিষয়বস্তুটাই মোদ্দা বিষয়, লেখকের লেখনীর ধার কেমন সেটা এখন আর ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অনেক তুলনামূলক নিম্নমানের লেখকবৃন্দ যেমন রাতারাতি কোন একটা বিশেষ বিষয়ের উপর খানকতক গল্প-উপন্যাস লিখে বাজারে নাম কিনছেন, অপরদিকে আর এক শ্রেনীর লেখকবৃন্দ তুলনামূলক অনেক উঁচুমানের সাহিত্য রচনা করেও সেভাবে সাড়া জাগাতে পারছেন না পাঠকমহলে। আর তার মূল কারণ ওই একটাই, বিষয়বস্তু। তাঁরা হয়তো যে যে বিষয় নিয়ে লিখছেন সেটার আসলে তেমন কোন চাহিদাই নেই কিংবা সেই মাপের বোদ্ধাও কেউ নেই, যা এক নিদারুণ পরিতাপের বিষয়।

সবশেষে, আমি এটাই বলতে চাইব যে, যদি আপনার রচনার বিষয়বস্তু বাজার চাহিদার সঙ্গে মিল খায়, তাহলে হয়তো আপনি কয়েকখানা গৎবাধা কাহিনী লিখে রাতারাতি জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হতে পারেন, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আপনি একজন ভালো ও উন্নতমানের লেখক।

~সত্যান্বেষী



জনপ্রিয় লেখা মানে অনেক জনের সেই লেখা পড়ে ভালো লেগেছে। তার সঙ্গে ভালো লেখার কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। আবার ভালো লেখার কি মাপকাঠি আছে? আর সেই সেই প্যারামিটার কারা মাপবে? আজ আমার যদি নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে পড়তে ভালো লাগে না, তাহলে কি বলব উপন্যাসটি বাজে? ওই উপন্যাসে সেক্স কন্টেন্ট এত বেশি কেন? একই কথা অলীক মানুষ বা ঢোঁড়াই চরিত মানস সম্পর্কে বলা যায়। আসলে আমি কি পড়তে ভালোবাসি, সেই সেই প্যারামিটার ম্যাচ করলে একটা লেখা আমার কাছে ভালো কি মন্দ হয়। সেটা ভালো লেখার মানদণ্ড হতে পারে না। এবার যে লেখা জনপ্রিয় ধরে নিলাম ১০০ জনের সেটা সত্যি ভালো লেগেছে, ১০০ জন লেখকের ফ্যান হিসেবে ভালো বলেছেন, আর ১০০ জন পড়েছে তেমন কিছু মনে হয়নি, তবু সবাই বলছে তাই তার ভালো লেগেছে। তার মানে ২০০-৩০০ জন বইটা পড়ার চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে ১০০ জনের ভালো লেগেছে। সেই ১০০ জনের রুচি, চাহিদা, বই পড়ার পরিস্থিতি এক নাও হতে পারে। তবু ভালো লেগেছে ওই ১০০ জনের। তাহলে সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে বলা যায় জনপ্রিয় লেখা অনেকের ভালো লেগেছে, তাই জনপ্রিয়। আর ধারাবাহিকভাবে জনপ্রিয় হতে গেলে তার কিছু লেখা অন্তত পাঠকের মনে থাকতে হবে। না হলে জনপ্রিয় হবে কি করে?

~অর্ণব দাস



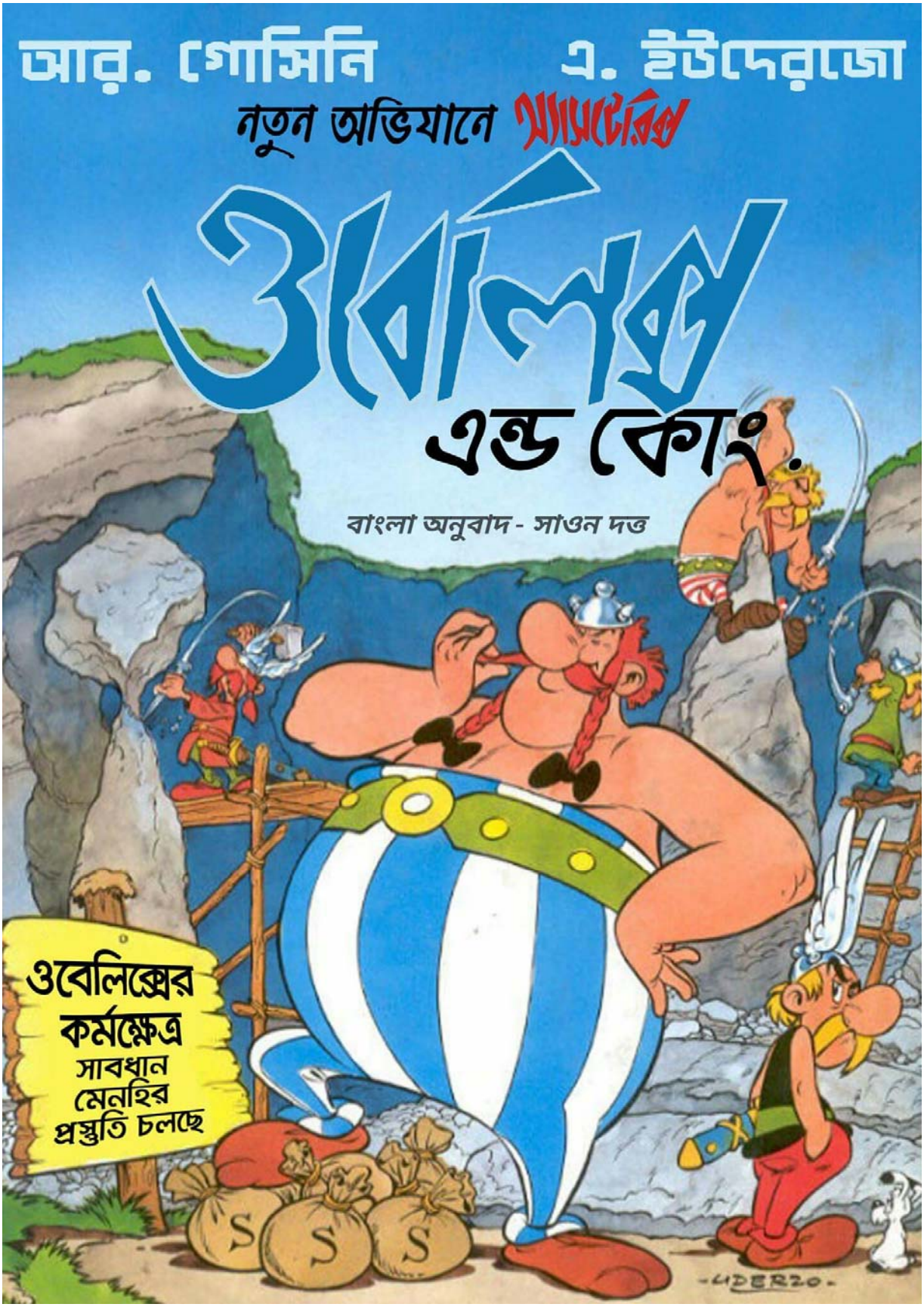
বি ডি বিতর্কের বিষয় ধারাবাহিক ভাবে কোন লেখক ভালো লিখে গেলে তিনি বা লেখা জনপ্রিয় হবে। সবাই অতীতের উদাহরণ দিয়ে, আবার কেউ হাতীর শুঁড়ের মতো লম্বা অঙ্ক কষে, তাদের নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। আমি যেহেতু খুব বেশি অতীতের লেখা পড়িনি, এবং অঙ্কে খুব কাঁচা তাই ঐ দুই রাস্তায় মোটেও যাব না। আমি বলছি আজকের দিনের অর্থাৎ ফেসবুকভিত্তিক জনপ্রিয় লেখকদের কথা। গত ৩ বছরে একাধিক লেখক ও গবেষককে জন্মাতে দেখেছি এই আন্তর্জালিক জগতে যারা প্রাথমিক দিকে সময় কাটাতে কি বোর্ড টিপতেন। তারা তাদের বন্ধুকুলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পরে অনেকটা তাদের পাঠকদের তাগিদাতেই বা স্বেচ্ছায় কাগুজে জগতে পা রাখেন, যেহেতু তাদের পাঠক থেকে লেখক হওয়ার গতি খুব আস্তে ছিল, তাই সামান্য হলেও তাদের সাহিত্যের মান ভাল। কিন্তু ২০১৫ সাল নাগাদ এক গোষ্ঠীভিত্তিক সাহিত্যের চল আরম্ভ হয়েছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যেই লেখক, গবেষক, প্রকাশক, মার্কেটিং এক্সপার্ট মায় রিভিউয়ার সবাই হাজির। এরা নিজেরাই একের পর এক বই লিখছেন ছাপছেন, আর একরকম হ্যামারিং করে বিক্রিও করাচ্ছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ ভাল লিখছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ যাকে বলে পাতে দেওয়ার অযোগ্য, অথবা চর্বিত চর্বণ। কিন্তু তারা জনপ্রিয় হচ্ছেন, প্রায়ই বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় প্রশস্তি প্রকাশিত হচ্ছে আর পাঠক সেই প্রশস্তিতে ভুলে বই কিনে ঠকছেন।

তাই আমার মতে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে জনপ্রিয়তা যেখানে পূর্ব পরিকল্পিত, অনেকাংশে ফোলানো বেলুনের মতো, সেখানে

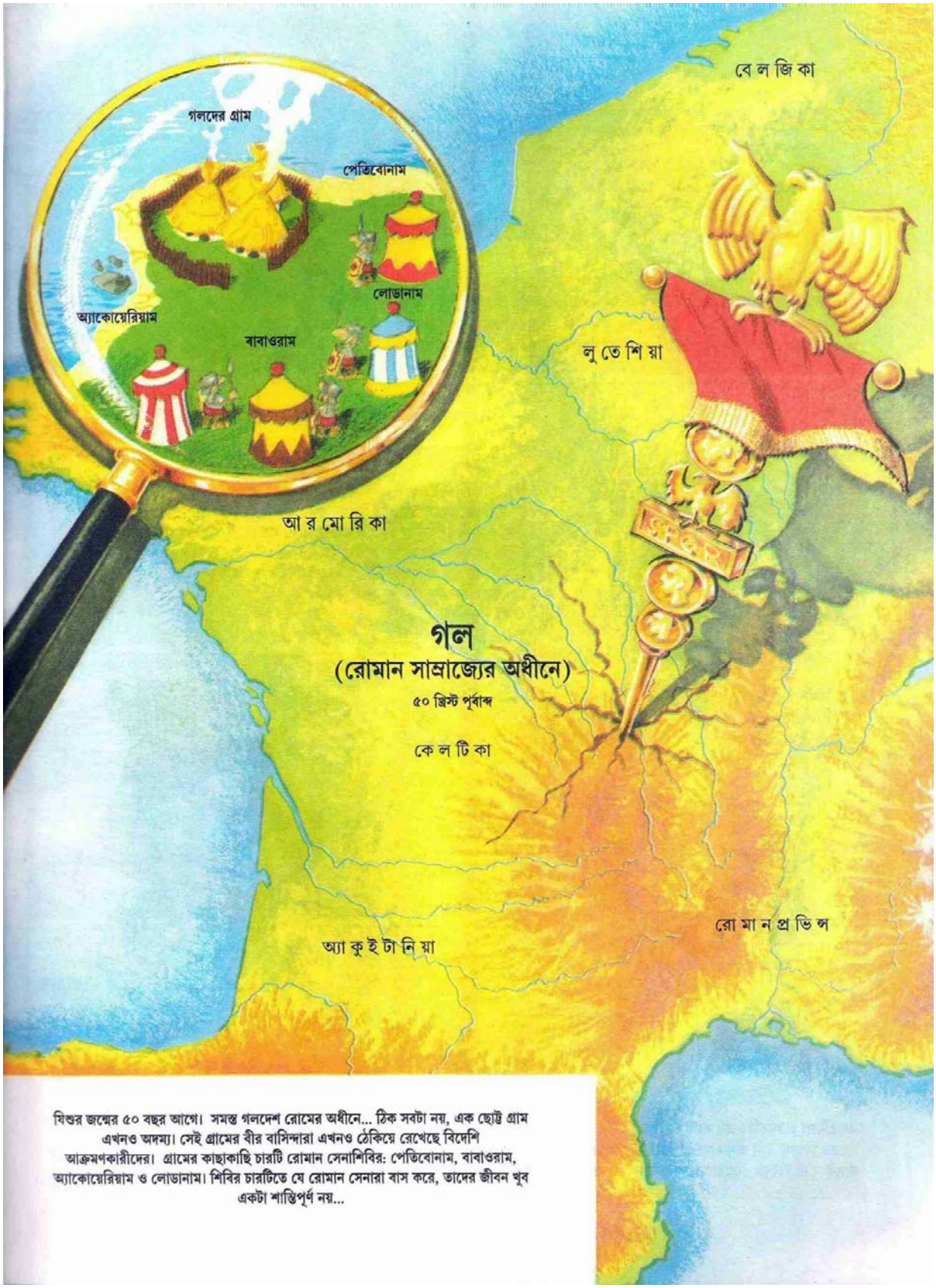
জনপ্রিয় লেখক ভাল লেখক নাও হতে পারে।

~সুশোভন রায়

#


আর. গোসিনি
এ. ইউদেরজো
নতুন অভিযানে অ্যাসটেরিক্স
ওবেলিক্স
এন্ড কোং.
বাংলা অনুবাদ - সাওন দত্ত
ওবেলিক্সের
কর্মক্ষেত্র
সাবধান
মেনহির
প্রস্তুতি চলছে
S
S
S
-UDERZO-

#



যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গলদেশ রোমের অধীনে... ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির: পেত্তিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...

#



গলের কয়েকজন অধিবাসী

অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে-কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে। সঙ্গে থাকে গোঁয়ার্তুমিক্স, পৃথিবীর একমাত্র কুকুর যে গাছ উপড়ে পড়লে চিৎকার করে কাঁদে।



এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানা রকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...



কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে উলটো। অবশ্য গান-টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মতো বন্ধু কমই আছে....



এবং বিশালাকৃতিক্স। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগচটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে... তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'

#


হালকা ঢিলেঢালা শৃঙ্খলা বাবাওরামের শিবিরে....
এটা আমাদের পরিত্রান ছেলেরা! এটা আমাদের পরিত্রান!
দ্বার খুলে দাও! দ্বার খুলে দাও!
এই যে সেঞ্চুরিয়ান গন্ডমালাস! সব ঠিক চলছে তো!
আমি সেঞ্চুরিয়ান মাথামোটাস! আভে!
শুভ সাক্ষাৎ! আমি হলাম সেঞ্চুরিয়ান গন্ডমালাস! আভে! কি শান্তি!
তোমার সৈনিকের পোশাক কোথায়?
আমরা খুব একটা বাইরে বেরোই না, তো ওসব পরে কি লাভ!
GRRAT! GRAT!
এগিয়ে চলো!

#


অতীতে আমি এরকম করে কুচকাওয়াজ করতাম!
আহ্?
একটা উপদেশ শুনুন.. মাথা ঠান্ডা রেখে নিজের শান্তির জন্য অপেক্ষা করুন। আর কোনো স্থানীয় গল যদি রাগানোর চেষ্টা করে তো পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। ওদের সব মাথা খারাপ আর ওরা অদম্য
আমার উদ্দেশ্য সব গলদের নরকে পাঠানো! এটা সিজারকে সন্তুষ্ট করবে....আর আমি সারাজীবন সেফুরিয়ান থাকতে চাই না!
কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার সারাজীবন অশান্তিতে কেটেছে.. ঠিক আছে, ছেলেরা এদিকে!

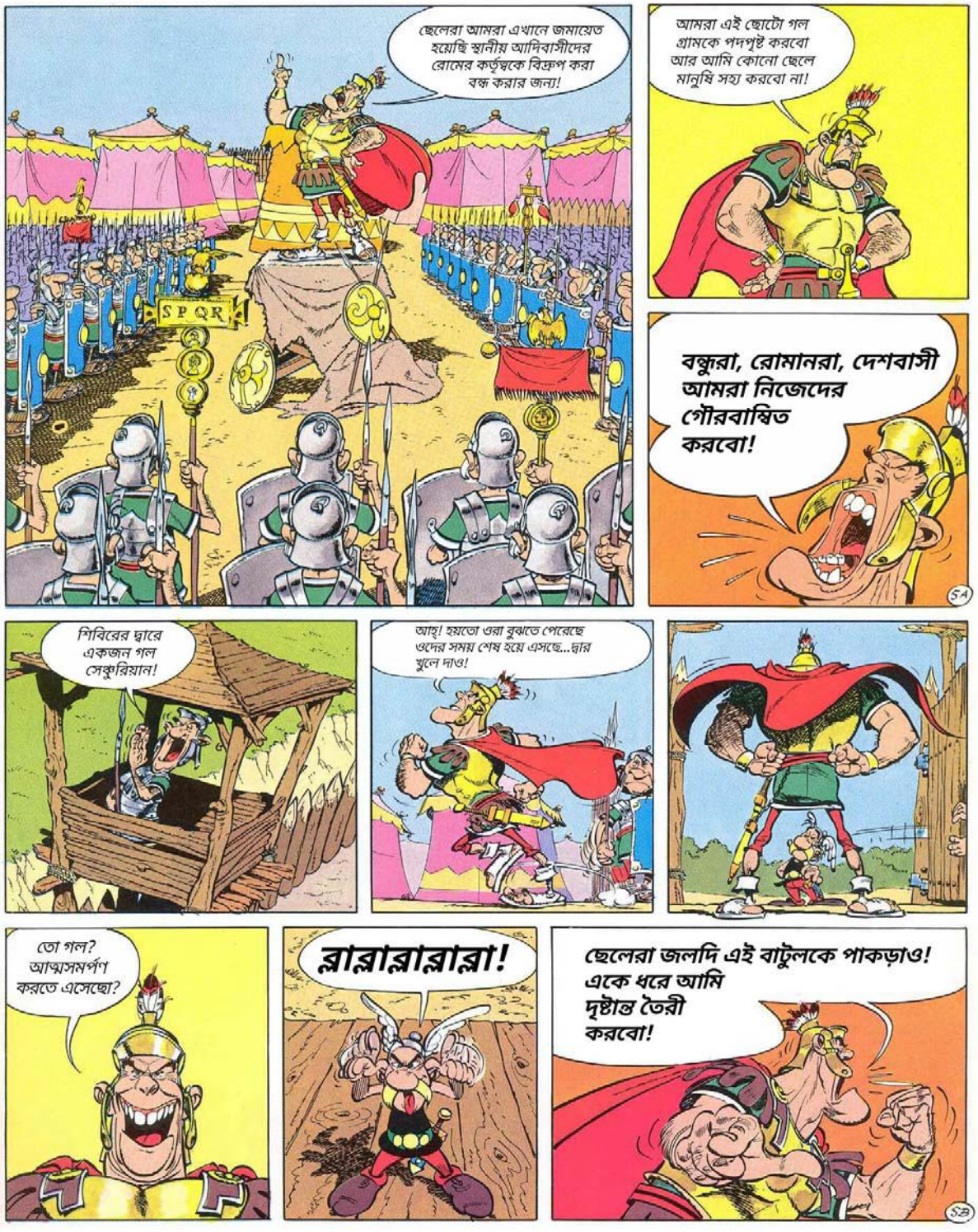
#


জবর খবর!
জবর খবর!
জবর র..
?
জবর খবর কি, অ্যাসটেরিক্স?
হুমম?... ও কিছু না.. হিঃহিঃহিঃ!
3A
সতর্ক থেকো! ওই আসছে!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
হিঃহিঃহিঃ!
এদের কি কামড়িয়েছে?
3B

#


নতুন রূপে আমাদের পুরোনো বন্ধু! এক্ষুনি এসে পড়বে!
সতর্ক থেকো!
কার নতুন রূপ? কে এসে পড়বে?
হুমফ? অন্তত পক্ষে এই মাছগুলো নয়!
হিঃহিঃহিঃ!
অ্যাসটেরিক্স এসব এখানে কি হচ্ছে?
হুমফ?
লোকজন আমার সামনে চলে এলেই হিঃহিঃহিঃ করে হাসছে এমনকি হাতুড়িক্স অরুচিক্সের মাছের প্রশংসা করছে মারপিট করার বদলে!
হিঃহিঃহিঃ!
4A
ওরা আর ওদের গোপন কথা! আমরা গ্রাহ্য করি না, তাই না গোঁয়াতুর্মিক্স?
আমরাও আমাদের গোপন কথা তৈরি করবো, ঠিক আছে!
হিঃহিঃহিঃহিঃ!
!?!
আমার মনে হয় ও কিছু সন্দেহ করছে। এখন কি আমি যাবো?
হ্যা সব কিছু প্রস্তুত।
4B

#


ছেলেরা আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি স্থানীয় আদিবাসীদের রোমের কর্তৃত্বকে বিদ্রুপ করা বন্ধ করার জন্য!
S P QR
আমরা এই ছোটো গল গ্রামকে পদপৃষ্ট করবো আর আমি কোনো ছেলে মানুষি সহ্য করবো না!
বন্ধুরা, রোমানরা, দেশবাসী আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত করবো!
শিবিরের দ্বারে একজন গল সেন্ট্রিয়ান!
আহ্! হয়তো ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের সময় শেষ হয়ে এসছে...দ্বার খুলে দাও!
তো গল? আত্মসমর্পণ করতে এসেছো?
ল্লাল্লাল্লাল্লা!
ছেলেরা জলদি এই বাটুলকে পাকড়াও! একে ধরে আমি দৃষ্টান্ত তৈরী করবো!

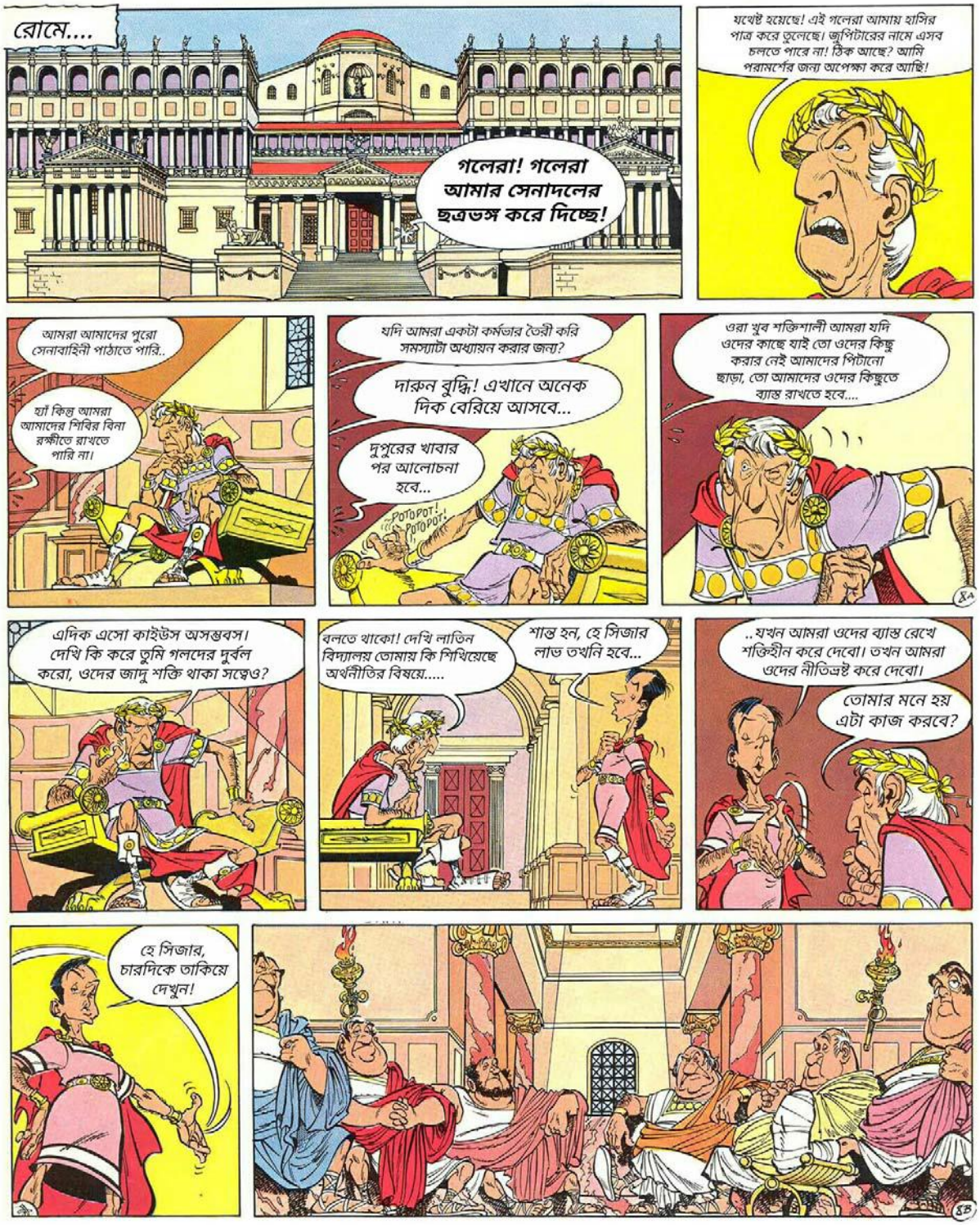
#


ওরা আমাদের তাড়া করছে! ওরা আমাদের তাড়া করছে!
কারা তাড়া করছে?
রোমানরা..একদম নতুন রোমানরা, এক্ষুনি এসে পড়বে।
রোমা..আমার উপর ছেড়ে দাও! আমার উপর ছেড়ে দাও!
হ্যাঁ হ্যাঁ সব তোমার!
সব আমার?
64
অবশ্যই ভ্যাবাগঙ্গারাম! আজ তোমার জন্মদিন। আমরা নতুন রোমানদের তোমাকে উপহার দিচ্ছি!
TOK! TOK! TOK!
তো..তাই জন্য তোমরা আমাকে দেখা হাসছিলে!
একদম ঠিক ওবেলিক্স! যাও, উপহার তোমার জন্য অপেক্ষা করছে!
ছেলেরা আমরা গলদের মাটিতে মিশিয়ে দেবো! হামলা! ওরা দলে খুব বেশি নেই..এটা একটা উপহার!
আমার সাথে আয়, গোঁয়াতুর্মিক্স!
RRRRAAAORRR
69

#


শুভ জন্মদিন তোমাকে,
শুভ জন্মদিন তোমাকে...
খুব আনন্দদায়ক উপহার.... খুব মার্জিত আর সুস্বাদু...তোমরা.. তোমরা খুব সুবিবেচক.. আমি জানি না কিভাবে তোমাদের.....
ওবেলিক্স কারার কিছু নেই! তুমি খুব আবেগপ্রবণ! এসো তোমার জন্য ভোজসভা অপেক্ষা করছে অনেক বন্য শুকরের সাথে!
শুভ জন্মদিন.. শুভ জন্মদিন...
মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভাতে ভুলে গেছে!
এখন কি হবে সেঞ্চুরিয়ান?
শিবিরে ফিরে যাবো আর সিজারকে খবর দেবো ..আর অপেক্ষা করবো আমাদের পরিত্রানের!

#


রোমে....
গলেরা! গলেরা আমার সেনাদলের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে!
যথেষ্ট হয়েছে! এই গলেরা আমায় হাসির পাত্র করে তুলেছে। জুপিটারের নামে এসব চলতে পারে না! ঠিক আছে? আমি পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে আছি!
আমরা আমাদের পুরো সেনাবাহিনী পাঠাতে পারি..
হ্যাঁ কিন্তু আমরা আমাদের শিবির বিনা রক্ষীতে রাখতে পারি না।
যদি আমরা একটা কর্মভার তৈরী করি সমস্যাটা অধ্যায়ন করার জন্য?
দারুন বুদ্ধি! এখানে অনেক দিক বেরিয়ে আসবে...
দুপুরের খাবার পর আলোচনা হবে...
POTOPOT! POTOPOT!
ওরা খুব শক্তিশালী আমরা যদি ওদের কাছে যাই তো ওদের কিছু করার নেই আমাদের পিটানো ছাড়া, তো আমাদের ওদের কিছুতে ব্যাস্ত রাখতে হবে....
এদিক এসো কাইউস অসম্ভবস। দেখি কি করে তুমি গলদের দুর্বল করো, ওদের জাদু শক্তি থাকা সত্বেও?
বলতে থাকো! দেখি লাতিন বিদ্যালয় তোমায় কি শিখিয়েছে অর্থনীতির বিষয়ে.....
শান্ত হন, হে সিজার লাভ তখনি হবে...
..যখন আমরা ওদের ব্যাস্ত রেখে শক্তিহীন করে দেবো। তখন আমরা ওদের নীতিভ্রষ্ট করে দেবো।
তোমার মনে হয় এটা কাজ করবে?
হে সিজার, চারদিকে তাকিয়ে দেখুন!

#


যত্তসব!
এই নতুন যুবক সম্প্রদায় কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আর হাবভাব দ্যাখো সবজান্তার মতোন!
হে সিজার, এর কথা শোনার কোনো দরকার নেই.. আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা...
আমাদের কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে! আমাদের প্রচার'ণার কথা মনে আছে সিজার? আমরা পুরো পৃথিবীকে আমাদের সেনাবাহিনীর কাছে নত করেছি!
আমার সব মনে আছে। তুমি সাহসী, বলিষ্ঠ আর জয়নায়ক ছিলে, তুমি প্রচার'ণার মাধ্যমে রোমের ভাগ্য এনেছিলে..কিন্তু এখন নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!
দ্যাখো তোমাদের সব সোনা, তোমাদের উদ্যানবাটি, তোমাদের অজাচার সব তোমরাই তৈরী করেছো! তোমাদের সব অধঃপতন ঘটেছে!
এই যে চিন্তার সাগর? যাই তুমি ভাবো সব সাগরের জলে ডুবে যাই!
হুমফ? খাবার সময় হয়ে গেলো?
তোমার মনে হয় তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে গল দের পরাজিত করতে পারবে?
হ্যাঁ, সিজার!
আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, আমি ওদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেবো!
কিন্তু আমার প্রচুর সোনার দরকার.. প্রচুর সোনা!
তোমাকে অপরিমিত সোনা দেওয়া হবে! তুমি তোমার যাত্রা শুরু করতে পারো!

#


কিছুদিন পর, বাবাওরামের শিবিরে.....
হ্যাঁ মোটকা মতোন একটা ছেলে। পিঠে করে মেনহির বয়ে নিয়ে যাই আর ওর সাথে একটা ছোট্ট কুকুরছানা থাকে...
তুমি ওকে দেখলেই পালিয়ে যাবে.. এমনকি ওর কুকুরছানাও ভয়ঙ্কর।
আমি যাচ্ছি। শিবির ছেড়ে কোথাও যেও না।
না না! যতক্ষন না পরিত্রান পাচ্ছি ততক্ষন এখান থেকে বেরুবো না।
একটু পরে....
কোনো গন্ধ পেয়েছিস নাকি? দেখি...
GRRRRR!
?
ইস! কি দারুণ সুন্দর জিনিস তোমার পিছনে!
আমার পেছনে?
কিন্তু আমার পেছনে তো কেউ নেই!
হ্যাঁ আছে, মেনহিরটা আছে!
হ্যাঁ আমি ভুলে গেছিলাম... এটা একটা মেনহির।
জাঁকজমকশালী!
?

#


হা, তোমার পিঠের ওই অসাধারণ মেনহিরটা তুমি কোত্থেকে পেলে?
আমি এটা খুঁজে পাইনি, এটা আমি তৈরী করেছি। প্রথমে আমি মেনহির খোদাই করি তারপর এগুলোকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসি।
আমাকে অনেক গুলো দিতে পারবে?
না একজনের জন্য একটা মেনহির যথেষ্ট, ওদের আর বেশির দরকার হয় না। এটা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়েও যাই না।
এটার দাম কত?
ওহ্, আমি ঠিক জানি না.. আমি সাধারণত এর বিনিময়ে কিছু নিয়ে নি
বিক্রি করবে ওটা আমার কাছে? দুইশ সেসরটি দেব!
সেসরটি?
স্বর্ণমুদ্রা থাকলে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। 'স্বর্ণমুদ্রা থাকলে তুমি হবে গ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষমতাবান!
এই নাও
এটা আমার পক্ষে খুব ভারী.. তুমি এটা বাবাওরামের শিবিরে নিয়ে যাও।
বাবাওরামের শিবির?!?
নাহহহহ! আমি সৈনিক না, আমি শুধু ওখানে থাকি! আমি একজন মেনহির ক্রেতা.. শোনো আমার কথা।
গররররর
আমার মতন মেনহির ক্রেতার জন্য তোমার মতন মেনহির বাহক প্রয়োজন.....
এদিকে দ্যাখো!
পরিত্রান?
না, মোটকা নরপশু!

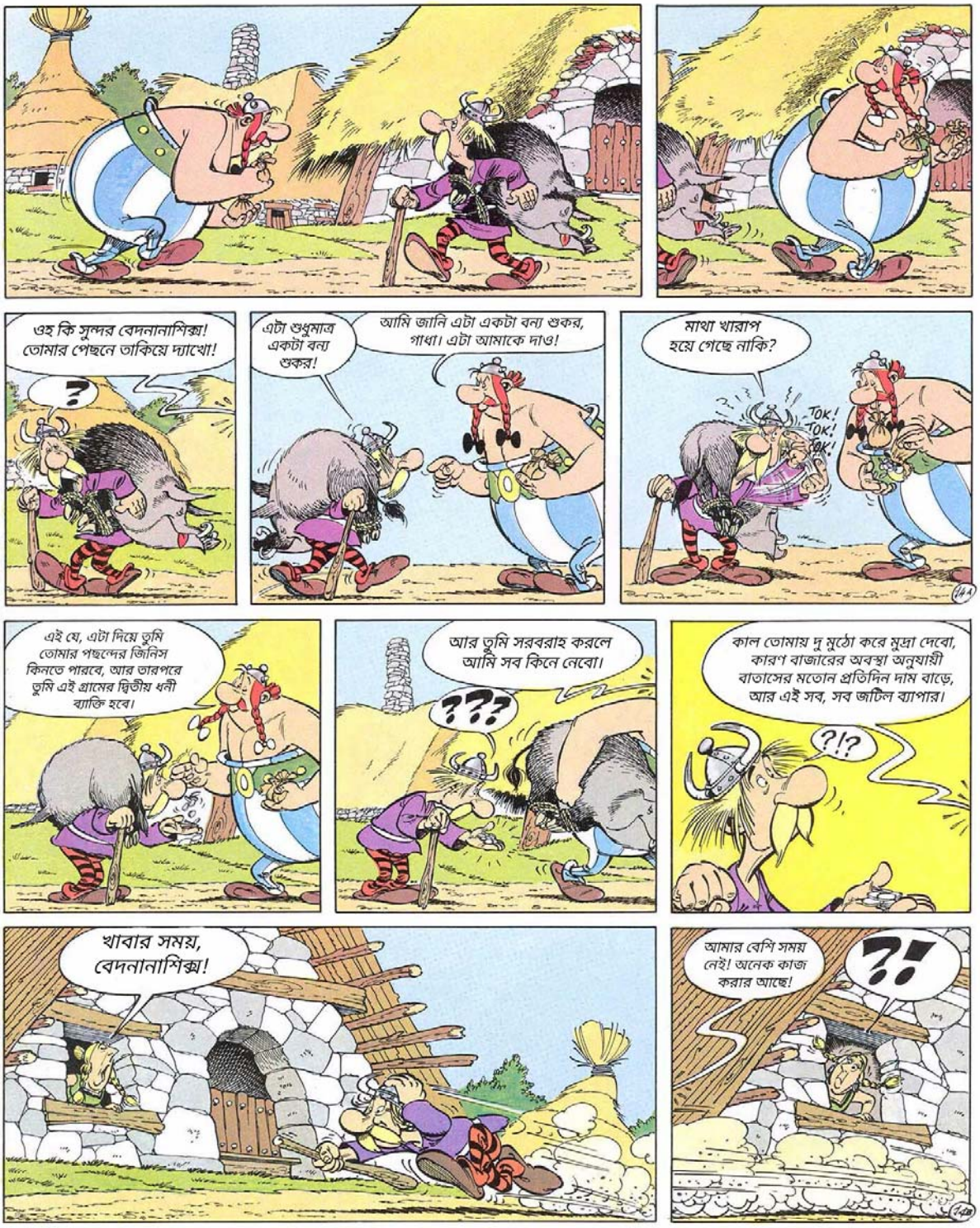
#


সবাই কোথায়?
কিছু মনে কোরো না। মেনহিরটা ওখানে রেখে দাও, আর এই নাও তোমার ২০০ সেসরটি।
এই রোমানগুলো সব পাগল!
তুমি এখানে এসে মেনহির দিয়ে গেলে আমি সব মেনহির কিনে নেবো!
এসব কি ছিলো?
আমাদের সব সমস্যার সমাধান!
আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ওবেলিক্স। চলো শুকর শিকারে যাই?
না।
তুমি ঠিক আছো তো?
WRAF! WRAF!
আমি একদম ঠিক আছি! আমার অনেক কাজ আছে! আমার নষ্ট করার মতোন সময় নেই!
গিয়ে অ্যাসটেরিমক্সের সাথে খেলা কর গোয়াতুমিরিক্স, আমি ব্যস্ত।
??
!

#


পরের দিন...
এদিকে দ্যাখো!
পরিত্রান?
না, মোটকা নরপশু!
সবাই লুকিয়ে পড়ো!
সবাই কোথায়?
খুউব সুন্দর! আগের দিনের থেকেও এটা বেশি সুন্দর!
এই যে তোমার চারশত সেসরটি।
না, দুশো সেসরটি।
দাম প্রত্যেকদিন বাড়ে।
কোথা থেকে?
না, না..এটা নির্ভর করে সরবরাহ আর চাহিদার উপর..বাজারের অবস্থার উপর, এটা জটিল হলেও এটা মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেয়।
আর ভুলে যেওনা, আমি তোমার খোদাই করা সব মেনহির কিনে নেবো।
SNIF! SNIF!
অ্যাসটেরিক্স!
হ্যাঁ?
আমি ক্ষুধার্ত। তোমার মনে হয়..
যখন তুমি ব্যস্ত থাকবে না তখন তুমি বন্য শুকর শিকারে যেতে পারো, জঙ্গল বন্য শুকরে ভর্তি।
SKRONTCH
গররররর

#


ওহ কি সুন্দর বেদনানাশিক্স! তোমার পেছনে তাকিয়ে দ্যাখো!
?
এটা শুধুমাত্র একটা বন্য শুকর!
আমি জানি এটা একটা বন্য শুকর, গাধা। এটা আমাকে দাও!
মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?
TOK! TOK! TOK!
এই যে, এটা দিয়ে তুমি তোমার পছন্দের জিনিস কিনতে পারবে, আর তারপরে তুমি এই গ্রামের দ্বিতীয় ধনী ব্যাক্তি হবে।
আর তুমি সরবরাহ করলে আমি সব কিনে নেবো।
???
কাল তোমায় দু মুঠো করে মুদ্রা দেবো, কারণ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী বাতাসের মতোন প্রতিদিন দাম বাড়ে, আর এই সব, সব জটিল ব্যাপার।
?!?
খাবার সময়, বেদনানাশিক্স!
আমার বেশি সময় নেই! অনেক কাজ করার আছে!
?!

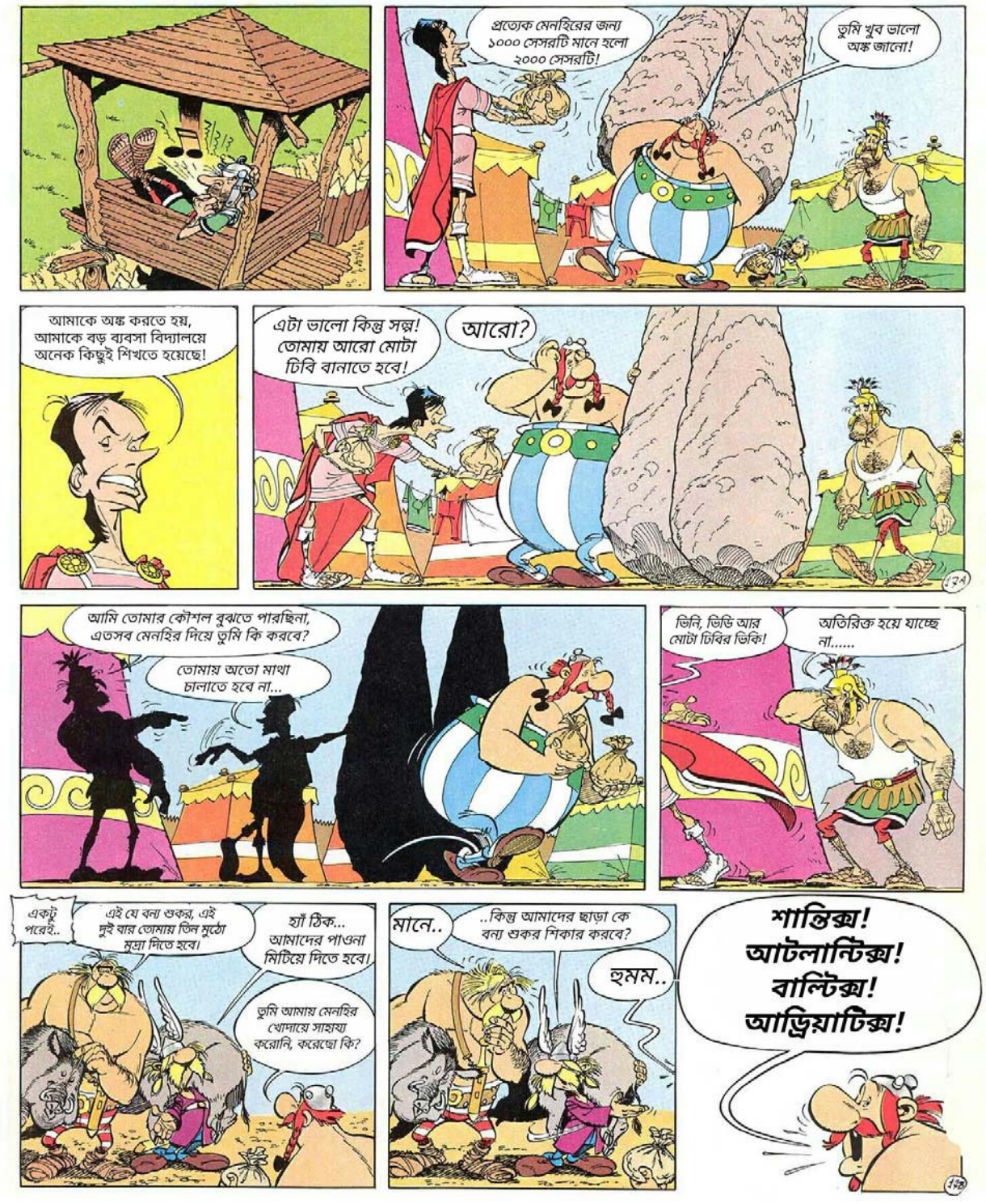
#


মেনহির সরবরাহের ছেলে এসেছে!
আটশ সেসরটি।
তুমি বলতে চাইছো কালকের থেকে বাজারমূল্য আজকে আবার বেড়েছে?
ইয়ে?...ওহ হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে। তুমি একবারে একটা মেনহির আনছো এদিকে আমার অনেক মেনহির দরকার....
আমি এর থেকে দ্রুত খোদাই করতে পারবো না। আমি একদিনে একটা মেনহির খোদাই করতে পারি কারণ ছোটো বেলায় আমি জাদু পানীয়তে পড়ে গেছিলাম...
দুঃখের বিষয়...
তুমি যদি তোমার কাজের গতি না বাড়াতে পারো তাহলে বাজারের মূল্য পড়ে যেতে পারে।
উহ?
তুমি যদি মোটা চিব্বির মেনহির খোদাই না করতে পারো তাহলে আমি তোমায় মোটা টাকা দিতে পারবো না। মাথায় ঢুকলো কিছু?
অ্যাসটেরিক্স, তুমি কি আমায় মেনহির খোদাই করতে আমায় সাহায্য করবে?
?
দ্যাখো আমরা যদি দ্রুত মেনহির খোদাই না করতে পারি তাহলে বাজারের মূল্য পড়ে যাবে।
উহ?
মাথায় ঢুকলো কিছু?
ঠক! ঠক! ঠক!

#


এর মানে তুমি আমায় সাহায্য করবে না?
হুহ!
এই যে বন্য শুকর!
আর ভুলে যেওনা বাতাসের মতোন বাজারমূল্য বাড়ে। যেটা তুমি দু মুঠো করে দেবে।
আমায় মেনহির খোদায়ে সাহায্য করার ব্যাপারে তোমার কি মত?
উহ?
তুমি যদি আমায় মোটা টিবির মেনহির খোদায়ে সাহায্য করো তাহলে আমি তোমায় মোটা সেসরটি দিতে পারবো.....
মাথায় ঢুকলো?
ঢুকলো, কিন্তু তখন কে তোমায় মোটা শুকর শিকার করে দেবে?
তাই তো!
GRATT! GRATT!
তুমি এরকম হাস্যকর ভাবে কথা বলছো কেন?
হুমম? এভাবেই ব্যবসায়ীরা কথা বলে
একটা কাজ করতে পারো, তোমার পরিবর্তে কাউকে ভাড়া করে বন্য শুকর শিকার করতে বলো!
দুজনকে শুকর শিকার করতে বলবো, কারণ আমরা দুজন মেনহির খোদাই করবো!
একস্বরাইক্স! অনেকিক্স!

#


প্রত্যেক মেনহিরের জন্য ১০০০ সেসরটি মানে হলো ২০০০ সেসরটি!
তুমি খুব ভালো অঙ্ক জানো!
আমাকে অঙ্ক করতে হয়, আমাকে বড় ব্যবসা বিদ্যালয়ে অনেক কিছুই শিখতে হয়েছে!
এটা ভালো কিন্তু সল্প! তোমায় আরো মোটা ঢিবি বানাতে হবে!
আরো?
আমি তোমার কৌশল বুঝতে পারছিনা, এতসব মেনহির দিয়ে তুমি কি করবে?
তোমায় অতো মাথা চালাতে হবে না...
ভিনি, ভিডি আর মোটা ঢিবির ভিকি!
অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে না.....
একটু পরেই..
এই যে বন্য শুকর, এই দুই বার তোমায় তিন মুঠো মুদ্রা দিতে হবে!
হ্যাঁ ঠিক... আমাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে!
তুমি আমায় মেনহির খোদায়ে সাহায্য করোনি, করেছো কি?
মানে..
..কিন্তু আমাদের ছাড়া কে বন্য শুকর শিকার করবে?
হুমম..
শান্তিক্স! আটলান্টিক্স! বাল্টিক্স! আড্রিয়াটিক্স!

#


ওবেলিক্সের জন্য উদ্বেগের কিছু নেই, আমি জানি এই মুহূর্তে ওবেলিক্সের ব্যবহার অদ্ভুত, কিন্তু সময়ের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে।
তুমি জানো এখন আমরা কি করবো? আমরা দুজনে বন্য শুকর শিকার করে ওবেলিক্সকে খেতে আমন্ত্রণ করবো!
ওই যে একটা আসছে!
দূরে থাকো! এটা আমার!
?
তোমার মানে বলতে কি চাইছো? রোমানদের মতো শুকর বেসরকারী সম্পত্তি!
রোমানরা ঠিক আছে, কিন্তু বন্য শুকর না!
আমরা ওবেলিক্সের জন্য শিকার করছি।
এক টিপি মুদ্রা পাবো বন্য শুকরের জন্য।
আমরা এখন কাজ করছি আমাদের বিরক্ত করো না.. যাও এখান থেকে!
না! না! তুমি এটা করতে পারো...
ঢক ঢক ঢক
না!
গদাম!

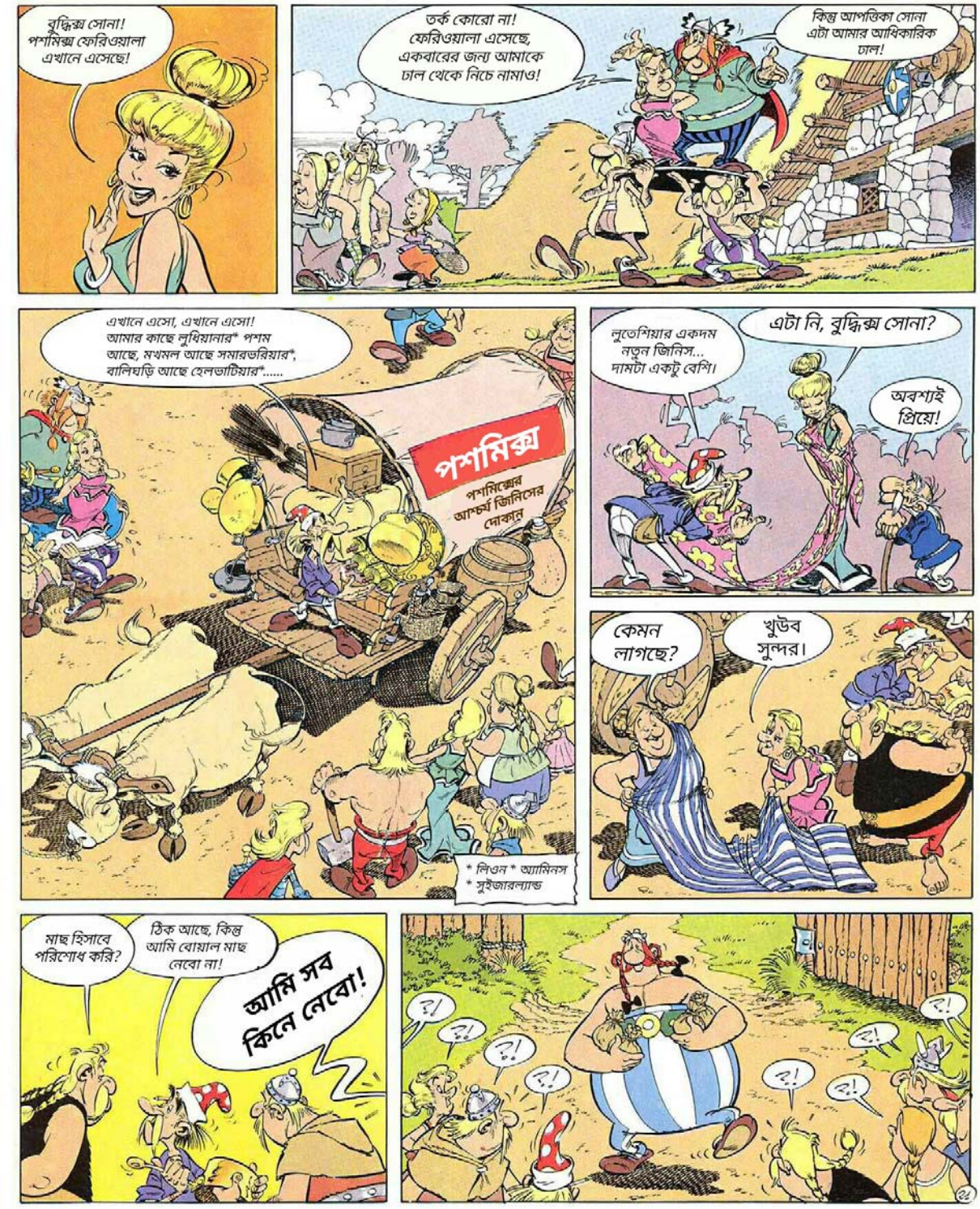
#


ভুতের নামে, আমার কি হয়েছিল?
?
টিপির আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিলো!
চলো ওবেলিক্সের সাথে বোঝাপড়া আছে!
ওবেলিক্সের কর্মক্ষেত্র
সাবধান মেনহির প্রস্তুতি চলছে
আমি পাগল নয়... মেনহিরের ব্যবসা এর আগে এতো ভালো হয়নি। আমি এই গ্রামের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যাক্তি হতে চলেছি।
পাগল এই সব কি করছো?
কিন্তু তোমার মনে হয় না তুমি এর থেকে ভালো ছিলে যখন তুমি বন্য শুকর শিকার করতে আর বন্ধুদের সাথে মজা করতে?
অবশ্যই। যখন আমি এক টিপি মেনহির খোদাই করা শেষ করবো তখন আমি আবার শুকর শিকারে যেতে পারবো.....
চলে এসো গোঁয়াতুর্মিক্স! গ্রামের সব থেকে প্রভাবশালী ব্যাক্তি! হুহ!
আমার সাথে কাজ করো অ্যাসটেরিক্স, কিছু বছরে তুমি..
আউচ!
গোঁয়াতুর্মিক্স আমায় কামড়ে দিয়েছে!

#


আমার মনে হয়না এটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়..
কিন্তু যেটা আমায় ভাবিয়ে তুলছে সেটা হলো হটাৎ করে রোমানদের মেনহিরের প্রতি গভীর আসক্তি.....
খারাপ চলছে না, কিন্তু আমার তোমার সাথে কথা আছে... চলো খেতে খেতে কথা হবে।
ভালোই হলো। আগে জানলে আমার শিকারীদের আর জঙ্গলে শিকারে পাঠাতাম না।
চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু এখনো তোমার সরবরাহে সমস্যা আছে। তোমায় সরবরাহের নালা বাড়াতে হবে।
দুঃখিত, আমি বলতে ভুলে গেছিলাম তুমি একবারে অনেক মেনহির খোদাই করতে পারছো না। তোমায় আরো বেশি মেনহির খোদাই করতে হবে জলদি জলদি!
কিন্তু সরবরাহের এত ছেলে আমার কাছে নেই..
সমস্যাটা আরো একবার ভাবো। যাই হোক আমি তোমার সংস্পর্শে থাকবো।
আরো একটা কথা: তোমাকে সেসরটি খরচ করা শুরু করতে হবে। তোমার আধুনিক পোশাকের প্রয়োজন....
কেন? আমার পাজামাটা কি খারাপ দেখতে?
সেটা না ব্যবসায়ীদের সবসময় পরিপাটি থাকতে হয়।
তাই নাকি?

#


বুদ্ধিক্স সোনা! পশমিক্স ফেরিওয়ালা এখানে এসেছে!
তর্ক কোরো না! ফেরিওয়ালা এসেছে, একবারের জন্য আমাকে ঢাল থেকে নিচে নামাও!
কিন্তু আপত্তিকা সোনা এটা আমার আধিকারিক ঢাল!
এখানে এসো, এখানে এসো! আমার কাছে লুধিয়ানার* পশম আছে, মখমল আছে সমারভরিয়ার*, বালিঘড়ি আছে হেলভাটিয়ার*.....
পশমিক্স
পশমিক্সের আশ্চর্য জিনিসের দোকান
* লিওন * অ্যামিনস * সুইজারল্যান্ড
লুতেশিয়ার একদম নতুন জিনিস... দামটা একটু বেশি।
এটা নি, বুদ্ধিক্স সোনা?
অবশ্যই প্রিয়ে!
কেমন লাগছে?
খুউব সুন্দর।
মাছ হিসাবে পরিশোধ করি?
ঠিক আছে, কিন্তু আমি বোয়াল মাছ নেবো না!
আমি সব কিনে নেবো!
?!
?!
?!
?!
?!
?!
?!

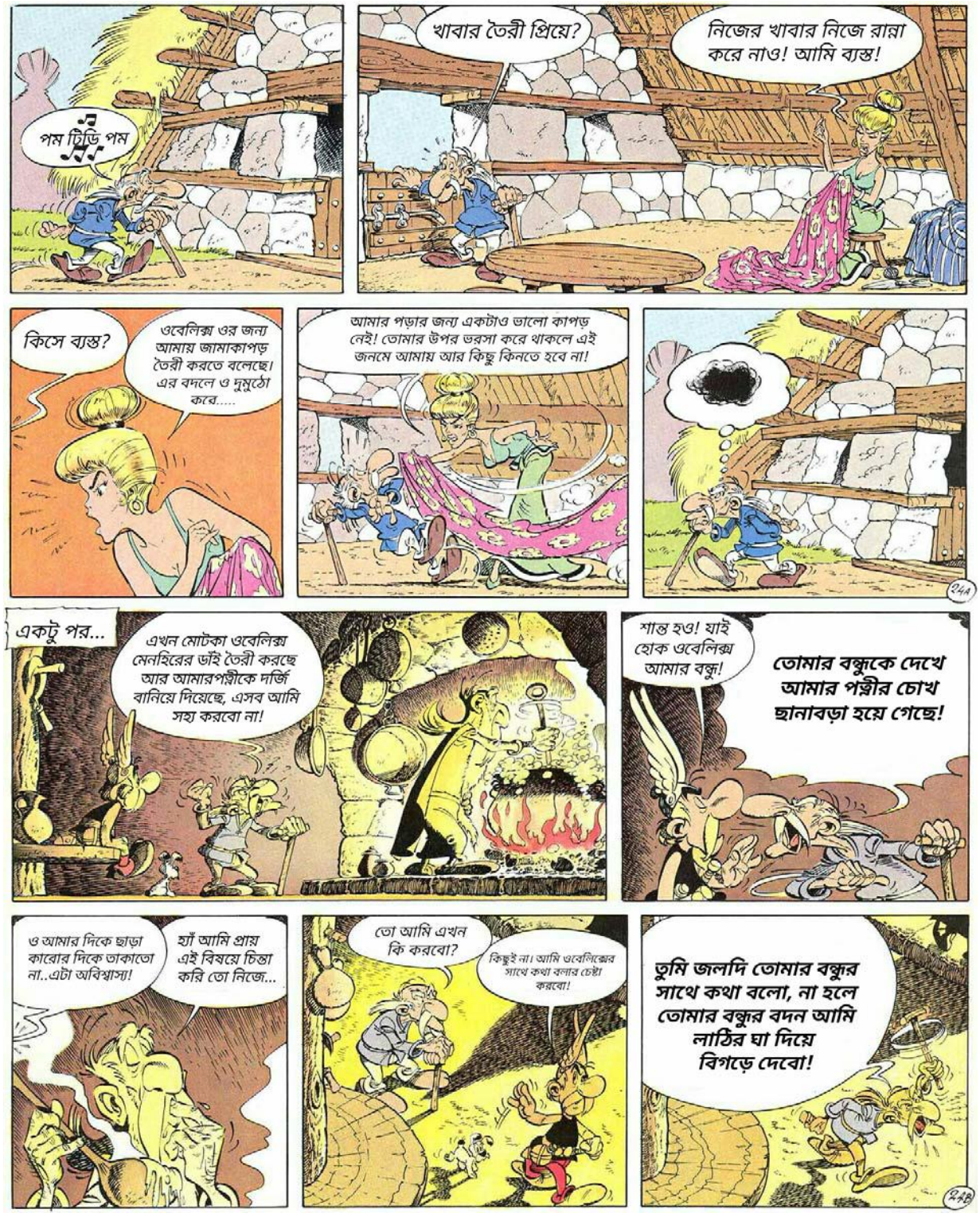
#


তুমি...তুমি বলতে চাইছো তুমি আমার দোকানের সব জিনিস কিনতে চাও?
তোমার জিনিস, তোমার গাড়ি আর তোমার বলদ!
এক টিপি মুদ্রা। মাথায় ঢুকলো?
উহ?
হ্যাঁ ঢুকলো...আমি বলতে চাইছি.. .কিন্তু যদি আমি আমার গাড়ি আর বলদ বেঁচে দি তাহলে আমার পরিবারের ভারবহন কি করে করবো?
আমি তোমায় কাজ দেবো। খেতে খেতে কথা হবে।
উহ?
খেতে এসো। আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দেবো!
সরেন দেখি...
!
আমার মালিক সব কিনে নিয়েছে।
!
তোমাদের কিছু বলার আছে?
উহ?
হুহ!

#


জুপিটারের নামে, এদিকে দ্যাখো!
OBELIX & CO
চমৎকার! দুর্দান্ত! আমার তাঁবুতে এসো ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলবো। মেনহিরের দাম আবার বেড়েছে।
কিন্তু মেনহিরগুলো আমায় নামাতে হবে.....
না না এসব মালিকের কাজ না।
মেনহিরগুলো গিয়ে নিচে নামা!
উহ?
মেনহিরগুলো নামা! মাথায় ঢুকলো?
এসে আমাদের সাথে যোগ দে! তাইতো ওরা বল্লো..
ক্র্যাচচচচ !
পরে....
এইযে ওবেলিক্স!
আমি তোমায় অভিনন্দন দিতে এসেছি এই গ্রামের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার জন্য।
তাই নাকি? ইয়ে... মানে...
যাই হোক... তুমি আমার জন্য কিছু করোনি, তাই নয় কি?
অবশ্যই!

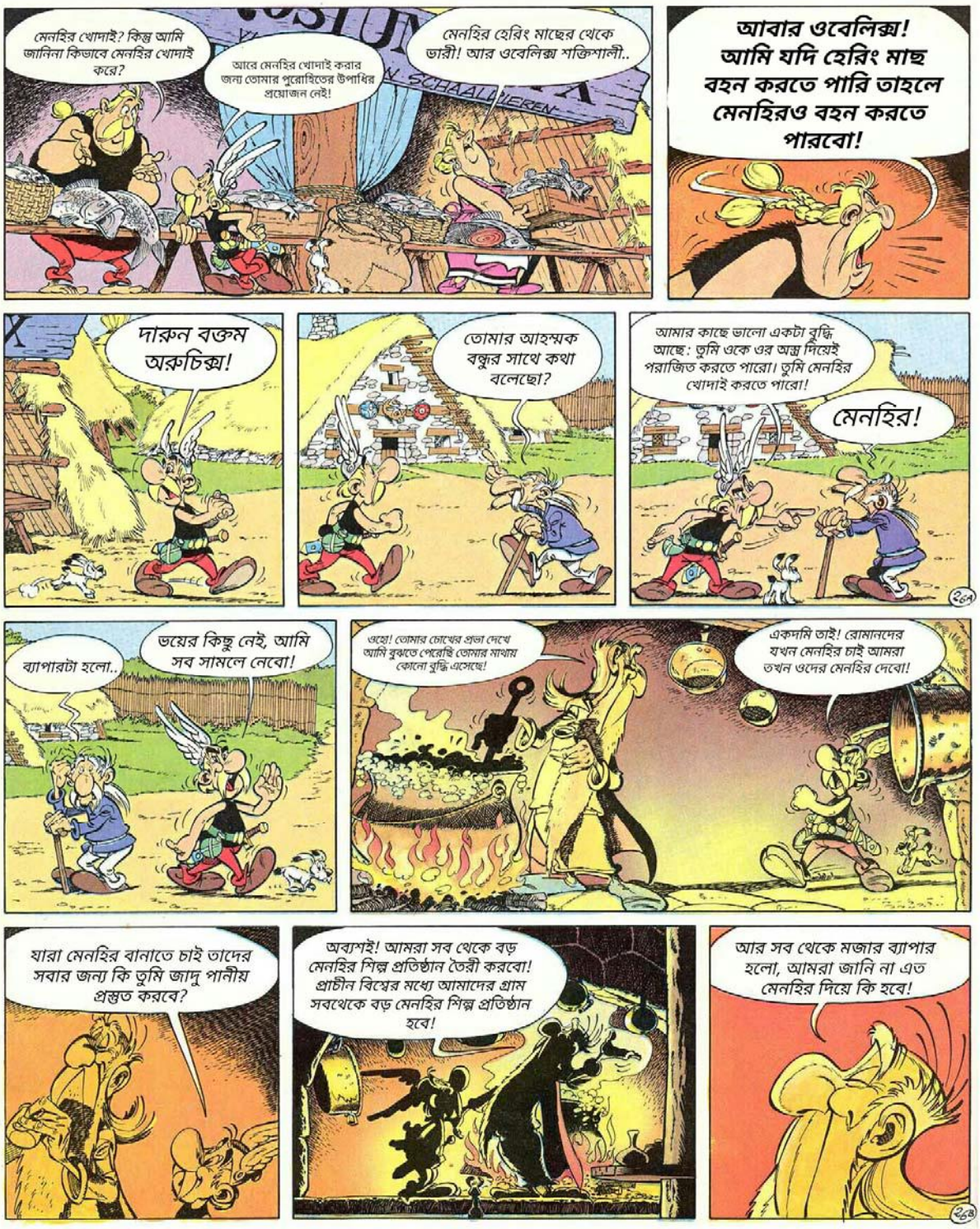
#


পম টিড়ি পম
খাবার তৈরী প্রিয়ে?
নিজের খাবার নিজে রান্না করে নাও! আমি ব্যস্ত!
কিসে ব্যস্ত?
ওবেলিক্স ওর জন্য আমায় জামাকাপড় তৈরী করতে বলেছে। এর বদলে ও দুমুঠো করে.....
আমার পড়ার জন্য একটাও ভালো কাপড় নেই! তোমার উপর ভরসা করে থাকলে এই জনমে আমায় আর কিছু কিনতে হবে না!
একটু পর...
এখন মোটকা ওবেলিক্স মেনহিরের ডাঁই তৈরী করছে আর আমারপত্নীকে দর্জি বানিয়ে দিয়েছে, এসব আমি সহ্য করবো না!
শান্ত হও! যাই হোক ওবেলিক্স আমার বন্ধু!
তোমার বন্ধুকে দেখে আমার পত্নীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে!
ও আমার দিকে ছাড়া কারোর দিকে তাকাতো না..এটা অবিশ্বাস্য!
হ্যাঁ আমি প্রায় এই বিষয়ে চিন্তা করি তো নিজে...
তো আমি এখন কি করবো?
কিছুই না। আমি ওবেলিক্সের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবো!
তুমি জলদি তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলো, না হলে তোমার বন্ধুর বদন আমি লাঠির ঘা দিয়ে বিগড়ে দেবো!

#


?!?
?!?
হাহাহাহা
হাহাহাহা !
ভৌ !
ভৌ !
হাসির কি হলো?
নিজের দিকে দ্যাখো ওবেলিক্স!
খারাপ না তাই না? বড় মেনহিরের ব্যবসায়ী এরকম পরিপাটি থাকে।
HARRY! HARRY!
হাস্যকর যত্তসব ব্যাপার স্যাপার
আমার তাড়া আছে..তোমার যদি ভালো লাগে তো কোনোদিন দুপুরে আমার সাথে খেতে এসো।
ওবেলিক্স! ওবেলিক্স! শুধু ওবেলিক্স! আমি অসুস্থ বোধ করছি ওবেলিক্স ওবেলিক্স শুনে!
তুমি ওবেলিক্সের নাম শুনে অসুস্থ বোধ করতে পারো কিন্তু ও এই গ্রামের সবথেকে প্রভাবশালী ব্যাক্তি।
মেনহিরের মত মাছের চাহিদা এরকম হলে তখন এই সব বলো
তুমি মেনহির কেন খোদাই করছো না?
?

#


মেনহির খোদাই? কিন্তু আমি জানিনা কিভাবে মেনহির খোদাই করে?
আরে মেনহির খোদাই করার জন্য তোমার পুরোহিতের উপাধির প্রয়োজন নেই!
মেনহির হেরিং মাছের থেকে ভারী! আর ওবেলিক্স শক্তিশালী..
আবার ওবেলিক্স! আমি যদি হেরিং মাছ বহন করতে পারি তাহলে মেনহিরও বহন করতে পারবো!
দারুন বক্তম অরুচিক্স!
তোমার আহম্মক বন্ধুর সাথে কথা বলেছো?
আমার কাছে ভালো একটা বুদ্ধি আছে: তুমি ওকে ওর অস্ত্র দিয়েই পরাজিত করতে পারো। তুমি মেনহির খোদাই করতে পারো!
মেনহির!
ব্যাপারটা হলো..
ভয়ের কিছু নেই, আমি সব সামলে নেবো!
ওহো! তোমার চোখের প্রভা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধি এসেছে!
একদমি তাই! রোমানদের যখন মেনহির চাই আমরা তখন ওদের মেনহির দেবো!
যারা মেনহির বানাতে চাই তাদের সবার জন্য কি তুমি জাদু পানীয় প্রস্তুত করবে?
অব্যশই! আমরা সব থেকে বড় মেনহির শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করবো! প্রাচীন বিশ্বের মধ্যে আমাদের গ্রাম সবথেকে বড় মেনহির শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে!
আর সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, আমরা জানি না এত মেনহির দিয়ে কি হবে!

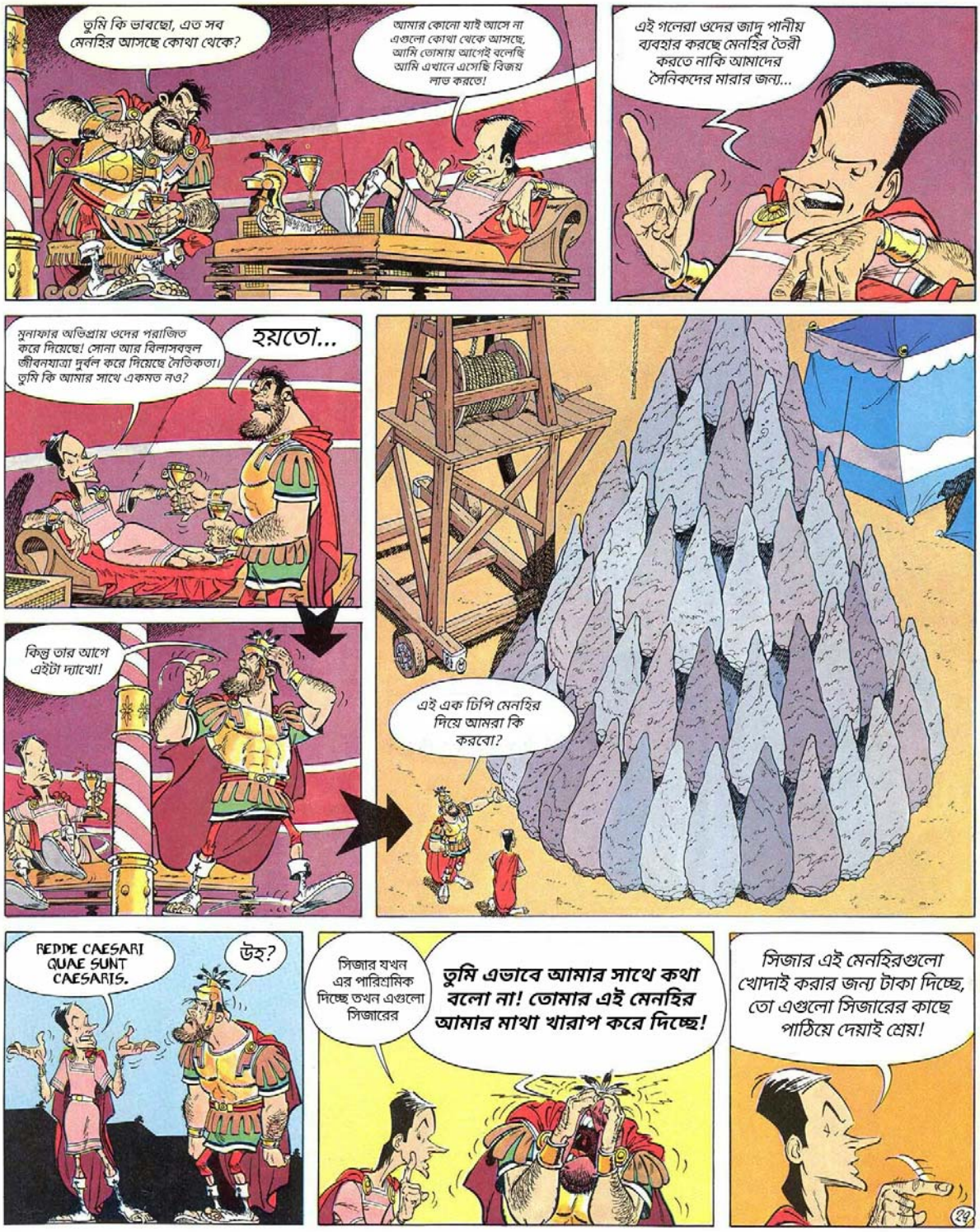
#


পরের দিন..
?
এটা কি?
অহ্ক নাকি! এটা একটা মেনহির!
তুমি এখন মেনহির সরবরাহ করছো?
অব্যশই! এটা হেরিং মাছের মতন হালকা।
তাই নাকি!
23A
বুদ্ধিক্স কোথায়?
মেনহির সরবরাহ করতে গেছে।
HOEFNIX
HOEFNIX
IJZERSTERKE MENHIRS
সরবরাহ করতে...কিন্তু আমি এখানকার একমাত্র.....
পথের বাইরে!
NESTORIX
HET ALOUDE ADRES VOOR UW MENHIRS
!?!
23B

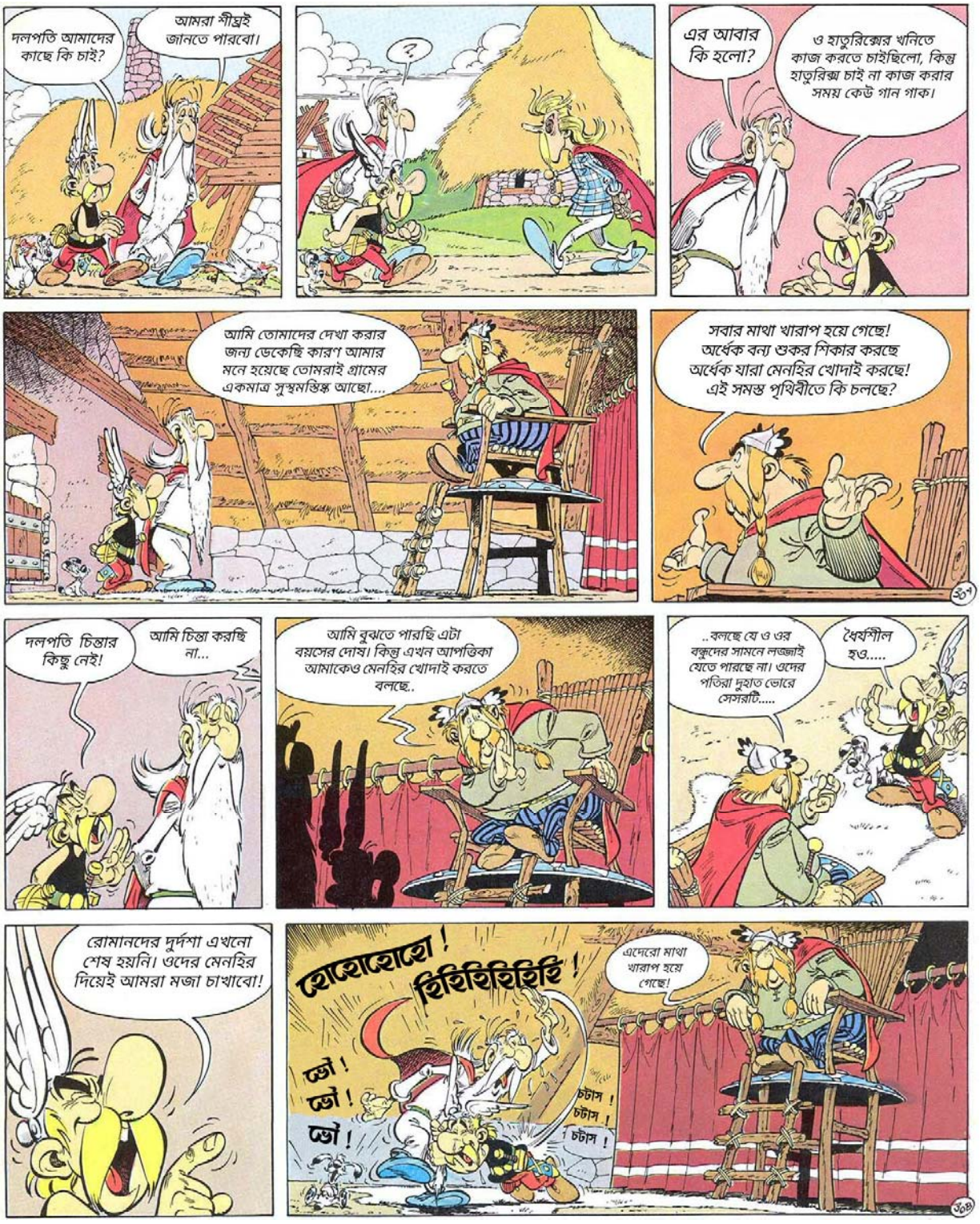
#


শুরুটা ভালোই হয়েছে!
তুমি এসব পারবে না, গিয়ে বলে দাও!
আরো একজন এলো!
তোমার সৈনিকদের মুখের ভাষা বিগড়ে যাচ্ছে!
যেদিন থেকে তুমি এসেছো আমার সৈনিকদের কথাবার্তা হাস্যকর হয়ে উঠেছে...
ওদের বোধবুদ্ধি কোনোদিনো ভালো ছিল না, তাও ওরা..
তুমি এখান থেকে মেনহির কিনতে পারবে, বুঝলে?
প্রকৃতপক্ষে হ্যাঁ! আমাদের নামাতে দিল শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক!
বৃদ্ধ? আমি তোমায় দেখাচ্ছি কে বৃদ্ধ, রোমান!
কোথায় রাখবো এগুলো?
?!?
সতর্ক থেকো! আরো একটা বাতিকগ্রস্ত লোক আসছে!
OBJIIIT!
KOSTUNRIX VERSE MENHIRS
এই মেনহিরের ব্যবসা আমায় পাগল করে দিলো!

#


তুমি কি ভাবছো, এত সব মেনহির আসছে কোথা থেকে?
আমার কোনো যাই আসে না এগুলো কোথা থেকে আসছে, আমি তোমায় আগেই বলেছি আমি এখানে এসেছি বিজয় লাভ করতে!
এই গলেরা ওদের জাদু পানীয় ব্যবহার করছে মেনহির তৈরী করতে নাকি আমাদের সৈনিকদের মারার জন্য...
মুনাফার অভিপ্রায় ওদের পরাজিত করে দিয়েছে! সোনা আর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দুর্বল করে দিয়েছে নৈতিকতা। তুমি কি আমার সাথে একমত নও?
হয়তো...
কিন্তু তার আগে এইটা দ্যাখো!
এই এক টিপি মেনহির দিয়ে আমরা কি করবো?
REDDE CAESARI QUAE SUNT CAESARIS.
উহ?
সিজার যখন এর পারিশ্রমিক দিচ্ছে তখন এগুলো সিজারের
তুমি এভাবে আমার সাথে কথা বলো না! তোমার এই মেনহির আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে!
সিজার এই মেনহিরগুলো খোদাই করার জন্য টাকা দিচ্ছে, তো এগুলো সিজারের কাছে পাঠিয়ে দেয়াই শ্রেয়!

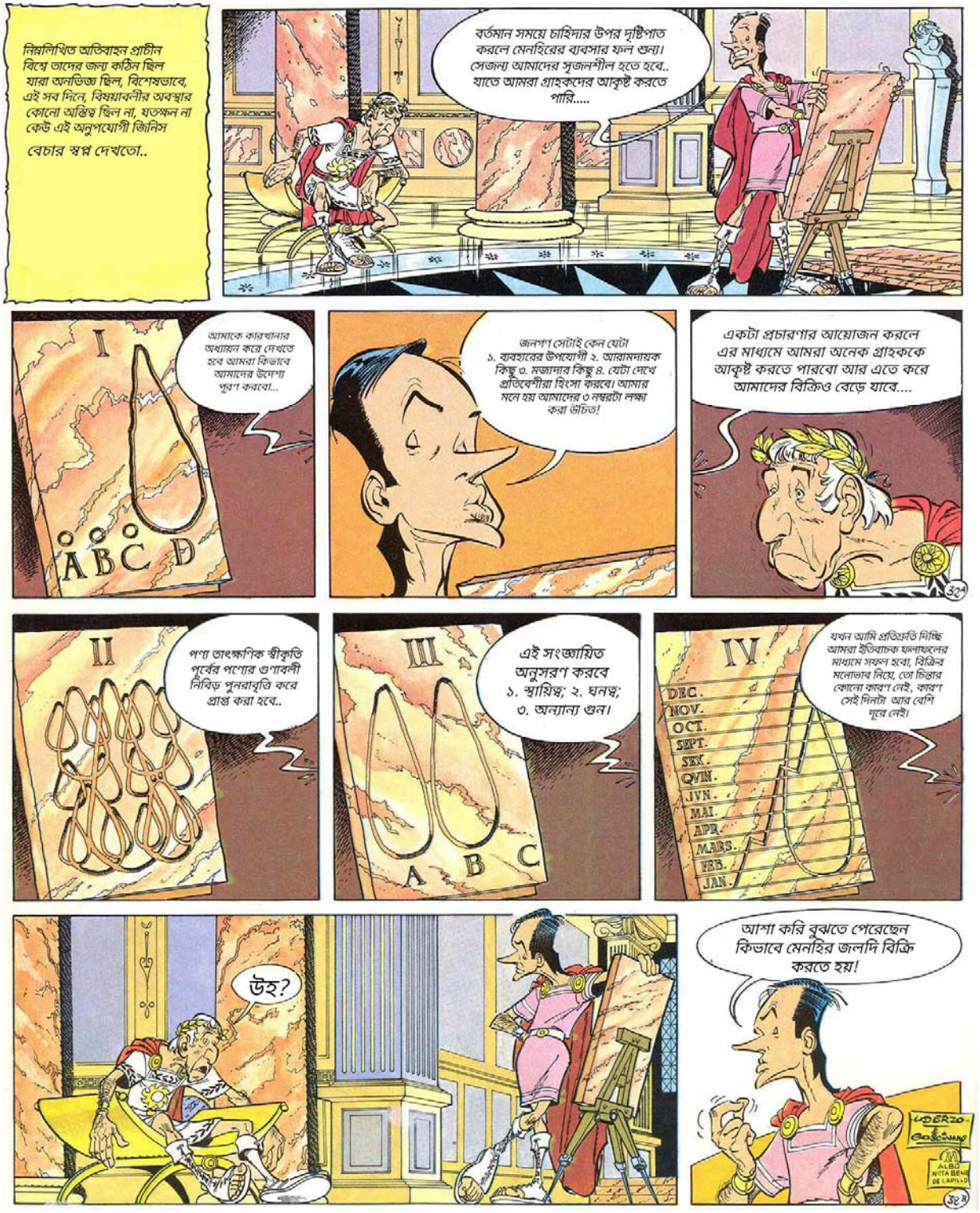
#


দলপতি আমাদের কাছে কি চাই?
আমরা শীঘ্রই জানতে পারবো।
?
এর আবার কি হলো?
ও হাতুরিক্সের খনিতে কাজ করতে চাইছিলো, কিন্তু হাতুরিক্স চাই না কাজ করার সময় কেউ গান গাক।
আমি তোমাদের দেখা করার জন্য ডেকেছি কারণ আমার মনে হয়েছে তোমরাই গ্রামের একমাত্র সুস্থমস্তিষ্ক আছো....
সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! অর্ধেক বন্য শুকর শিকার করছে অর্ধেক যারা মেনহির খোদাই করছে! এই সমস্ত পৃথিবীতে কি চলছে?
দলপতি চিন্তার কিছু নেই!
আমি চিন্তা করছি না...
আমি বুঝতে পারছি এটা বয়সের দোষ। কিন্তু এখন আপত্তিকা আমাকেও মেনহির খোদাই করতে বলছে..
..বলছে যে ও ওর বন্ধুদের সামনে লজ্জাই যেতে পারছে না। ওদের পত্নিরা দুহাত ভোরে সেসরাটি.....
ধৈর্যশীল হও.....
রোমানদের দুর্দশা এখনো শেষ হয়নি। ওদের মেনহির দিয়েই আমরা মজা চাখাবো!
হোহোহোহো!
হিহিহিহিহিহি!
এদেরো মাথা খারাপ হয়ে গেছে!
ভৌ!
ভৌ!
ভৌ!
চটাস!
চটাস!
চটাস!

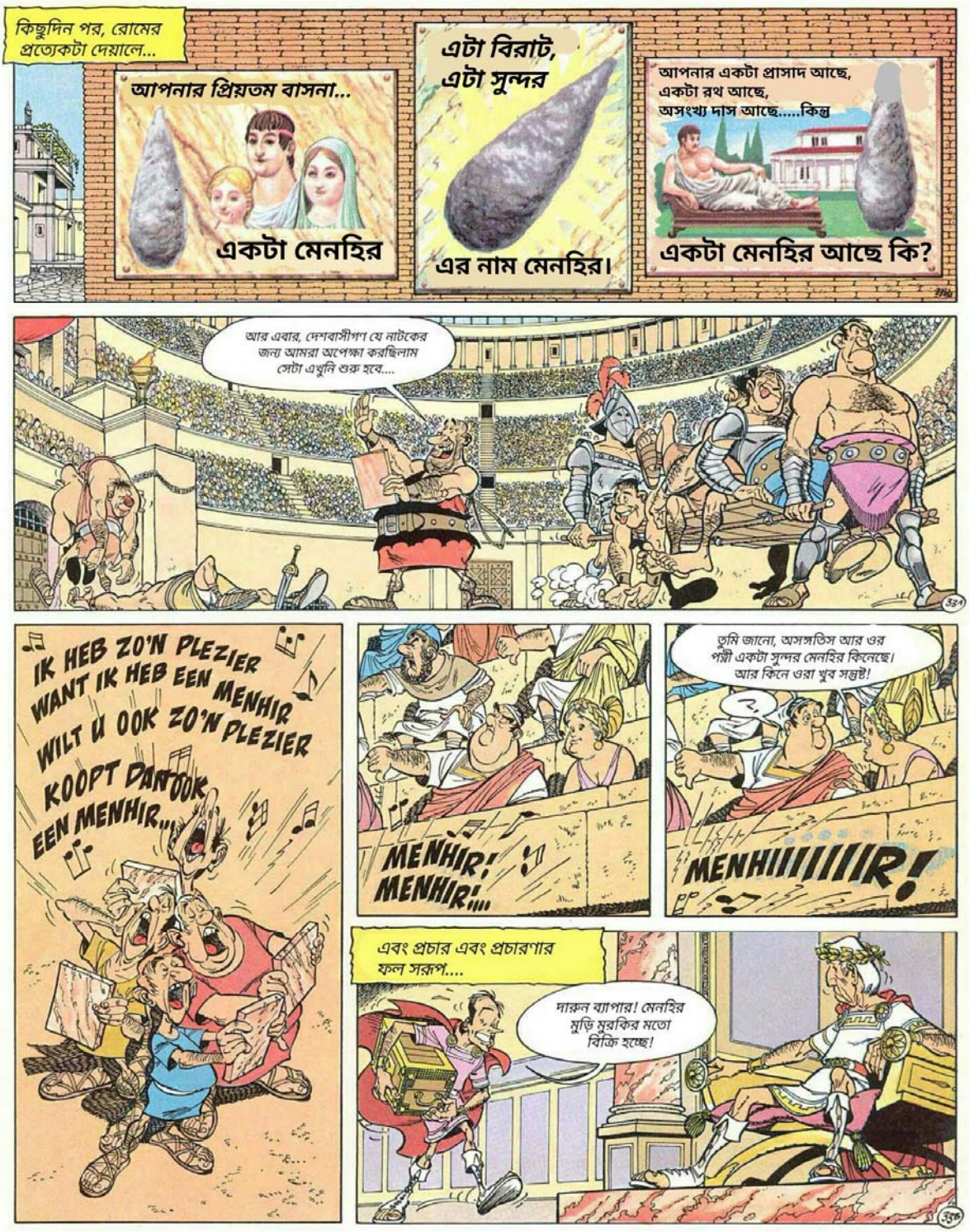
#


রোমে জুলিয়াস সিজারের প্রাসাদে..
আর আমি এত সব মেনহির দিয়ে কি করবো?
কিন্তু সিজার এটা আমার সাফল্যের প্রমান! গলেরা মারপিটের থেকে মেনহির খোদায়ে ব্যস্ত, তো....
হতে পারে, কিন্তু তোমার জন্য আমার কোষাগার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ওই পাগলগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্য!
শান্তি সব মূল্যের থেকে অনেক বড়.. SI VIS PACEM.....
যুবক ছোকরা, আমি এখানে প্রায় শাস্ত্রীয় মন্তব্য করি, ALEA JACTA EST আর ওই সব, আর কি, তুমি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি: আমি এত সব মেনহির দিয়ে কি করবো?
বিক্রি করে দিন, সিজার।
বিক্রি করবো?
একদম ঠিক, এভাবে আপনি আপনার খরচ থেকে মুনাফা উদ্ধার করতে পারবেন।
কিন্তু মেনহির কে কিনবে? এগুলো কোনো কাজে আসে না!
সঠিকভাবে! আমাদের প্রচারণার একটা পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য! যাতে করে আমরা লক্ষ্য স্থির করতে পারি!
প্রচারণা? পদক্ষেপ? লক্ষ্য? এই সবই আমি শুনতে চাইছিলাম! আমি আমার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলবো!
না! না! আমাকে বিস্তারিত বলতে দিন.....

#


নিম্নলিখিত অতিবাহন প্রাচীন বিশ্বে তাদের জন্য কঠিন ছিল যারা অনভিজ্ঞ ছিল, বিশেষভাবে, এই সব দিনে, বিষয়াকলীর অবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, যতক্ষন না কেউ এই অনুপযোগী জিনিস
বেচার স্বপ্ন দেখতো..
বর্তমান সময়ে চাহিদার উপর দৃষ্টিপাত করলে মেনহিরের ব্যবসার ফল শুন্য। সেজন্য আমাদের সৃজনশীল হতে হবে.. যাতে আমরা গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে পারি.....
I
A B C D
আমাকে কারখানার অধ্যায়ন করে দেখতে হবে আমরা কিভাবে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবো...
জনপণ্য সেটাই কেন যেটা ১. ব্যবহারের উপযোগী ২. আরামদায়ক কিছু ৩. মজাদার কিছু ৪. যেটা দেখে প্রতিবেশীরা হিংসা করবে। আমার মনে হয় আমাদের ৩ নম্বরটা লক্ষ্য করা উচিত!
একটা প্রচারণার আয়োজন করলে এর মাধ্যমে আমরা অনেক গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে পারবো আর এতে করে আমাদের বিক্রিও বেড়ে যাবে....
324
II
পণ্য তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি পূর্বের পণ্যের গুণাবলী নিবিড় পুনরাবৃত্তি করে প্রাপ্ত করা হবে..
III
A B C
এই সংজ্ঞায়িত অনুসরণ করবে ১. স্থায়িত্ব; ২. ঘনত্ব; ৩. অন্যান্য গুন।
IV
DEC.
NOV.
OCT.
SEPT.
SEX.
QVIN.
JVN.
MAI.
APR.
MARS.
FEB.
JAN.
যখন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা ইতিবাচক ফলাফলের মাধ্যমে সফল হবো, বিক্রির মনোভাব নিয়ে, তো চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ সেই দিনটা আর বেশি দূরে নেই!
উহ?
আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে মেনহির জলদি বিক্রি করতে হয়!
ALBO NOTA BENE DE LAPILLI
324

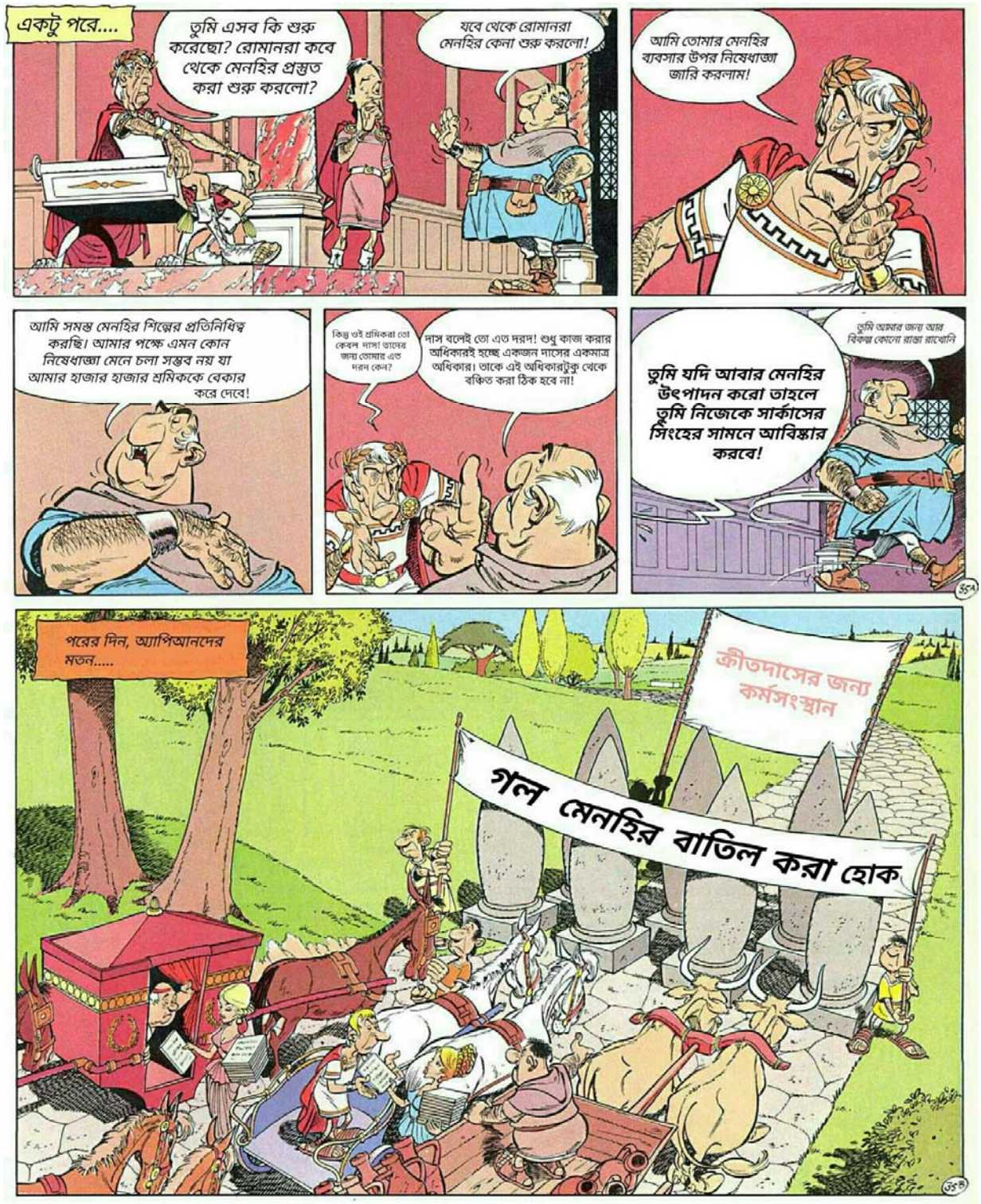
#


কিছুদিন পর, রোমের প্রত্যেকটা দেয়ালে...
আপনার প্রিয়তম বাসনা...
একটা মেনহির
এটা বিরাট, এটা সুন্দর
এর নাম মেনহির।
আপনার একটা প্রাসাদ আছে, একটা রথ আছে, অসংখ্য দাস আছে.....কিন্তু
একটা মেনহির আছে কি?
আর এবার, দেশবাসীগণ যে নাটকের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম সেটা এখুনি শুরু হবে....
IK HEB ZO'N PLEZIER WANT IK HEB EEN MENHIR WILT U OOK ZO'N PLEZIER KOOPT DAN OOK EEN MENHIR...
MENHIR! MENHIR!!!
তুমি জানো, অসঙ্গতিস আর ওর পত্নী একটা সুন্দর মেনহির কিনেছে। আর কিনে ওরা খুব সন্তুষ্ট!
MENHIIIIIIR!
এবং প্রচার এবং প্রচারণার ফল স্বরূপ....
দারুন ব্যাপার! মেনহির মুড়ি মুরকির মতো বিক্রি হচ্ছে!

#


আমি আরো কিছু বুদ্ধি বার করেছি সিজার!
আলখাল্লা!
সূর্যঘড়ি!
মনিরত্ন!
আর এটা হলো নিজে মেনহির খোদাই করার সামগ্রী!
আমরা গলদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছি, ধন্যবাদ ওদের আমরা একটা বাস্তবিক হত্যা করতে চলেছি!
জুপিটারের নামে, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট!
টেকসই মেনহির বানানো আমাদের কর্তব্য, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে গেলে এটা আমাদের ব্যবসার ক্ষতি, আর....
সিজার!
পুরো রোমের দেয়ালে এটা ঝুলছে!
?!
খাঁটি রোমান মেনহির আমদানি মেনহিরের থেকে সস্তা
রোমান মেনহির কিনুন
চটকদারস মেনহির প্রস্তুতকারক
কেউ গিয়ে এই চটকদারস কে খুঁজে বার করো!

#


একটু পরে....
তুমি এসব কি শুরু করেছো? রোমানরা কবে থেকে মেনহির প্রস্তুত করা শুরু করলো?
যবে থেকে রোমানরা মেনহির কেনা শুরু করলো!
আমি তোমার মেনহির ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলাম!
আমি সমস্ত মেনহির শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমার পক্ষে এমন কোন নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা সম্ভব নয় যা আমার হাজার হাজার শ্রমিককে বেকার করে দেবে!
কিন্তু ওই শ্রমিকরা তো কেবল দাস! তাদের জন্য তোমার এত দরদ কেন?
দাস বলেই তো এত দরদ! শুধু কাজ করার অধিকারই হচ্ছে একজন দাসের একমাত্র অধিকার। তাকে এই অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না!
তুমি যদি আবার মেনহির উৎপাদন করো তাহলে তুমি নিজেকে সার্কাসের সিংহের সামনে আবিষ্কার করবে!
তুমি আমার জন্য আর বিকল্প কোনো রাস্তা রাখোনি
পরের দিন, অ্যাপিআনদের মতন.....
ক্রীতদাসের জন্য কর্মসংস্থান
গল মেনহির বাতিল করা হোক

#


হে সিজার, রোমানরা নিজেদের তৈরী মেনহির কিনতে চাইছে, এই অবস্থায় আপনার উচিত..
তুমি আমার কাছ থেকে কি আশা করো! এই ফালতু মেনহিরের জন্য নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করবো!
আমাদের সমস্যা হচ্ছে শুধু গলদের মেনহির নামাতে..
আমাদের আক্রমণাত্মক ভাবে কথা বলতে হবে...
আমার সৈন্যবাহিনীকে তলব করো!
না না, আমি আক্রমণাত্মক ভাবে মুদ্রাস্ফীতির যুদ্ধের কথা বলেছি! আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে..দাম কমিয়ে..
মূল্যহ্রাস মূল্যহ্রাস গলিশ মেনহিরের
রোমান মেনহির একটির দামে দুটো নিন
আরো বড় আরো ভালো আরো সস্তা সুপার ডিলাক্স রোমান মেনহির
গলিশের মেনহির কিনুন বিনামূল্যে দুটো দাস নিন স্টক সীমিত
ইজিপ্টের মেনহির কিনে দেখেছেন
দাম পড়ে যাচ্ছে! ইজিপ্ট, গ্রিক আর ফিনিশীয় ওদের মেনহিরের ব্যবসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে!
যথেষ্ট হওয়ার পর..
আমি বলেছিলাম এই লুটপাট আমাদের জলে ডুবিয়ে ছাড়বে!
আমি ভেবেছিলাম এখনকার মেনহিরগুলো জলে ভাসে....
তাই নাকি, সব মেনহির এখন জলের তলায়।

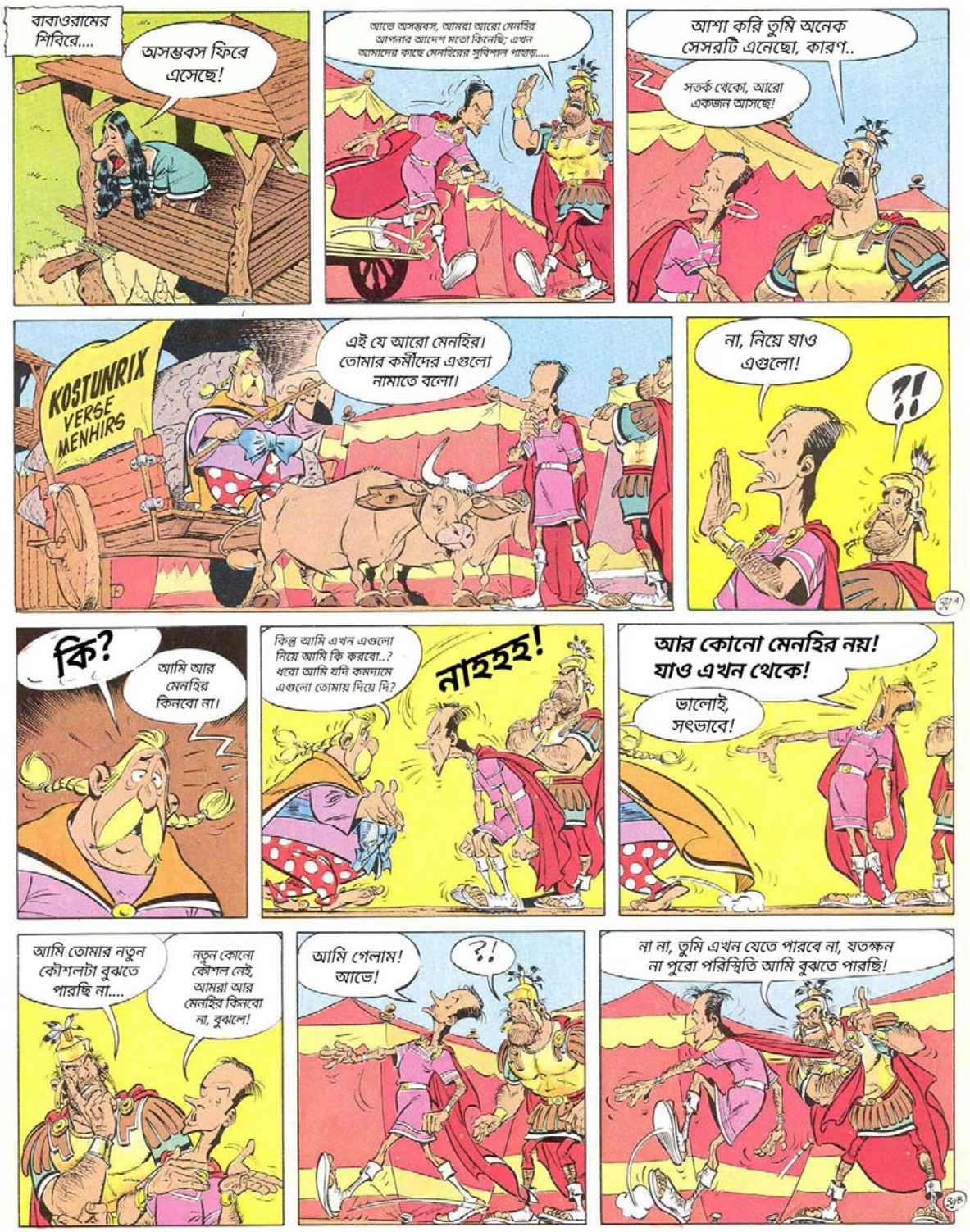
#


রোমে, মেনহির ব্যবসা পরে যাওয়ার পর।
প্রতিটি দাস কেনার সাথে দুটি করে মেনহির একদম বিনামূল্যে
মানুষজন এর সাথে বিনামূল্যে উপহার দেওয়া সত্ত্বেও আর আকৃষ্ট হচ্ছে না...এটা খুব খারাপ হলো! আমার ভাগ্যটাই খারাপ...
ব্যাপারটা হলো..
হ্যাঁ?
ব্যাপারটা অনেকটা..
আমি গলদের সাথে শান্তি চাই, আমি যাওয়ার আগে আদেশ দিয়েছিলাম সব মেনহির কিনে নেবো...
তুই অর্থনীতির কি বুঝিস? আর এই তোর আক্রমণাত্মক বুদ্ধি! গলে গিয়ে এসব বন্ধ করতে বল!!!
আপনি যদি আমার বদলে অন্য কাউকে পাঠানো পছন্দ করেন, আমার একটা বন্ধু আছে আমরা একসাথে ব্যবসাই বিদ্যালয়ে ছিলাম, সে..
আহম্মক তুই নিজে ওখানে যাবি! তোর জন্য এখানে গৃহযুদ্ধ হতে যাচ্ছিল! তুই রোমকে ছারখার করে দিয়েছিস! এমনকি ব্রুস আমার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল!
কিন্তু..কিন্তু ওরা আমায় মেরে ফেলবে!
এতে আমায় কিছু যাই আসে না!
যাই হোক তুই যদি না যাস তাহলে আমি তোকে সিংহ দিয়ে খাওয়াবো!
MENHIRKERKHOF

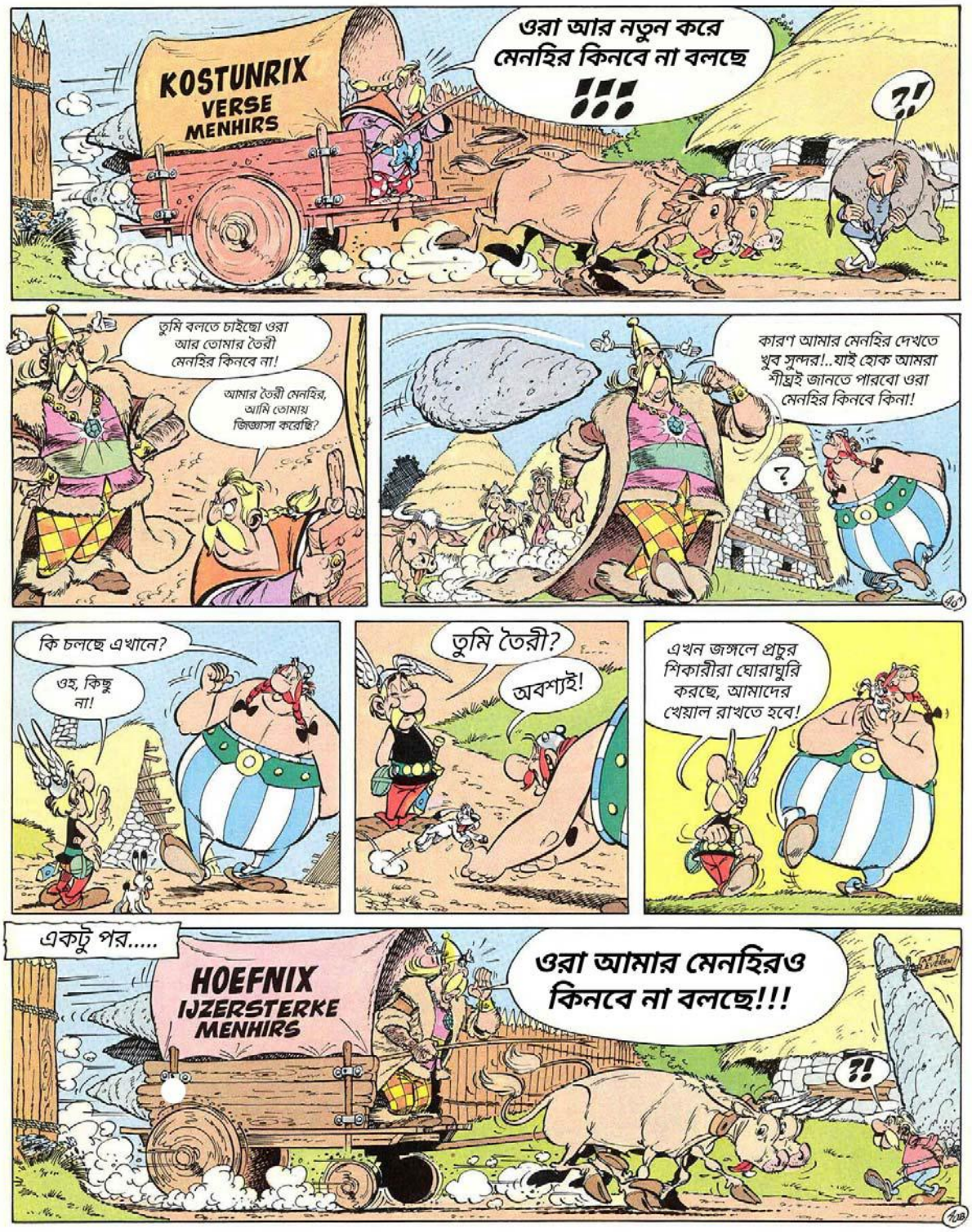
#


বিশ্বের মেনহির সঙ্কট তখনো আমাদের গল গ্রামকে প্রভাবিত করেনি....
অ্যাসটেরিক্স! গোঁয়াতুর্মিক্স!
?!
শোনো..আমি তোমার সাথে শুকর শিকারে যেতে পারি?
কি, তুমি না প্রভাবশালী ব্যাক্তি? তুমি না সম্মেলনে ব্যস্ত?
দয়া করে আমায় আর লজ্জা দিয়ো না, আমি জানি আমি বোকা ছিলাম। যথেষ্ট হয়েছে আর আমি ক্লান্ত, প্রত্যেকেই যথেষ্ট সেসরটি কমিয়ে নিয়েছে আর এই গ্রামে এখন সবাই প্রভাবশালী ব্যাক্তি!
আমি আবার তোমার বন্ধু হতে চাই! একসাথে শিকারে যেতে চাই! একসাথে মজা করতে চাই....
বুহুহু!
তুমি আবার আমার সাথে শিকারে যেতে চাও?
স্নিফ.. হুমফ?
আমি এখুনি আসছি!
হিঃহিঃ!

#


বাবাওরামের শিবিরে....
অসম্ভবস ফিরে এসেছে!
আভে অসম্ভবস, আমরা আরো মেনহির আপনার আদেশ মতো কিনেছি; এখন আমাদের কাছে মেনহিরের সুবিশাল পাহাড়.....
আশা করি তুমি অনেক সেসরটি এনেছো, কারণ..
সতর্ক থেকো, আরো একজন আসছে!
KOSTUNRIX VERSE MENHIRS
এই যে আরো মেনহির। তোমার কর্মীদের এগুলো নামাতে বলো।
না, নিয়ে যাও এগুলো!
?!
কি?
আমি আর মেনহির কিনবো না।
কিন্তু আমি এখন এগুলো নিয়ে আমি কি করবো..? ধরো আমি যদি কমদামে এগুলো তোমায় দিয়ে দি?
নাহহহ!
আর কোনো মেনহির নয়! যাও এখন থেকে!
ভালোই, সৎভাবে!
আমি তোমার নতুন কৌশলটা বুঝতে পারছি না....
নতুন কোনো কৌশল নেই, আমরা আর মেনহির কিনবো না, বুঝলে!
আমি গেলাম! আভে!
?!
না না, তুমি এখন যেতে পারবে না, যতক্ষন না পুরো পরিস্থিতি আমি বুঝতে পারছি!

#


KOSTUNRIX
VERSE
MENHIRS
ওরা আর নতুন করে মেনহির কিনবে না বলছে
!!!
?!
তুমি বলতে চাইছো ওরা আর তোমার তৈরী মেনহির কিনবে না!
আমার তৈরী মেনহির, আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি?
কারণ আমার মেনহির দেখতে খুব সুন্দর!..যাই হোক আমরা শীঘ্রই জানতে পারবো ওরা মেনহির কিনবে কিনা!
?
কি চলছে এখানে?
ওহ, কিছু না!
তুমি তৈরী?
অবশ্যই!
এখন জঙ্গলে প্রচুর শিকারীরা ঘোরাঘুরি করছে, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে!
একটু পর.....
HOEFNIX
IJZERSTERKE
MENHIRS
ওরা আমার মেনহিরও কিনবে না বলছে!!!
?!

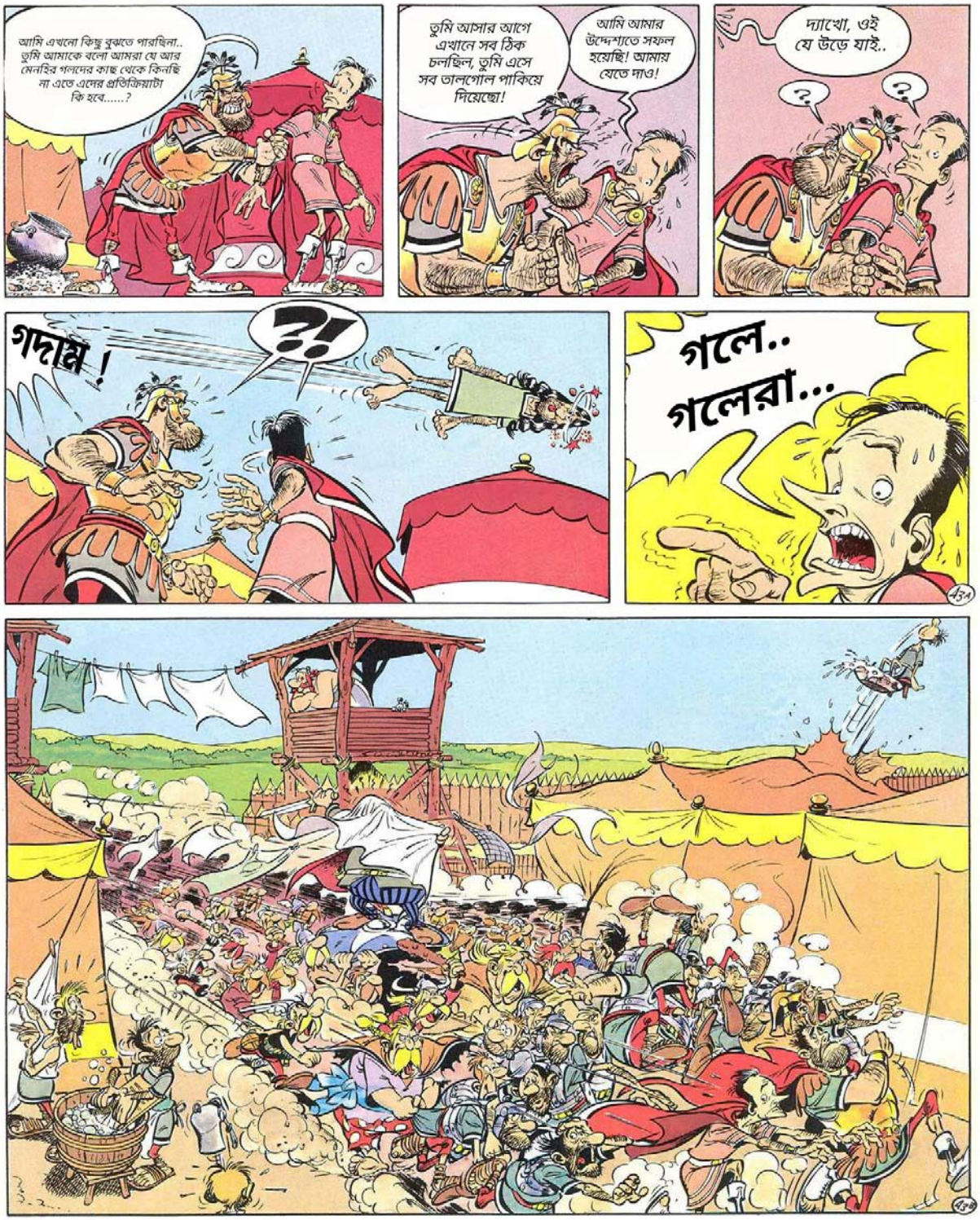
#


ওই রোমান বলছিল ওরা জীবনে আর কোনো মেনহির দেখতে চাই না!
হো!
কিন্তু..কিন্তু তাহলে আমি কি করবো! আমার কর্মীদের বেতন দেবো কি করে!
শুনে খুশি হলাম! আমি আবার আমার ঢাল বাহকদের ফিরে পাবো!
দ্যাখো!
ওবেলিক্স মেনহির খোদাই করা বন্ধ করে দিয়েছে!
তার মানে ও জানতো রোমানরা মেনহির কেনা বন্ধ করে দিয়েছে..তাও ও আমাদের সাবধান করে দেয়নি!
আর ওই আমাদের গ্রামে মেনহিরের হুজুগ তুলেছিলো!
ও একটা বিশ্বাসঘাতক!
এসব সব ওর দোষ!
ওকে একটা শিক্ষা দিতে হবে!
অ্যাসটেরিক্স এটা একটু ধরো দেখি?
দাও!
আমার সাথে আয় গোঁয়াতুর্মিক্স!
গররররররর!

#


গ্রামকে পুরোনো রূপে ফিরে আসতে দেখে ভালো লাগছে!
এটাই তো আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য!
তোমার বুদ্ধিটা খুব ভালো ছিল!
হ্যাঁ এখন আমরা শুধু দর্শক!
থামো! আমার কথাটা আগে শোনো!
তোমাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু তোমরা নিজেদের মধ্যে মারপিট না করে রোমানদের মারতে পারো, কারণ এই সব রোমানদের জন্যই শুরু হয়েছে!
হুহ!
ও ঠিকি বলেছে!
জন্মদিনের উপহারের জন্য আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিতে চাই, তাই আমি রোমানদের তোমাদের দিচ্ছি
তোমার এই ব্যাপারে কি মত, বিশালাকৃতিক্স?
তুতের নামে, সরাও এটা আমার উপর থেকে!

#


আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছিনা.. তুমি আমাকে বলো আমরা যে আর মেনহির গলদের কাছ থেকে কিনছি না এতে এদের প্রতিক্রিয়াটা কি হবে.....?
তুমি আসার আগে এখানে সব ঠিক চলছিল, তুমি এসে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছো!
আমি আমার উদ্দেশ্যতে সফল হয়েছি! আমায় যেতে দাও!
দ্যাখো, ওই যে উড়ে যাই..
?
?
গদাম !
?!
গলে..
গলেরা...

#


ওদের আক্রমন সমাপ্ত হয়েছে! পরিত্রান এখন, তাই নয় কি?
ডুনো! এত কিছু হওয়ার পর আমাদের কর থেকে পরিত্রান দেওয়া উচিত....
এবার শান্তি হয়েছে গাধা?
আমাদের সব বন্ধুরা সেসরটিতে পরিপূর্ণ.. ওরা এখন এগুলো দিয়ে কি করবে?
বেশি না...
রোমে এখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, যদিও আমি এর কারণ জানি না। যাই হোক ওরা এখন সেসরটির মূল্যহ্রাস করবে!
উহ?
এক টিপি মেনহির ওদের এবার মূল্য চুকাতে হবে!
এই সমস্ত জটিল সমস্যা দ্রবীভূত হলো তারাভরা আকাশের নিচে, যেমন সূর্যের উত্তাপে বরফ গলে যাই, আর পুনরায় বন্ধুত্বের খুশিতে সবাই তাদের পরম্পরাগত ভোজসভায় মেতে উঠলো....
সমাপ্ত
বাংলা অনুবাদ - সাওন দত্ত
UDERZO & GOSCINNY

#

লেখক পরিচিতিঃ সাওন দত্তের জন্ম কৃষ্ণনগরে। পড়াশুনা কৃষ্ণনগর সি. এম. এস সেন্ট জনস উচ্চবিদ্যালয়ে। বর্তমানে কলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। প্রাচীন ইতিহাস ও কল্পবিজ্ঞান নিয়ে উৎসাহী। নতুন ও অজানা বিষয় জানতে ভালোবাসে।

#

মনসামঙ্গল এবং একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান

রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

একসময় প্রায় গোটা বঙ্গভূমি বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল। এখনও বাঙ্গালীদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু রেশ রয়ে গেছে। এক সময় বাঙ্গালার সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ বেশ ভাল ছিল। উল্লেখ্য তিব্বতীগণ ভারত থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে যে সব বৌদ্ধশাস্ত্র বিলুপ্ত, তার বেশ কিছু তিব্বতী ভাষান্তর পাওয়া যায়। গবেষকগণ বঙ্গভূমিতে সর্পপূজার প্রচলনের পিছনে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা বলেন। কিন্তু বঙ্গভূমি নদীবহুল দেশ হওয়ায় সাপের উপদ্রব তিব্বতের থেকে অনেক বেশী। সে যাই হোক, এখন তিব্বতী ভাষায় লেখা বহু বৌদ্ধ উপাখ্যানের ইংরাজী ভাষান্তর পাওয়া যাওয়ায় গবেষকদের বেশ সুবিধা হয়েছে। প্রায় সমান্তরাল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি বোঝা যাচ্ছে।

বিশেষ একটি বৌদ্ধ উপাখ্যানের সঙ্গে মনসামঙ্গলের আপাতসাদৃশ্য থাকায় সেটির এখানে তুলে ধরা হল।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য কুন-ডা-নিন-পো (আনন্দ গর্ভ)। তিনি তারানাথ নামে বেশি পরিচিত। তিনি জন্মে ছিলেন ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে বিখ্যাত 'কা-গর-চোস-বুন' (ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস) গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। ইতিহাসটি তিব্বতে পরে 'কার্য-কাম-সর্ব-প্রবৃত্তি নাম' বলে পরিচিত হয়।

এই বৌদ্ধ উপাখ্যানটি তারানাথের লেখা গ্রন্থ থেকে নেওয়া। ইংরাজী অনুবাদ করেছেন লামা চিমপা ও অলকা চট্টোপাধ্যায়। তারানাথের গ্রন্থ সমাপ্তির বছর এবং কাহিনীর পটভূমি দেখলে মনে হয় তিনি হয়তো মনসামঙ্গলের কাহিনী শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার হতেও পারে যে তারানাথের সর্প-উপাখ্যানের উৎস এক সময় বহুল প্রচারিত কিন্তু অধুনালুপ্ত কোনও লৌকিক কাহিনী। এই বিষয়ে নতুন গবেষণার প্রয়োজন আছে।

তারানাথের কাহিনী বাঙ্গালার মনসামঙ্গলের মত মিলনান্তক নয়, বিয়োগান্তক। মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় চরিত্র বণিক কিন্তু তারানাথের কাহিনীতে ব্রাহ্মণ। কাহিনীর ভাবানুবাদ মনে হয় বাঙ্গালায় এই প্রথম প্রকাশিত হল।

জীবনের শেষ দিকে পূর্ব দিকে অবস্থিত ওডিভিশা (আধুনিক ওড়িশার অংশ?) রাজ্যের রাজা বুদ্ধপক্ষ, সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের ওপর রত্নগিরি নামক এক মন্দির (মঠ) নির্মাণ করান। তিনি মহাযানী ও হীনযানী বৌদ্ধশাস্ত্রগুলোর তিনটি অনুলিপি করে ওই মঠে রেখেছিলেন। তিনি ওখানে বৌদ্ধ মতবাদ শিক্ষার আটটি বিশাল কেন্দ্র গড়ে তুলে পাঁচশ ভিক্ষু প্রতিপালন করতেন।

রাজার দেখাদেখি তাঁর মন্ত্রী বৃহস্পতি নামক এক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালার কাছে সমুদ্র উপকুলে একটি পাহাড়ের ওপর একই ধাঁচে দেবগিরি নামক একটি মঠ নির্মাণ করান। (ভৌগলিক অবস্থানে মনে হয় চট্টগ্রাম বা এর কাছাকাছি)। এই মঠেও বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুলিপি রেখে শঙ্কু নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রী মঠে উপাসনার

#

উপকরণ যোগাতেন আর বুদ্ধপক্ষের রাণী আবাসিক ভিক্ষু ও সঙ্ঘের ভরণপোষণ করতেন। এই শঙ্কু উপাখ্যানটির কেন্দ্রীয় চরিত্র।

ধনী ব্রাহ্মণ সারো, সাত ভাই ও পরিবার নিয়ে মগধ ও বাঙ্গালার মধ্যবতী পুণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চলে বাস করতেন। সারো মহাদেবের পূজক ছিলেন।[১] তিনি তন্ত্রমন্ত্র শিখে নাগদের বশ করার চেষ্টা করেছিলেন। নাগেরা বশ মানল না বরং সারো সহ সাতভাই পরিবারসমেত সাপের কামড়ে মারা গেলেন।[২] সারোর আত্মীয়রা তার একমাত্র ছেলে শঙ্কুকে বাঁচানোর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। একটা সুরক্ষিত বাড়ি তৈরি করে সেখানে শঙ্কুকে রাখা হল। সাপের উপদ্রব ঠেকানোর জন্য প্রচুর বেজি আর পোষা ময়ূর বাড়ির নিচতলায় আর ছাদে পাহারাদারি করতে লাগল। 'শেলা' সাপ মারে। (এক ধরণের পাহাড়ী জন্তু। সঠিক নাম বোঝা যায়নি। এক জাতীয় শেয়াল হতেও পারে) বাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো 'শেলা' ছেড়ে রাখা হল। সারোর আত্মীয়রা নাগদের দমন করার জন্য বাড়িতে অনেক তান্ত্রিক উপকরণও জমা করেছিলেন। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। নাগেরা হঠাৎ একদিন সেখানে এসে 'ফুট' মন্ত্র উচ্চারণ করতেই ময়ূরগুলো ভয়ে পালিয়ে যায়। নাগজাদুতে উঠে আসা ভীষণ ঝড়ের দাপটে শেলাজন্তুরা গর্তে লুকিয়ে পড়ে। তখন একটা লিকলিকে সাপ বাড়ির এক কোণ বেয়ে উঠে শঙ্কুকে কামড়ে মেরে ফেলে।[৩] শঙ্কুর বউ স্বামীর মৃতদেহ একটা ছোট ভেলায় তুলে 'কে আমার স্বামীকে বাঁচাবে' বলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মৃতদেহ নিয়ে তিনদিন গঙ্গায় ভেসে চলেন।[৪] নদীতীরের রাখালরা শঙ্কুর স্ত্রীকে টিটকারি দিতে থাকে।[৫] তার দুঃখে বিচলিত হয়ে এক মহিলা আবির্ভূতা হন। তিনি মৃতদেহে একটু মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলে শঙ্কু বেঁচে ওঠে।[৬]

বাড়ি ফিরে শন্কু জানল, সাতদিন আগে তার মৃত্যু হওয়ায় সব জিনিসপত্র আত্মীয়দের (ব্রাহ্মণদের) মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ফাঁকা বাড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে তার সবকিছু অবিশ্বাস্য ভোজবাজি মনে হচ্ছিল। প্রথমে সে খুব ভয় পেল। পরে সবকিছু বুঝতে পেরে আনন্দিত হল। তারপর প্রাণপণে সর্পবশীকরণ মন্ত্র শেখার চেষ্টা করতে লাগল। মন্ত্রের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। ক্ষেতে কাজ করতে এক চাষী মা তার বাচ্চা ছেলে নিয়ে এসেছে। চাষী মা মন্ত্র উচ্চারণ করায় কোথা থেকে একটা একটা সাপ এসে ছেলেটার পায়ের আঙ্গুলে কামড়ে তাকে মেরে ফেলল। চাষী মার কাজ শেষ হওয়ার পর আবার একটা সাপ এসে ছেলেটার ক্ষতস্থান চুষে তাকে বাঁচিয়ে তুলল। শঙ্কু বুঝল চাষী মা আসলে ডাকিনী (বৌদ্ধ তন্ত্রে ডাকিনীরা অশুভ নয়। তারা ডাক বা জ্ঞানী পুরুষের সমকক্ষ। ডাকিনীরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্না এবং বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষা দেবার অধিকারিণী। আদি মধ্যযুগের পূর্বভারতে বৌদ্ধতন্ত্রের কেন্দ্রগুলোতে ডাকিনীদের উপস্থিতির কথা জানা যায়।) সে চাষী মার পায়ে ধরে মন্ত্র শেখার জন্য অনুনয় করতে লাগল। ডাকিনী বললেন, 'তুমি মন্ত্র শেখার যোগ্য পাত্র নও, তা ছাড়া এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করা কঠিন।' ডাকিনী শঙ্কুকে মন্ত্র শেখাতে অস্বীকার করলেও শঙ্কু ডাকিনীকে ছাড়ল না। সে ডাকিনীর পা ধরে বারবার অনুনয় করতে লাগল। শেষে ডাকিনী শঙ্কুকে মন্ত্র শেখাতে রাজী হলেন।

মন্ত্র শেখার জন্য প্রয়োজনীয় নিকষ কালো মাদীকুকুরের দুধে তৈরি আট অঞ্জলি ঘন ক্ষীর। শঙ্কু ওটা যোগাড় করে ডাকিনীর কাছে ফিরলে মন্ত্রসাধনা শুরু হল। কয়েকবার গোপন মন্ত্র উচ্চারণ করে ডাকিনী শঙ্কুকে পুরো ক্ষীর খেয়ে নিতে বললেন। ছ'অঞ্জলি ক্ষীর খাবার পর শঙ্কুর পেট আই-ঢাই, সে আর খেতে পারছিল না। তখন ডাকিনী শঙ্কুকে

#

বললেন, 'বাকি ক্ষীরটুকু না খেলে সাপ আগে তোমাকে মেরে পরে অনেককে মারবে।' ভয়ে শঙ্কু আবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও এক অঞ্জলির বেশি ক্ষীর খেতে পারল না। তখন ডাকিনী বললেন, 'আগে বলেছিলাম তুমি মন্ত্র শেখার উপযুক্ত নও। যা হোক সাত অঞ্জলি ক্ষীর খেয়েছ বলে সাত গোত্রের সাপ তোমার বশে থাকবে। বাসুকি গোত্রের সাপ তোমার বশীভূত হবে না। তাদের কারুর ছোবলে তুমি মরবে।'

মন্ত্রবলে শক্তিশালী হয়ে শঙ্কু এরপর নাগদের দিয়ে ইচ্ছেমত ভালমন্দ কাজ করাত। প্রতিদিন সে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করাত। আর রাতে প্রমোদকাননে নাগিনীদের নিয়ে নিজের কামনা-বাসনা মেটাত। শঙ্কু পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কাছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি ভট্টারিকা আর্যতারা দেবীর মন্দির বানিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে ত্রি-রত্নের' (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ) উপাসনা করত।

শঙ্কুর শেষদিন কিন্তু ঘনিয়ে এল। নাগিনীদের মধ্যে একজন ছিল বাসুকি-বংশীয়া। শঙ্কু তাকে চিনতে না পারায় অসতর্ক ছিল। একদিন নাগিনী শঙ্কুর কপালে ছোবল দিয়ে পালিয়ে যায়। শঙ্কু ভৃত্যকে ডেকে বিষের কাটান হিসাবে তাড়াতাড়ি এক রকমের সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষের সাদা হাড় (সম্ভবতঃ সমুদ্রের শুকনো শক্ত ফেনা) তাড়াতাড়ি যোগাড় করে আনতে বলে। তাকে ফিরতি পথে পিছনে তাকাতে, কারুর ডাকে সাড়া দিতে বা কথা বলতে নিষেধ করে। হাড় নিয়ে ফেরার পথে ভৃত্যটিকে পিছন থেকে কেউ বারবার ডাকতে থাকে। প্রথমে সে পিছনে তাকায়নি। কিন্তু পিছনের লোকটি বলে ওঠে, 'আমি চিকিৎসক। আমি নানারকম অসুখ এমনকি সাপে কাটা রোগীকেও ভালো করতে পারি।' ভৃত্যটি তখন পিছনে ফিরে দেখল এক ব্রাহ্মণ ওষুধের পেটরা নিয়ে আসছে। ব্রাহ্মণ বলল, "কি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছ?' উত্তরে ভৃত্য তাকে হাড় দেখালে, ব্রাহ্মণ তা তখনই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভৃত্যটি ফিরে আসার পরে সব শুনে শঙ্কু ভৃত্যকে বলে যেখানে হাড়টি ফেলা হয়েছিল সেই মাটি নিয়ে আমার জন্য নিয়ে এস। কিন্তু নাগজাদুতে প্লাবনের জলে সব ডুবে গেলে ভৃত্যটি মাটি যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে শঙ্কু মারা যায়।[৮] মরার আগে শঙ্কু দক্ষিণে খগেন্দ্র নামে এক জায়গায় পাথরের 'গরুড়স্তম্ভ' নির্মাণ করেছিল। স্তম্ভপূজা করলে সাপে কাটা রোগী তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠত। কুষ্ঠরোগীকে স্তম্ভ ধোওয়ানো জল খাওয়ালে বা জলে স্নান করালে তার রোগ নিরাময় হত।

মনসামঙ্গলের সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য -

১) চাঁদ সদাগর। ২) চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্রের বিষে মৃত্যু। ৩) সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসরঘরে কালনাগিনীর দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু। ৪) বেহুলার মান্দাসে যাত্রা। ৫) ধোনা মোনার উপাখ্যান (বিজয় গুপ্ত)। ৬) নেতা ধোপানী। ৭) নেতা ধোপানী। ৮) ওঝা শঙ্কর গারুড়ির উপাখ্যান।

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। লেখাপড়া মুলতঃ ইংরাজী মাধ্যমে। অঙ্কের ছাত্র। সংস্কৃত, ধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধদর্শন এই তিনটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর আরও তিনটি উপাধি এবং কাব্য ও ব্যাকরণ তীর্থ উপাধি আছে। এছাড়া রুশ, কাস্তিয়ান এবং তিব্বতী ভাষাশিক্ষা এবং কমপিউটার সাইন্স্ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সরকারী শংশাপত্র। ইন্টারন্যাশনাল চেস আরবাইটার। লেখাপড়া, গানবাজনা এবং নাটক প্রিয়।

#



পূর্বকথাঃ

অন্ধকারের মধ্যেও একটা অদ্ভুত আলো খেলে বেরাচ্ছে চারিদিকে। সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখলাম ফুলটাকে। খাদের ধারে হ্রস্বনালিকার উপরে অবস্থিত এক শ্বেতবর্ণ কমল। পাপড়ি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। দেবপ্রিয় জিনিস বটে। হাত বাড়ালাম ফুলটার দিকে, এই একটাই নেব। চারিদিকে কত তো ফুটে আছে আমি শুধু একটাই তুলব। নালিতে হাত লাগাতেই কি যেন হয়ে গেল। পায়ের তলা থেকে সরে গেল মাটি আর আমি পড়ছি, পড়ছি পড়ছি... হাঁকপাঁক করে উঠে বসলাম বিছানায়। উফফ্ কি স্বপ্ন!

এ প্রায় বছর দুয়েক আগেকার কথা কিন্তু তখন থেকেই আমি জানি ঐ ফুলের জন্য আমাকে একবার যেতেই হবে সেই স্বর্গোদ্যানে। ইংলিশে যার নাম ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ারস, গাড়োয়াল হিমালয়ের একপ্রান্তে পর্বত বেষ্টিত এক স্বর্গরাজ্য। গল্প শুনেছি অনেক। বিশেষ করে আমার বড়দা আর বৌদি যখন বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে। যাব যাব করে পেরিয়ে গেল দুটো বছর। তাও হয়ত শেষ রক্ষা হত না। কিন্তু মা বাবা গত পুজোয় তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সিমলা-কুলু-মানালি ঘুরে আসার পর আমার জেদ চাপল আমি হিমালয় যাবই যাব। প্রথমে ঠিক হল এপ্রিল-মে-তে যাওয়া হবে সাংলা-কল্পা। কিন্তু সঙ্গে যাওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। পাহাড়ী রাস্তায় এস ইউ ভি বা টাটা সুমো জাতীয় গাড়ী চলে। একটা আট দশ জনের গাড়ীর খরচ দুজনে বইতে হলে পকেটে প্রচুর টান ধরে। তাই সাংলা-কল্পা অচিরেই বাদ হয়ে গেল। একদিন জায়গার খোঁজে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়ল ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ারস। এই তো আমার সেই স্বপ্নের দেশ। এখানেই যাওয়া হবে।

#

এপ্রিল মাসেই দিল্লির প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেল। আমি ততদিনে নেট ঘেঁটে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করে ফেলেছি। ওখানে যাওয়ার প্রকৃত সময় হচ্ছে জুলাই-এর প্রথম থেকে অগাস্টের মাঝামাঝি। কিন্তু আবার ব্রহ্মকমল দেখতে হলে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরটাই বেটার। সন্তুর ছুটি, ফুলের জন্মসময় সব বিচার করে ঠিক হল আমরা যাবো অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

যাওয়ার উৎসাহে আমি নেট ঘেঁটে যাবতীয় তথ্য ডাউনলোড করা শুরু করে দিলাম। খুঁজে খুঁজে পড়তে শুরু করলাম সমস্ত ব্লগ। একটা রুট চার্ট বানাতে হবে। সেইমত ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। আরও দুই মাস এইসব করতে করতেই কেটে গেল। তখনো হোটেল বুকিং হয়নি। বর্ষা পা রাখল জীবনে। আস্তে আস্তে উৎসাহ কমতে লাগল। ততদিনে আত্মীয়বন্ধুরা প্রায় সবাই জেনে গেছে আমরা বর্ষাকালে হিমালয়ে যাচ্ছি। সমবেত নিষেধ আর উপদেশ অতিসাহসীর বুকের ভেতরেও কাঁপন ধরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট, আর সেখানে আমি তো নার্ভের রুগী। যাওয়ার একমাস আগে থেকে আমার আর বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট নেই। তার উপরে প্রচুর বৃষ্টিতে গাড়োয়াল হিমালয়ে ধ্বস আর বন্যাশঙ্কার খবর বার বার টিভি নিউজে আসছে। ঠিক করা হল যদি হরিদ্বার গিয়ে দেখা যায় ঐ রুটের হাল খারাপ তাহলে আমরা আর ঐদিকে না গিয়ে অন্য কোথাও ঘুরতে চলে যাব। এমনকি এটাও ভাবা হল যে হরিদ্বারে যদি বন্যা হয়ে যায় তাহলে আমরা দিল্লী থেকে রাজস্থানের দিকে ঘুরতে চলে যাব।

যাওয়ার দুই হপ্তা আগে পর পর দুটো ঘটনা ঘটল। আমার এক কলেজ ফ্রেন্ডের ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ল, আর আমাদের তি প্রিয় বইপোকা বন্ধু নির্মাল্য অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এরপর থেকেই আমি একটা অদ্ভুত মানসিক অসুখে পড়লাম। আমার খালি মনে হত লাগল আমি ওখানে গেলে মরে যাব। ল্যান্ডস্লাইডে হোক, হড়পা বানে হোক, আমরা বাঁচব না। বেড়াতে যাওয়া আর এক হপ্তাও দেরী নয়। ব্যাগ গুছিয়ে রাখা আছে পাশের ঘরে আর আমার মনে হচ্ছে আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছি। কিন্তু কাউকে বলতেও পারছি না। কাউকে যদি এইকথা বলি তাহলে তক্ষুনি যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আমি জানি, অথচ আমার যেতেও দারুণ ইচ্ছা করছে। যাওয়ার দুদিন আগে থাকতে না পেরে ডাক্তার কাকাকে ফোন করলাম। অনেকক্ষণ কথা বলে খানিকটা কাউন্সেলিং-এর মত করে মনে একটু জোর পেলাম। ঠিক করলাম বাঁচি বা মরি হিমালয়ের কোলে স্বর্গোদ্যানে ব্রহ্মকমলের আলিঙ্গনেই মরব। দৃশ্যটা কল্পনা করেও মনে শান্তি আসছিল।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমরা একটা ভ্রমণসূচী বানিয়েছিলাম। আমরা হরিদ্বার থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার জন্য দুদিন সময় হাতে রেখেছিলাম আবার নামার সময়েও দুদিন হাতে রেখেছিলাম। যদি কোনভাবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যেন খুব মুস্কিলে না পড়তে হয়।

৬ অগাস্ট ২০১৬, প্রথম দিনঃ

সারারাত আমার ঘুম হলো না পরের দিন পাঁচটায় উঠতে হবে বলে। সবকিছু গুছিয়ে, জানলা দরজা আর সুইচ বন্ধ করে আমরা বেরোলাম তখন পাক্কা ৬:৪৫। একটা অটো নিয়ে গেলাম রামমুর্তিনগর সিগন্যালের কাছে, সেখান থেকে এয়ারপোর্টের বাস পাওয়া যাবে। বাসের বদলে একটা শেয়ারের গাড়ী পেলাম। ৮টার আগেই পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্ট। চেকিং-এর ঝামেলা মিটলে শুনলাম প্লেন লেট। ৯:৪৫ এর প্লেন ছাড়ল ১০:২০ তে। দিল্লী পৌঁছাতে একটা বাজিয়ে দিল।

এই দুঃখের মধ্যে একটাই সুখের জিনিস ছিল তা হল আমাদের পাইলট। ছেলেটা খুব বেশী লম্বা নয় কিন্তু যাকে বলে একেবারে নয়নমনোহরকারী। প্লেন থেকে নেমে দিল্লীর প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হতে হতে এয়ারপোর্ট মাঠের মধ্যে আমি প্রায় চঞ্চলচিত্তচকোরীর মতই তাকে দেখে চোখ জুড়োচ্ছিলাম। তারপর বাস এসে গেল। আমরা ঝপাঝপ উঠে পড়লুম। কিন্তু ছেলেটার বোধহয় আমাকে আরেকটু ঠাণ্ডা করার ইচ্ছা ছিল। দেখলাম বাকি এয়ারহোস্টেস আর পাইলটদের সঙ্গে কীসব কথা বলে সে আমাদের বাসটাতেই এসে উঠল। স্বর্গোদ্যানে পৌঁছনোর আগেই দেবকান্তি পুরুষের সান্নিধ্যে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই মনটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগেকার যত ভীতু ভীতু চিন্তার মেঘ ঝাঁ করে উধাও হয়ে গেল মাথা থেকে। আমি সন্তুর সঙ্গে নাচতে নাচতে গিয়ে আমাদের লাগেজগুলো সংগ্রহ করলাম।

দিল্লীতে আমার দুই প্রস্থ আত্মীয় থাকে। একদিকে থাকে বড়দা, বড়বৌদি আর তাদের বিচ্ছু পুত্রসন্তান। আরেকদিকে থাকে ডাক্তার কাকুর মেয়ে; আমার দুই বোন, কাকিমা আর আমাদের নতুন জামাইবাবু। দুই তরফ থেকেই নিমন্ত্রণ। দুজনেই কি কি খাওয়াবে তার হেভি লিস্ট দিয়ে রেখেছে। তবু ঠিক হয়েছিল প্রথমবার যাওয়া হবে বড়দাদের বাড়ি। ফেরার সময় যাওয়া হবে বোনেদের বাড়ি।

সেইমত বড়দা আর আমার ছয় বছরের বিচ্ছু ভাইপো গাড়ী নিয়ে হাজির দিল্লী এয়ারপোর্টে। গাড়ীতে করে যেতে যেতেই আমার উদ্দেশ্যে সে ঘোষণা করল, "তোমার মাথাটা বেশ টেস্টি মনে হচ্ছে। খেতে ভালোই লাগবে আমার।" দিল্লীর বিখ্যাত জ্যাম টপকে আমরা বড়দার বাড়ীতে পৌঁছলাম প্রায় তিনটে নাগাদ।

জমিয়ে গল্প আর ইলিশসহ আরও ছয়রকমের পদ দিয়ে খাওয়া দাওয়া হল। আগেই বলেছি বড়দারা একদা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস গিয়েছিল। বেশ কিছু তথ্য নিলাম তাদের কাছ থেকে। রাত্রিবেলা আবার একপ্রস্থ ভাত মাছের ঝোল সাঁটিয়ে এগারোটার সময় আমরা বড়দার গাড়ীতে রওনা দিলাম নিউদিল্লী রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে। ওখান থেকেই রাত্রি পৌনে বারোটায় ছাড়বে নন্দাদেবী এক্সপ্রেস।

৭ অগাস্ট ২০১৬, দ্বিতীয় দিনঃ

ভোর পৌনে চারটেয় হরিদ্বার পৌঁছানোর কথা। তার বদলে প্রায় সাড়ে চারটের সময় হরিদ্বার পৌঁছল নন্দাদেবী এক্সপ্রেস। হরিদ্বারের আবহাওয়া রীতিমত গরম ভ্যাপসা। ওই ভোরবেলাতেই লাগেজ টানতে আমাদের ঘাম ছুটে যাচ্ছিল। তার উপরে ষ্টেশন জুড়ে অজস্র সাধু সন্ন্যাসী আর সাধারণ মানুষ শুয়ে বসে আছে। গুগলে দেখলাম হরিদ্বার থেকে জোশীমঠের রাস্তা পরিষ্কার। কোন ল্যান্ডস্লাইড নেই। উপরন্তু আবহাওয়াও মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে। প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা নেই। ষ্টেশনে দাঁড়িয়েই আমরা ঠিক করলাম সেইদিনই উঠে যাব জোশীমঠ। একটু কষ্টদায়ক জার্নি কিন্তু জোশীমঠ মানে আমাদের সমস্ত জার্নির মধ্যে সবথেকে বেশী দূরত্বটা কভার করে ফেলা। সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা ছুটে গেলাম রেলের রিটার্নিং রুম বুক করার জন্য। কপাল ভালো, পেয়েও গেলাম ঘন্টা দুয়েকের জন্য একটা রুম। দুজনে একেবারে শ্যাম্পু মেখে স্নানটান করে ফ্রেস হয়ে নিলাম। উপরে উঠছি, এরপরে আর স্নানটান ভাগ্যে জুটবে কিনা জানা নেই।

৬:৩০-এ যখন লোকবোঝাই শেয়ারের টাটাসুমোটা আমাদের নিয়ে জোশীমঠ রওনা দিল তখন হরিদ্বার সম্পূর্ণ জেগে গেছে। হরিদ্বার থেকে শেয়ারের গাড়ী পাওয়া অফসিজনে সত্যি সমস্যার। তদুপরি আমি কিছুতেই একদম পিছনের

সিটে বসব না। টাটাসুমোর সামনের সিট দুটো দখল করতে আমাদের রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। সামনে যে দুজন ভদ্রলোক ছিল তাদের মধ্যে একজনের পাহাড়ে উঠলেই গা গুলোয়। তাদেরও জীবনসংকট, আমারও। আমি ঐ পিছনের চারজনের সিটে শেয়ারের গাড়ীতে অন্তত যেতে পারব না। আমি পারলে প্রায় পায়ে ধরে ফেলি ভদ্রলোক দুজনের। অনেক কষ্টে দুজনে রাজি হলেন পিছন দিকে চলে যেতে। আমি আর সন্তু সামনের সিট দখল করে বসলাম।

হরিদ্বার বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে গাড়ী বড় রাস্তায় পড়ল। প্রথমেই দর্শন পেলাম গঙ্গার। তারপরেই সামনে আকাশ ছোঁয়া হিমালয়। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম বহুদিন আগে। প্রায় চার বছর হয়ে গেছে। এতদিন পর গগনচুম্বী পর্বতের সমারোহ দেখে মনটা কেমন যেন উদ্বেল হয়ে গেল। সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে ঠিক এরকম অনুভূতি হয় না। তখন মনে হয় এই জীবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতি হল। জগত সংসারের অসামান্য ব্যাপ্তি আর প্রকৃতির প্রকাণ্ডতার মাঝে আমাদের কাজ শুধু জীবন তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়; এমন কিছু করা উচিত যার ব্যাপ্তি আছে সমাজ জীবনে, যার প্রকাণ্ডতা ছুঁয়ে যাবে জীবনের সর্বোচ্চ শিখর।



হরিদ্বারের সাধু

হিমালয়ের সামনে দাঁড়ালে মনটা বড় হয়ে যায়, এরকম বেলুনের মত ফাঁপানো মন নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল পিছনের ভদ্রলোককে বলি "ভাইয়া আপ ইধার চলা আইয়ে, হামলোগ পিছে চলে জায়েঙ্গে।" কিন্তু তখন গাড়ী পুরো দমে ছুটছে। সিট বদলানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি হিমালয়ের চূড়ো থেকে থাপ্পড় মেরে মেরে মনটাকে সমতলে নামিয়ে আনলাম। পরে গাড়ী থামলে যদি আবার মনবাবাজীর মহৎ হবার সাধ জাগে।

হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশের রাস্তা একদম সমতল। তারপরেই শুরু হয়েছে চড়াই। ঋষিকেশ থেকে তিনধারা পৌঁছনোর আগেই আমার সারা শরীর পাক দিতে শুরু করল। চোখ বুজলেই মনে হচ্ছে পেট থেকে কালকের ইলিশ একেবারে লাফিয়ে বেড়িয়ে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ খাবে। পিছনের ভদ্রলোকের অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। আমি মনে মনে

ভাবছি, "ভগবান ওঁর কষ্ট কমিয়ে দাও। এখন না আবার সিট চেঞ্জ করতে বলে।" ভদ্রলোকের মাথায় জল দেবার জন্য মাঝখানে একবার গাড়ী দাঁড় করানো হল। তারপরে গাড়ী থামল তিনধারা পেরিয়ে গিয়ে একটা ধাবায়। কিছু খাব না খাব না করে একটা আলুর পরোটা মেরে দিলাম। আশ্চর্য তারপর থেকে আমার একবারও আর গা গোলায়নি। বুঝলাম খালি পেটে পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চাপা একদম উচিত নয়। গাড়ী দেবপ্রয়াগ কখন পার হল জানিনা, কারণ আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি তখন। পাক্কা দু তিন ঘন্টা সন্তুর হাত আর কাঁধের বারোটা বাজিয়ে যখন ঘুম ভাঙল তখন আমরা অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছি।

গাড়ী একবার থামল। প্রচণ্ড গরম। সবাই রাস্তার পাশেই একটা কলের জল লক্ষ্য করে ছুটল চোখে মুখে জল দেবে বলে। আমিও ছুটলাম। ড্রাইভারসাহেব চা বিড়ি পান করলেন। গাড়ী আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। সামনেই রুদ্রপ্রয়াগ। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছুই দেখতে পেলাম না। শেয়ারের গাড়ীর থামার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তার উপরে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে যেন বাঘে তাড়া করেছিল। 'খানা খন্দ নালা আর পথ, হরিদ্বার থেকে জোশীমঠ' তার গাড়ী চালানোর জন্যই আমাদের মনে হচ্ছিল স্বর্গোদ্যান কেন, স্বর্গেই পৌঁছে যাব আমরা।

রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকেই হিমালয় তার রুদ্রমুখ দেখাতে শুরু করল। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে পাথরের বন্যা। ধ্বসের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শিউরে শিউরে উঠছে মন। মাঝে মাঝে রাস্তা এতোটাই সরু হয়ে যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে গাড়ির চাকা বুঝি হাওয়ায় ভাসছে। পথ নেই বললেই হয়। বড় বড় বুলডোজার দিয়ে মাটি সরিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে আর তারমধ্যে দিয়েই নেচে নেচে চলছে আমাদের লড়ঝড়ে টাটা সুমো। তার আবার আমার দিকে দরজার খানিকটা অংশ ভাঙা। তীব্র গতিতে যখন বাঁক নিচ্ছিল তখন দরজার মাথার উপরে হ্যান্ডেল ধরে নিজেকে সামলাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম হ্যান্ডেলের একটা স্ক্রু খুলে বেরিয়ে হ্যান্ডেলটা ঝুলে গেল। তারপর থেকে আর দরজার উপরে ভরসা করতে পারিনি। সন্তুকে জড়িয়েই বসে ছিলাম।

উল্টোদিক থেকে মাঝে মাঝেই দেখছি গেরুয়া পতাকা লাগানো বাইকে দুজন করে মানুষ লাগেজ নিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে। জোশীমঠের দিকেও যাচ্ছে এরকম গাড়ী। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম এরা বেশীরভাগই হেমকুণ্ডে তীর্থের জন্য যাচ্ছে। বাইক আসছে হরিদ্বার, দিল্লী এমনকি পাঞ্জাব থেকেও। অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর রাস্তাবিহীন পথ বেয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম নন্দপ্রয়াগ। তখন বেলা প্রায় দেড়টা।

নন্দপ্রয়াগ পেরনোর পর আবহাওয়াটার একটু পরিবর্তন হল। পাহাড়গুলো আরও সবুজ হয়ে উঠল। আর প্রায় প্রতিটা পাহাড় ঘিরেই মেঘের সমারোহ। আমি তখন একবার রাস্তার হাল দেখছি আরেকবার কালো কালো মেঘের দলকে। বহু নিচে সগর্জনে ধেয়ে চলছে অলকানন্দা। গাড়ী থামলেই তার গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই করতে করতে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছালাম জোশীমঠ। আগে থেকেই ঠিক ছিল আমরা জোশীমঠেই থাকব, গোবিন্দঘাটে থাকব না।

দু তিনটে হোটেলের নাম আর ফোন নাম্বার লিখে এনেছিলাম। সেগুলো ধরে ফোন করা শুরু হল। প্রথম হোটেলেই ঘর পাওয়া গেল। হোটেল কামেট। নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম। ঘরটা এমন কিছু ভালো নয়। উপরন্তু

#

বর্ষাকাল বলে তার বিছানা লেপ সবই স্যাঁতস্যাঁতে। কিন্তু সেদিন আর অন্য হোটেল দেখার ইচ্ছা ছিল না। কিছুই ভাল লাগছিল না। হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে হোটেলের ঘরেই খাবার অর্ডার করলাম। খাওয়া দাওয়া করে টিভি দেখতে দেখতে আর মোবাইলে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন প্রায় সাড়ে নটা বাজে। হোটেলের ছেলেটা জানতে এসেছিল আমাদের কিছু লাগবে কিনা। তাকে দিয়ে কিছু তন্দুরী রুটি কিনিয়ে আনা গেল। তারপর আবার খেয়ে দেয়ে ঘুম।

৮ অগাস্ট ২০১৬, তৃতীয় দিনঃ

পরের দিন ঘুম ভাঙল সূর্য উঠে যাওয়ার অনেক পরে, প্রায় ৮:৩০ বাজে তখন। ঘুম ভেঙে দেখি সন্তু ঘরে নেই। রুমের দরজা ধরে টেনে দেখি ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে। আমি মুখ ধুয়ে টুয়ে ফ্রেস হতে হতে সন্তু ফোন করল। সে রোপওয়ের সন্ধানে গেছে। তাকে বলেছিলাম আমরা জোশীমঠে যদি একদিন থাকতে পারি তাহলে আউলিটা ঘুরে নেব। সাতসকালে ঘুম ভাঙতেই সে ছুটেছে আউলি যাবার হালহদিশ জানতে। ফোন করে জিজ্ঞেস করল আমি তক্ষুনি বেরতে পারব কিনা, তাহলে রোপওয়ের ওখানে অলরেডি একটা গ্রুপ এসেছে তাদের সঙ্গে আমাদের উপরে যাওয়া হবে। আমি এককথায় নাকচ করে দিলাম আইডিয়াটা। আজকে একদম তাড়াহুড়ো নয়। আমরা মজাসে সব কিছু দেখব। একটু পরেই সন্তু ফিরে এল। বলল, কাল সারারাত হেভি বৃষ্টি হয়েছে। আশেপাশের পাহাড়গুলো পুরো মেঘে ঢাকা। তবে রোপওয়ে চলছে। জমিয়ে ব্রেকফাস্ট আর চা খেলাম। তারপর প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সাজুগুজু করে রওনা দিলাম রোপওয়ের বিল্ডিং-এর দিকে।

আমাদের হোটেলের ঠিক পিছনেই একটু চড়াই উঠলেই রোপওয়ে বিল্ডিং। বিল্ডিং থেকে আশেপাশের পাহাড়গুলো ভালোই দেখা যাচ্ছিল। চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত ছোট একটা সমতল ভূমিতে গড়ে উঠছে জোশীমঠ নামক এই ছোট শহরটা। শহরটা থেকে অলকানন্দাকে দেখা যায় না। সমুদ্রতল থেকে জোশীমঠ প্রায় ৬১৫০ ফিট উঁচুতে। আউলি টপ যাওয়ার একটাই রাস্তা সেটা হল রোপওয়ে। জোশীমঠ থেকে চার কিলোমিটার দূরত্ব কভার করে রোপওয়ে কিন্তু সাড়ে তিন হাজার ফিটের উপরেও উঠিয়ে দেয় মাত্র পনেরো কুড়ি মিনিটে। আউলি এশিয়ার সেকেন্ড হায়েস্ট আর লংগেস্ট রোপওয়ে। প্রথমটা বোধহয় কাশ্মীরের গুলমার্গে আছে।

পাক্কা এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে পাঁচজন বাঙালীর একটা গ্রুপ এল। আমাদের সবাইকে নিয়ে রোপওয়ে রওনা দিল আকাশ পথে। কেবিলকার বা গন্ডোলাগুলোর দেওয়ালগুলো কাচের তৈরি। আমরা দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম নিচের পাহাড়, বাড়িঘর, রাস্তা। সামনের বিশাল বিশাল পাহাড় চূড়া। কিন্তু আমাদের কপাল খুব একটা ভালো নয়, পাহাড়গুলো অধিকাংশই মেঘ কুয়াশায় ঢাকা। পায়ের তলার ঘরবাড়ী কমে এল। শুরু হল বনজঙ্গল। উঁচু উঁচু পাইনের জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাদের রোপওয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে হিমালয়ান মাংকি আর নাম না জানা বেশ কয়েকটা পাখি দেখলাম। রোপওয়ের চালক আমাদের কয়েকটা গাছের নাম আর তাদের গুণাগুণ ব্যাখা করছিলেন। তখন শুনতে ভালোই লাগছিল কিন্তু এখন আর কিছুই মনে নেই।

আউলি টপে পৌঁছে গেলাম বারোটার মধ্যেই। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। কয়েকজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বসে আছেন রোপওয়ে বিল্ডিং-এর বাইরে। চা কফি পকোড়া খাচ্ছে সবাই। আমাদের সঙ্গে আসা গ্রুপটাও খাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিল। আমরা একটু চত্বরটায় ঘোরাফেরা করে ফোটোসেশন করার পর, বিল্ডিং-এর পিছনের চড়াই ভেঙে উঠতে থাকলাম। পাহাড়ের চড়াই উঠে গেছে অনেকটা। সমুদ্রতল থেকে প্রায় দশ এগারো হাজার ফিটের কাছে দাঁড়িয়ে মানুষ নির্মিত তার আর বাড়ীঘরের জঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। চারিদিকে সবুজ ঘাস বা ফার্নের মাঠ আর একটু দূরে দূরেই পাইনের জঙ্গল। চড়াইটা ভেঙে বেশ অনেকটা উপরে ওঠা গেল। দূরে পাহাড়কে একবার একটু স্পষ্ট হতে দেখা গেল। তারপরেই আবার কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এলোকেশে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ের বুকে। আমাদের ইচ্ছা ছিল পাহাড় ভেঙে আরও খানিকটা উপরের দিকে ওঠার কিন্তু মেঘগুলো কাছে আসতেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পাঁচশো মিটার দূরের বনটাকে মনে হচ্ছিল অন্ধকার খাদ। মেঘ এসে এমনভাবে ঘিরে ফেলল আমাদের যে রোপওয়ের বিল্ডিংটাও একটুও দেখা যাচ্ছিল না। মাঠের মধ্যে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঘ আবর্তের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে পেলাম গরু চলার নালা মত রাস্তাটা। সেটা বেয়েই দুজনে নেমে এলাম রোপওয়ের বিল্ডিং-এর কাছে। আমাদের আশপাশ দিয়ে মেঘের দল যেন হাত নেড়ে নেড়ে উড়ে যাচ্ছে। কোনরকমে দ্রুত বাকি চড়াইটা ভেঙে ঢুকলাম গিয়ে রোপওয়ে বিল্ডিং-এর মধ্যে। ঠাণ্ডায় হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। ছাতা থাকা সত্ত্বেও হাওয়ার দাপটে একটু আধটু ভিজে তো গেছিই। চা, গরম গরম পকোড়া আর পিনাট বাদাম নিয়ে বসলাম দুজনে।



আউলি টপ

#

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাহাড় বেয়ে আরও কিছু ছেলে মেয়ে নেমে এল রোপওয়ে বিল্ডিং-এ। ওরা ট্রেকিং করতে গিয়েছিল আউলির উপরের কোন একটা শৃঙ্গে। আজকে রাতটা ওরা আউলিতেই কাটাবে। আগামীকাল রওনা দেবে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের উদ্দেশ্যে। গ্রুপের মধ্যে একটা কলকাতার বাঙালী জুটে গেল। জব্বর গল্প জুড়ে দিলাম আমরা তার সঙ্গে। বাইরে তখনও তুমুল বৃষ্টি হয়ে চলছে।

কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থামতে আমরা ঘোরাফেরা করলাম বাইরের চত্বরটায়। আমাদের সঙ্গে যে গ্রুপটা এসেছিল তাদেরকে আর দেখাতে পেলাম না। অন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে প্রায় আড়াইটে নাগাদ নেমে এলাম জোশীমঠে। বেলা তিনটের সময় গরম জলে গা ধুয়ে লাঞ্চ করলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম জোশীমঠের কয়েকটা দ্রষ্টব্যস্থান দেখব বলে।

জ্যোতির্মঠ যার থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে জোশীমঠ আর আদি শংকরাচার্যের আমলের একটা গাছ। এই দুটো দেখে টাকাপয়সা তুলে নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। পরের দিন থেকে আর এটিএম পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই। হোটেলে এসে পরের দিনের জন্য একটা গাড়ী বুক করলাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নেট ঘাঁটাঘাঁটি আর টিভি দেখা। তারপর ডিনার সেরে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে বাইরে। কালকে সকালে যেন মেঘ কেটে যায় এই কামনা করে ঘুম রাজ্যে ডুব দিলাম।

৯ অগাস্ট ২০১৬, চতুর্থ দিনঃ

অ্যালার্মের ডাকে ঘুম ভাঙল পাঁচটায়। প্রথমেই আমি কম্বলটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সন্তুকে তুলে দিলাম। তারপরে তাকে ঠেলে ঠেলে বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়ে কম্বলটা আরেকপ্রস্থ জড়িয়ে নিয়ে একটা উপঘুম দেবার জন্য রেডি হলাম। সন্তু দাঁত মেজে টেজে এসে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল গরম বসালো, আর বলল "ওহো কারেন্ট নেই।" আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। কারেন্ট নেই? কারেন্ট নেই কেন? এই হোটেলে তো জেনারেটর আছে। তখনও সুর্যের আলো ফোটেনি ভালো করে। কারেন্ট না থাকা মানে সবকিছু অন্ধকার। আর গরম জল তো অত্যাবশ্যক জিনিস।

সন্তু গায়ে একটা জ্যাকেট আর কানে টুপি গুঁজে খোঁজ নিতে বেরল কারেন্ট কোথায় গেছে। খানিকবাদে এসে বলল, জেনারেটর চালাচ্ছে। ম্যানেজার নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল, সন্তু ডেকে ডেকে তাকে প্রায় বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছে। গতকাল রাত্রে মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছে আর তার জন্য সারা জোশীমঠে কোথাও কারেন্ট নেই। এইসব তথ্য প্রদানের মাঝেই জেনারেটর চলল, কারেন্ট এল। আমরাও একে একে ফ্রেশ হয়ে চা আর ছাতুজল খেয়ে রেডি হলাম গাড়ির জন্য। গাড়ীকে বলা হয়েছিল সকাল ৬ টায় আসতে। আমাদের রেডি হতে হতে প্রায় সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। সন্তু আমার উপরে প্রচুর চেঁচামিচি করে বাইরে গেল গাড়ির খোঁজ নিতে ম্যানেজারের কাছ থেকে। ম্যানেজার বলল, গাড়ী তখনো আসেনি। আমাদের রাগান্বিত মুখ দেখে ম্যানেজার ছোকরাটি বলল যে যতক্ষণ না গোবিন্দঘাটের দিক থেকে কোন গাড়ী আসছে ততক্ষণ এদিক থেকে না যাওয়াই ভালো, কারণ কাল রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় কোথাও ধ্বস নেমে থাকলে আমরা

আটকে যাব। আর কাল রাতে হোটেলে আরও একটা বারোজনের গ্রুপ এসেছে তারাও ঘাঙ্গারিয়া যাবে আজকেই। অতএব আমাদের খুব একটা টেনশনের কারণ নেই।

ম্যানেজারের কথায় আমরা হোটেলের সামনের ছোট রিসেপশনটায় বসলাম কিছুক্ষণ। সেই বারো জনের গ্রুপের গাইড ম্যানেজার ছোকরার খোঁজে এলে তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। সে কোন হোটেলে উঠবে ঘাঙ্গারিয়ায় তা আমরা জেনে নিলাম। আমার একটু টেনশন ছিলই। ছোটবেলা থেকে ঘুরেছি অনেক কিন্তু হিমালয়ের এতটা ইন্টিরিওরে কোনদিন মা বাবা-র সঙ্গেও যাইনি, সেখানে একা একা দুজনে যাচ্ছি। গাইডের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে গোবিন্দঘাট থেকে ঘাঙ্গারিয়া অবধি রাস্তার কিছু তথ্য জেনে নিলাম। হোটেল ম্যানেজার এসে বলল, আমাদের গাড়ী এসে গেছে। গাইডও উঠে পড়ল ওদের গাড়ী ছাড়বে ৮টার সময়।

আমাদের ছোট্ট অল্টো গাড়ী জোশীমঠ ছাড়ল পাক্কা ৭টার সময়। জোশীমঠ থেকে গোভিন্দঘাটের রাস্তাতেই আমরা শেষ প্রয়াগ পাবো। বিষ্ণুপ্রয়াগ, যেখানে অলকানন্দার সঙ্গে এসে মিশেছে ধৌলিগঙ্গা। জোশীমঠ শহরটা ছাড়তেই পথের দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিপদসংকুল বাঁক আসতে লাগল একের পরে এক। মনে পড়ল মায়ের গল্প। আমার তখন তিন কি চার বছর বয়স। আমাদের বিশাল গ্রুপটা সেইবার বদ্রীনাথ গিয়েছিল এই রাস্তাতেই রাতের অন্ধকারে বাসে করে। মা বলেছিল এ যাওয়া তো যাওয়া নয়, প্রাণ হাতে করে যাওয়া। মায়ের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। সামনেই একটা বিশাল হাইড্রোলিক পাওয়ার প্ল্যান্ট। প্রায় আরেকটা ছোটখাটো শহরই বলতে গেলে।

নদীর ভয়ংকরী রূপ আর পথের স্বাস্থ্যের কল্যাণে আত্মারাম দেহখাঁচা ছেড়ে উড়তে চাইলে, মনও কিছু পিছিয়ে থাকতে রাজি হচ্ছে না অনুভব করলাম। পাহাড়ী পথে পথে গত তিনদিনে চলে এসেছি প্রায় তিনশ কিলোমিটার; উঠেছি পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশী। পাহাড় ক্রমাগত তার রূপবদল করে চলেছে চোখের সামনে। যে পাহাড়কে দেবপ্রয়াগের আগে অবধি মনে হয় প্রৌঢ় সংসারী, একপ্রকার মিটমাট করেই নিয়েছে মানুষের সঙ্গে; সেই আবার কর্ণপ্রয়াগের পর থেকে বাঁশী হাতে নওলকিশোর। উচ্ছল তার ভঙ্গিমা; লীলাময়, সে সবসময়ই খেলতে চায় অনুচরদের সঙ্গে। মাথায় ঘন বিদ্যুৎগর্ভ নীল মেঘের চূড়া বেঁধে সে কথায় কথায় আড়ি করে, আবার ভাব জমাতেও দেরি করে না।

কিন্তু জোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাটের পথে পাহাড় যেন জ্ঞানী সন্ন্যাসী। তার মুখ প্রশান্ত কিন্তু রুদ্ররূপ দেখাতেও সে দ্বিধা করবে না সেই সংকল্পে দৃঢ়। তার রুক্ষশুষ্ক বুক কাঁধ ব্যেপে ঝুলে ঝুলে পড়ে সাদা সাদা মেঘের জটা। তবু সে তরুণ। সবুজ তারুণ্যের ছাপ ফুটে ওঠে তার বহিঃরঙ্গের রুক্ষতাকে ঢেকে দিয়ে। সে গম্ভীর মুখে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বসে আছে মানুষের জন্য। তার কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ ছাড়া এগানো যায় না। এই তিনজনের মিল একটাই। এদের কোমরে জড়ানো অলকানন্দার স্বচ্ছতোয়া মেখলা। আর কাঁধ বেয়ে বেয়ে নেমে এসেছে অন্যান্য হাজারো নদীর নানা রঙের ক্ষীণ বা স্থূল উড়নি।

জোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট মাত্র কুড়ি কি পঁচিশ কিলোমিটার। পাক্কা এক ঘন্টা সময় লাগল আমাদের এই পথটুকু যেতে। রাস্তায় গতরাত্রের বৃষ্টির ছাপ স্পষ্ট। বিষ্ণুপ্রয়াগের আগেই একটা জায়গায় হপ্তাখানেক আগেই ধ্বস

#

নেমেছিল। দেখলাম পাহাড় থেকে একটা দোতলা বাড়ীর সমান পাথর এসে রাস্তাকে প্রায় মুছে দিয়েছে। ঐ বাকি প্রায়ের উপর দিয়ে কোনরকমে অলকানন্দার সঙ্গে কুমিরডাঙ্গা খেলে গাড়ী পার হল ধ্বসের জায়গাটা।

গোবিন্দের নাম নিতে নিতে আটটা নাগাদ আমরা ঘাটে মানে ব্রিজের কাছে পৌঁছলাম। ওখান থেকে দেখি আবার গাড়ী যাচ্ছে। এই গাড়ীর কথা তো কোন ব্লগ বা ওয়েবে পাইনি। কিসের গাড়ী এটা? আমাদের ড্রাইভার জানালেন ২০১৩-এর উত্তরাখণ্ড বন্যায় সমস্ত রাস্তাঘাট ধুয়ে সাফ হয়ে গেছিল। পরে যখন আর্মিরা এই রাস্তাটা আবার তৈরি করে তখন তারা পুলনা অবধি মোটরেবল রোড বানিয়ে দিয়েছে। পুলনা মানে গোবিন্দঘাট থেকে প্রথম সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা। আমরা ঠিক করলাম এই রাস্তাটা আমরা গাড়ীতেই যাব। একটাই গাড়ী দুজন যাত্রী নিয়ে বসে আছে। দশজন না হলে ছাড়বে না। আমরা ঠিক করলাম এখানেই ব্রেকফাস্ট করে রওনা দেওয়াই ভালো হবে। সেইমত গাড়ীর ড্রাইভারকে বলে আমরা একটা দোকানে ব্রেকফাস্ট করতে ঢুকলাম। ব্রিজের সামনেই বেশ কয়েকটা খাবার দোকান। আর পাশের রাস্তাতেই মার্কেট আর হোটেল। একটা পাঞ্জাবীদের জন্য বানানো বিশাল যাত্রীনিবাসও দেখেছিলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে আসতেই দেখি আমাদের গাড়ী আমাদের মালপত্র পাশের একটা দোকানে রেখে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

ঠায় আধ ঘন্টা বসে থাকার পরে কিছু যাত্রী পাওয়া গেল যারা পুলনা অবধি গাড়ীতে যেতে রাজি হল। বেশীরভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে। ট্রেক করার জন্য এসেছে একেবারে গোভিন্দঘাট থেকেই ট্রেক শুরু করছে তারা। কিন্তু ব্রীজটা পার হতেই বুঝলাম গাড়ির জন্য আধঘন্টা অপেক্ষা করাটাই ভালো হয়েছে। এই প্রথম সাড়ে তিন কিলোমিটার পুরো খাড়াই চড়াই। আমি অন্ততঃ পারতাম না। পুলনায় গাড়ী থেকে নেমেই যে যার মত হাঁটা লাগালো। আমাদের সঙ্গে দুটো বড় বড় লাগেজ। একটা ট্রলি আর একটা রুকস্যাক। পাহাড়ী ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবস্থা করা হল পুলনা থেকে। একটা আমায় নিয়ে যাবে, আরেকটা লাগেজ। দোকান থেকে কেনা হল লাঠি। উপরে গেলে দাম বেড়ে যাবে, নিচ থেকে কেনাই যুক্তিযুক্ত।

সন্তু একটা লাঠি নিয়ে কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ ঝুলিয়ে ঢিমে তালে হাঁটা শুরু করল আর আমি ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে এগিয়ে গেলাম। বেশী টগবগ করা যাচ্ছিল না কারণ পাশেই খাদ, আর নিচ দিয়ে রূপালি জরির মতন লক্ষ্মণগঙ্গা বয়ে চলেছে। দেখলাম নদীটায় জল বেশী নেই কিন্তু দুপাশে চওড়া নুড়িয়ারী। আমার সঙ্গের ঘোড়া সামলানো ছেলেটি, নাম রনবীর সিং জানাল, আগে রাস্তা ছিল ঐ নদীর পাশের নুড়িপাথরের উপর দিয়েই। কিন্তু ২০১৩-র বন্যায় ভেসে গেছে সব। এখন নতুন রাস্তা বানানো হয়েছে পুলনা থেকে। আগেকার রাস্তায় গোবিন্দঘাট থেকে ১৪ কিলোমিটার দূর ছিল ঘাঙ্গারিয়া আর এখন পুলনা থেকেই ১৩ কিলোমিটার প্রায়।

বড় পাথর আর নুড়ি পাথরে বাঁধানো প্রায় পাঁচ ছয় ফিট চওড়া রাস্তা। পুলনা থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার পথে বেশির ভাগটাই চড়াই শুধু তিন চারটে ছোট ছোট উৎরাই আছে। একটি বয়স্ক দম্পতি দেখলাম হাঁটা স্টার্ট করছেন। তারা আমাদের সঙ্গে একই গাড়ীতে এসেছেন পুলনা। পুলনা গ্রামটা পেরোনর আগেই দেখলাম ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছেন। আমি তাদেরকে ঘোড়া নেবার কথা বলতে, ভদ্রলোক বললেন যে তারা ট্রেক করতে এসেছেন, হেঁটেই উঠবেন। আমার নিজের ক্ষমতা আর পৃথুলতা নিয়ে আমার কোন দ্বিমত নেই। এই চৌদ্দ কিলোমিটার চড়াই ভাঙতে হলে আমাকে সন্তুর পিঠে রুকস্যাকের মতই ঝুলে পড়তে হবে। ঘোড়াই আমার একমাত্র অপশন। সবথেকে বড় কথা পাহাড়ী রাস্তায় এর আগেও দু তিন বার ঘোড়ায় চড়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ঘোড়ায় চড়তে আমি ভয় পাইনা।

#

সুনিবিড় ছায়া ঘেরা পথ আর নির্জনতা। যদিও সেই নির্জনতা মাত্র কয়েক মিনিটের কারণ ঘোড়া দ্রুতগামী। বনভেদ করে বানানো হয়েছে এই নতুন পথ, তাই কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝখান দিয়েই উঠেছে বিশাল শাল বা পাইন গাছ। পথের মাঝে মাঝে তিন চার কিলোমিটার অন্তর ছোট ছোট চটি। বিশ্রাম আর খাবারের দোকান।

হঠাৎ একটা তীব্র ফট ফট গোঁ গোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখলাম একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। আওয়াজটা আগেও বেশ কয়েকবার পেয়েছি তবে এটা যে কপ্টারের আওয়াজ তা বুঝিনি। রণবীরকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, গোবিন্দঘাটে হেলিপ্যাড আছে আর ঘাঙ্গারিয়ার এক কিলোমিটার আগে একটা হেলিপ্যাড আছে। এই দুই জায়গার মধ্যে কপ্টার যাতায়াত করে। অনেক যাত্রীরাও যায়। চারজন করে চাপতে পারে। পার হেড এক পিঠের আড়াই তিন হাজার টাকা খরচ। পথের মাঝখানে ছোট বড় বেশ কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ঝর্না পড়েছে। তবে সবকটা ঝর্নাই নদী অন্য পাড়ের পাহাড়ে।



ঘাঙ্গারিয়ার রাস্তায় পাহাড়ী ঝর্না

ঘোড়ায় চেপেছি ৯টার সময়। প্রায় এক ঘন্টা পরে আমরা ভুইন্ডার গ্রামের একটু আগে একটা চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম, রণবীর জলখাবার আর চা খেল। আবার ঘোড়ায় উঠতে ও জানাল, আগে জে ভুয়ান্ডার গ্রামটা ছিল সেটা ২০১৩-র বন্যায় পুরোই ভেসে গেছে। তাই এখন অনেকেই পুলনা গ্রামে উঠে গেছে বা এই চটি বানিয়ে তাতেই থাকে।

#

রাস্তাটাকে বেশ ঝকঝকে নতুন মনে হচ্ছিল আমি সে কথাও জিজ্ঞেস করলাম রনবীরকে, ও বলল, রাস্তার কাজ অফিসিয়ালি নাকি শেষ হয়েছে মাত্র মাস দেড়েক আগে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে ২০১৫-য় এই রাস্তায় যাত্রীরা গেল কি করে? রনবীর বলল শেষের অংশটা তখনও হয়নি। ঐ যাত্রী যাওয়ার মত সরু করে বানানো ছিল। আর ২০১৫ নাকি মাত্র একমাসের জন্য এই পথ খোলা হয়েছিল। নিজের ভাগ্যকে আর ভারতীয় মিলিটারিদের প্রাণ খুলে আরেকবার ধন্যবাদ দিলাম।

হঠাৎ বনজঙ্গল শেষ হয়ে গেল। সামনে দেখি রাস্তার দু পাশে দোকানে দোকানে ছয়লাপ। দোকানগুলো পেরোতেই এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য আমার শ্বাসরোধ করে দিল। কাকভুষুন্ডী উপত্যকা, এখানে লক্ষণগঙ্গার সঙ্গে পুষ্পবতী নদী এসে মিশেছে। এতক্ষণ বনজঙ্গলের আড়াল থাকায় বোঝাই যায়নি। সামনেই উৎরাই আর তারপরেই পুষ্পবতী নদীর উপরে অন্য পারে যাওয়ার নতুন ব্রীজ। পুরনো ব্রীজটাও দেখলাম, মানে তার ভগ্নাংশকে, কিছু রড আর লোহার স্ট্রাকচারটা বেঁকে দুমড়ে আগের কনস্ট্রাকশন পিলারের সঙ্গে লেগে আছে। আর তাকে থাপ্পড় মেরে সহর্ষে ছুটে চলছে পুষ্পবতী নদী। ২০১৩-র বন্যায় পুষ্পবতী তার ধ্বংসলীলা দেখিয়েছে। ভগবানের নাম নিয়ে ঠকঠকে ঘোড়ার পায়ে ব্রীজ পেরোলাম। ব্রীজ পেরিয়েই দেখি পাথরে পাথরে বসবার জায়গা বানানো। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। সূর্যের তেজ ভালোই বেড়েছে, তবু কাকভুষুন্ডীর মায়া কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। আমি ঘোড়া থেকে নেমে বসলাম কিছুক্ষণ সিমেন্টের বেঞ্চে। রনবীর তার ঘোড়াদের ঘাস খেতে ছেড়ে দিল। আমি অবশ্য ঘাস টাস বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, ঘোড়াগুলো হয়ত দেখতে পাচ্ছিল।

দুপাশের আকাশচুম্বী পাহাড়কে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলছে লক্ষ্মণগঙ্গা আর পুষ্পবতী। কাকভুষুন্ডী উপত্যকাতে এসে দুই জনের মিলন। অসামান্য এই উজ্জ্বল সবুজ পাহাড় আর নদীর দৃশ্য শহুরে চোখের দেখে দেখে আর আশ মেটে না। তবে মন বলছে এই তো শুরু, এ তো স্বর্গের দরজার দৃশ্যপট মাত্র, আগামী দুদিন স্বর্গসৌন্দর্য্য অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। মিনিট পনের বসে থেকে উঠে পড়লাম স্বর্গদ্বারের সামনে থেকে। সামনে খাড়াই চড়াই। আমরা যাব পুষ্পবতীর পার ধরে কিন্তু আর দেখা পাবো না তার। আর লক্ষ্মণগঙ্গার পাড় ধরে শুনেছি কাকভুশুন্ডী লেক-এ ট্রেকিং করতে যায় অনেকে। শেষ সাড়ে তিন কিলোমিটারের গল্প আমি প্রত্যেকটা ব্লগেও পড়েছি আর বড়দাও বলেছে। কোমর বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রেডি হলাম। আবার জঙ্গল শুরু। ছোট ছোট ঝর্নার জলে ভেজা ভেজা রাস্তা আর টিপটাপ খসে পড়া পাতার মধ্যে দিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

পাহাড়ী রাস্তায় ঘোড়ায় চাপার জন্য দুটো জিনিস জানার দরকার হয়। যখন ঘোড়া উৎরাইতে নামে তখন নিজের শরীরকে হিসাব করে পিছন দিকে টান করে রাখতে হয়, নয়তো ঘোড়া মুখ গুঁজে সামনে হুমড়ি খাবে আর সওয়ারী ঘোড়ার ঘাড় টপকে গিয়ে পড়ে যাবে। আবার ঘোড়া যখন চড়াইতে ওঠে তখন ঘোড়ার ঘাড়ের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, নয়তো ঘোড়ার পা পিছলাবে ভারসাম্য থাকবে না। সাড়ে তিন কিলোমিটার টানা চড়াই যে কীরকম হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। মাঝখানে দুবার ঘোড়া থামল জল খাবার জন্য। তার পেট থেকে ভুরুররর ভ্রু ডাক আসছিল। রণবীর সমানে আমার লাঠিটা দিয়ে পিটিয়ে গেল ঘোড়াদুটোকে। মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই আমি হাঁপিয়ে গেলাম। রণবীরকে বললাম, "থোড়া রুকোগে কেয়া?" রণবীর রাজি হল না যদিও সে বেচারাও বেশ হাঁপাচ্ছিল। আমার সন্তুর কথা

ভেবে রীতিমত দুঃখ হল। এখন ওকে জানানোর কোন উপায় নেই যে ব্রীজের কাছ থেকে যেন সে ঘোড়া করে নেয়। ঐ নয়/দশ কিলোমিটার চড়াই উৎরাই ভাঙার পরে এই তিন কিলোমিটার খাড়া চড়াই যেকোন মানুষের দম ছুটিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। আরও কিছুদূর যেতে বনজঙ্গলের পালা সাঙ্গ হল। সামনেই দেখলাম একটা খোলা মাঠ আর তারপরে ছোট ছোট কয়েকটা ঘর। ডান পাশ দিয়ে একটা ঝর্না তীব্র বেগে রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। রাস্তার উপরে গোড়ালি ডোবানো জল। রণবীরকে জিজ্ঞেস করলাম, এসে গেছে নাকি? সে জানাল আরও প্রায় এক কিলোমিটার। হায় ভগবান এখনো এক কিলোমিটার!

ওটা ঘাঙ্গারিয়ার হেলিপ্যাড আর তারপাশেই হোটেল খুলেছে কেউ। কোন পাকা ঘর নেই শুধু তাঁবু। আবার আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠছি তো উঠছিই। এবার ঠিক করেছি আর ভাবব না কতটা এলাম। এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি সামনে একটা তিন-চারতলা বাড়ী। রণবীর বলল, হোটেল আ গ্যয়া ম্যাডাম। ঘাঙ্গারিয়ার প্রবেশ পথের প্রথম হোটেল শ্রীনন্দা লোকপাল, আমরা সেটাই বুক করেছিলাম।

হোটেলের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দেখলাম একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গানো আর তাতে সন্তুর নাম লেখা। যাক হোটেল বুকিং-এর ব্যাপারে আর কোন চিন্তাই রইল না। হোটেলের মালিক আর কয়েকজন সেখানটায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আমি রুম নম্বর ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে নিলাম। রণবীর ঘোড়া থেকে মাল নামিয়ে আমার থেকে টাকা নিয়ে হাসি খুশী মুখে চলে গেল। তখন ঘড়িতে বাজে সোয়া বারোটা।

অত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার বাবু ভাবলেন আমি বুঝি আজকেই উপত্যকাতে যাব, তাই তিনি আমাকে নিজেই জানালেন আজ কিন্তু উপত্যকা বন্ধ। আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম, সে কি বন্ধ কেন? আমি জানতাম উপত্যকা হপ্তায় সাতদিনই খোলা থাকে। তিনি জানালেন গত কয়েকদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে পরশু দুপুরের দিকে ধ্বস নেমেছে উপত্যকার ভিতরে, তাই গতকাল বন্ধ ছিল। তবে আগামীকাল নিশ্চয়ই খুলে যাবে বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন তিনি।

আমি নিজেকে টানতে টানতে তেতলার ঘরে নিয়ে গেলাম। ঠায় তিন ঘন্টা ঘোড়া চড়ে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে। আমার লাগেজ যে রাখতে এল সে জিজ্ঞাসা করল আমি স্নানের জন্য গরম জল নেব কিনা? এক বালতি গরম জল ৬০/৭০ টাকা। এক বালতিতেই আমাদের দুজনের হয়ে যায়। কিন্তু এখন সন্তু কখন আসবে তার ঠিক নেই। তাই আমি লাগবে না বলে দিলাম। সে ঘরদোর একটু ঠিক ঠাক করে দিয়ে গেল।

ঘর খুব সুন্দর। একটা বড়সড় খাট আর তার মাথার কাছে দুদিকে দুটো জিনিস রাখার ছোট টেবিল। পায়ের কাছে বেতের দুটো সিঙ্গল সিট সোফা আর একটা টেবিল তারপরে আরেকটা সিঙ্গল খাট। ঘরটায় দিব্যি চারজন শুয়ে পড়তে পারবে। সবথেকে বড় কথা এই হোটেলটায় চব্বিশ ঘন্টা কারেন্ট থাকে। যেটা ঘাঙ্গারিয়ার সবথেকে বড় প্রবলেম। আমি বিভিন্ন ব্লগে পড়েছিলাম ঘাঙ্গারিয়ায় কোন কারেন্টের ব্যবস্থা নেই। কোন মোবাইল, এটিএম কিছু নেই। শহুরে জীবন সেই গোবিন্দঘাটেই ছেড়ে রেখে আসতে হয়। ব্লগগুলোতে লেখা ছিল জেনারেটরের সাহায্যে হোটেলগুলোতে সন্ধ্যেবেলা ঘন্টা তিন চার আর সকালবেলা ঘন্টা দুয়েক কারেন্ট দেওয়া হয়। কিন্তু নন্দা লোকপালের ম্যানেজার আমাদের আগেই

বলেছিলেন কপাল খুব খারাপ না হলে চব্বিশ ঘন্টা কারেন্ট পাবেন। আর আমরা তা পেয়েও ছিলাম। আমাদের ইলেকট্রিক কেটলি এই ট্যুরে বিশাল সার্ভিস দিয়েছে। ছাতুজল, চা আর কাপ নুডলস সবই তার কল্যাণে সময় মতো পেটে গেছে।

ঠাণ্ডা জলেই বেশ করে হাত মুখ গা পা ধুয়ে নিলাম, তারপর ব্যাগ খুলে এক প্যাকেট কেক বার করার সময় দেখি কাঁপুনি লাগছে। ছুটে গিয়ে লেপের ভিতরে আশ্রয় নিলাম। কাঁপুনি আর থামেই না। বুঝলাম এ হচ্ছে পাহাড়ী শীত, বেশী চালাকি চলবে না, মজা বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে। বেশ অনেকক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে থেকে কাঁপুনিটা বশে এল। কেক খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সন্তুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল।

দরজাটা খুলেই আবার এক লাফে বিছানায় চড়ে বসলাম বেশীক্ষণ থাকা যাচ্ছে না বাইরে। সন্তু ধূলিধূসরিত অবস্থায় প্রায় কোঁকাতে কোঁকাতে ঘরে ঢুকল। বলল পায়ের আর কিছু বাকি নেই। তখন প্রায় আড়াইটে বাজে। গরম জলের কেটলিতে বেশ চার পাঁচবার জল গরম করে সে গা ধুতে গেল। আমি কাপ নুডলস বানালুম। খেয়ে দেয়ে দুজনেই এবার লম্ফ দিয়ে বিছানায়।

সন্তুর ঘুম ভাঙল প্রায় সাতটার সময়। আমি আগেই উঠে হোটেলটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। হোটেলের লবিগুলোতে খুব সুন্দর ছিমছাম আলো লাগিয়েছে। লবিগুলোতে মাঝে মাঝে তেল মালিশ হেঁকে যাচ্ছে একটা দুটো লোক। সামনেই পাইনের জঙ্গল আর সূর্যের নরম আলো। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল। দুপুরবেলাতেও বৃষ্টি হচ্ছিল। তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এর মধ্যেই একেকটা গ্রুপ আসছে দেখছি। বাঙ্গালীরও অভাব নেই। আমাদের হোটেল ম্যানেজার বলল, আমিও বাংলা শিখে গেছি। তা বাঙ্গালীদের বিখ্যাত বা-ন্দি ভাষার কল্যাণে বাংলা শেখা ছাড়া বিশেষ গত্যন্তর থাকে না হোটেলওয়ালাদের সেটা অন্যান্য জায়গাতেও দেখেছি। তবে ভ্রমণ বিলাসী বাঙ্গালী এত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়ে উঠেছে সেটা আগে জানা ছিল না। বিশেষ করে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারসের সব ব্লগই দেখেছি অবাঙালীদের।

দু একজন বাঙালী এসে আলাপও করে গেল আমার সঙ্গে। তিনতলার বারান্দায় প্রায় এক ঘন্টা বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা আর আলাপচারিতায় কাটানোর পরে খেয়াল হল সন্ধে নেমে গেছে। ঘরে এসে সন্তুকে ডেকে তুললাম, চা বানানো হল। খেয়েদেয়ে আবার বিছানায় আজকে সারাদিনে সন্তু কি কি ফোটো তুলেছে তা দেখা হল। কারেন্ট থাকার আরেকটা সুবিধা এক্সট্রা ক্যামেরার ব্যাটারি ক্যারি করতে হয় না। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারের জন্য নিচে নামলাম। খেয়ে দেয়ে ফোন করলাম বাড়ীতে। ওখানে বিএসএনএল ছাড়া মোবাইল টাওয়ার পাওয়া যায় না। হোটেলের রিসেপশনের স্যাটেলাইট ফোনই ভরসা। এক মিনিট দশ টাকা। আমরা ঠিকঠাক আছি, কোন ল্যান্ডস্লাইড হয়নি এইসব জানিয়ে টানিয়ে রুমে ফিরে এলাম। কাল আবার ভোর ভোর উঠতে হবে, স্বর্গদ্যান অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নিয়ে।

১০ অগাস্ট ২০১৬, পঞ্চম দিনঃ

ঘুম ভেঙেছিল অ্যালার্মের ডাকে ঠিক পাঁচটায় কিন্তু পরস্পরকে তাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। যথারীতি মুখ ধুয়ে ছাতুজল আর চায়ের পালা মিটিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর্ব। আপাদমস্তক ধড়াচুড়ো চাপিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। হোটেল থেকেই আমরা খাবার প্যাক করে নিলাম।

লবিতে আরেকটা যুগল বেরোচ্ছে, মেয়েটা দুটো লাঠি সামলাচ্ছে দেখেই আমাদের লাঠির কথা মনে পড়ল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "লাঠি লাঠি।" মেয়েটা ফিক করে হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "বাঙালী?" ব্যাস বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আগের দিন উপত্যকা বন্ধ থাকায় ওরা হেমকুণ্ড ঘুরে এসেছে। আজকে উপত্যকা যাবে। আমিও বেশ একটা জুড়ি পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। ঘাঙ্গারিয়া ছোট্ট গ্রাম। হোটেল আর রেস্টুরেন্টের সংখ্যাই বেশী। একটা বেশ রঙচঙে গুরুদ্বার আছে। সেখানে বিনাপয়সায় হেমকুণ্ড যাত্রীরা থাকতে পারে। ঘাঙ্গারিয়া খোলা থাকে মে থেকে অক্টোবর অবধি। কারণ ওই সময়ই হেমকুণ্ড আর উপত্যকার যাত্রীরা সব ভিড় করে এই ছোট্ট গ্রামটাতে। উপত্যকাটা খোলা থাকে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি। কিন্তু জুন মাসে উপত্যকাতে ফুল থাকে না বললেই চলে। বড় বড় গ্লেসিয়ার দেখা যায়। বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। ফুলের মরসুম পুরোদমে শুরু হয় জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। চলে প্রায় অগাস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আবার তারপর থেকে ফুল ঝরতে শুরু করে। সেপ্টেম্বরে ফুল অনেকটাই কমে যায় আর গ্লেসিয়ারও গলে যায়। তারপর থেকে উপত্যকা তার উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের বদলে ছাই রঙা কাপড়ে মুড়ে নেয় নিজেকে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই উপত্যকা বন্ধ হয়ে যায় সাধারণত। তখন ঘাঙ্গারিয়াও প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। সবাই নেমে চলে যায় জোশীমঠে।

ঘাঙ্গারিয়া গ্রামটায় একটাই সরু রাস্তা। আর রাস্তার দুধারেই হোটেল। বেশীরভাগ রাস্তায় মাথার উপরে পলিথিন শীট দিয়ে ঢাকা দেওয়া। সরু রাস্তায় উঁচু নিচু পাথর আর ঘোড়াগুলোকে টপকে টপকে প্রায় পাঁচশ মিটার এসে আমরা খোলা প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়াতে পারলাম। এখানে রাস্তা চওড়া। সামান্য ঢালু রাস্তা ধাপ কেটে কেটে উঠে গেছে সামনে। সামান্য দূরেই পাহাড়ের উপর থেকে সগর্জনে ঝরে পড়ছে হেমগঙ্গা, নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে পুষ্পবতীর সঙ্গে মিলবে বলে। হেমগঙ্গার উপরে একটা ছোট কাঠের পুল পেরিয়ে আমরা ঝর্না আর পাহাড়ের ছবি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুঝে উঠতে পারছিলাম না কাকে দেখব। এদিকে জলকণায় কুয়াশাবৃত প্রচণ্ডা নর্তকী ঝর্না আর ওদিকে সূর্যের প্রথম আলোয় সোনালী মুকুট পরে হিমালয় সন্ন্যাসীরাজা। একজন প্রায়স্বচ্ছ বসনে দেহের বিভঙ্গে তাল তুলে কলকল কণ্ঠে লাস্যময়ী, অন্যজন নিরব গাম্ভীর্যের অটলতার আড়ালে সামান্য কৌতুক চোখে নিয়ে নিরীক্ষণ করছে তাকে। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তার শান্ত নির্মল হাসি।

ঝর্নার আগেই রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে; পাথর বাঁধানো চওড়া রাস্তাকে ফেলে রেখে একটা ছোট পায়ে চলা পথ ঢুকে গেছে বনজঙ্গলের মধ্যে। সেইখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আউলির সেই বাঙালি ডাক্তারের। তাঁর দলবল আজ ঘোড়ায় চেপে হেমকুণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, কাল তারা আসবে উপত্যকায়। আমরা পায়ে চলা পথ ধরে মূল রাস্তা থেকে সরে এলাম। এখনই রাস্তার দুপাশে ফুল, পথে পড়ে আছে ঝরে যাওয়া ফুল; এখনো আমরা উপত্যকার গেট পর্যন্ত পৌঁছাইনি। প্রবেশদ্বারের আগেই প্রকৃতি আমাদের ফুল বিছিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। শ্রী নন্দা লোকপাল হোটেল থেকে উপত্যকার গেট প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক লোক জড়ো হয়েছে। গতকাল বন্ধ ছিল, তাই অনেকেই আজ যাচ্ছে উপত্যকা দেখতে। গেটের কাছে মেলা বসে গেছে একেবারে। সন্তু গিয়ে নামধাম এন্ট্রি করে টিকিট কেটে আনল।

উপত্যকার ভেতরে ঘোড়ার প্রবেশ নিষেধ। তবে হাঁটতে অক্ষম হলে তারও গতি আছে; পিট্ঠু, পালকি করেও অনেকে যাচ্ছে। পিট্ঠু হলো একটা বেতের ঝুড়ি যেটায় মানুষ চেয়ারের মত বসতে পারে আর সেটাকে একজন পিঠে করে নিয়ে যায়। পালকি চারজনে মিলে বয়ে নিয়ে যায়। এটাও একটা চেয়ারের মত। আমরা হাঁটা লাগালাম।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নুড়ি আর পাথর ঢালা পথ। কয়েক'শো মিটার যেতেই প্রথম ঝর্নাটা পড়ল। একটা টিনের পাত আর চারটে গাছের ডাল দিয়ে বানানো ব্রীজ। টলমল করতে করতে পার হলাম। ব্রীজ পেরিয়ে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ছাড়লাম। একটা ফাঁড়া গেল। এবার চড়াই। সামনেই একটা টিলা মতন পাহাড় সেটাকে টপকাতে হবে। পাহাড়ে বেয়ে বেয়ে ওঠা হল, আবার উলটো পিঠে নামা হল। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা অদ্ভুত গাছ। গাছটার আশেপাশের ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে রেখেছে লোকেরা। গাছটা দর্শনীয়। ইয়া মোটা গাছটার গুঁড়িতে একটা ফোঁকর। দিব্যি চেয়ারের মত বসা যায়। পরে বুঝলাম গাছের গুঁড়িটা পুরো ফাঁপা। একটা মানুষ লম্বা হয়ে গুঁড়ির ভেতরে দাঁড়িয়েও পড়তে পারে।

ওখানে ফটোসেশন শেষ হলে গাছকে পাশে রেখে আমরা পাথর বিছানো পথে হাঁটতে থাকলাম। গাছে চেরি ঝুলছে। এখনো পুষ্ট হয়নি। দুপাশের জঙ্গলে ছোট ছোট ফুল, তাদের ছোট্ট পাপড়িতে রঙ আর ধরে না! আরও কয়েক'শো মিটার গিয়ে একটা পাকা পোক্ত ব্রীজ পেলাম। দুপাশে কংক্রিটের থাম আর লোহার ব্রীজ। পুষ্পবতী নদী ভীমবেগে বয়ে যাচ্ছে তার তলা দিয়ে। নদীর রূপ দেখে রীতিমত ভয় লাগে। এই নদী যদি ঐ রেলিং ছাড়া দেড় ফুটি চওড়া কাঠ আর টিনের উপর দিয়ে পেরোতে হত তাহলে সত্যি আমি শিবশম্ভুকে প্রণাম জানিয়ে এখান থেকেই ফিরে চলে যেতাম। বড় বড় বোল্ডারের মত পাথরের উপর দিয়ে কোনরকমে পা ফেলে ফেলে নামলাম ব্রীজের কাছটায়। পাশেই এক বিশাল খাড়া কালোপাহাড় উঠে গেছে বনজঙ্গল সব ভেদ করে স্বর্গকে ছোঁবে বলে। আমরা ব্রীজের উপরে উঠে এলাম। পাথরে পাথরে আঘাত খেয়ে জলকণা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ব্রীজের উপরে দাঁড়ানো মানুষজনকে। সেই সঙ্গে বইছে প্রবল হাওয়া। হাওয়ার তর্জন আর নদীর গর্জনে কান পাতা দায় ঐ জায়গাটায়। একসঙ্গে চার পাঁচ জনের বেশী দাঁড়াতে দিচ্ছে না ব্রীজের উপরে। একজন বনকর্মী বা গাইড দেখলাম ব্রীজের মুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলছে। আমরাও তাড়াতাড়ি কয়েকটা ফোটো তুলে এগিয়ে গেলাম। উপত্যকার গেট থেকে এই ব্রীজ প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব তো হবেই। কিন্তু এই এক কিলোমিটার সমতলের এক কিলোমিটার নয়। এর মধ্যেই আমাদের দুবার চড়াই ভাঙতে হয়েছে। আর ব্রীজের পর থেকে শুরু হচ্ছে একটানা চড়াই।

আমি তখনই হাঁপিয়ে গেছি। এখানের ভিউটাও বেশ সুন্দর। তাই নদীর পাশে একটা বড় পাথরের উপরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম আর বিস্কুট চিবোলাম। এবার শুরু হল চড়াই। প্রায় সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে রাস্তা। সেখানে শূন্য শতাংশও মসৃণতা নেই। এক পা বাঁদিকে দুমড়ে পড়ছে তো আরেক পা ডানদিকে। যেখানে পা পড়ছে সেখানে হয়ত পাথর ছুঁচালো হয়ে আছে। নয়তো দুই পাথরের মধ্যিখানে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে জুতো সমেত পা। পচা পাতা আর কাদার আস্তরণে মাঝে মাঝেই পাথরে পিছ্লাচ্ছে। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস যাবো বলে বাটা থেকে ভালো মত কড়ি খরচ করে দুজনে দুটো জুতো কিনেছি। ছয়মাসের ওয়ার‍্যান্টিও দিয়েছে। জুতোর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে আজকে। কিছু হলেই ফিরে গিয়ে দোকানদারকে চেপে ধরব। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিন ফুটের রাস্তা। কোথাও কোথাও সেটা দু'ফুট। তারমধ্যে পিট্ঠু আর পালকির অত্যাচার। তারা আমাদের থেকে অনেক দ্রুতবেগেই উঠছে। তাদেরকে জায়গা করে দিতে

হচ্ছে বারে বারে। একবার থামলে তাদের টাল সামলাতে অসুবিধা হবে। অন্যান্য ট্রেকাররাও আমার থেকে একটু দ্রুতই উঠছে। কখন কখন তাদের জন্যেও পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হচ্ছে। চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়ে নিয়ে খাড়া রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রতি বাঁক ওঠার পরেই দমে টান ধরছে, থেমে যাচ্ছি। মাঝে মাঝেই শ্যাওলাধরা বসার জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। হাঁটতে থাকলে গলা শুকিয়ে যায়, কিন্তু জল খাওয়া চলবে না। অবশ্য কিছুক্ষণ বসলেই আবার ঠিক হয়ে যায়। পাহাড়ী রাস্তায় বেশী জল খেয়ে ফেললে দমে ঘাটতি হয়। আমরা একটার পর একটা লজেন্স চিবুচ্ছি। সাড়ে তিন কিলোমিটার খাড়া চড়াই। প্রথম দু কিলোমিটারের পর থেকেই ক্রমাগত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছি, "দাদা আর কতদূর।"

একটা বাঁকে দেখি একটা বড় ভূর্জপত্রের গাছ। এই গাছের ছড়াছড়ি উপত্যকার মধ্যে। এই গাছের ছালের উপরেই প্রাচীন ভারতে পুঁথি লেখা হত। গাছের ফাঁক দিয়ে উপত্যকার একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে। সবুজে সবুজ একটা লোভনীয় উপত্যকা। মেঘের একটা ছোট নৌকা ভেসে যাচ্ছে সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে। ভালো করে দেখি, সেই যে কালো পাহাড়টা... যেটা আমরা ব্রীজের কাছে দেখেছিলাম সেটার প্রায় পেট বরাবর উঠে এসেছি আমরা। এবারে তার চূড়োটা দেখা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে পিছনে ফেলে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। উপত্যকা অবধি পৌঁছতে হবেই হবে।

"সামনে কিন্তু আর থামা যাবে না। একভাবে হেঁটে যেতে হবে?" একজন বনকর্মী জানাল। আমি ধপাস করে পাশের বাঁধানো জায়গাটায় বসে পড়লাম। "কেন?" আমার কথার উত্তর না দিয়ে বনকর্মীটা কোনদিকে যেন চলে গেল। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে সামনের বাঁকে, সন্তু উঁকি মেরে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী?

দু'দিন আগে যে ধ্বস নেমেছিল সেটা সামনে এসেছে। উপত্যকাতে ঢুকে থেকে ধ্বসের কথাটা মাথা থেকে বেড়িয়ে গেছিল। চমকে উঠলাম। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সামনের পাহাড়ের গায়ে প্রায় পঞ্চাশ মিটার জুড়ে রাস্তা বলতে কিছু নেই। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বন্যাস্রোতের মত নুড়িপাথর বয়ে গেছে একদম নিচে পুষ্পবতী নদী পর্যন্ত। তবে এখন সবই নিশ্চল। ভালো করে ঠাওর করলে দেখা যায় ঐ পাথর দিয়েই কোনরকমে বেঁধে একটা একফুটের রাস্তা বানানো আছে। ধ্বসের বহর দেখে বুক কেঁপে উঠল। তাহলে কি এখানেই?

পাশেই একজন বনকর্মী, তিনি একজন করে লোক ছাড়ছেন। সেই লোক রাস্তাটা পেরিয়ে গেলে তবে আরেকজনকে ছাড়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু ভয় আছে নাকি?" উনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, জলদি জলদি পেরিয়ে যেতে হবে জায়গাটা নয়তো যেকোন সময় উপর থেকে পাথর গড়িয়ে এসে গদাম... বাকিটা আর শোনার দরকার নেই। জয় বাবা রুদ্রনাথ বলে মরণফাঁদে আমি পা বাড়ালাম। যতটা পারছিলাম তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে উপর দিকে তাকাচ্ছিলাম। এরমধ্যেই শুনলাম সন্তু পাশ থেকে বলছে আর দেখতে হবে না চল। বেশী জলদি চলার উপায় নেই কারণ ভালো খাড়াই, হাঁপ ধরে যাচ্ছে। ধ্বসের অংশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়, খাড়াই পথে দ্রুত চলতে গিয়ে উলটো বিপত্তি ঘটল, দমে প্রচণ্ড টান পড়ল আর মাথা ঘুরে গেল। সন্তু একটু পিছিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি এসে ধরল। মনে হচ্ছিল যেন ফুসফুস অবধি হাওয়া পৌঁছাচ্ছে না। বুকের ভেতরে বাজ পড়ছে। হৃৎপিন্ড যেন খাঁচা ভেঙে বাইরে বেড়িয়ে আসবে। এক পা এগোনোর ক্ষমতা নেই আর। কারা যেন সামনে থেকে বলছে, "চলা আও চলা আও, উপরসে পাথর আকে গদাম..." কানের মধ্যে সমস্ত শব্দ ইকো হয়ে হয়ে ঢুকছিল। চলা আও বললেই কি আর আসা যায়, সামনে

#

প্রায় ষাট ডিগ্রীর বেশী চড়াই। আমি কি এক আশায় মাথা ঘোরালাম পিছন দিকে। মনে হল আমরা কি একাই দাঁড়িয়ে আছি নাকি? পিছনে দেখি ধ্বসের মধ্যেই এক পিট্ঠু তার পিঠের মানুষকে নামিয়ে বিশ্রাম করছে। আমার সেই বান্ধবীও এক জায়াগায় বসে পড়েছে। সঙ্গে তার বরও। একটু সাহস এল মনে। আসিলে আসুক পাথর। এইতো অন্যেরাও একভাবে চলতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বসের মাঝেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্বাস চলাচল খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। হৃদয়টাও বশে এল। এবার আর দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে সন্তুর হাত ধরে ষাট ডিগ্রীর চড়াইটা বেয়ে বেয়ে উঠলাম। উপরে উঠে একটু দাঁড়িয়েছি তখনও পাশ দিয়ে একটা ছেলে বলতে বলতে গেল, "মাত ঠাহরো, পাথর গিরে গি।" আমি দাঁত খিঁচিয়ে বল্লুম, "গিরুক।" মনে মনে ভাবলাম, যদি পাথরের পড়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে পড়বে, আমি তার জন্যে এই পাহাড়ী চড়াইতে দৌড়ে দৌড়ে প্রাণ দিতে রাজি নই। আর কয়েক পা গিয়েই জঙ্গল শুরু। কোনমতে শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম। বসার জায়গা আছে। বসে এবারে জল খেলাম। ঠিক করলাম যতক্ষণ না বুকের ধড়াস ধড়াস একদম কমে যাচ্ছে ততক্ষণ এখানটায় বসব। একটু পরেই আমার সেই বান্ধবী চলে এল। সেও হাঁপাচ্ছে। বসল আমার পাশেই। আরেকজন বলতে বলতে গেল, "...গদাম..." তার উদ্দেশ্যে সে দাঁত খিঁচালো, "যত্তসব! সারা রাস্তাটাই নাকি পাথর পড়ছে, পড়লে পড়বে তা বলে এতটা রাস্তা, এরকম খাড়াই একভাবে হাঁটা যায় নাকি?" বান্ধবী আমার থেকে ক্ষীণাঙ্গী, তার মুখে এই কথা শুনে আমার একটু ভরসা জাগল। যাক মোটা বলে নড়তে পারছি না এমনটা নয়।

সেখানটায় বেশ কিছুক্ষণ বসে আমরা আবার রওনা দিলাম। বান্ধবী আরও কিছুক্ষণ বসবে বলল। আবার সেই একই বাঁক আর ওঠা। ক্রমশঃ অস্থির লাগছে, এই ওঠার যেন আর শেষ নেই। একজনের কাছ থেকে শুনলাম আগের রাস্তা নাকি অনেক ভালো ছিল। সামান্য চড়াই সেই রাস্তা পুষ্পবতী নদীর ধার দিয়ে দিয়েই যেত। বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। এই নতুন রাস্তা আগের থেকে আরও পাঁচশো মিটার বেশী আর অনেক বেশী চড়াই। সামনেই আরেকটা ল্যান্ডস্লাইড জোন। জুলাইতে নাকি মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে। আগেরবারের মত দ্রুত চলে ভুল করলাম না। আস্তে আস্তে হেঁটে একবারও না বসে পুরো ল্যান্ডস্লাইডটা কভার করলুম। এটা আগেরটার থেকে অনেক কম খাড়াই। প্রায় উপত্যকার কাছাকাছি চলে এলাম সেটা বুঝতে পারছিলাম। ঘন জঙ্গল আর নেই। পাশের পাহাড়, নদী দৃশ্যমান। একটা ছোট ঝর্না পড়ল। একজন বনকর্মী আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, এইসব জায়গায় বেশী না দাঁড়াতে। সামনেই একটা বড় ঝর্না। কিন্তু কোন ব্রীজ নেই। পাথরের উপর দিয়ে দিয়ে কোনরকমে জল বাঁচিয়ে পার হলাম। আবার একটা ল্যান্ডস্লাইড। জুলাই মাসে প্রকৃতির খেলাধূলার চিহ্ন। এই ল্যান্ডস্লাইডটা পেরনোর পরে বুঝলাম সারা দেহ বিদ্রোহ করছে। আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। অথচ সামনে উপত্যকার মনোরম দৃশ্যরা ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে লোভ দেখাচ্ছে। পুষ্পবতী নদীকে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে বিস্কুট আর গ্লিকারস খেয়ে আবার হাঁটা দিলাম। এবার খানিকটা উৎরাই, তারপরে আবার চড়াই, আবার উৎরাই... উৎরাই এলেই ভয় লাগছে আবার চড়তে হবে বুঝি। তবে আগের মত খাড়া চড়াই আর নেই। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আর কতদূর। সে বলল, "একদম চলেই এসেছেন। আর একটুখানি।" কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ম্যাজিক পর্দার মত সামনের পাহাড়টা সরে গেল আর সম্পূর্ণ উপত্যকাটা চোখে ধাঁধা লাগিয়ে একেবারে ঝিকিয়ে উঠল। সবুজের কত রকমের শেড্স হয় তা আমি জানিনা কিন্তু প্রকৃতি জানে। যতদূর চোখ যায় ততদূর অবধি এই সবুজের নিরবিচ্ছিন্ন গালিচা দেখে এরকমটাই মনে হল। একটানা পাহাড়ে ওঠার ধকল নিমেষে উড়ে গিয়ে মন একেবারে ফুরফুরে ডানা লাগিয়ে

প্রজাপতির মতই নেচে বেড়াতে লাগল উপত্যকাময়। উপত্যকাটা দেখে আমার বারবার একটাই বিশেষণ মনে আসছিল, সেটা হল কাঁচা, কাঁচা সৌন্দর্য্য। এর আগেও আমি হিমালয়ে ঘুরেছি, গেছি গুরুদোংমার লেক। কিন্তু যেখানেই গেছি সেখানেই মানুষের ছাপটা বড্ড বেশী ভাবে ফুটে উঠেছে। হয় ইলেক্ট্রিকের তার নয়তো কংক্রিটের বাড়িঘর বা মনুষ্যকৃত পূজাস্থানের আড়ম্বর সবসময়ই চোখকে বাধা দিয়েছে। মনে হয়েছে এ যেন প্রকৃতির থেকে বেশী শুধু মানুষের জয়যাত্রার পালা দেখা। কিন্তু এই প্রথম, জীবনে প্রথমবার প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল এর কোলে একদিন কাটানোর কাছে সারা পৃথিবী জয় করার সুখও তুচ্ছ। এ সেই বৃহতের থেকেও বৃহত্তর যাঁর সামনে দাঁড়ালে মৃত্যুকেও বড় নিজের বলে মনে হয়। ঈশ্বরের থেকেও বড় শিল্পী, ভগবানের চেয়েও বেশী লীলাময়। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে উপত্যকাটাকে মনপ্রাণ আর চোখ দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে পুরে নিতে চাইলাম। আর হয়তো এখানে আসা হবে না কোনদিন, কিন্তু কোনভাবেই যেন ভুলে না যাই এই স্বর্গকে। চারধারে সবাই ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। ছবিতে তো শুধু কিছু নিম্নমানের দৃশ্য ধরা পরে, আর এই বর্ণ, গন্ধ, অনুভব আর ব্যাপ্তির সবটাই অধরা থেকে যায়।

পথের সঙ্গে একটু লাগোয়া পাথরের একটা চাতাল। তার উপরে পাথরের ঢিবি। অনেকে পথেই বসে পড়েছে। আমি একটু এগিয়ে গেলাম চাতালের উপর দিয়ে। সামনেই খাদ। কিন্তু আমার কোন ভয় লাগছে না। স্বর্গে পৌঁছে গেলে কি আর ভয় থাকে? আমরা বেশ কিছুক্ষণ চাতালে বসে থাকলাম। পা আর এগোতে পারছিল না। মনে হল এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে। অনেকেই দেখলাম ওখানে বসে থেকে থেকে। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। উপত্যকাটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ছোঁয়া গেলনা। আমরা বসে বসে বিস্কুট, কেক আর ট্যাং গোলা জল খেলাম। ছবি তুললাম অনেকগুলো। পায়ের অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পুষ্পবতী নদী উপত্যকাকে দু ভাগে ভাগ করে দিয়ে। আমরা যেদিকে বসে আছি তার উল্টোদিকেও উপত্যকার মত। তবে ওই ধারে পাহাড় আরও ঢালু। সেখানে সবুজের মধ্যে কখনো সাদা, কখনো লাল ছোপ ছোপ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে বুঝিনি সেটা কি। পরে বুঝলাম ওগুলো ফুলের ঝোপ। এখানে হু হু করে হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে চাতালের উপর থেকে। অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণের জন্য শেষ মেঘের নৌকাটাও মিলিয়ে গেল উপত্যকার উপর থেকে। হিমালয়ের স্বচ্ছ দূষণমুক্ত বাতাসে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে দূরান্তকেও। বহুদূরে শেষ হয়ে গেছে সবুজ চাদর, ফুটে উঠেছে এক সাদাটে খয়েরী উপত্যকা, আর তারও পিছনে এক বিশাল কালোপাথরের পর্বত। উপত্যকার পাহাড়গুলোর থেকেও উঁচু তার মাথা। ছুঁয়ে আছে আকাশকে। দেখ না দেখ মেঘ এসে ঢেকে দিল পাহাড়টাকে। তারপর আর বাকি সময়টায় ওই পাহাড়টাকে দেখতে পাইনি। আমি প্রথমে চমকিত পরে উত্তেজিত। উপত্যকা আমাকে সুযোগ দিল একবার তাকে নিরাবরণ দেখার। এ ভাগ্য ছাড়া আর কি।

ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, ফুঁলো কে বাঁদিয়া, আমার কাছে স্বর্গোদ্যান। সাম্প্রতিককালের মধ্যে এই স্বর্গোদ্যান প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন এডিনবুর্গ বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক সদস্য ফ্র্যাঙ্ক এস. স্মিথ। ১৯৩১ সালে তিনি এক এক্সপিডিশনে আসেন এই অঞ্চলে আর "The valley of Flowers" নামে একটা বই লেখেন। তিনি এখান থেকে হাজারের উপরেও নতুন ধরনের ফুল কালেক্ট করেছিলেন। তাঁর কাজকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেক হিমালয়প্রেমী জোয়ান মার্গারেট লেগে ১৯৩৯ সালে এই স্বর্গোদ্যানে আসেন ফুলের সন্ধানে। তিনি এই উপত্যকায় কিছুদিনের জন্য ক্যাম্প করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাহাড়ের উপর থেকে ফুল তোলার সময় তিনি পড়ে গিয়ে মারা যান। উপত্যকার মধ্যে আজও তার

#

কবর আছে মার্বেলে বাঁধানো; তার উপরে লেখা আছে; "I shall lift my eyes up to Himalayas, from whence cometh my help"।

এক ফালি বাঁকা চাঁদের মত উপত্যকাটা প্রায় দশ কিলোমিটার লম্বা আর চওড়ায় প্রায় দুই কিলোমিটার। এর সর্বোচ্চ অংশ ৩৯৬২ মিটার উঁচু আর সর্বনিম্ন অংশের উচ্চতা হল ৩৬৫৮ মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে। সম্পূর্ণ উপত্যকাটা পুষ্পবতী নদী দিয়ে দুভাগে ভাগ করা। উপত্যকার শেষে যে বরফাবৃত বিশাল কালো পর্বত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম ঘোড়াধুঙ্গি পর্বত।

পৌরাণিক কথা অনুযায়ী এই উপত্যকার সঙ্গে জুড়ে আছে রামভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণের নাম। লক্ষ্মণের সঞ্জিবনী জড়িবুটি আনতে হনুমান এসে এখান থেকেই পাহাড় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে কোথাও একদা লক্ষ্মণের একটি মন্দিরও ছিল। শোনা যায় প্রাচীনকালে তিব্বতিরাও হিমালয় পেরিয়ে সেই মন্দিরে পূজো দিতে আসত।



ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স

বেশ কিছুক্ষণ বসার পরে সন্তু বলল, চল আরেকটু যাই। আমি খানিক গাঁই গুঁই করে রাজী হয়ে গেলাম। আবার আমরা হাঁটতে থাকলাম। এখনো চড়াই উৎরাই তবে আগের থেকে অনেক কম। সাদা পাথরের পথটা বেগুনী হয়ে গেছে ঝরা ফুলের দাপটে। আমাদের দুপাশে এখন আর জঙ্গল নয় বরং রংবেরঙের ফুলের ক্ষেত। মাথার উপরে উজ্জ্বল নীল রঙের মধ্যে সাদা মুক্তোর মত মেঘখচিত চাঁদোয়া আর পায়ের নিচে ফুলের গালিচা, চোখের সামনে পাহাড়ের অপূর্ব সব দৃশ্যপট। প্রকৃতির রাজবাড়ীতে ঢুকে গেছি আমরা। সন্তুর ক্যামেরা বিশ্রাম পাচ্ছে না মোটেই। আমি ধীরলয়ে হেঁটে চলেছি। যেদিকেই তাকাচ্ছি অপরূপ লাগছে। সব থেকে বড় কথা এই উপত্যকাকে আড়াল করে নেই কোন মনুষ্যকৃত জয়যাত্রার

#

পতাকা। এখানে শুধুই প্রকৃতি। প্রকৃতির লাবণ্য তার নির্মলতা নিয়ে বিরাজ করছে। আসো, দেখে যাও আমার রূপ এইটুকুই শুধু অনুমতি দিয়েছে দেবভূমি। তাকে ছোঁয়া নিষেধ, স্থাপনা পাপ।

উপত্যকায় প্লাস্টিক বা অন্য কিছু ফেলা প্রবলভাবে নিষেধ। দেখলে জরিমানার ব্যবস্থাও আছে। মানুষের নিজেরই এই জ্ঞান থাকা উচিত। তবে গাইডরা দেখলাম এ ব্যাপারে খুব কঠোর। কঠোরতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সিজনের সময় প্রতিদিন প্রায় আড়াইশো তিনশো মানুষ আসে এই উপত্যকায়। তাদের দশ শতাংশও যদি আবর্জনা ফেলে তাহলে খুব শীঘ্রই ফুলের উপত্যকা ধাপার মাঠ হয়ে যাবে। উপত্যকাতে কোনভাবে রাত্রিবাস করাও নিষিদ্ধ। সন্ধে সাড়ে ছটার বেশী হয়ে গেলে দশ হাজার টাকা জরিমানা। এই কঠোরতাগুলো আর অধিকাংশ যাত্রীর ভালো মানসিকতার জন্য এই স্বর্গদ্যানের কৌমার্য আজও অক্ষুণ।

হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা ঝর্না চলে এল সামনে। এর উপরে প্রথম বারের মত গাছের ডাল আর টিনের পাটাতন। ঝর্নাটা রীতিমত ফুঁসে ফুঁসে প্রপাতের মত হয়ে নামছে। মনে মনে একবার ঈশ্বরকে ডেকে নিয়ে পা বাড়ানো হল। মাঝখানে টিনের পাটাতন আবার কড়াং করে উঠল। কোনরকমে অন্যদিকে পৌঁছে হাঁপ ছাড়লাম। সামনে একটুখানি চড়াই তারপরেই একটা বিশাল একটা কালো পাথর। এই কালোপাথর থেকেই উপত্যকাটা আসলে শুরু। গেট থেকে এই কালোপাথর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। এরপরেও প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া যায় যেখানে উপত্যকা শেষ হয়ে গেছে। কালোপাথরের তলায় অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে তারা খাওয়া দাওয়া করছে। পিট্ঠু আর পালকিগুলোও এই পর্যন্তই আসছে। আমরা আরও পাঁচশো মিটার মত এগোলাম। দেখি আমার সেই বান্ধবী বসে আছে একটা পাথরের উপরে। উপত্যকার ভিতরে মানে ওই চাতালের পর থেকেই আর কোন সিমেন্ট পাথরে বাঁধানো বসার জায়গা নেই। আমি গিয়ে পাথরটার উপরে বসলাম। পাথরটা মোটেও চ্যাটালো নয় বরং ছুঁচালো। কোনরকমে পাথরের ঢালু অংশে নিতম্ব ঠেকানো গেল।

সমস্ত উপত্যকাতে আর কোন বড় গাছ বা কালো পাথরের মত বড় পাথর নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রূপালী জরির মত চিকচিকে ঝর্না নেমে এসেছে অজস্র। কেন যে মানুষ কল্পনা করছে শিবের জটা বেয়ে গঙ্গার অবতারণের কথা তা একেবারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। আমাদের জন্যই যেন সম্পূর্ণ উপত্যকাটা মেঘবিহীন হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে দু একটা মেঘের বজরা ভেসে যাচ্ছে বটে কিন্তু সেই আধো ঢাকা আধো খোলায় উপত্যকার রূপ যেন আরও অনবদ্য হয়ে উঠছে। চারপাশে ফুলের সমারোহ। প্রকৃতির নিজস্ব বাগান। আমি কেমন যেন দেখলাম হিমালয়ান টাইগারের চামড়া পরা এক চিরযুবক ভূর্জপত্রের ছাল জড়ানো এক চিরযুবতীর কাঁধে হাত দিয়ে গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে সামনের বাগানের মধ্যে দিয়ে। দৃশ্যটা এত স্পষ্ট দেখলাম যে চমকে উঠলাম। ওদের আবার দেখলাম নদী পেরিয়ে অন্যধারের পাহাড়ের গায়ে তারা যেন গলফ খেলছে। সপাটে একটুকরো মেঘকে শেষের কালো পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ভুরু কুঁচকে সেটাকে নিরীক্ষণ করছে যুবক আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে যুবতী।

আমি এবার নড়ে চড়ে বসলাম। কষ্টকল্পনা নাকি হ্যালুসিনেশন! পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে এসেছি, অক্সিজেনের অভাবে ভুলভাল দেখতে শুরু করলাম নাকি! সন্তু ততক্ষণে আমাদের ব্যাগ খুলে সকালের প্যাক করা খাবার বের করে ফেলেছে। আমি উপত্যকার থেকে চোখ সরিয়ে খাবারে নিবদ্ধ করলাম। আমার বান্ধবী খুব কথা বলতে

ভালোবাসে। সে অনেক কিছু বলছিল। ঠাণ্ডা বিস্বাদ কিছু একটা চিবোতে চিবোতে আমি ওর কথা শুনছিলাম। আমাদের সামনেই একটা পিট্ঠুর লোক তার খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরছিল। এই লোকটা আসার সময় অনেকটা পথ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। আমার বান্ধবীকে দেখে সে মেমসাব বলে হাসল। বুঝলাম বান্ধবীর সঙ্গে এই লোকের কথা হয়েছে। বান্ধবী আমাকে জানাল দুদিন আগের ধ্বসে নাকি এই লোকটা পাথরের আঘাতে সোজা পুষ্পবতী নদীতে গিয়ে পড়েছিল। তারপরে স্রোতের টানে বেশ কিছুটা ভেসে গিয়ে কোনরকমে উঠে আসতে পেরেছে ডাঙ্গায়। অন্য গাইডরা আলোচনা করছিল তাকে নিয়ে। আমি হাঁ করে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকালাম। সহ্যশক্তি আর দারিদ্র্য এদের কোন পর্যায়ে! দু দিন আগে অতবড় অ্যাক্সিডেন্টের পরেও আবার ঝুড়ি কাঁধে মানুষ বইছে। বান্ধবী বলছে, ওদের পাহাড়ী জান বলেই বেঁচে গেছে আমাদের আর বাঁচতে হবে না। তা বটে, ওরা এই হিমালয়ের পাথরের মতই শক্ত, চাট্টান আর আমরা ননীমাখনের পুতুল। আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা কোনভাবেই সম্ভব নয়। শিবঠাকুরের আপন দেশের মানুষ সব, হিমালয়ের আশীর্বাদধন্য। খাওয়া শেষ করে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন দিলাম। বান্ধবী কর্তাকে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞেস করতে বলল সে ফোটো তুলতে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমিও আমার কর্তাটিকে বললাম তুমিও যাও না। আমরা ঘন্টাখানেক এইখানেই বসি তুমি যতটা পারো ঘুরে এস। কর্তামশাই কেন কে জানে রাজি হল না। উপত্যকার মধ্যে অনেক অনেক দূর অবধি রংবেরঙের পিঁপড়ের মত মানুষ চলাচল করছে। তবে বেশিরভাগই ফিরে যাচ্ছে কালো পাথরের কাছ থেকেই। দিনের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত, অনেকেই দেখছি ফিরতি পথে অনুযোগ করছে, এহে কোথায় ফুল, শুধুই এক বেগুনী ফুলের ঝাড়। একজন তো রীতিমত আক্ষেপ করতে করতে চলেছে, কিছুই তো দেখা গেল না, শুধু শুধু এত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসা আবার এতখানি রাস্তা ভেঙে ফিরতে হবে। বুঝলাম শুধু প্রকৃতি একা স্বর্গীয় হলেই হয় না, মানুষের সেই মনটা থাকা দরকার যাতে সে স্বর্গসুধার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

ফেরার চিন্তা আমারও ছিল। ফুলের রাজত্বে কয়েকটা ফোটো তুলতে তুলতে হঠাৎ দেখি কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে উপত্যকাটা, আর দেখা যাচ্ছে না নরম সবুজ গালিচা। তার বদলে ছাইসাদা তুলোট মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে নিচ্ছে উপত্যকার রাণী। পাহাড়ের মাথায় মাথায় অন্ধকার ঘনাচ্ছে। দামাল হাতির মত ধূসর মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে সেখানে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাদের সাদা সাদা প্রকাণ্ড দাঁতের ঝিলিক। চারিদিকে একটা হাল্কা ছায়া ছায়া আবরণ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। প্রায় দেড়টা বেজে গেছে, আমরা ব্যাগপত্র তুলে নিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা দিলাম। বান্ধবীর বর ফেরেনি তখনও সে অপেক্ষা করতে লাগল। কালোপাথর ডিঙ্গিয়ে এসে ঝর্নার সামনে বসলাম কিছুক্ষণ। স্বর্গ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু প্রকৃতি তার শিঙ্গা বাজানো শুরু করে দিয়েছে। মেঘ ডাকছে গুরু গুরু স্বরে। অনেকেই বলছে বৃষ্টি আসার আগে ল্যান্ডস্লাইড জোনগুলো পেরিয়ে যাওয়া দরকার। বাস্তবের তাড়নায় কিছুক্ষণ ঝর্নার পাগলপারা রূপ দেখে উঠে পড়লাম।

চাতালের কাছে যখন এলাম তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। শেষবারের মত মাথা ফেরালাম স্বর্গভূমি দেখব বলে। কিন্তু না ততক্ষণে প্রকৃতি তার সাদা আঁচলে ঢেকে দিয়েছে সম্পূর্ণ উপত্যকাকে। চাতালের ঠিক পাশেই ঝুলে রয়েছে মেঘের দল। দেখা যাচ্ছে না পুষ্পবতী নদীকেও। পায়ে হেঁটে পেরনোর ঝর্নায় দেখলাম জল বেড়ে গেছে। আমার জুতো ভিজে গেল। যতক্ষণে জঙ্গল অবধি পৌঁছলাম ততক্ষণে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মুষলধারায় শুরু হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বরফকুঁচির মত বিঁধছে সেগুলো হাতে মুখে। আমার বন্ধু আর তার বরও দেখি এসে গেছে রেইনকোট মুড়ি দিয়ে। আমরাও ওয়াটার প্রুফ

#

জ্যাকেট পরে ছিলাম। অনেকেই গোবিন্দঘাট থেকে সস্তার পলিথিনের রেইনকোট চাপিয়েছে গায়ে। কিন্তু সেগুলো এই বৃষ্টি আটকানোর জন্য মোটেও কাজের নয়। তার উপরে জঙ্গলের গাছের ডালের খোঁচায় অনেকের রেইনকোট ছিঁড়ে গেছেও দেখলাম। আমরা আজকে রেইনকোটের প্যান্টটা পরে আসিনি। ভেবেছিলাম উরু ছাড়িয়ে লম্বা জ্যাকেট, প্যান্টের দরকার নেই। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম ভুল করেছি। প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে ক্রমশঃ। হেঁটে যাচ্ছি মাথা গুঁজে। প্রাণের দায়ে মাথা গুঁজতে হয়েছে কারণ জঙ্গলের ভেতরের হালকা অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে, পিছলতর হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি পাথর আর মাথার উপর থেকে সহস্রধারায় গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল। একেকবার পা ফেলছি আর নড়বড় করে উঠছে পাথরগুলো। একটু অন্যমনস্ক হলেই স্লিপ করে সোজা চলে যাব খাদে। পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘ নেমে এসে থম ধরে বসে রয়েছে পথের মধ্যে। তিন চারহাত দূরের মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় ল্যান্ডস্লাইড জোনটায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। একইসঙ্গে পাহাড় ঢাল বেয়ে উপর থেকে নেমে আসছে মেঘের স্রোত, আবার নিচ থেকে গুঁড়ি মেরে উপরে উঠছে মেঘের দল; মাঝখানের পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বেশ খানিকদূর অবধি। ক্যামেরা অনেকে আগেই প্লাস্টিকে মুড়ে পিঠের ব্যাগে চালান হয়ে গেছে। মনক্যামেরায় বন্দী করে রাখলাম সেইসব দৃশ্যকে।

চলে এলাম সাম্প্রতিকতম ধ্বসের কাছ অবধি। এখানটায় অতটা মেঘ নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশার মধ্যে ধ্বসের দৃশ্য যেন গিলে খেতে আসছিল। প্রতিমূহুর্তে মনে হচ্ছিল উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়বে। বৃষ্টির তো বিরাম নেই, বরং ফাঁকা জায়গায় তার তেজ বেশী। শীর্ণ ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে পাথরের গা বেয়ে। বিড় বিড় করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর যতগুলোর নাম মনে পড়ল আওড়াতে আওড়াতে হাঁটলাম। ধ্বসটা পেরিয়ে একটা হাঁফ ছেড়ে পাথরের বেঞ্চিতে বসলাম খানিক। এবারে খাড়া উৎরাই নামতে হবে। আমার চশমার উপর দিয়ে জলের ধারাস্রোত বয়ে চলেছে তাতেই একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে চশমার কাচ। মুছে লাভ নেই আবার ভিজে যাবে, খুলে রাখলে দূরদৃষ্টির অভাবে পাথরে হোঁচট খেয়ে সোজা খাদে চলে যেতে পারি। তাই যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি নামতে থাকলাম। খাড়াই পথে সোজাসুজি পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে পাতা ভিজে পথকে একেবারে পার্কের সুপার স্লিপার বানিয়ে দিয়েছে। আড়াআড়িভাবে পা রাখতে রাখতে সিঁড়ি ভাঙছি একের পর এক। লাঠি সম্পূর্ণভাবে একটা তৃতীয় পায়ের কাজ করছে। মাঝে মাঝে এক পা পিছলে গেলেও সে পতনরোধ করে দিচ্ছে। কবজি আর বাহু টন টন করছে বার বার লাঠির উপরে ভর দিয়ে দিয়ে। পায়ের অবস্থাতো তথৈবচ। মেঘ এসে আবার আমাদের ঘিরে ফেলছে। সামনের মানুষ বা পিছনের মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু আমরা দুজনে পাহাড়ের গা ধরে সরু পথে হেঁটে চলেছি। যেন বহুযুগের পরিব্রাজক সেই আমরাই, যুগ যুগান্তের ওপার থেকে হেঁটে চলেছি। যখন প্রায়মানুষের দল প্রথম আফ্রিকা ত্যাগ করে বেরিয়েছিল নতুন ঘরের সন্ধানে সেই দলেও যেন আমরা ছিলাম। রামায়ণের যুগে হেঁটে গেছি উত্তর থেকে দক্ষিণ ভূখণ্ডে। আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি হিমালয়ের অলিতে গলিতে সেই আমরাই।

এইভাবে কতক্ষণ হেঁটেছিলাম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ একসময় সামনেই দেখি পুষ্পবতী নদী। অনন্ত পরিব্রজনের স্বপ্ন ছেড়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল মন, পথ ফুরাতে আর দেরি নেই। জলের স্রোত আরও বেড়েছে, সঙ্গে তার গর্জনও। ব্রীজের উপরে দাঁড়ানো সম্ভবই হচ্ছে না। তবু কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, বসলাম নদীর পাশের পাথরের উপরে। এই তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি স্বপ্নের উপত্যকাকে। আর কবে ফেরা হবে তা তো জানি না। যতক্ষণ ছুঁয়ে থাকা যায়। এবার সামনে চড়াই। পাহাড়ী রাস্তায় দশ কিলোমিটার হাঁটার পরে খাড়া চড়াই একেবারে প্রাণ বের করে দিল। তারপরে কাদা মাটি

আর জমা জলের জ্বালাতন। এখানে লোকসংখ্যা বেশ বেশী। আবার একটা ঝরনা সামনে। সেই টিনের ব্রীজ। টলমল করতে করতে পার হলাম। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলেছি, কলুষিত মানুষের স্থান নেই স্বর্গদ্যানে রাত্রিযাপনের। সেখানে শুধু সেই চিরযুবক যুবতীর স্থান, তাদের মিলনভূমি। মানুষের জন্য আছে ঘাঙ্গারিয়ার হোটেল। তার উদ্দেশ্যেই হাঁটছি আমরা। প্যান্ট জুতো ভারী হয়ে গেছে বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে। গেটের কাছে চলে এলাম। সন্তু কাউন্টারে জানাতে গেল আমরা ফিরে গেছি উপত্যকা থেকে। ওরা নামের পাশে টিক দিয়ে দেবে। মেইন রোডে এসে দেখলাম সকালের ঝরনা আশেপাশের পাহাড় সব মেঘচাদরে মুড়ি দিয়েছে। কোনরকমে হেঁটে চললাম, এখানের রাস্তায় আবার ঘোড়ার অত্যাচার। হোটেলে যখন পৌঁছালাম তখন পাক্কা সাড়ে পাঁচটা। এক বালতি গরম জল অর্ডার করে তিনতলায় উঠলাম।

স্নান করে পেট ভরে গরম গরম কাপ নুডলস খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে জম্পেশ করে ঘুম লাগালাম। ঘুম ভাঙল ন'টায়। প্রথমে কিছুক্ষণ নড়তে পারলাম না। মনে হল কেউ যেন আমাকে বেদম পিটিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ ভোলেনি মালিশ করলাম হাতে আর ফাস্ট রিলিফ স্প্রে করলাম পায়ে। তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিচে নামলাম খাওয়ারের জন্য। ডিনার আর ফোনের পালা চুকিয়ে ফিরে গেলাম ঘরে। পরের দিন আর অত ভোরে ওঠার জ্বালা নেই। সেই স্বর্গভূমিতে যুবকযুবতীর প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে গেলাম।

১১ অগাস্ট ২০১৬, ষষ্ঠ দিনঃ

ঘুম ভাঙল পাক্কা ছ'টায়। অ্যালার্ম দিয়ে রাখিনি আজকে। ধীরেসুস্থে ছাতুজল আর চা খেয়ে রেডি হলাম হেমকুণ্ড যাওয়ার জন্য। আমাদের এখানে আসার যে আসল উদ্দেশ্য ব্রহ্মকমল, তার দেখা এখনও পাইনি আমরা। আজকে সেই অভিলাষ পূর্ণ হবে। অনেক বাঙালী দেখলাম হেমকুণ্ড না দেখেই চলে যাচ্ছে। আর শিখ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন উপত্যকা দেখতে যায়। কালকের জিন্স, জুতো মোজা সবই ভিজে ঠান্ডায় কাঠ হয়ে আছে। আজকে আর গতকালের মত ভুল করলাম না। দুজনেই ওয়াটার প্রুফের জ্যাকেট আর প্যান্ট দুটোই পরে নিলাম। আজকে উঠতে হবে প্রায় দেড় হাজার ফিট। উপরে রীতিমত ঠাণ্ডা লাগবে। তাই জ্যাকেটের তলায় মোটা সোয়েট শার্ট আর তার তলায় উলেন গেঞ্জি পরে রেডি হলাম। ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুণ্ডের চড়াই অত্যন্ত খাড়া, তবে পথ ভালো বাঁধানো। এই দিন আমরা দুজনেই ঘোড়া করে উঠব সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। ব্রেকফাস্টের জন্য যখন নিচে নামলাম তখন বাজে সাড়ে সাতটা। গরম গরম পনির পরটা আর এক প্রস্থ চা খেয়ে দুপুরের খাওয়ার প্যাক করে নিলাম আমরা। সন্তু গেল ঘোড়ার খোঁজে। আমি রেস্টুরেন্টেই বসেছিলাম। দেখলাম কালকে বান্ধবী আর তার বর ফিরে যাবার জন্য লাগেজ নিয়ে নেমে এসেছে। আমাদের আরেক চোট গল্প হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারছি না। এও মনে আছে যে তারা সাতগাছিতে থাকে।

সন্তু ঘোড়া ঠিক করে ফিরে এল। শেষবারের মত বান্ধবীর সঙ্গে ফোটো তুলে আমরা দুই যুগল দুই দিকে রওনা দিলাম। আবার কালকের পথের প্রথমাংশ। সেই ঝরনা, তবে আজকে সে খানিক খানিক কুয়াশায় ঢাকা। হেমকুণ্ডের রাস্তা সত্যি খাড়া। কালকে যে খাড়া পথে প্রথমে উঠেছিলাম উপত্যকায় এখানে তার থেকে আরও বেশী খাড়া পথ উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত। বার বার ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটে চলে যাচ্ছে খাদের দিকে। আমাদের সঙ্গে আসা লোকটা সামলাতে চেষ্টা করছে তাদেরকে। উল্টোদিক থেকে আসা একদঙ্গল ঘোড়ার

জিনে আমার পা জোর ঠুকে গেল। এই ব্যথাটা পরে খুব ভুগিয়েছিল। দু কিলোমিটার যেতে না যেতেই আমাদের কোমর, ঘাড় সব ব্যাথা করতে লাগল। কিছুক্ষণ রেস্ট বলে একটা চটি মতন দেখে আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম। সামনে পাহাড়ের গা বেয়ে কিছু ঝরনা বইছে। সন্তু রেলিং-এর ধারে গেল তার ছবি তুলতে। এই রাস্তায় যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য মাঝে মাঝেই চটি বানানো আছে। আর আছে রাস্তার ধারে অস্থায়ী শৌচালয়। আর একটু ঘুরে বেড়িয়ে কোমরের ব্যথা আর পায়ের ঝিঁঝি কাটিয়ে আবার ঘোড়ায় উঠলাম। পথ চওড়া, প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। অনেক জায়গাতেই পাশে রেলিং দেওয়া। প্রায় দেড় কিলোমিটার গেছি সেখানে এক জায়গায় দেখি পথের উপরে একটা বিশাল পাথর পরে রাস্তার প্রায় চারের তিন ভাগ খেয়ে নিয়েছে। একপাশে ফুট দেড়েকের মত পথ পড়ে আছে। পায়ে হেঁটে ওই সরু পথ পেরোতে অসুবিধা হয় না কিন্তু অন্যের পায়ের উপর কতটা ভরসা করা যায় বুঝতে পারলুম না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে পাহাড়ের দিকে বডিটা সামান্য হেলিয়ে জায়গাটা পেরোলাম। মাঝখানে একবার চোখ খুলে খাদটা দেখেছিলাম। আমি কেন ওখানে হাতি পড়লেও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপরেই কয়েক মিটার প্রায় সত্তর ডিগ্রী খাড়া চড়াই। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ঘোড়ার গলা ধরেই ঝুলে পড়ি। এবার মনে হচ্ছে পিঠের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে লেজ ধরে ঝুলতে হবে বোধহয়। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো চড়াই-এর মাঝখানেই ঘোড়াওলা ঘোড়া থামাল। আশেপাশে প্রচুর ঘোড়া গিজ গিজ করছে জায়গাটায়। খাদের দিকে বেশ কয়েকটা চটি দোকান। আমরা সেরকম একটায় ঢুকলাম। দুজনেই চা খেলাম। ঠাণ্ডায় নাকের ডগা বরফ হয়ে গেছে একদম।

গরম চা-এর কাপ হাতে পেয়ে নাকে একটু ঘষে নিলাম। এক কাপ চা খেতে ঠাণ্ডা যেন অনেকটা কমল। আবার যাত্রা শুরু। এবারে আরও খাড়াই চড়াই। ঘোড়ার পিঠে ফেভিকল দিয়ে নিজেকে সেঁটে নিতে ইচ্ছা করছিল মাঝে মাঝে। যত উপরের দিকে উঠছি তত হু হু করে হাওয়া বইছে। শীত যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এক জায়গায় দেখি রাস্তা জুড়ে বড়সড় ধ্বস নেমেছে। সেখানে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। খাদের দিকের খানিকটা রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চলাচল করছে। কোন মতে জয়বাবা শম্ভুনাথ বলে জায়গাটা পেরোলাম। তার পরেই দেখি আরেক জায়গায় মাত্র এক ফুট একটা নালীর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া উঠছে প্রায় ষাট ডিগ্রীর চড়াই বেয়ে। সেখানে আবার উপর থেকে ঘোড়া নামলে নিচের থেকে ঘোড়া উঠতে পারছে না। ভাগ্যভাল এটা খাদের দিক নয়। নয়তো সেখানেই হার্টফেল করতাম আমি। এরপরেই পেলাম রাস্তার এই অবস্থার কালপ্রিটকে। একটা ঝরনা, অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে এই অঞ্চলে মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছিল। ঝরনাটা বিপুলা হয়ে রাস্তাঘাট ধ্বসিয়ে নেমে গেছে কয়েকদিন আগে। ছবিতে কোথায় রাস্তা আর কোথায় পাহাড় কিছুই আলাদা করা যাচ্ছে না। বাস্তবিক আমরাও তখন আলাদা করতে পারছিলাম না। ঘোড়া যখন পা ফেলছে তখন দেখছি হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু সমতল বটে। এই করতে করতে ঝর্নার কাছে চলে এলাম। ও মা! ঝরনা পেরব কি করে? এখানে তো টিনের পুলও নেই। ঘোড়াওলা বলল কিচ্ছু চিন্তার নেই। ভালো কথা! উপর থেকে জল ঝরে পড়ছে, পায়ের (মানে ঘোড়ার পায়ের) তলায় নড়বড়ে পাথর আর খাদের দিকে তাকালে মাথা আরও ঘুরে যায়। সেই ঝর্নার জলরাশি পাথরে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জলকণার আবরণ তৈরী করে ছুটে চলছে। ঘোড়াটা ঠিক কিভাবে পার হল বুঝলাম না। একটা আট দশ ইঞ্চির ধাপ কাটা ছিল ঝর্নার মাঝে, ঐটা দিয়েই বোধহয়। নাঃ এইসব নিয়ে ভাবতে নেই। মাথা তুলে দেখলাম উপরে অনেকখানি কালচে সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। না এখনো পর্যন্ত ব্রহ্মকমল দেখতে পাইনি আমরা। ঘোড়াওলাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল মিলেগি জরুর।

#

হঠাৎ সন্তু পিছনের ঘোড়া থেকে চেঁচিয়ে বলল, "পাহাড়ের গায়ে দেখ।"

আমি ভাবলাম ব্রহ্মকমল বুঝি, পাহাড়ের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনজন মানুষ টিকটিকির মত বেয়ে বেয়ে উঠছেন পাথর গাছ খামচে ধরে। প্রথম জন একটু কমবয়স্ক যুবা, মাঝের জন মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা আর নিচের জন মধ্যবয়স্ক শিখ। তারা শর্টকাট করবে বলে ঘোরানো পথ বাদ দিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। দৃশ্যটা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল। উফ্ কি স্ট্যামিনা!

এখানেও রাস্তার ধারে ধারে অনেক ফুল। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস-এ যেমন ফুলের প্রাচুর্য দেখেছিলাম এখানে সেরকম নয়, তবে ভ্যারাইটি অনেক। ঘোড়ার পিঠে চেপে এক হাতে ক্যামেরায় ঠিক জুত করে ফোটো তুলতে পারছিল না সন্তু। মাঝে মাঝেই ঘোড়া থামাতে হচ্ছিল। হেমকুণ্ড যাওয়ার প্রথম দু' কিলোমিটার মোটামুটি খাড়াই, তারপর দুই কিলোমিটার অত্যন্ত বেশী খাড়াই। তারপর আবার দু' কিলোমিটার মোটামুটি খাড়াই। এই রাস্তায় কোন উৎরাই নেই। শুধুই উঠে যাও উঠে যাও মেঘ ভেদ করে। তীর্থস্থানটা একটা পাহাড়ের উপরে। একটা সময় কুয়াশা অনেকটা কেটে যেতে আমরা নিচের দিকে দেখছিলাম শীতঘুমে নিশ্চল অজগরের মত এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে পথ, বিসদৃশ্য নীল প্লাস্টিকে ঢাকা চটি আর সবুজ হলুদ রেলিং।

কিছুদূর গিয়ে সামনে আবার একটা ঝরনা পড়ল। এর উপরে লোহার পুল আছে। তবে ঘোড়া করে যাওয়ার সময় পুল একেবারে মচ মচ করে উঠল। আমার ঘোড়াটা একটা লাঠির বাড়ি খেয়ে সামান্য ছুটে গিয়ে পাহাড়ের আরেকটা বাঁক পেরোল। চোখের সামনে কয়েক মূহুর্তের জন্য কি যেন একটা অনবদ্য ছবি এসেই চলে গেল। ভয়ের চোটে পিছনে ঘাড় ঘোরাতে পারলাম না। সামনেই আবার বাঁক, রাস্তাও সরু। আবার বাঁক পেরোতেই এবার দৃশ্যটা আশ মিটিয়ে দেখলাম। ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র বেগুনী, লাল, নীল, গোলাপি ফুল ঝাড় ধরে ফুটে রয়েছে আর তাদের মাঝে মাঝে রাজদর্শনের মত দেখলাম ব্রহ্মকমল। উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট রঙের পদ্মের মতই বড় বড় ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। আবছা কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠছে তার ঔজ্জ্বল্য। ঠিক আমার স্বপ্নের মতই ফুলটা যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ব্রহ্মকমল হিমালয়ের ফুলগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। সাধারণত পাহাড়ের এত উপরে সব ফুলই ছোট ছোট অথবা সরু সরু অর্কিড জাতীয়, কিন্তু একমাত্র এই ফুলটাই বেশ বড়সড়। আমাদের দেশে একমাত্র হেমকুন্ডেই ব্রহ্মকমল দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও কেদারনাথ আর তুঙ্গনাথে এই ফুল পাওয়া যায়, কিন্তু তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা ঘোড়া থামাতে চাইলে আমাদের চালক রাজী হল না। বলল উপরে আরও ফুল পাওয়া যাবে।

ব্রহ্মকমল উত্তরাখণ্ডের স্টেট ফ্লাওয়ার। এখানকার মানুষ ফুলটাকে অসম্ভব পবিত্র মনে করে। এই ফুল ছেঁড়া মানে পাহাড়ে উপরে বিপর্যয় নেমে আসবে বলে মনে করে তারা। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে নন্দাষ্টমী উৎসবের আগে এক বিশেষ তিথিতে ব্রহ্মকমল তুলতে আসেন কেদারনাথ আর বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিতরা। তখন এই ফুল তুলে দেবতার বন্দনা করার পরে প্রসাদ হিসাবে যাত্রীদের দেওয়া হয়।

প্রায় এক কিলোমিটার আগে থেকেই শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাবী ভাষায় শিখ গুরুদের বন্দনার গান বাজচ্ছে মাইকে। নির্জনতা ভেদ করে তা ছড়িয়ে পড়ছে দূর দূরান্তে। আমাদের ঘোড়া চালক বলল, প্রার্থনা হচ্ছে। তাহলে হেমকুন্ডে পৌঁছে

গেলাম আমরা শেষমেশ। পথের শোভা দেখতে দেখতে এবার আর কোমর ব্যথাটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে এল না। হেমকুণ্ড সাহিবের মস্ত টিনের আটচালার সামনে ঘোড়া থেকে নামলাম। দুটো তিনটে বিশাল বিশাল আটচালা। এর মধ্যে লেকের একেবারে ধার ঘেঁষে বেশী রঙচঙে বাড়ীটা গুরুদ্বারা। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সকাল সোয়া আটটায়। এই তেরশ' ফিটের চড়াই উঠে আসতে ঘোড়াতেই লেগেছে তিন ঘন্টা; এখন এগারোটা বাজে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সূর্য মাঝে মাঝেই মেঘের আড়ালে মুখ লুকাচ্ছে। আমরা আটচালাগুলো পেরিয়ে লেকের ধারে চলে এলাম। নীল জল টল টল করছে বিরাট হ্রদটায়। তাতে ছায়া পড়েছে পাশের বরফাবৃত পর্বতচূড়াগুলোর। অপর পাশে হ্রদের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে মাথা তুলে আছে বিশাল বিশাল পর্বতচূড়া। তাদের ছুঁচালো সাদা মাথাগুলো সুর্যের আলোয় ঝিলিক তুলে খোলা কৃপাণের মতই ঝক ঝক করছে। মনটা পথকষ্ট ভুলে আগেই ভালো হয়ে গিয়েছিল, এখন একেবারে আহ্লাদে ফেটে পড়ল। আমরা ছুটোছুটি শুরু করলাম ছবি তোলার জন্য। কিন্তু ঠিক তখনই লেকের উপর দিয়ে ঠিক ইংরাজি ভুতের সিনেমায় যেমন দেখায় সেইভাবে গুঁড়ি মেরে মেঘকুয়াশা এসে ঢেকে দিল বিশাল হ্রদ আর পর্বতচূড়াগুলোকে।

গুরুদ্বারার দিকের পাড়টা সম্পূর্ণভাবে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। দু এক ধাপ ঘাটও বানানো আছে। শেকল আছে ধরে ডুব দেওয়ার জন্য পবিত্র হ্রদের জলে। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দু তিনজন শিখ তীর্থযাত্রী স্নান করছিলেন। অনেকেই হ্রদে নেমে অঞ্জলিতে জল নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছে। একটা জরিদার কালো শেরওয়ানি আর রূপোর অলংকার লাগানো বিশাল কালো পাগড়ি পরে মস্ত একজোড়া কালো গোঁফ নিয়ে একজন ভদ্রলোক লাঠি হাতে হ্রদের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ভদ্রলোক কেন ওরকম জমকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উনি আসলে হ্রদ পাহারা দিচ্ছেন। অনেকেই জুতো না খুলেই হ্রদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওঁর কাজ হল তাদেরকে ঠ্যাঙ্গানো। হ্রদের পাড়ের ফুট দুয়েকের মধ্যে জুতো পরে যাওয়া বারণ। আর হ্রদের জলে জুতো ঠেকানো তো নৈব নৈব চ।

শিখদের পবিত্র গ্রন্থ "গুরু গ্রন্থসাহিব"-এ গুরুগোবিন্দ সিং বলেছিলেন যে তাঁর পূর্বজন্মে তিনি একটি হ্রদের ধারে উপাসনা করেছিলেন যেটা ঘিরে আছে সাতটি বরফ ঢাকা পর্বতচূড়া। ১৯৩০ সালে হাবিলদার সোহান সিং এই হেমকুণ্ড হ্রদটি খুঁজে পান আর তিনি এটিকে শিখগুরুর উপাসনাস্থল হিসাবে চিহ্নিত করেন।

হেমকুণ্ড খুলে যায় মে মাসের মাঝামাঝি থেকে। ওইসময় কিছু একটা উৎসব থাকে শিখদের। প্রতিবছর মে জুন মাসে কয়েক লক্ষ শিখযাত্রী যায় হেমকুণ্ড দর্শনে। তারজন্যেই হেমকুণ্ডের রাস্তা পরিষ্কারভাবে বাঁধানো, চওড়া। তবে এত তীর্থযাত্রীর দশ শতাংশও যায় না ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ারস।

এই হ্রমকুন্ড হ্রদ থেকেই উৎপত্তি হেমগঙ্গা নদীর যেটা ঘাঙ্গারিয়ায় পুষ্পবতী নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই জায়গাটার কথা নাকি আছে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ মার্কেণ্ডেয় পুরাণে। এইখানেই ছিল ঋষি মেধস-এর আশ্রম, যিনি প্রথম সপ্তশ্লোকে চণ্ডীর বর্ণনা ব্যক্ত করেন। এছাড়াও হস্তিনাপুরের মহারাজ পাণ্ডুও এসেছিলেন এখানে।

হ্রদটা কুয়াশায় ঢেকে যেতে আমরা অন্যদিকে মন দিলাম। ব্রহ্মকমল। কোথায় সেইগুলো? কাছে যেতে হবে ছুঁয়ে দেখতে হবে একবার। হ্রদের পাড়ে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানেই নতুন এক আটচালা বানাবার কাজ হচ্ছে। বিশাল বিশাল টিনের শেড, রড আর স্টোনচিপ রাখা আছে। তার পিছনেই একটা ছোট পাহাড়। আমরা আটচালাটা ঘুরে

#

অন্যদিকে গিয়ে বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের গায়ে উঠলাম। রাস্তা থেকে ফিট তিরিশেক উপরেই একটা ব্রহ্মকমল পাহাড়ের কোল আলো করে বিরাজমান। একটু দূরে আরও একটা... আরও একটা! একটু উঠতেই দেখলাম গাঢ় সবুজ আর কালো পাথরের পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ-এর মত চলে গেছে আর তাদের গায়ে স্ফুরজ্যোতির্ময় অপার্থিব এক পুষ্পসম্ভারের কারুকার্য। আমরা কাছের ব্রহ্মকমলটার পাশে গেলাম। এ ফুল যেন সত্যিই স্বয়ংপ্রভ। অনেক পৌরাণিক কাহিনী আছে এই ফুল ঘিরে। বলা হয় গণেশের হাতির মাথা লাগানোর পরে এই ফুলের জলেই চান করে গণেশ বেঁচে ওঠে। এই ফুলই নাকি কৌরব লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তার পঞ্চস্বামীর সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় দেখেছিলেন এবং এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এছাড়াও লোককথা আছে এই ফুল ফুটতে দেখলে জীবনের সবথেকে অসম্ভব কামনাও পূরণ হয়। কিন্তু এই ফুল ফোটে রাতের অন্ধকারে তাও নাকি চৌদ্দ বছরে একবার, অতএব ব্রহ্মকমল ফুটতে দেখাও এক অসম্ভব প্রায় কামনা।



ব্রহ্মকমল

আমরা ফুলটাকে প্রায় কোলে করে কিছু ফোটো তুললাম। তারপরে পাথর বেয়ে বেয়ে আরও খানিক পাহাড়ের উপরে উঠে এক জায়গায় বসলাম। সন্তু গেল ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলতে। আমি বসে বসে আশেপাশের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগলাম। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারসের মত এখানে নিষ্কলুষ সবুজ চাদর বিছানো নেই পাহাড়ের গায়ে, বরং সবুজের সঙ্গে সঙ্গে যত্রতত্র খোঁচা খোঁচা উঠে আছে কালো পাথর। একফুট থেকে দোতলা বাড়ীর সমান উচ্চতা তাদের। তার মাঝেই ফুটে আছে বিভিন্ন রঙের অজস্র ফুল। যা দেখতে পাইনি ভ্যালিতে এখানে সেই রঙবেরঙের অজস্র ফুলের সমারোহ পেলাম আমরা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে হিমালয়ের বিখ্যাত ব্লু পপি, ইনুরি, মার্স অর্কিড আরও নাম না জানা বহু ফুল। এছাড়াও একটা ফুল দেখলাম গাঢ় নীল রঙের ছোট ফুল, নাম জেন্টিয়ানা ফিলোক্যালিক্স; এই ফুল নাকি উপত্যকাতে দেখতে পাওয়া যায় না হেমকুণ্ড সাহিবেই ফোটে।

শুনেছি আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরে নাকি নীলকণ্ঠ পর্বতচূড়া দেখা যায়। কিন্তু এখন সে আশা করাই বৃথা। মাঝে মাঝেই প্রবল বাতাস আর মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চারপাশ। একটা সময় এতই মেঘে ঢেকে গেল যে আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে থাকা ব্রহ্মকমলটাকেও আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম, কখনো কখনো সামান্য হেঁটে চলে ঠাণ্ডা কাটিয়ে নিচ্ছিলাম। সন্তুটা যে ছবি তুলতে কোথায় চলে গেল আর দেখতেই পাচ্ছি না। আরও কয়েকটা গ্রুপ এসে পৌঁছেছে হেমকুণ্ডে। তাদের মধ্যেও কয়েকজন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে। হেমকুণ্ডের ওই আটচালা আর সিমেন্টের বাড়ীগুলো না থাকলে এখানের প্রকৃতি আরও ভালোভাবে ধরা দিত মানুষের কাছে। কিন্তু যতবার পাহাড়ের উপর থেকে লেকটা দেখতে যাচ্ছি ততবার চোখ আটকে যাচ্ছে বিসদৃশ্য টিনের চালায়, মন বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছে। তবে উল্টোদিকে পাহাড়ের গায়ে ব্রহ্মকমলের ছড়াছড়ি সেখানে কোন বাধা নেই দৃষ্টির। দূরে দূরে একটা একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, কিন্তু তারাও যেন এই প্রকৃতির অংশ বলেই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় হিমালয়ের সমস্ত সুন্দর স্থানে আইন করে মানুষের বসবাস বন্ধ করে দেওয়া উচিত তাতে যদি প্রকৃতি কিছু রক্ষা পায়।

মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে, হু হু করে বয়ে যাচ্ছে আমার চুল উড়িয়ে মুখের উপর দিয়ে, এক অদ্ভুত অনুভূতি। জলকণায় ভিজে গেলাম পুরো। এতক্ষণে সন্তু নেমে আসছে পাহাড়ের উপর থেকে। আমরা ওখানে বসেই প্যাক করে আনা খাবার দাবার খেয়ে নিলাম। জল টল খেয়ে নেমে গেলাম আবার হ্রদের ধারে। ঠিক ছিল সন্তু এখানে স্নান করবে, সেইমত গামছা, জামাও আনা হয়েছিল কিন্তু আবহাওয়া যা ঠাণ্ডা! সন্তু একবার মোজা জুতো খুলে জলে নেমেই লাফিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা ফোটো তুললাম। পবিত্র জল মাথায় নিয়ে সন্তু হি হি করতে করতে উঠে এল। তারপরে গুরুদ্বারে গিয়ে আমরা গরম গরম চা আর ডালিয়া খেলাম। ওখান থেকে সব যাত্রীকেই দেওয়া হচ্ছিল। এবার ফেরার পালা।

সত্যি বলতে কি আমরা উপত্যকার থেকে অনেক বেশীধরনের ফুল দেখেছি হেমকুণ্ডে। উপত্যকা বিশাল বড়, পুরো উপত্যকার কোথায় কোন ফুলের ঝাড় ফুটে আছে সেটা খোঁজা একটু কষ্টকর বটে; সে তুলনায় হেমকুণ্ডের পাহাড়গুলোয় কম জায়গাতেই বহুধরনের ফুলের সমারোহ। কিন্তু উপত্যকার রূপের কোন তুলনা হয়না।

প্রায় সোয়া একটা বাজে, আমরা আমাদের ঘোড়াওলাকে খুঁজে নামার উদ্যোগ করলাম। হঠাৎ করে হু হু করে মেঘের সঙ্গে জলের ছিটে আসা শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি আবার! আমরা ভালো করে রেইনকোট মুড়ি দিলাম। এত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া যা কানপাট্টা, হুডারের টুপি কিছুই খোলা যাচ্ছে না। তার উপর দিয়ে রেইনকোটের টুপিটা আর মাথায় ঢুকল না, এক্সট্রা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে মাথা মুড়ি দিলাম। আগের দিনের অভিজ্ঞতার কারণে আজ সব গুছিয়ে এনেছিলাম। সন্তুকে একইভাবে সব গুছিয়ে দিতে হল। ও হেঁটে হেঁটে নামবে ফোটো তুলতে তুলতে (তার জন্য আরও প্লাস্টিক ব্যাগ আনা হয়েছিল) আর আমি ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার পিঠে এরকম খাড়া উৎরাই নামা বেশ ভয়ঙ্কর। তারমধ্যে তুফান তুলে বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়া। ঘোড়ার পিঠে উঠে টুকটুক করে যাওয়ার সময় আরেকবার ভালো করে দেখে নিলাম ব্রহ্মকমলের উদ্যান। হাওয়া আর বৃষ্টির মধ্যে নট নড়নচড়ন হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। দু একটা হয়ত তাল মিলিয়ে মাথা দোলাচ্ছে। আমরা নামতে শুরু করলাম। বৃষ্টির জন্য হাতে গ্লাভস পড়ারা যায়নি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মনে হচ্ছে হাত দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ছুঁচের মত জলকণা এসে বিঁধছে মুখে। একটু পরে চশমাটা খুলে পকেটে পুরে ফেললুম। স্যাঁতস্যাঁতে

#

ঠাণ্ডা ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট আর প্যান্ট ভেদ করে ঢুকে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তারমধ্যেও মেঘের আনাগোনা দেখছিলাম মোহিত হয়ে। নিচের পাহাড় পুরো সাদা হয়ে গেছে। তবে এখানে খুব জমাট বাঁধা মেঘ নয়। মোটামুটি কুড়ি তিরিশ ফিট পর্যন্ত অনায়াসে দেখা যাচ্ছে।

খাড়া উৎরাই শুরু হল এবার। ঘোড়া একেকবার হুমড়ি খাচ্ছে আর আমার মনে হচ্ছে আমি যেন জীন ছেড়ে ঘাড় টপকে এক্ষুনি পপাত চ, আর তারপরেই মমার চ। মাঝখানের দু' কিলোমিটার রাস্তার হাল খুবই বাজে। সকালের সেই ঝর্না যার উপরে কোন ব্রীজ ছিল না, সেই জায়গাটা দেখতে দেখতে চলে এল। ছপ ছপ করে ঝর্নার উপর দিয়ে ঘোড়া শুদ্ধ পার হলাম। আমার ঘোড়াটা আবার উৎরাই পেয়ে কথা নেই বার্তা নেই মাঝেমাঝেই ছুট লাগাতে চাইছিল। ঘোড়াওলাকে বলে বলে আমি লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটাতে বাধ্য করলাম। অন্য ঘোড়াটার কোন সওয়ারী পাওয়া যায় নি। সে এই ঘোড়াটার পিছু পিছু আসছিল। সেই বড় নীল প্লাস্টিক ঢাকা চটি, আমি ভেবেছিলাম ওখানে হয়ত থামবে ঘোড়া, সন্তুকে বলে রেখেছিলাম আমরা ওখানে মিট করব; কিন্তু ঘোড়াওলা ওখানে থামল না। আমরা চটির দোকানদারকে বললাম কেউ যদি আমার খোঁজ করে তো বলতে আমি নিচে নেমে গেছি। আরও কিলোমিটারখানেক উৎরাই ভাঙার পরে আমি আর পারলাম না। একটা চটি দেখে ঘোড়াওলাকে থামাতে বললাম। পা ঠান্ডায় জমে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। স্টিরাপে পা আছে কিনা বুঝতেই পারছি না। কোমরে ব্যাথা, একটানা হাত টান করে পিছনে হেলে থাকায় হাতের বাহু দুটো টন টন করছে। আর জলস্রোতের মত বৃষ্টি বইছে মুখের উপর দিয়ে। রাস্তার উপরে একটু লাফাঝাঁপা করে ঠাণ্ডা কাটালাম। আমার ঘোড়াওলা নিজের জন্য ম্যাগি না কি যেন বানাতে বলল দোকানদারকে। আমি দোনামনা করে ভাবছিলাম চা খাব কিনা। আসলে ঘোড়াওলাকে যত টাকা দিতে হবে ঠিক তত টাকাই আছে আমার কাছে। আবার প্রচণ্ড হাওয়ায় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নাঃ এক কাপ চা খাওয়াই যাক, টাকার চিন্তা পরে করব। একটা চেয়ারে বসে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ খানিকক্ষণ দোনামনা করলাম। বৃষ্টি এখন থেমে গেছে, তারপর যেই আরেক ঝলক হাড় কাঁপানো হাওয়া ভেসে এল সামনের পাহাড়ের দিক থেকে অমনি ঠিক করে ফেললাম নাহ চা খেয়েই ফেলি। আরও কিছুক্ষণ বসলাম। গরম গরম মালাই চা যেন প্রাণ এনে দিল। আমি প্রথমেই চায়ের গ্লাসে হাত ঘসে হাতদুটোতে সাড় ফেরাবার চেষ্টা করলাম। তারপর আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা-টা শেষ করলাম। সবে ভাবছি আরেক কাপ খাব কিনা, দেখি উপর থেকে সন্তু নামছে। আমি অনেকখন থেকেই রাস্তার দিকে নজর রাখছিলাম। অনেকেই নামছে। কেউ গুটি গুটি, কেউ প্রচণ্ড স্পিডে। সন্তুও দেখলাম বেশ স্পীডেই নামছে। রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকাডাকি করছি দেখি চিনতে আর পারেনা। তারপর কাছে এসে বুঝতে পারল। সন্তুর সঙ্গে আরেক কাপ চা খেলাম। এবার বেশ গা গরম হয়েছে।

প্রায় আড়াইটে বাজে তখন আবার ঘোড়ায় চাপলাম। সন্তু আর ঘোড়ায় উঠতে রাজী হল না। বাকি রাস্তাটা খুব একটা আর খাড়াই নয়। মোটামুটি দুলকি চালেই ঘোড়া নামল। নিচের দিকে দেখি খুব একটা বৃষ্টি হচ্ছে না। যত বৃষ্টি উপরের দিকে। তবে রাস্তাঘাট দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগেই খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে হাওয়ার তেজও বাড়ে আর কষ্টও বাড়ে। এই অনবরত মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, বরফ আর পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করে করেই এখানকার মানুষ এত কষ্টসহিষ্ণু। সমতলের মানুষ দুইদিনেই কাতর হয়ে পড়বে। আমরা ঘাঙ্গারিয়ার কাছে প্রায় নেমে চলে এলাম। হেমগঙ্গার ঝর্নাটা দেখতে পাচ্ছি। মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে ঝর্নাটার গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছে।

ঘোড়াওলার টাকা মিটিয়ে আমি হোটেলে ঢুকলাম প্রায় তিনটের সময়। ওয়াটার প্রুফ জ্যাকেট আর প্যান্ট থেকে জল ঝরছে। ওই দুটোকে দড়িতে টাঙ্গিয়ে রাখলাম। জুতো তো আগের দিন থেকেই ভিজে, আজকে নতুন মোজা পড়েছিলাম সেটাও গেছে। গরম জল অর্ডার করলাম। ভেবেছিলাম সন্তু এলে বলব কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেল সন্তুর পাত্তা নেই। জামাকাপড় ছেড়ে গরম জলে গা ধুয়ে নিলাম। সন্তু এল প্রায় চারটের সময়। খানিকটা গরম জল ছিল আর খানিকটা কেটলিতে বানিয়ে সে গা ধুতে গেল। আমি গরম গরম কাপ নুডলস আর চা বানালাম। খেয়ে দেয়ে সাড়ে চারটের মধ্যে লেপের তলায়। ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটা নাগাদ। আজকে আর অতটা গায়ে ব্যথা নেই। তাও খানিক ফাস্ট রিলিফ আর ভোলিনি মালিশ করে আমরা সব হিসাব নিকাশ করলাম। আজকে হোটেলের বিল মিটিয়ে দেব। কাল সকালে হোটেল ছেড়ে আমরা নেবে যাব গোবিন্দঘাট, আর সেখান থেকে যোশীমঠ। হোটেলে কিছু টাকা আগে থেকেই দেওয়া ছিল। তাই বাকি আর কত টাকা দিতে হবে সেটা হিসাব হল।

সাড়ে আটটা নাগাদ খেতে গেলাম। ফোন করলাম বাড়ীতে। তারপর বিল টিল মিটিয়ে ঘরে এসে বসলাম। আমার ফোনটায় জলে ঢুকেছে। সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করা হল। তারপর ঘুম।

১২ অগাস্ট ২০১৬, সপ্তম দিনঃ

আজকে আমাদের পুষ্পবতীর কোলে শেষ দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয়ে গেল। কম্বলের ওম নিতে নিতে শুনছি পাখি ডাকছে। এই কয়েকদিন সকালের দিকে সেইভাবে পাখির ডাক শুনিনি। কি জানি হিমালয়ে পাখিরাও বোধহয় দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। চা, ছাতুজল খেয়ে বাথরুমে গেলাম। আজ আমরা হেঁটেই নামব ঠিক করেছি। ব্যাগ দুটো পাঠিয়ে দিতে হবে ঘোড়া বা পিঠ্ঠু করে।

ব্যাগপত্র ঠিক করে গুছিয়ে নেওয়া হল। সেও ভারী ঝক্কির কাজ। অর্ধেক জামাকাপড় মোজা কাদা জলে ভিজে টুসটুসে। এখানকার আবহাওয়ার কল্যাণে দু দিনেও তারা শুকায়নি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে প্রচুর পলিথিন ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলোতে ভরে ভরে জামাকাপড়গুলোকে ট্রলির তলায় চালান করা হল। সব গুছিয়ে যখন নিচে নামলাম তখন প্রায় সোয়া আটটা বাজে প্রায়। তরিবত করে পনির পরটা আর পেঁয়াজ পরটা খেয়ে সন্তু গেল ঘোড়ার খোঁজে। আমি একটা চিকেন ফ্রায়েড রাইস প্যাক করে নিলাম দুপুরের জন্য। একটু পরে সন্তু ফিরে এল, ঘোড়াওলারা বেশী টাকা চাইছে। বেশীরভাগ ঘোড়াওয়ালার দুটো করে ঘোড়া। একটা ঘোড়া বুক করলে সে অন্যটার জন্যেও কিছু চার্জ ধরে নেয়। তাই একটা ঘোড়া বুক করলে দাম যথারীতি বেশী পড়ছে। একটা পিট্ঠু পাওয়া গেল। কমবয়সী একটা ছেলে। সে মোটামুটি দামে ব্যাগ দুটোকে নিচে নামাতে রাজী হল। তার ঝুড়িতে বাঁধা হল ব্যাগদুটোকে।

আমি হোটেলের একটা ছেলের সঙ্গে ফোটো তুললাম হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ঘাঙ্গারিয়াকে বিদায় জানিয়ে নামতে শুরু করলাম। পিট্ঠু ছেলেটা একটুখানি পথ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল তারপরেই সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। তবে বৃষ্টির জল আর ঘোড়ার নাদি রাস্তার হাল খারাপ করে দিয়েছে। তাও ভালো পুরো রাস্তাটায় আমরা খুব বেশীবার ঘোড়ার মুখোমুখি হইনি।

খানিক হাঁটার পরে হেলিপ্যাডটা এল। উলটো দিকের পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্না দেখে আমার মনে পড়ল আরে এইখানেই একটা ঝর্না ছিল না। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ঝর্না আজকে আর বইছে না, হয় তার জল শুকিয়ে গেছে বা সে বেলা হলে বইতে শুরু করে। আমরা এগোতে থাকলাম। সন্তু মান্না দে-র গান চালালো ফোনে। দিব্যি লাগছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মান্না দে-র গান শুনতে শুনতে হাঁটা। ওঠার সময় এই জায়গাটায় সন্তু এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কোনরকম ফোটো তুলতে পারেনি। এখন নামার সময় সে প্রাণ ভরে ফোটো তুলতে তুলতে নামছে। দু' কিলোমিটার নামার পরেই আমার পায়ে একটু একটু লাগতে শুরু করল। এখানে সিঁড়ি টপকে টপকে নামতে হচ্ছে খাড়া উৎরাই। একটা জায়গায় বসে একটু রেস্ট নিলাম। কোথা থেকে যেন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। এরকম পাখির ডাক আগে শুনিনি। তবে খোঁজাখুঁজি করেও পাখিটাকে পাওয়া গেল না। আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

নামার সময় স্বাভাবিক ভাবেই গতি দ্রুত হয়ে পড়ে, তাই বারবার ব্রেক কষতে হয়। এই করে করে হাঁটুতে ব্যথা শুরু হল। একদিন আগেই প্রায় বারো কিলোমিটার ট্রেক করেছি। শহুরে আহ্লাদি শরীরে আর কত সয়। প্রথম চার কিলোমিটার হেঁটে সেই কাকভুশুণ্ডি উপত্যকায় আসতেই আমার দেড় ঘন্টা লেগে গেল। সেইখানে নদীর পাশে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম।



কাকভুশুণ্ডির সঙ্গম

আবার হাঁটা শুরু। ব্রীজ পেরিয়ে উল্টোদিকে প্রথম চড়াই পড়ল রাস্তায়। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম। উঠেই ঠিক করলাম আর হাঁটা নয় আমি এবার ঘোড়ায় যাব বাকিটা। সন্তু কিছুতেই শুনল না। বলে ঠিক আছে আরেকটু চলো তারপর দেখছি। তখনও শরীরে একটু জোর ছিল। আবার হাঁটা লাগালাম গান শুনতে শুনতে। অনেকক্ষণ থেকেই পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা হচ্ছিল। যখনই উৎরাইতে নামার জন্য পা ফেলছি তখনই পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু একটু লাগছিল। আরও কিলোমিটার খানেক যাওয়ার পরে ব্যথাটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। আমার মনে হল বুড়ো আঙুলের নখ বোধহয় ভেঙে

#

গেছে। একটা বসার জায়গা পেয়ে জুতোটা খোলা হল। কই না তো! শুধু একটু লাল হওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয়নি পায়ের বুড়ো আঙুলে। একটু ভোলেনি লাগিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। আরও খানিক যাওয়ার পরে বুঝলাম বুড়ো আঙুলটা প্রতি পদক্ষেপে জুতোর সামনে ঠোক্কর খাচ্ছে। হাজার রকম ভাবে স্টেপ ফেলেও জুতোর সঙ্গে আঙুলের সংঘর্ষ রোধ করা গেল না। অগত্যা খোঁড়াতে খোঁড়াতেই এগিয়ে চললাম। গত এক কিলোমিটার ধরেই এক ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন। বিশাল বপু, দুই হস্তে দন্ড ধৃতা, সাদা সালোয়ার কামিজ শোভিতা, পঞ্চাশোর্ধ্বা ভদ্রমহিলাকে দেখেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। খানিক হাঁটার পরেই তিনি বসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এক জায়গায় তাঁর পাশেই আমি বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। তিনি ঘোড়ায় চড়তে ভয় পাচ্ছেন। ওঠার সময় চড়েছেন কিন্তু নামার সময় আর চড়বেন না তাই হেঁটে চলেছেন। তাঁর বাড়ী রাজস্থানে, এসেছেন মায়ের সঙ্গে, হেমকুণ্ডে তীর্থ করতে। মা নেমে গেছে ঘোড়ায় চড়ে। সন্তুকে অনুরোধ করল তাঁর ফোনে কিছু ফোটো তুলে দেওয়ার জন্য।

ফোটো তুলে টুলে আমরা আবার হাঁটা দিলাম। বনের মধ্যে দিয়ে পথ, সে ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্ব অধঃ সবদিকেই মোচর দিয়ে দিয়ে চলেছে, শির শিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। টুপ টাপ করে খসে খসে পড়ছে গাছের পাতা। মাঝেমাঝেই "সৎ শ্রী আকাল" ধ্বনি দিয়ে হেমকুণ্ডগামী শিখদের ছোট ছোট দল আসছে উল্টোদিক থেকে। তাদের মধ্যে একজন আবার আপেল, শাকালু বিলি করতে করতে চলেছেন। এরকম আরেকটা দলের কাছ থেকে আমরা দুটো চকোলেটও পেলাম। দেখা পেলাম একদম সদ্যোজাত (দু তিন মাসের হবে) এক শিশু নিয়ে হেমকুণ্ড চলেছে এক শিখদম্পতি।

এতক্ষণে আমাদের ক্রশ করল একজোড়া বিদেশী ছেলে মেয়ে। এরা ঘাঙ্গারিয়ায় আমাদের হোটেলেই উঠেছিল। সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এদের দেখেছিলাম। তারা পিঠে ইয়া দুটো রুকস্যাক নিয়ে দিব্যি গল্প করতে করতে চলেছে। অবিলম্বে আমাদের পেরিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। শুধু বিদেশী বলে নয়, ছেলেমেয়ে দুটোকে সত্যি দেখতে সুন্দর। আমরা পেরিয়ে এসেছি প্রায় সাত কিলোমিটার। এখনো কিলোমিটার পাঁচ/ছয় বাকি পুলনা পৌঁছাতে। মাঝেমাঝেই ছোট ছোট চড়াই পড়ছে, আর মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ে উঠছি। একটা দোকানে থেমে লেবু জল খাওয়া হল। প্রায় বারটা বাজে; এখন বেশ গরমও লাগছে। আরও এক কিলোমিটার হেঁটে একটা জায়গায় রাস্তার ধারে লোহার বসার বেঞ্চ আর ছাউনি দেওয়া। সেখানে বসে আমাদের সঙ্গে আনা প্যাকেট ফ্রায়েড রাইস খাওয়া হল। আমার আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। একটা ঘোড়া পেলে এখনি চেপে বসি। দু একটা ঘোড়াওলা পেয়ে জিজ্ঞেসও করেছিলাম কিন্তু ব্যাটারা বাগে পেয়ে বেশী টাকা চাইছে। পায়ে আবার ভোলেনি মাখলাম, ফাস্ট রিলিফ স্প্রে করলাম। প্রথমে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে লাগছিল, এখন দেখি বাঁ পায়েও ব্যথা শুরু হয়েছে। আবার হাঁটা শুরু হল। সামনেই একটা চটিতে দেখলাম সেই বিদেশীযুগল বসে চা খাচ্ছে আর তাস খেলছে। আমরা যখন চটিটা পার হচ্ছি তখন সেই পাঞ্জাবী আন্টি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চটিতে ঢুকে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসলেন।

খানিক গিয়ে আমার প্রায় নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। একচোট ঝগড়া হয়ে গেল সন্তুর সঙ্গে। আমি রাগের চোটে একা একা হাঁটা দিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা বড় জলপ্রপাত পড়ল উল্টোদিকে। সেখানে একটা বসার জায়গায় বসতে গিয়ে দেখি সামনের ঝোপে একটা ছোট্ট পাখি। যেমন তার রূপের বাহার তেমনি তার গলার জোর। ওই ছোট শরীর থেকে কি করে যে এত তীক্ষ্ণ আওয়াজ বের হয় সেটা বেশ ভাবনার বিষয়। ছবি টবি তুলে আবার হাঁটা শুরু। ভুইয়ান্ডর

গ্রামটা পেরনোর পর থেকেই জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে। পথে ঘাঙ্গারিয়া যাত্রী বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। আমিও তাদের জিজ্ঞেস করলাম কতদূর আর তারাও জিজ্ঞাসা করল একই কথা। পুলনা আরও দু কিলোমিটার হবে। আমার পায়ের ব্যথাটা প্রায় অসহ্য লাগছে। এখন আরেকটা ব্যথার সুত্রপাত হয়েছে, উৎরাই নামার সময় হাঁটুতে দেখি বেশ খচ খচ করে লাগছে। আমাদের ঘাঙ্গারিয়ার হোটেল মালিককে দেখলাম। তিনি কি এক কাজে সকালে নেমে এসেছিলেন এখন দেখছি ঘোড়ার পিঠে চেপে ফেরত যাচ্ছেন।

এই করে করে একসময় পুলনা পৌঁছে গেলাম। পুলনা গ্রামটাই প্রায় এ মাথা ও মাথা এক কিলোমিটার লম্বা হবে। আমাদের যেতে হবে গ্রামের অন্য প্রান্তে সেখান থেকেই গাড়ী ছাড়বে গোবিন্দঘাটের। গ্রামের শুরুতেই বিদেশীযুগল আমাদেরকে টপকে গেল। ওদের যা স্পিড, কিন্তু এত দেরি করল নামতে; কতক্ষণ তাস খেলছিল কে জানে? সেই পাঞ্জাবী আন্টিকে দেখতে পেলাম না। গ্রামের মধ্যে বেশ কিছু বাড়ী খাদের ঢালে নদীর দিকে। তাদের ছাতগুলো প্রায় রাস্তার সমান্তরালে। প্রায় প্রতি ছাদেই দশ বারো বা তারও বেশী বাইক রাখা। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যারা নিজেদের বাইক নিয়ে আসে দিল্লী, হরিয়ানা বা পাঞ্জাব থেকেও তার এখানেই বাইক রেখে উপরে যায়। আরও একটু হেঁটে গিয়ে গ্রামটা জাস্ট পেরিয়েই দেখি সেই যুগল বসে আছে পথের ধারে একটা বড় পাথরের উপরে।

কিছুক্ষণ কথা হল তাদের সঙ্গে। তারা স্কটল্যান্ড থেকে আসছে। মেয়েটা এর আগেও তিনবার এসেছে ভারতে। ছেলেটার এটা প্রথমবার। এরপরে কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করতে তারা বলল এবার দিল্লী তারপরে কলকাতা। আমি একটু অবাক হলাম। ঘোরাঘুরির সূত্রে আগেও অনেক বিদেশী দেখেছি, কথা বলেছি। তারা সাধারণত কলকাতা প্রায় কেউই যায় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতো জায়গা থাকতে কলকাতা কেন? ছেলেটা জানাল, তার গ্র্যান্ডফাদারের বাড়ী ছিল কলকাতায়। আত্মীয়রা এখনও থাকে। স্কটল্যান্ডের লোকেরা দেখলাম বেশ গল্প করতে ভালোবাসে। নিজেই জানাল তার গ্র্যান্ডফাদার তরুণ বয়সে স্কটল্যান্ডে চলে গেছিল তারপরে সেখানেই থেকে গেছে। ও গ্র্যান্ডফাদারের শহর দেখতে এসেছে। সেখান থেকে কোথায় একটা যাবে বলল একদম বুঝতে পারলাম না। আবার জিজ্ঞেস করলাম সে আবার বলল তাও বুঝলাম না। তারপর বলল, টাইগার। আমি হাঁপ ছাড়লাম, ওহ্ সুন্দরবন। বাপরে কি উচ্চারণ। আমরা দুবার সুন্দরবন সুন্দরবন বলতে এবার ওরা বলল, সুন্ড্রাবন্। যাক এবার খানিক বোঝা যাচ্ছে। আমরা ওদের কাছে খানিক কলকাতার মাহাত্ম্যের গল্প টল্প করে হাঁটা শুরু করলাম। ওরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল।

পৌনে তিনটে বাজে, আমরা শেষ চড়াই অতিক্রম করে গাড়ির স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছলাম। গ্রামের মধ্যপথে আরেক জোড়া আমাদেরকে টপকে এগিয়ে গিয়েছিল। দেখি তারা একটা গাড়ির মাথায় ব্যাগ তুলে গাড়ির ভেতরে বসে আছে। আমাদের দেখতে পেয়ে সেই পিট্ঠুর ছেলেটা একগাল হেসে ছুটে এল। ব্যাগ ট্যাগ তার কাছ থেকে নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে তার ভাইও নেমে এসেছে নিচে। সন্তু তাকে কিছু একস্ট্রা টাকা দিল। আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। কিন্তু এতো শেয়ারের গাড়ী। পুরো গাড়ী ভর্তি না হলে নিচে নামবে না। আমরা বসে বসে ঘড়ি দেখে দেখে অস্থির হতে লাগলাম। প্রায় সাড়ে তিনটের সময় দেখা গেল সেই পাঞ্জাবী আন্টি আসছেন। কোনরকমে তিনি এসে গাড়ীতে বসলেন। আর আমরাও সবাই মিলে ঠিক করে নিলাম যে খানিক বেশী টাকা দিয়েই আমরা নেমে যাব। তখন সোয়া তিনটে বেজে গেছে।

নামতে মিনিট পনেরোর মত লাগল। সেই গোবিন্দঘাটের ব্রীজ। হিসাব করে টাকা পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হল। পাঞ্জাবী আন্টি আর শিখযুগল গোবিন্দঘাটেই থাকবে, কিন্তু আমাদের যেতে হবে জোশীমঠ। আমরা গাড়ী খুঁজতে লাগলাম। ব্রীজের সামনের এক দোকানদার বলল, শেয়ারে গাড়ী পাওয়া যাবে উপরের রাস্তা থেকে। এখান থেকে সেখান অবধি হেঁটেই যেতে হবে। দোকানদাররা বলল এই তিন চারশ মিটার বেশী দূর নয়। আমার কাঁধে একটা ডে প্যাক, আর সন্তুর ক্যামেরার ব্যাগ আর জলের বোতল। সন্তু রুকস্যাকটা কাঁধে নিল আর ট্রলিটা টানতে শুরু করল। গোবিন্দঘাটের বাজারটা পেরিয়ে গিয়ে একটা চড়াই রাস্তা। সেটা নিজেই তিন চারশ মিটার হবে। পাহাড়ীদের দূরত্ব জ্ঞানকে কোনদিনও ভরসা করা উচিত নয়। আবার ঝগড়া হয়ে গেল সন্তুর সঙ্গে। যে গাড়ীটায় আমরা এসেছিলাম তার নাম ফোন নম্বর রাখা উচিত ছিল আমাদের। কে জানত এমন গেরো। অতি কষ্টে চড়াইটা পার হলাম। সামনে কোথাও কোন গাড়ির স্ট্যান্ড দেখা যাচ্ছে না। আমি ব্যাগটা রেখে একটু বসার জায়গা খুঁজলাম, পেলাম না। একজন বয়স্ক লোক আসছিলেন গোবিন্দঘাট বাজারের দিক থেকে, তিনি বললেন আর পাঁচশ মিটার, ঝর্না যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনারা চলে যেতে পারবেন। ঝর্না ঠিক থাকা মানে? তিনি বললেন, রাস্তার উপরে একটা ঝর্না আছে। কখনো কখনো তার জল বেড়ে যায় তখন পার হওয়া মুশকিল হয়। কপাল চাপড়ে আবার এগোতে থাকলাম। নাঃ, ঝর্নায় জল কমই আছে। ঝর্না পার হয়ে আবার চড়াই। আমি থেমে গিয়ে বললাম, আর কতদূর? উনি বললেন এই চড়াইটা উঠলেই ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ সত্যিই একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। মনে নতুন উদ্যম এনে চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করলাম। তেরো কিলোমিটার ট্রেকের পরে আরও এক কিলোমিটার ফাউ যোগ হল তাও আবার মালপত্র সমেত। সন্তুর হাল খারাপ হয়ে গেছে। কোনরকমে আস্তে আস্তে টেনে টেনে ব্যাগ দুটোকে তুলল। কিন্তু কই কোন গাড়ী নেইতো। ভদ্রলোক বললেন এখানেই দাঁড়াও একটু পরেই গাড়ী আসবে। আমরা মালপত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। এরপর থেকে সন্তু আর আমায় ঘড়ি দেখতে দেয়নি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠলাম। কোন গাড়ীর দেখা নেই। আমি শুনেছিলাম বেশী রাত হয়ে গেলে গোবিন্দঘাট থেকে জোশীমঠ যাবার গাড়ী পাওয়া যাবে না। আমি সন্তুকে আলটিমেটাম দিলাম চারটে বেজে গেলে শেয়ার কারের আশা ত্যাগ করে পুরো ভাড়া দিয়ে জোশীমঠ যাওয়ার গাড়ী খুঁজবে। আমরা গোবিন্দঘাটে যে থেকে যাব, তাও সম্ভব নয়। কারণ প্ল্যান আছে পরের দিনই হরিদ্বার নেমে যাওয়ার। জোশীমঠ থেকে হরিদ্বার যেতেই ন'ঘন্টা লেগে যায় সেখানে গোভিন্দঘাট থেকে তো কম করে আরও এক ঘন্টা বেশী লাগবে। উপরন্তু জোশীমঠ মোটামুটি বড় শহর। সেখান থেকে হরিদ্বার নেমে যাওয়ার গাড়ী পাওয়া যতটা সোজা গোভিন্দঘাট থেকে তা নয়। এই সব চিন্তা করেই আজকে আমাদের যোশীমঠ নেমে যাওয়ার প্ল্যান। কিন্তু সন্তু সেসব কিছু না বুঝেই 'সেরকম হলে আজ এখানেই থেকে যাব' বলে চিল্লাতে শুরু করে দিল। আমার মাথা আরও গরম হয়ে গেল। এমন সময় একজন ক্ষয়াটে চেহারার লোক এসে আমাদের সঙ্গে দাঁড়ালেন। তিনিও জোশীমঠ যাবেন। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরেই একটা টাটাসুমো এল। একদল চ্যাং ব্যাং ছেলেতে পুরো প্যাকড আপ। টাটাসুমোটা এসে 'জোশীমঠ' বলে দাঁড়াল। পিছনের দুজনের সিটে তৃতীয় জন হয়ে সেই ভদ্রলোক নিজেকে গুঁজে দিলেন। টাটাসুমো চলে গেল। আমার তখন প্রায় কান্না পায় পায় দশা। এইভাবে যেতে হবে? হে ভগবান ঘাঙ্গারিয়াতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলে হত। আমি সন্তুকে ঠেলে পাঠালাম গাড়ী বুক করার জন্য। সন্তু খানিক এদিক ওদিক ঘুরে হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই আরেকটা টাটা সুমো এসে দাঁড়াল। নাঃ এতে বেশ ভদ্রসভ্য

#

মানুষজন আছে। এমনকি একজন মহিলাও আছেন। খানিক সাহস এল মনে। পিছনের সিটে একজন মাত্র বসে। আমরা উঠে পড়লাম। মালপত্র ড্রাইভার তুলে দিল গাড়ীর মাথায়। বাঁধাবাঁধির কোন প্রশ্নই নেই।

উদ্দাম বেগে গাড়ী ছুটল। এইবারের বেড়ানোতে দু দুবার শেয়ারের গাড়ীতে চেপে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল যে এরা নিজেদেরকে রেসের গাড়ীর ড্রাইভার বলে ভাবে। যারা গাড়ী বুক করে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা এদের গাড়ী চালানো কল্পনাও করতে পারবে না। যেমন ঝাঁকানি তেমনি কাঁপানি। মানে প্রতি বাঁকে উঁচু নিচু রাস্তায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে গাড়ী লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, তেমনি দুরন্ত গতিতে ছোটার জন্য তার সর্ব অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। আগেই বলেছি যোশীমঠ থেকে ঘাঙ্গারিয়ার রাস্তা কেমন, তার উপরে এই ড্রাইভারের গাড়ি চালানোর চোটে পনের মিনিটের মধ্যেই আমার গা গোলাতে শুরু করে দিল। পকেটে তখনও দুটো লেবু লজেন্স বাকি ছিল। সেগুলোই বের করে দুজনে মিলে চুষতে শুরু করলাম। ভাগ্যিস আসার পথে কিছু ছবি তুলেছিল। যাওয়ার পথে দেখতেই পেলাম না কোথায় প্রয়াগ আর কোথায় কি!

অক্ষত অবস্থায় জোশীমঠ পৌঁছলাম যখন তখন জোর করে সন্তুর কাছ থেকে ঘড়িটা টেনে দেখি সাড়ে পাঁচটা বাজে। মানে গোবিন্দঘাটেই সাড়ে চারটের সময় আমরা গাড়ীতে উঠেছিলাম। আমার মাথা গরম দেখে সন্তু আর সময়টা বলেনি। জোশীমঠে যখন পৌঁছলাম তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। শরীর এত ক্লান্ত যে এখুনি একটা বিছানা পেলে শুয়ে পড়ব। কিন্তু হায় কপাল! এখনো যে অনেক দুর্ভোগ বাকি। যেখানে আমাদের গাড়ী থেকে নামিয়েছে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। এখান থেকে আমরা যেখানে ছিলাম হোটেল কামেট, তা আবার এক দেড় কিলোমিটারের ধাক্কা। আমায় কেউ ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলে রাস্তা দিয়ে খুশী হতাম তখন। কিন্তু না সেই এগারো নম্বরেই ভরসা, টায়ার ফাটা গাড়ীর মত কোঁকাতে কোঁকাতে চললাম। সন্তুরও একই হাল। তারপরে আবার দুটো ব্যাগ কাঁধে। হাঁটছি তো হাঁটছিই, সেই জীপ স্ট্যান্ডের আর দেখা নেই। হোটেল জীপ স্ট্যান্ডের পরে। তবে একটাই সৌভাগ্য যে এটা উৎরাই। অবশেষে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে জীপ স্ট্যান্ড আর হোটেল পেলাম।

হোটেলও আমাদের কপাল খারাপ। একটা বড় পার্টি এসে সব ঘর বুক করে নিয়েছে। আমাদের একদম ওঁছা একটা ঘর দিল। স্যাঁতস্যাঁতে ড্যাম্প পুরো ঘরটায়, আবার তার দরজাটা বন্ধ করতে গেলে গোটা পাঁচেক লাথি কষাতে হয়। এমনকি এক বালতি গরম জল পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মনের দুঃখে সন্তুকে বেদম ঝাড় দিয়ে ইলেকট্রিক কেটলিতেই গরম জল বানিয়ে বানিয়ে স্নান করলাম। মাথায় শ্যাম্পু পর্যন্ত করে ফেললাম। এই কয়েকদিন মাথায় জল ছোঁয়ান হয়নি। বৃষ্টিতে ভিজে, ঘামে কাদায় চুল পুরো শনের নুড়ি জটাবুড়ি হয়ে গিয়েছিল। হোটেলের একটা বয়কে দিয়ে খাবার আর জল কিনে আনা হল। সেটা খেয়ে দেয়ে আরেক প্রস্থ ঝগড়া হল। পা দুটো অসহ্যভাবে কন কন করছিল। আমি তো রাগে দুঃখে তক্ষুনি হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাচ্ছিলাম। নেহাত পা দুটো রাজী হল না বলে যাওয়াও হল না।

সন্তু একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি আমার ফোনটাকে চার্জ দিয়ে দিয়ে কোনমতে অন করে কিছু ডাটা এক্সটারনাল মেমরিতে ট্রান্সফার করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা বয় এসে আমাদের রাতের খাবারটা দিয়ে গেল। সন্তু বলল, খাবে? আমি রাগের চোটে বললাম, না খাব না। সন্তু আবার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ডাটা ট্রান্সফার করতে করতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি দেড়টা বাজে। হেভি খিদে পেয়েছে।

সন্তুকে উঠিয়ে খেতে বসলাম। চামড়া হয়ে যাওয়া তন্দুরী রুটি আর ঠাণ্ডা চিকেন কারি। রাগের চোটে গরম তন্দুরীগুলোকে ফেলে রেখে চামড়া বানিয়েছি। মনটা আরও ভেঙে গেল। কোনমতে খানিক খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। আবার কাল দীর্ঘ যাত্রা।

১৩ অগাস্ট ২০১৬, অষ্টম দিনঃ

আমাদের এই ট্যুরটায় আমি দেখেছি একদিন কষ্টের সীমা থাকেনা তো পরের দিন মজাসেই কাটে। গতকালটাকে দুঃস্বপ্ন ভেবে নিয়ে ভ্রমণের অষ্টম দিনে জোশীমঠে, হোটেল কামেটের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধওলা ঘরে ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে সাতটায়। ভোরের দিকে কারা যেন খুব চেঁচামিচি করছিল বলে একবার ঘুমটা একটু ভেঙে গেছিল। কিন্তু তারপরে একদম সকাল হয়ে ঘুম ভাঙল। আগেরদিন আমাদের হোটেলওলা ছোকরাটি বলছিল অপেক্ষাকৃত সস্তায় গাড়ী বুক করে দিতে পারবে হরিদ্বার যাওয়ার জন্য। রাত্রিবেলা তার আর দেখা পাইনি আমরা। তাই ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে প্রায় আটটা নাগাদ সন্তু গেল তার আর গাড়ীর খোঁজ নিতে। আমি ব্যাগ গোছাতে শুরু করলাম। সন্তু ফিরে এলেই আমরা বেড়িয়ে পড়ব। মিনিটি পনেরো কুড়ি পরে সন্তু ফিরে এল। হোটেলওলা কোন গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না আর হরিদ্বার যাওয়ার শেষ বাস চলে গেছে সকাল সাতটা নাগাদ। আমাদেরই দেখতে হবে বাইরে গাড়ি পাওয়া যায় কিনা।

হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে আমরা নিচের রাস্তায় এলাম। হোটেলের সামনের রাস্তাতেই ব্যাগ রেখে সন্তু গাড়ির খোঁজ করতে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে গেলাম। সবে যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছি ঠিক তখনি সন্তু ফিরে এসে জানাল এখান থেকে হরিদ্বারের শেয়ার গাড়ী ছাড়েনা, আমাদেরকে হয় পুরো গাড়ী বুক করে যেতে হবে। নয়তো চামোলী অবধি শেয়ার গাড়ীতে গিয়ে আবার গাড়ী বদল করতে হবে। চামোলী থেকে রুদ্রপ্রয়াগ অবধি পরের গাড়ী যায় এতদূর অবধি জেনে এসেছে সন্তু। আমি তক্ষুনি গাড়ী বুকিং-এর ডিসিশন নিয়ে নিলাম। ছোট গাড়ী ফোর সিটার চাইছে আট হাজার আর বড় গাড়ী টাটাসুমো চাইছে পাঁচ।

সন্তু গিয়ে টাকা তুলল এটিএম থেকে। তারপর একটা টাটাসুমো পাকড়ে নিয়ে এল, তখন পাক্কা নটা বাজে। আমি মনের আনন্দে টাটাসুমোটায় উঠে পড়লাম। আসার সময় গাড়ীর চলনের ধকলে প্রাকৃতিক দৃশ্য ঠিক মন খুলে উপভোগ করতে পারিনি। ফেরার সময় সেই সুযোগও হয়ে গেল। গতকাল বিভিন্ন টেনশনে আর ফোনে ব্যাটারি না থাকার কারণে বাড়ীতে ফোন করা হয়নি। এখন হরিদ্বার যাওয়ার গাড়ী পেয়ে টেনশন ফ্রি ভাবে হিমালয় আর অলকানন্দার লুকোচুরি দেখতে দেখতে ফোন করলাম বাড়ীতে।

সন্তু জানলার ধার পেয়ে মনে আনন্দে ফোটো তুলছে তখন। ফোটো তুলতে তুলতে আর বিস্কুট খেতে খেতে আমরা প্রায় চামোলী পৌঁছালাম প্রায় এগারোটায়। চামোলীতে গাড়ী থামিয়ে পেট ভরে ব্রাঞ্চ খাওয়া হল। আবার গাড়ী ছুটে চলল হরিদ্বারের দিকে। জোশীমঠ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ অবধি রাস্তার হাল খুবই খারাপ। তবে ড্রাইভার দেখলাম খুব ভালোভাবেই গাড়ী চালাচ্ছে। ধ্বসের জায়গাগুলোতে স্পিড নামিয়ে আনছে প্রায় কুড়িতে আবার ভালো রাস্তায় মসৃণভাবে স্পিড তুলে দিচ্ছে ষাটের কাছে। নিজস্ব গাড়ী বুক না করলে এই রাস্তায় গাড়ির ভেতরে, ঘটিগরম বানানোর সময় একটা বন্ধ কৌটোতে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে যেইভাবে ঝাঁকায় পুরো সেইরকম অভিজ্ঞতা হয়।

আমরা প্রয়াগগুলোতে থেমে থেমে ফোটো তুলতে তুলতে যাচ্ছিলাম। অলকানন্দা নেমে এসেছে বদ্রীনাথ থেকে। প্রথম তার সঙ্গে এসে মিশেছে ধৌলিগঙ্গা, বিষ্ণুপ্রয়াগে; জোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট যাওয়ার পথে আমরা দেখেছিলাম সেটা। জোশীমঠ থেকে হরিদ্বার নামার সময়ে চামোলীর পরে প্রথম পেলাম নন্দপ্রয়াগ। এখানে অলকানন্দার সঙ্গে এসে মিলেছে নন্দাকিনী নদী। এরপরেই এল কর্ণপ্রয়াগ, পিন্ডার গঙ্গা এসে মিশেছে এখানে অলকানন্দার সঙ্গে। একটা বাজার পর থেকে কষ্টটা বাড়তে শুরু করল। বিশ্রী দম চাপা আবহাওয়া। রোদের জন্য জানলার কাছ থেকে সরে আসতে হয়েছে। এতটুকু হাওয়া নেই। ফ্যাকাসে সবুজ পাহাড় যেন ঝলসে যাচ্ছে সূর্যদেবের তাপে। এরমধ্যেই পেরিয়ে গেলাম রুদ্রপ্রয়াগ, এখানে কেদারনাথ থেকে মন্দাকিনী নেমে এসে মিশেছে অলকানন্দায়। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু কেক আর কুকি ছিল। সেগুলো খাওয়া হল একে একে। গাড়ী ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে।

গরমে শ্রান্তিতে ঘুম পাচ্ছে। সন্তুতো মাঝখানে দিব্যি এক চোট ঘুমিয়ে নিল। আমি জেগে আছি। যদি দুজনকেই ঘুমাতে দেখে ড্রাইভারও ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করালো ড্রাইভার। পাশেই পাহাড়ের গা থেকে একটা নল থেকে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। সে চোখে মুখে জল দেবে। তখন প্রায় আড়াইটে বাজে। আমরাও পাহাড়ের ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ঘাড় গলা ভালো করে ধুয়ে ফেললাম। শ্রান্তি খানিক কেটে গেল। রুদ্রপ্রয়াগের পর থেকে গাড়ী ভালোই স্পিডে ছুটছে। তার আগে এতো ল্যান্ডস্লাইড জোন যে স্পীড বাড়াবার সুযোগই ছিল না কোন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেবপ্রয়াগ পৌঁছে গেলাম। গঙ্গোত্রী থেকে বিশাল বপু ভাগীরথী এসে মিশেছে এখানে অলকানন্দার সঙ্গে। অলকানন্দা আর ভাগীরথীর কলেবর প্রায় সমান সমান। এখান থেকেই অলকানন্দা এফিডেফিট করে গঙ্গা নামে বয়ে চলেছে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত জুড়ে। দেবপ্রয়াগই এই রাস্তার শেষ প্রয়াগ। সেখানে ফোটো তোলার নামে একটু ঘোরাঘুরি করে পায়ের আড় ভাঙলাম। ঠায় গাড়ীর মধ্যে বসে থেকে থেকে পা কোমর ধরে গেছে একেবারে।

এবার আস্তে আস্তে প্রকৃতি শান্ত হতে শুরু করল। গাড়ীর জানলা দিয়ে বেগুনপোড়া রোদের বদলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্রাণ মন জুড়ানো হাওয়া ঢুকতে শুরু করল। আমরা চলতে লাগলাম। কত পথ পার হলাম, কত যে পাহাড় নদী। এরপরের বার ঠিক করেছি আরও আরও গান ফোনে ভর্তি করে নিয়ে যাব কোথাও বেড়াতে গেলে। সব বিস্কুট, কেক শেষ এমন সময় একটা জায়গায় দেখি বাজার মত বসেছে আর প্রচুর ভুট্টা পুড়িয়ে বিক্রি করছে। গাড়ী থামিয়ে ভুট্টা কেনা হল। ভুট্টা খেতে খেতে শ্যাম্পু করা চুল উড়িয়ে গাড়ীর জানলা দিয়ে পাহাড়ের দৃশ্য। আহা! এর থেকে বেশী সুখ আর কোথায় আছে। ঋষিকেশের কয়েক কিলোমিটার আগে এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার চা খেতে গেল। আমি আর সন্তুও লেবু জল খেলাম। বড্ড গরম। পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম স্রোতস্বিনী গঙ্গা দ্রুতবেগে চলেছে। এখানে যদিও নদী অনেক শান্ত। একটু পরেই ড্রাইভার এল। আবার গাড়ী ছুটল। প্রায় সাড়ে চারটে বাজে আমরা ঋষিকেশে পৌঁছলাম। শহরে পৌঁছানর আগে এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে রামঝুলাসহ ঋষিকেশ শহরের খানিক অংশের ছবি তোলা হল। তারপর ঢুকলাম শহরে। আর দশটা সাধারণ শহরের মতই ঘিঞ্জি রাস্তায় জ্যাম পেরিয়ে যখন আমরা আবার খোলা রাস্তায় পড়লাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। আধঘন্টা পরেই হরিদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আবার জ্যাম শুরু হল। দীর্ঘ জ্যাম পেরিয়ে আমরা পাক্কা ছটার সময় হরিদ্বার স্টেশনের সামনে নামলাম।

সন্ধ্যার মুখে হরিদ্বারের রাস্তা তখন গমগম করছে। কতরকমের পশরা সাজানো দোকান, খাবারের দোকানে ঘুরে ঘুরে শুন্যে উঠে যাচ্ছে বড় বড় ময়দার লেচি, রাস্তার ময়লা আবর্জনার ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ছাপিয়ে প্রাণকাড়া গন্ধ ভেসে আসছে খাবারের দোকান থেকে। এক জায়গায় ব্যাগপত্র রেখে আমি পাহারায় দাঁড়ালাম আর সন্তু হোটেল খুঁজতে গেল।

হরিদ্বারে রীতিমত ভ্যাপসা গুমোট গরম। পাহাড় থেকে নেমে আসার জন্য আরও বেশী গরম লাগছিল। যাইহোক আমরা মোটামুটি ভাড়ায় একটা এসি রুম পেয়ে গেলাম এক হোটেলে। ভেবেছিলাম সন্ধ্যাবেলা ঘুরতে বেরবো আশেপাশে কিন্তু আর ভালো লাগল না। তাই চানটান করে এসি-র ঠাণ্ডায় পকোড়া দিয়ে চা খেতে খেতে আর হোটেলের টিভি দেখতে দেখতে একটা ছোট্ট ঘুম দিয়ে নিলাম। ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে আটটার সময়। আমাদের হোটেলটা নিরামিষাশী। সন্তু চিকেন খাবে বলে ক্ষেপে উঠলেও আমার একটুও বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করছিল না। আমাকে সাপোর্ট করে বরুণ দেব ঝমঝম করে বৃষ্টি পাঠাল। আমরা হোটেলের ঘরেই পনির পোলাও, পনির কড়াই আর তন্দুরী রুটি খেয়ে ঘুম দিলাম।

১৮ অগাস্ট ২০১৬, নবম দিনঃ

আজ সকালে কোথাও যাওয়ার নেই। তাড়া নেই গাড়ী ধরবার, অ্যালার্ম নেই ট্রেকিং-এর; ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়ে। ঘুম ভেঙে দেখি সন্তু তখনও ওঠেনি। কিছুক্ষণ বাদে একেবারে চানটান সেরে সেজেগুজে যখন হোটেলের বাইরে পা দিলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। সন্তু কাল থেকেই চিকেন খাব চিকেন খাব করে নাচছিল, তাই প্রথমেই আমরা কিছু খাওয়ারের জন্য একটা নন-ভেজ দোকান খুঁজলাম। আশেপাশে সেরকম কোন নন-ভেজ দোকান দেখলাম না। তাই একটা দোকানে ঢুকে পেট ভরে ছোলাবাটোরা খেয়ে নিলাম। এইসব উত্তর ভারতীয় মনপসন্দ খাবারগুলো আবার ব্যাঙ্গালোরে বসে পাওয়া যায় না।

খেয়ে দেয়ে বেড়িয়ে একটা অটো বুক করে কংখলে আনন্দময়ীর আশ্রম, মহাকালেশ্বর মন্দির আরও দু চারটে ছোটোখাট মন্দির দেখলাম ঘুরে ঘুরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বেদম বৃষ্টি শুরু হল। প্রায় দুটো বেজে গেছিল, তাই আমরাও ফিরে চলে এলাম হোটেলে। ফেরার পথে প্রচণ্ড জ্যামে পড়ায় অটোটা একটু ঘুর পথে আনল। আমরাও দেখতে পেলাম কণ্বমুনির ঘাট। অটোতে বেড়াতে বেড়াতে দেখছিলাম রাস্তায় ছোট বড় চাকা লাগানো পাটাতনকে সুন্দরভাবে সাজানো। যেমন অনেকটা আমাদের ঠাকুর বিসর্জনের সময় ম্যাটাডোরের পিছনে পাটাতনে করে সাজিয়ে নিয়ে যায়। সদ্য সদ্য কি উৎসব গেছে মনে পড়ল না। হোটেলে ফিরে ভাত, ডালমাখানি আর মটর পনিরের তরকারি খেয়ে আবার ঘুম লাগালাম। এখনো অবধি হাত পায়ের যন্ত্রণা সারেনি। একেবারে বাড়ী ফিরলে তখনই সারবে বোধহয়।

বিকেলবেলা পাঁচটার সময় উঠে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলাম। হরিদ্বারের কিছুই তো দেখা হল না, অন্ততঃ গঙ্গা আরতীটা যদি না দেখি তাহলে খুবই খারাপ হবে। এছাড়া সারা ট্যুরে কিছুই কেনাকাটা হয়নি। আর হরিদ্বার তো শপারদের স্বর্গরাজ্য। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলাম। এইখানে একটা জিনিস প্রমাণ করল যে পুরুষদের কখনো কোন সিদ্ধান্ত নিতে দিতে নেই। তারা স্বততই গণ্ডগোল বাধায়। আমি একটা এক্সট্রা কাঁধের ব্যাগ নিয়ে এসেছিলাম। এক্সট্রা জিনিস কিছু হলে তাতে বইব বলে। সেই কাঁধের ব্যাগটা খালিই পড়েছিল। আমি কত করে সেটা নিতে চাইলাম। সন্তু ডেপ্যাকটা নিচ্ছে বলে আর কিছুতেই সেটা নিতে দিল না।

আমরা বেড়িয়ে পড়লাম সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। একটা রিক্সা নিয়ে কোতোয়ালি পর্যন্ত যেতে পারলাম। তারপরে দেখি রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অগত্যা রিক্সা ছেড়ে দিয়ে হাঁটা শুরু হল। দুপাশে নানান দোকানের ভিড়। আমি যেতে যেতে ঠিক করতে লাগলাম ফেরার পথে কি কি কিনব। প্রায় দেড় দু' কিলোমিটার হাঁটা। তবে সমতল রাস্তা হওয়ার জন্য কষ্ট হচ্ছিল না বিশেষ। শেষমেশ ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। সন্ধ্যা আরতি শুরু হবে সোয়া সাতটা নাগাদ। এখনই ঘাটের দুপাশের সিঁড়িতে প্রচুর লোক বসে আছে। আমরাও বসলাম একটা জায়গায় আরও দশজনের সঙ্গে। মাইকে গান বাজছে। একগাদা পুলিশ এদিক ওদিক শুধু ঘোরাফেরা করছে না রীতিমত "আব বলো গঙ্গা মাঈকি জয়" "আব বলো গঙ্গা মাঈকি জয়" "লো আব পয়সা দো গঙ্গা মাঈকি পূজা কে লিয়ে" বলে জনতাকে শাসন এবং শোষণ যুগপৎ চালিয়ে যাচ্ছে। দেখে অবাক হলাম অনেকেই ওদের হাতে একশো পাঁচশো টাকার নোট তুলে দিচ্ছে। পুলিশগুলো একটা করে বিল কেটে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের পাশের ভদ্রলোক বললেন এরা প্রতিদিন কিছু না হলেও লাখ দশেক টাকা রোজগার করে ফেলে এই ঘাট থেকে। অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম সামনের টাকা নেওয়া পুলিশটার দিকে। সন্ধ্যা নেমে এল। একটু পরেই জোরে জোরে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ মাইকে গঙ্গাস্তুতি চলতে লাগল। সাধারণ জনতা জোড়হাতে দুলে দুলে সেই স্তুতিতে কণ্ঠ মেলাতে লাগল। অনেকেই ছবি তুলবে বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সন্তুও উঠে পড়ল।



সেই অজানার খোঁজে

তারপর ভিড়ের মধ্যে কে যে কোথায় কিছুই আর বোঝা গেল না। মিনিট কুড়ি বাদে আরতি শেষ হল। এবার আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে এল। সন্তুও কোথা থেকে যেন উদয় হল। আমরা একটা পাতার নৌকা ধূপ আর কর্পুরের প্রদীপ দিয়ে সাজানো জলে ভাসালাম। খুব ভালো লাগছিল। এরকম অসংখ্য নৌকা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। আরও একটা ভাসাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ওখান থেকে চলে এলাম। সামনেই একটা ব্রিজ, তার উপরে উঠে

দাঁড়ালে সুন্দর দেখা যায় গঙ্গার বুকে মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রদীপগুলো ভেসে ভেসে চলেছে। কিন্তু বেশী দূর পর্যন্ত নয়। সামনেই একটা জায়গায় নদী গোঁত্তা খেয়ে ফুঁসে উঠছে। ওইখানে গিয়েই প্রদীপগুলো সব নিভে যাচ্ছে।

বেশ দার্শনিক দার্শনিক মনোভাব নিয়ে ব্রিজ থেকে নেমেই একেবারে হিসেবী মানুষ হয়ে গেলাম। এবার কেনাকাটার পালা। প্রথমে সবার জন্য গোছা গোছা চুড়ি কেনা হল; তারপরে কার তামার ঘট, কার পিতলের কমণ্ডুলু ইত্যাদি ইত্যাদি লিস্টি মিলিয়ে কেনা হল। তারপর খাওয়া হল ক্ষীরমালাই, কুলফি বরফ। সামনেই একটা কাঠের দোকান আমি তীর বেগে ঢুকে গেলাম। সেখান থেকে কাঠের বাক্স, দাবা বোর্ড আরও কীসব কীসব কেনা হল। তারপর পাইকারি হারে ফোটো নেওয়া হল হরিদ্বারের একে তাকে দিতে হবে। তারপরে মায়ের জন্য বেতের ঝুড়ি। এইসব কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমাঝে দেখছি রাস্তা দিয়ে মিছিলের মত যাচ্ছে। অনেক লোক হাতে কীসব নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে ঘাটের দিকে। জিনিসপত্র ঢোকাতে ঢোকাতে সস্তু ডেপ্যাকটা ভরে গেল। আমি তখনই জানতুম আরেকটা ব্যাগের দরকার হবে। দুহাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আরও কিছু কেনার ইচ্ছা ছিল। যদি আরও কয়েকটা হাত থাকত তবে অবশ্যই কিনতাম। এইজন্যই বলে ছেলেদের বুদ্ধির উপর ভরসা করতে নেই একদম।



জীবনের হাতে-বাজারে

আসার সময়ে দেখলাম প্রসেশন বেরিয়েছে। সকালবেলার সেই সুন্দর করে সাজানো পাটাতনগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া বা মোটরভ্যান। তার উপরে সেজেগুজে সব দেব দেবীরা। রাধা কৃষ্ণ গেল নাচতে নাচতে। গরমে তাদের সিল্কের জামা সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। তারপরে প্রচুর সাজগোজ করে রাম আর সীতা বসে আছে দেখলাম। সীতার মুখটা প্যাঁচার মতন হয়ে গেছে। পেট কামড়াচ্ছিল কিনা কে জানে। উল্টোদিকে পায়ের কাছে গম্ভীর মুখে লক্ষ্মণ বসে, তাকে বিশেষ কেউ দেখতে পাচ্ছেনা বলে বোধহয় রাগ হয়েছে। তারপর বিষ্ণু লক্ষ্মী। সরস্বতী। এরকম পরের পর প্রায় গোটা

#

দশ বারো মোটরে টানা পাটাতন গেল। শিবকেও দেখলাম। রঙচঙে বাঘছাল পরে সে আর নন্দী নাচছে বোম্বাচাক গানের সঙ্গে। দিব্যি লাগছিল। পার্বতী মনে হয় নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই দেখলাম একধারে বসে আছে।

দুহাতের প্রায় ছিঁড়ে যায় যায় প্লাস্টিক প্যাকেট সামলে হাজারো মানুষ ঠেলে আমরা শেষমেশ কোতোয়ালীর কাছে এসে পৌঁছালাম। এখান থেকে রিক্সা নিয়ে সোজা হোটেল। শুনলাম আজ নাকি কিসের একটা যোগ আছে। তাই এত বড় প্রসেসন, আমাদের ভাগ্যটা ভালোই বলতে হয়। ট্যুরের শেষ পর্যায়েও একটা দর্শনীয় জিনিস ফাউ পেয়ে গেলাম।

এবার হোটেলে এসে প্যাকিং আর খাওয়া দাওয়া। ট্রেন রাত্রি একটায়। আমরা হোটেল ছাড়লাম সাড়ে বারটায়। যথাসময়ে ট্রেন এল। ব্যাগপত্র নিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। আপার বার্থের নাসিকা গর্জনের ঠেলায় সারা রাত্রি আর ঘুম হল না।

১৫ অগাস্ট ২০১৬, দশম দিনঃ

কথা ছিল দিল্লী ষ্টেশনে নেমে প্রিপেইড ট্যাক্সি ধরে চলে যাব বোনদের বাড়ী। কিন্তু ভোর পাঁচটার সময় দিল্লী স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম ট্যাক্সি কাউন্টার বন্ধ। জানা গেল পনেরই অগাস্ট বলে ট্যাক্সি কাউন্টার খুলবে না। একটা অটো ধরলাম। দিল্লীর অটো চোর হয় সবাই জানে। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি ভগবানের উঠোন থেকে আর কিছু কি খারাপ হতে পারে এই জীবনে! অটো নিয়ে সোজা বোনেদের বাড়ী। তারা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

বেশ কিছু হাসি মজা, ফটো দেখা, রান্না, খাওয়া দাওয়া এই করে কেটে গেল দিনটা। দুপুরবেলা প্রেমসে বোনের বানানো বিরিয়ানী আর চিকেন চাঁপ সাঁটিয়ে ওলাগাড়ি ধরে এয়ারপোর্ট। দিল্লী থেকে প্লেন ছাড়ল সাড়ে পাঁচটায়। প্লেনে খানিক ঘুমিয়ে আর খানিক জোৎস্না মাখা মেঘের রূপ দেখতে দেখতে নটার সময় পৌঁছালাম ব্যাঙ্গালোরে। এক ঘন্টা বাসে ঝিমুতে ঝিমুতে বাড়ী ঢুকলাম রাত্রি এগারোটার সময়।

বোনের সযত্নে প্যাক করে দেওয়া বিরিয়ানী খেয়ে নাগরিক জীবনের নিশ্চিন্ত কোলে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে ঘুম দিলাম।

আবার যেন পৌঁছে গেছি সেই উপত্যকায়। ঘুরে বেড়াচ্ছি স্বর্গের ফুলবাগিচায়। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ফুটে রয়েছে ব্রহ্মকমল। আর তাদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে আমাদের মাথায়।

লেখক পরিচিতি

অঙ্কিতা এখন পুজোর কেনাকাটায় ব্যস্ত। পরিচিতি জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।



ট্রেনে, বাসে, বা ভিড় স্থানে 'পকেটমারি' বা ডাকাতি অনেক পুরনো কাসুন্দি। ঘেঁটেও যে খুব একটা লাভ হয় – আমার তা মনে হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে যদি কোন ডাকাত বা পকেটমার ধরা পড়ে তাহলে অবস্থাটা কিন্তু উল্টো পক্ষে একই হয় না – বলা চলে মৃত্যু অবধারিত, নিদেনপক্ষে আধমরা করে পুলিশে দেওয়া। হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু বা লক-আপে গিয়ে অপেক্ষা – যেকোনো একটা। আমি এই জায়গা থেকে একটু অন্যদিকে হাঁটতে চাইছি। সাধারণ মানুষকে একটু দেখতে চাইছি নিজের চিন্তার আলোকে। একটু খোলসা করে বলা যাক।

২০০৪ সালের ৮ই মে (আমার ডায়রিতে ঘটনাটা লেখা আছে বলেই এতটা নিখুঁত বলতে পারলাম) আমি ট্রেনে এক গণপিটুনির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। সাধারণ মানুষ যে কতটা নৃশংস হয়ে যেতে পারে তার রূপ দেখেছিলাম – যা আজও মনে পড়ে। বর্তমানে সেই নৃশংসতার মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে। কারণ খবরের কাগজে এই খবর এখন প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা মেলে। আমার মনে হয়ে এই নৃশংসতার বৃদ্ধি আমাদের মনের মধ্যেই আছে। আমরা অসহিষ্ণু যত না সমাজে তার চাইতেই বেশি করে আমার বাড়ীতে, আমার পরিবারের কাছে। হিপোক্রেসি'ই যে এর কারণ তা স্পষ্ট।

আমরা বাঙালী। বীরপুঙ্গব জাতি। আমাদের বীরত্বের প্রমাণ যে পথে ঘাটে দিতেই হবে। তবে না আমরা সাহসী! আমাদের সাহসের প্রমাণ দিতে তাই পথে ঘাটে কিছু শীর্ণ মানুষ – যাদের বেশিরভাগ সমাজের চোখে নিম্নস্তরের – প্রয়োজন হয়। যে হয়তো সারাদিন অভুক্ত, আধমরা তাদেরকেই না মেরে সুখ। আমরা হাজার টাকার জামা পরে রেস্তোরাঁতে সঙ্গী/সঙ্গিনীসহ খেতে যেতে পারি, কিন্তু ভিখারিকে একটা টাকা দিতে মন সরে না। "কেন দেবো? ওরা কি সত্যি ভিখারি না কি? চালাকি চালাকি? জানেন, সব চালাকি। এটা ওদের ব্যবসা..." ইত্যাদি। আমরা এমন বীরত্ব কোথা থেকে পেলাম? ছোটবেলায় বাবাকে দেখেছি মা'কে পেটাতে, বা পাশের বাড়ীর কাকীমা'কে কাকু রাতে মদ (পড়ুন রাম) খেয়ে পেটান।

#

আর আমরা নিজে? নৃশংসর মতন মার তো প্রচুর খেয়েছি। সেই রাগ, অথবা কোন কিছু না পাওয়ার ক্ষোভ, কিম্বা আরও কোন সুপ্ত অকৃতকার্যতার দরুন দ্বেষ?

মানুষ খুব কমই তার নিজের ক্ষেত্রে সফলতা পায়। অবদমিত যৌনতা, বা ছোটবেলায় ফেলে আসা কোন নৃশংস স্মৃতি তাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। আমাদের শাস্ত্রে আছে – "মানুষ হও"। আগেকার দিনের দাদু-ঠাকুমা'রা হরদম এই আশীর্বাদ করতেন – কিন্তু কেন? একজন কুকুরকে তো কুকুর হতে হয় না, বা বাঘকে বাঘ! মানুষকেই বা কেন তাহলে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে?

কারণ মানুষও পাশব প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মেছে। কিন্তু মনের ভিতর থেকে একটা বিদ্রোহ, বলা ভাল একটা 'না' তাকে আর সব পশুর থেকে এতটা আলাদা, এতটা উন্নত করে তুলেছে। কিন্তুই সে তার উৎসকে ভুলবে কি করে? তাই ছোটবেলা থেকে মিথ্যা কথা না বলা শেখাতে হয়, পরের দ্রব্য চুরি না করতে শেখাতে হয়, অন্যায় না করা শেখাতে হয়। এই শিক্ষাই আস্তে আস্তে তাকে প্রকৃত মানুষের পর্যায়ে নিয়ে আসে।

এবার যে শিশু ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা পায়, কেবল কি সেই এমন মনুষ্যত্ব অর্জন করে? না তো। তাহলে দরিদ্র কোনোদিন সৎ হতে পারত না। ধনী কখনো পারত না 'অসৎ' হতে। তাহলে বাধছে কোথায়? বাধছে নিজের সঙ্গে। ওই যে বললাম, পাশব প্রবৃত্তি, কিম্বা ছোটবেলার ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা, যা তার অবচেতনে কাজ করছে। ফ্রয়েড সাহেব তাই বারবার একজন মনোরোগীর ছোটবেলায় যাওয়ার চেষ্টা করতেন। কারণ ওই ছোটবেলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটা বড় উত্তর।

বাঙালীদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই 'চালাকি' শব্দটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমার ছাত্রাবস্থায় আমি এমন কোন মা'কে মনে করতে পারি না, যিনি তার ছেলেকে বলেছেন, "বাবা, টিফিনে যদি দেখো তোমার বন্ধু টিফিন নিয়ে আসেনি তাহলে তাকে তোমার অর্ধেকটা অবশ্যই দিও।" আজও কোন স্কুলে কোন শিশুর মা বোধহয় এই শিক্ষা দিয়ে পাঠান না। শিশু নিজে থেকেই শিখে নেয় যে তার বন্ধুকে খাওয়ার দিয়ে খেতে হয়। আরেকটু বড় হয়ে সে শেখে দুনিয়াটা বড় স্বার্থপর। 'সবাই তোমাকে ঠকানোর জন্য রেডি (এক যিনি বলছেন তিনি ছাড়া), সুতরাং, তুমিও তাই কর। নিজের স্বার্থ নিজে বুঝে নাও।'

এখন এই স্বার্থ ব্যাপারটা কি? যে বলছে সম্ভবত সে নিজেও জানে না। শিশু যদি স্বার্থপর হতে শেখে তো সে সব জায়গায় স্বার্থপর হতে শিখবে। যে বাবা-মা তাকে শেখাচ্ছেন, তাদের প্রতিও সে তাই-ই করবে। শিক্ষা এমনই একটা জিনিস, তার প্রয়োগ সর্বগামী। সুতরাং বুমেরাং।

কেমন করে এই স্বার্থপরতা আটকানো যায়? উত্তর একটাই "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"। তোমার পাশের মানুষটাকে কষ্ট দিও না। মনে মনেও তার নিন্দা করো না। সম্ভব হলে তাকে নিজের সবকিছু দিয়ে সাহায্য কর। তবেই সম্ভব। পরার্থপরতা দিয়ে স্বার্থপরতা আটকানো যায়, সরলতা দিয়ে চালাকি আটকানো যায়, সত্য দিয়ে মিথ্যাকে আটকানো যা, নচেৎ নয়।

।। ২ ।।

ধর্ষণ বেড়েছে, শ্লীলতাহানি আরও বাড়ছে – মহামারীর আকার না নেয়। শুনেছি বিদেশে ১৩ বছরের মেয়ের ব্যাগে না কি পিল থাকে। বলা তো যায় না। আজ আমি ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে আর কিছুদিনের মধ্যে ক্লাস সেভেনের মেয়েকে নিয়মিত পিল খাওয়ানো বাধ্যতামূলক না করতে হয়। ক'টা মেয়ে আমাদের সমাজে আত্মীয়-স্বজন, বা কাছের কোনও পরিচিত জনের কাছে আপত্তিকর কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে নি, এ হাতে গুনে বলা যায়। এ আগেও ছিল, ইদানীং আরও বাড়ছে। ভিড়ে গায়ে হাত এখন জলভাত। অফিসে, স্কুলে আপত্তিজনক প্রস্তাব – আহামরি বা অবাক হওয়ার মতন নয়। কিন্তু কেন?

যৌনতার ওপর মানুষের চিরকালই আকর্ষণ। কিছু মানুষ অত্যন্ত বেশি করে। যখন ইন্টারনেট ছিল না, তখন যৌনতার ব্যাপারে – যাকে আমরা সেক্স এডুকেশন বলি, তাও ছিল না। মেয়েরা মায়ের কাছে কিছু পাঠ নেয়, ছেলেদের সে বালাইও নেই। কিন্তু বর্তমানে এর ভয়ঙ্করতা বেড়েছে। আপনি খেতে ভালবাসেন। আপনাকে একটা ঘরে প্রচুর খাওয়ার দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেয়েই গেলেন। কোথায় থামতে হবে, বা কতটুকু খেলে আপনার পক্ষে মঙ্গল – আপনি তা জানেন না। তাহলে হবে কি? লাগামছাড়া খাওয়ার ফলে শরীরপাত। আর এক্ষেত্রে আপনার কোন সেক্স এডুকেশন নেই। কিন্তু ইন্টারনেটে পর্ন সাইটে আপনি যখন খুশি ঢুকতে পারেন, যেকোনো রকমের গল্প/উপন্যাস পড়ে আপনার কল্পনার জগতকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে পারেন। কিন্তু বাস্তব থেকে আপনি ততটাই দূরে চলে গেলেন। ফল - মনঃপাত। মনের ব্যভিচার, বিকৃতি – অবশেষে বিনাশ।

আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি যৌনতার শিকার মেয়েরা। খবরের কাগজে শিউরে ওঠার মতন অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে, চলেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। 'নির্ভয়া' কাণ্ডে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আমাকে কিন্তু একটাই প্রশ্ন ভাবিয়েছিল, কেন? কেন একটা মানুষ একটা মানুষকে এতটা যন্ত্রণা দিল। বিশ্বাস করুন, গন ধর্ষণে আমি এতটা শিউরে উঠিনি, যতটা না তার পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়ায়। কেন? 'অপরাজিতা' কাণ্ডে আমি রাত্রে ঘুমাতে পারিনি। শুধুমাত্র একটা কথাই ঘুরেফিরে আসছিল, কেন? গন ধর্ষণ অবশ্যই ন্যক্কারজনক ঘটনা। সাজানো বা পরিকল্পিত গণ ধর্ষণ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য। কিন্তু তার পরবর্তী প্রক্রিয়া। এতটা বিকৃত রুচি একটা মানুষ পেল কিভাবে? কেন?

উত্তর পেলাম – অজ্ঞানতা। নির্ভয়া কাণ্ডের সতেরো বছরের ছেলেটি যা করেছে তাতে মনে হয়েছে বিকৃত রুচির বোধশক্তিই তার তৈরি হয়নি। আর সাতেরো বছর এখনো ভারতীয় ধারায় নাবালকত্বের পরিচয়, যেখানে সত্য অর্থে বারো-তেরো বছরের অনেক আগেই একজন যৌনতা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়। ফলে এই বিশাল ফারাকের জন্য শিক্ষা এবং দণ্ড ব্যবস্থা টালমাটাল হয়ে পড়েছে। নাবালকত্বের সীমারেখা আরও কমানো উচিৎ। যৌন শিক্ষার ক্লাস আরও কম বয়েস থেকে শুরু করা উচিৎ, এবং তা কিছুটা বাড়ী ও বাকিটা স্কুল থেকে করা উচিৎ।

পর্ন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিদেশি পর্ণ উঁচুদরের অভিনয় – বড়রা জানে। ছোটরা জানে কি? আর ছোটদের কথাই বা কি বলব, বিয়ের পরে অনেক স্বামী স্ত্রী সেক্স এডভেঞ্চার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আলাদা হয়ে গেছে – এরকম উদাহরণ ভুড়িভুড়ি। অতএব এটা বন্ধ না করা হোক, কিন্তু সেক্স এডুকেশনের মাধ্যমে একটা সম্যক

ধারণা তো দেওয়া যেতেই পারে, যে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। আজ ছেলেমেয়েরা 'সুপারম্যান' দেখে ছাদ থেকে লাফায় না, তারা জেনে গেছে সত্যি আর কল্পনার ফারাক। ব্যতিক্রম এখনো আছে বটে, কিন্তু আর যাই হোক, কাগজে 'শক্তিমান'-এর মতন এখন কিন্তু আর খবর আসে না। তবেই একদিন ওরা নিজেরাই ফারাক করে নেবে। বুঝতে শিখবে। আর আস্তে আস্তে নিজেরাই একটা নিজেদের জন্য সুন্দর জগৎ তৈরি করে নেবে।

তবে আগের পর্বে যেমন বাবা-মা দায়ী, এই পর্বে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দায়ী করব মূলত শিক্ষকদেরকে। নিজে শিক্ষক হয়েই বলছি, আজও যখন দেখি স্কুলে স্কুলে অবশ্যপাঠ্য হয়েও অনেক স্যার/ম্যাডাম পড়াতে চান না, অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার লজ্জায় কেবল দাগিয়ে দিয়ে যান, তখন লজ্জাই লাগে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে একজন বায়োলজির স্যার পেয়েছিলাম, যিনি শারীরবিদ্যার 'জননতন্ত্র' চ্যাপ্টারটা পড়ানোর পরে শুধুমাত্র ছেলেদেরকে নিয়ে একদিন একটা ক্লাস করিয়েছিলেন, তাতে আমরা যা প্রশ্ন ছিল করেছিলাম, এমনকি মনের গভীরতম প্রশ্নও, যার কথা ভাবলে আজ হাসি পায়। কিন্তু মনের কুয়াশা কেটে যাওয়ার পর যৌনতাটা ততটা রহস্যময় লাগেনি আর। বরং স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি বলেই মনে হয়েছিল।

যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের এ ব্যাপারে অন্ধকারে রাখেন তাহলে আর কি করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা তো স্বভাবত কৌতূহলী। তাদের কৌতূহল যদি না মেটে, তবে তারা নিজেরাই তার সমাধান খোঁজে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞানী খোঁজে। ফলে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী অন্ধকার থেকে অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়। যৌনতাটা এক রহস্যময় বিকৃতি ভাবে, সৌন্দর্যের এক পথ হিসাবে নয়। স্বামী স্ত্রী'কে, বা স্ত্রী স্বামীকে সম্মান করতে পারে না। কারণ ফ্যান্টাসি তো আর বাস্তব নয়। আর বাস্তব-কল্পনার পার্থক্য করতে না পারলে যা হওয়ার তাই হয়। বেশিরভাগ ডিভোর্স হচ্ছে কেবল যৌনতার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি না হওয়ার জন্য। আর তারপর, মানুষ আরও বিকৃত হচ্ছে, আরও জঘন্য পাপের পথে নিজেও নামছে, অন্যকেও নামাচ্ছে। নীচুশ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি ঘটছে।

পশ্চিমী যৌনতা আর প্রাচ্যের যৌনতার মধ্যে ফারাক আছে। তার আলাদা মনস্তাত্ত্বিকটা আছে। তার ওপর প্রত্যেক মানুষের মন আলাদা আলাদাভাবে গড়া। যে নিজের মন বুঝবে, নিজেকে জানতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি বাকি সবাইকে জানতে পারবে। শিক্ষকরা এই দায়িত্ব না নিলে কে নেবে?

।। ৩ ।।

লোভ বড় বিষম বস্তু। কোথায় যে তার শুরু তা জানতে পারো, কিন্তু শেষ কোথায় হবে কেউ বলতে পারে না। এ যেন সিঁড়ির প্রথম ধাপে বল আটকানোর ব্যাপার। প্রথম ধাপে না পারলে আর পারবে না। লোভ মানুষকে কোন পথে ঠেলে আজ তার উদাহরণ প্রচুর। আমরা নিজেরাই কি কম যাই? লোভ, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা শেষ করে দিচ্ছে। একটু একটু করে আত্মাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। একবার ধরলে এর থেকে রেহাই নেই।

বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন গীতা বলছে 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙস্তেষূপজায়তে' অর্থাৎ বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের ঐ বিষয়ে আসক্তি জন্মায়। এই আসক্তি একটা বিশাল বড় কথা। আসক্তি অর্থাৎ লোভ জন্মায়, জন্মায় পরশ্রীকাতরতা। আজ টিভির জগতে বিজ্ঞাপন একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। ভূমিকাটা কি? না, আপনার এই প্রোডাক্টটি

প্রয়োজন। আমরা ভেবেও দেখি না সেটা সত্যিকারের প্রয়োজন কি না। যদি ভেবে দেখতাম তাহলে মালুম হত যে আমার ঘরের বেশিরভাগ জিনিস ব্যতিরেকেই আমরা দিব্যি সুখী জীবন যাপন করতে পারব। রাসেল সাহেব বলছেন, 'তোমাদের সমস্যা প্রেস্টিজ বাঁচানোর সমস্যা, Struggle for prestige।' অর্থাৎ আমার আছে, এই ব্যাপারটাই বেশ বড় করে প্রমাণ করা। আর তাই আমরা জড়ো করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি। আমার ফেসবুক প্রয়োজন। তার জন্য ৫০০০ টাকা দামের ফোনে হয়তো হয়ে যায়। কিন্তু সেই জায়গায় আমি দশ হাজার টাকা খরচ করছি। যতটা না প্রয়োজনের তার চাইতে বেশি অপ্রয়োজনের। আসলে নিজেকে নিজের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে সকলের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা – আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। অর্থাৎ কি না, আমার পরিচয় আমার নিজের কাছে নয়, অন্যের চোখে। এই চোখও যে একইরকম সমস্যায় ভুগছে তা মাথায় আসে না।

অনেকে বলেন, কে কি বলে আমার কিছু যায় আসে না, আমি আমার মতন কাজ করে যাই। এও এক ধরণের ক্রাইসিস। জোর করে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা – যার মধ্যে আগের ক্রাইসিসেরই একটা অন্যরকম প্রকাশ, যে অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আমাদের আশেপাশের পরিবেশ পরিস্থিতিকেও আমরা অস্বীকার করি, তাকে কোথাও দূরে ঠেলে দিই। অবশেষে আমরা নিজগৃহে পরবাসী হয়ে পড়ি।

তাহলে উপায়? মধ্যপন্থা। না তো জোর করে কাউকে নিজের কাজের গুরুত্ব বোঝানো, না কেউ বুঝতে চাইলে তাকে অস্বীকার করা – যেমন ভাবে সব আসছে, তেমনিভাবে সবকিছুকে বয়ে যেতে দাও। 'ভাল মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'। আমার এক বন্ধু বলেন 'Accept Yourself'। বিবেকানন্দ বলেন, "লোকে বলে একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর, আগে নিজেকে বিশ্বাস কর দিকিনি, দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে।"

এই নিজেকে বিশ্বাস করার অর্থ কি? নিজেকে জানা "Know Thyself"- সক্রেটিস বলতেন। কীভাবে জানব? দিনের শেষে একান্তে বসে সারাদিনের প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা। দেখা যে, প্রতিটি কাজের পিছনে স্বার্থ কতটা ছিল আর পরার্থপরতা কতটা ছিল। "নিজেকে যে জয় করতে পেরেছে, সে বিশ্বকে জয় করতে পারে" বুদ্ধের অনবদ্য উক্তি। নিজেকে জয় করা, অর্থাৎ নিজের লোভকে জয় করা। নিজের প্রয়োজনকে সুনির্দিষ্ট করা। আর নিজেকে পবিত্র করা, শুদ্ধ করা, অ-পাপবিদ্ধ করা। তারপর পরের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কামিনী রায়ের ভাষায়,

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাহি কেহ অবনী পরে

সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

উপসংহারঃ

দ্রোহকাল আসুক নিজের মধ্যে, সমাজে নয়। নিজেকে পরিবর্তন করলেই জগৎ পরিবর্তন সম্ভব। এই দ্রোহ হোক নিজের বিরুদ্ধে। এই দ্রোহ হোক নিজের মনের মলিনতার বিরুদ্ধে। যাবতীয় ক্ষোভ, লালসা, রিরংসা, চিত্তবৈকল্যতার বিরুদ্ধে। দ্রোহকাল বাইরে নয়, দ্রোহকাল ভিতরে আসুক নেমে। সবার জীবনে দ্রোহকাল আসুক নেমে...

#

অলঙ্করণঃ অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ

লেখক পরিচিতি

অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ: চেনা মুখ, অতিচেনা ছদ্মনামে (তবে কিছু সদস্যদের অচেনা) এবারের প্রবন্ধ লেখা। যদিও লেখালেখি করেন বটে, তবে ক্ষেত্র অন্য, নাম ভিন্ন। শুধুমাত্র বহুমুখী'র জন্য অন্যস্বাদের (কিম্বা বিস্বাদের) লেখা, যা খানিক বিতর্কিতও বটে, এবং যুগপৎ আশা ও আশঙ্কায় আধাচেনা ছদ্মনামে প্রথমবারের মত বুদ্ধের আত্মপ্রকাশ।



(অনুবাদকের ভূমিকাঃ গল্পটি জ্যাকস ফুট্রেল লিখিত "প্রবলেম অফ সেল নম্বর থারটিন"-এর সংক্ষিপ্তকৃত অনুবাদ। এটা ১৯০৫ সালে ছয় কিস্তিতে 'বস্টন আমেরিকান' সাপ্তাহিকতে প্রকাশিত হয়। গল্পটাকে সর্বকালের সেরা রহস্য ধরা হয়। এটা মূল গল্পের ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। যারা কোনান ডয়েল, এলান পো'র লেখা পড়ছেন তারা জানেন সে যুগের লেখকরা বর্ণনা আর কথোপকথনে অলংকার এবং ভারী ভারী শব্দে লম্বা বাক্য প্রয়োগ করতেন। সেগুলো সরাসরি অনুবাদ না করে প্রায় চল্লিশ পাতার গল্পকে মূল বক্তব্যের কিছু বাদ না দিয়ে সহজ ভাষায় তুলে ধরেছি সাত পাতায়। ইংরেজিতে ডঃ ডুসনের নামের আদ্যাক্ষর আর "এ", বাংলায় "অ", তাই সাংকেতিক চিঠি আমাকেই লিখতে হল। গল্পটা তৎকালীন আমেরিকানদের জন্যে লেখা। তাই বর্তমান পাঠকদের সুবিধার্থে সমসাময়িক বাড়ি, জল নিষ্কাশন প্রণালীর বিবরণ ইত্যাদি যোগ করেছি। মূল গল্পে হিউমরের অভাব ছিল, আমি কিছু হাস্যরসও ছিটিয়েছি। তবে মূল গল্পের কাঠামো, পটভূমিকা আর চরিত্র অপরিবর্তিত। সুললিত ভাষায় লেখা এত সুন্দর গল্পে কাঁচি চালানর জন্যে ক্ষমা চাইছি।)

ডাক্তারি, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী প্রফেসার অগাস্টাস ফ্যান ডুসন "থিংকিং মেশিন" নামেই পরিচিত। তাঁর বাড়িতে একদিন সান্ধ্য আড্ডায় মানুষের মনের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত ছিলেন ডঃ রেনসাম, বিখ্যাত পদার্থবিদ্ আর উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার মিঃ ফিল্ডিং। কথাপ্রসঙ্গে ডুসন বললেন যে চিন্তাশক্তির জোরে সবকিছু করা সম্ভব। রেনসাম মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, "এটা তোমার কথার কথা, নিশ্চয়ই বলতে চাওনা যে চিন্তাশক্তির জোরে বন্ধ ঘর থেকে নিরেট দেওয়াল ভেদ করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে।" ডুসন জবাব দিলেন যে চিন্তা মানুষকে উদ্ভাবনা করার ক্ষমতা দেয় তার সাহায্যে সে বেরিয়ে আসতে পারে। এরপর উঠল যুক্তিতর্ক বাদানুবাদের

#

ঝড়। অবশেষে বিরক্ত হয়ে ডুসন বললেন, "বেশ আমার কথার সত্যতা তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আমাকে কোনো জেলখানায় বন্দী করো – সাতদিনের মধ্যে ঠিক বেরিয়ে আসবো।" ফিল্ডিং শর্ত জুড়লেন – জেলখানায় তিনি সাধারণ কয়েদির মত ব্যবহার পাবেন, কোনো বাড়তি সুবিধা নয়। তাতে ডুসেনর আপত্তি নেই।

তিনজনেই প্রতিপত্তিশালী, কয়েকটা ফোন করে গোপনীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নাম করে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেয়ে গেলেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই নিকটবর্তী চিসহোম জেলের সুপার এসে গেলেন। ডুসনকে সাতদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদি যে ঘরে থাকে সেরকম ঘরে রাখতে হবে, জেলের কর্মচারী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া চলবে না বন্দীকে, বন্দীর ঘরে কিছু জিনিস বিপদজনক মনে করলে সুপার তা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন; তবে যখন সুপারের ডুসন হার স্বীকার করবেন তখুনি তাঁকে মুক্তি দিতে হবে, এসব শর্ত সুপারকে বোঝানো হল। ডুসনকে সম্মান দেখিয়ে কয়েদির পোষাকের বদলে সাধারণ পোষাকের অনুমতি দিলেন সবাই – জুতো, মোজা, প্যান্ট, শার্ট। তখন ডুসন তিনটে জিনিসের অনুরোধ করলেন এটা জানিয়ে যে ওগুলো পেলে ভালো না পেলেও ক্ষতি নেই; একটা টুথপাউডার বাজার থেকে যে কেউ কিনে দিলেই চলবে, দুটো দশ আর একটা পাঁচ ডলারের ব্যাঙ্ক নোট এবং তাঁর জুতো জোড়া চকচকে পালিশ করিয়ে দিতে হবে। জেলের কোনো কর্মচারীকে পঁচিশ তো দূরের কথা পাঁচশ ডলারের বিনিময়েও কেনা যাবে না। হয়তো ভালো করে সেবাযত্ন করার জন্যে রক্ষীদের বকশিশ দিতে চান – জেল সুপারের আশ্বাস। তাই সবাই অনুরোধগুলো মেনে নিলেন যদিও জুতো পালিশের কেন দরকার কারুই বোধগম্য হল না।

সুপারের গাড়ীতে সবাই জেল মুখো হলেন, যাবার আগে ডুসন বাড়ির পরিচারিকাকে বললেন, "এখন রাত্রি ন'টা বাজে, ঠিক সাতদিন পরে রাত্রি সাড়ে ন'টায় আমার এই তিন বন্ধু এবং আরও দুজন আমার সঙ্গে নৈশাহার করবেন সব ব্যবস্থা করে রেখো।"

।। ২ ।।

জেল অফিসে ভালো করে তল্লাশির পর ডুসনকে ১৩ নং ঘরে, যেখানে ফাঁসির আসামিদের রাখা হয়, বন্দী করা হল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সবাইকে সপ্তাহান্তে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন ডুসন। শুভরাত্রি জানিয়ে বাকিরা চলে গেলেন।

তারপর ডুসন যেসব তথ্য পেয়েছেন জেলের চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে শুয়ে তার বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। চিসহোম থেকে তাঁর বাড়ি গাড়ীতে ঘন্টাখানেকের পথ, কালপাথরে তৈরি চারতলা জেলটা ওপরে কাঁটাতার লাগানো। ১৮ ফুট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের গা বেয়ে দু'জন রক্ষী টহল দেয় চব্বিশ ঘন্টা। জেলঘর থেকে পাঁচিল পর্যন্ত ২৫ ফুট চওড়া খোলা জমি জেল কম্পাউন্ডের চারিদিকে। ঘর থেকে পাঁচিলের দূরত্ব তাই ২৫ ফুট। পাঁচিলের ওপরে দুপাশে উঁচু লোহার থামে লাগানো কার্বন আর্ক ল্যাম্পের উজ্বল আলোয় দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত চিসহোম। জেলের পাঁচিলের বাইরের দেওয়ালের সঙ্গে লাগাও চেকপয়েন্ট বুথ আর দুটো লোহার দরজা। ২৫ ফুট চওড়া রাস্তা পেরিয়ে জেল। চার ধাপ সিঁড়ি উঠে সুপারের চেম্বার, মোটা কাঠের দরজা ঠেলে ঢুকতে হয়, চেম্বারের অন্যপ্রান্তে আরেকটা লোহার দরজার পার হলে টানা বারন্দায় কয়েকটা জেল অফিসঘর। আরেকটু ওপাশে বন্দীদের ঘর, প্রত্যেকটাতে লোহার দরজা যার ওপরে ফুটখানেক চওড়া উঁচু লোহার খড়খড়ি লাগানো এটা শুধু বাইরে থেকেই খোলা যায়। তাঁর ঘরটা একতলায়।

লোহার খাটে পাশ ফিরলে মচ্ মচ্ আওয়াজ, তারই ফাঁকে শোনা গেল জান্তব শব্দ। ডুসন চোখ খুলে দেখেন অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে বেশ কয়েক জোড়া চোখ আর ছোটো ছোটো ঝাপসা কিছু কায়া। ইঁদুর প্রচুর। ক্লান্ত শরীর ডুসনের - ঘুম এসে গেল।

সকালে উঠে চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ডুসন। ঘরটা বেশ বড়সড়, দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালের কোণের দিকে চার ফুট ওপরে দু'ফুট উঁচু দু'ফুট চওড়া লোহার গারদের জানলা। এর তলায় লোহার খাট। তোষকের জায়গায় লোহার পাত। জানলা দিয়ে দেখা যায় বৈদ্যুতিক তার বাড়ির দেওয়াল দিয়ে গিয়ে কার্বন ল্যাম্পের সঙ্গে জোড়া। বাড়ির দুপাশে খোলা জমিতে দুজন প্রহরী সারাক্ষণ টহল দেয়। ঘরের মধ্যে কিছু ইঁদুর ঘোরাফেরা করছিল। এই সময়ে রক্ষী সকালের খাবার নিয়ে এল। দরজা খোলা, ইঁদুরপাল উধাও। সকাল ছটায় প্রাতরাশ, দুপুর বারোটায় মধ্যাহ্নভোজ, সন্ধে ছটায় রাত্রের খাবার আর রোজ রাত নটায় সুপার পুরো ঘর নিরীক্ষণ করেন তবে প্রয়োজন মনে করলে তিনি যে কোনো সময় এসে পড়েন। খাবার পর ডুসন আবেদন করলেন যে তাঁর খুব জলতেষ্টা পায়, ঘরে একটু জল রাখলে ভালো হয়। সুপারের অনুমতি নিতে হবে বলে এঁটো থালা নিয়ে রক্ষী চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে একটা বড় মাটির ভাঁড়ে জল এনে জানিয়ে দিল ওটা ঘরেই থাকবে ভাঙলে আবার দেওয়া হবে না।

রক্ষী চলে যাওয়ার পর থিংকিং মেশিন আবার জানলার দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। চারিদিক নিঃশব্দ। আকাশে কয়েকটা পাখি উড়ছে যেগুলো সাধারণত জলাশয়ের কাছাকাছিই ওড়ে। মানে কাছাকাছি নদী বা বড় পুকুর আছে। কিছু পরে মোটরবোটের ক্ষীণ আওয়াজ পেলেন তিনি। নদী। বেলা বাড়তে মনে হল ভেসে আসছে ছেলেদের কোলাহল আর কাঠের ব্যাট দিয়ে বল মারার শব্দ।

এবার তিনি ঘরের দিকে মন দিলেন। রক্ষীর আসার সময়ে ইঁদুরগুলো কিন্তু দরজা দিয়ে পালায়নি। অন্য কোনো রাস্তা আছে। সূর্য ঘুরে গেছে ঘরটা বেশ অন্ধকার। খাটের দেওয়াল যেখানে মেঝের সঙ্গে মিশেছে সেই পুরো জায়গাটা হাত বুলিয়ে অনুভব করতে লাগলেন। ধৈর্যের ফল মিলল। এককোনে মেঝেতে সওয়া ইঞ্চি মত একটা গর্ত।

দুপুরে খেতে খেতে রক্ষীকে প্রশ্ন করলেন ডুসন, "নদীটা কতদূরে?"

"প্রায় দুশো গজ।"

"নদী থেকে পাঁচিল অব্দি খোলা মাঠে ছেলেরা নিশ্চয়ই খেলাধুলো করে?"

"বেসবল খেলে।"

"ইদানিং কি জেলবাড়িটাকে সারানো হয়েছে?"

"বছর চারেক আগে বাইরের দেওয়ালের মেরামতি আর নতুন করে জলের পাইপ লাগানো হয়।"

"আগের আমলে যেকোনো বাড়িতে পাইপ দিয়ে বরফ গলা, বৃষ্টি বা চানের জল বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছাড়া হতো, ওই পাইপ এখনো আছে?"

#

"হ্যাঁ, ভাঙা হয় নি। তবে ওই পাইপের ভেতর দিয়ে পালালে বাধা দেবো না", ব্যঙ্গ করে রক্ষী চলে গেল।

পরের দিন ডুসন রক্ষীকে লোভ দেখালেন, তৎক্ষণাৎ পঁচিশ এবং পালানোর পর আরও পাঁচশ ডলারের প্রতিশ্রুতি। সবিনয়ে জানাল যে টাকার বিনিময়ে সে বিশ্বাসঘাতক হবে না, তাছাড়া ঘর আর বারান্দার ছাড়া অন্য কোনো দরজার চাবি নেই ওর কাছে। মনে হল ডুসন একটু হতাশ। সব খবর পেয়ে সুপার খুশী খুশী মনে ভাবলেন পালানোর প্রথম প্রচেষ্টা ভেস্তে গেল।

তৃতীয় দিন প্রাতরাশের পর রক্ষী দূর থেকে লোহা দিয়ে লোহা ঘষার আওয়াজ পেল, ডুসনের ঘরের কাছে আসতে শব্দ থেমে গেল। এবার রক্ষী চুপিসাড়ে এসে খড়খড়ি খুলে দেখে বন্দী খাটের ওপর দাঁড়িয়ে গারদের ওপর দিকে কিছু করার চেষ্টা করছেন। তাড়াতাড়ি সুপারকে ডাকা হল। সুপার ডুসনের গরাদ কাটার যন্ত্রটা চাইলেন। ডুসন বেশ ঘাবড়ে গেলেন এবং কিছুতেই যন্ত্রটা দিতে চাইলেন না। জোর করে ধরে তল্লাশ করতে ঘোড়ার নালের আকৃতি কিন্তু অনেক ছোট লোহার জিনিস পাওয়া গেল, বস্টনের গলিঘুঁজি সব পাথরের, তাই অনেকেই জুতোর পাদমূলে এরকম নাল লাগাতেন। অন্য পাটি থেকে নালটা খুলে, "এ দিয়ে সাত মাস লাগবে" সজোরে হাসতে হাসতে নাল জোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সুপার। মাথায় হাত দিয়ে ডুসন মাটিতে বসে পড়লেন।

চতুর্থ দিন সকালে প্রাতরাশ পর্ব শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হল। একটু বেলা বাড়তে জেলখানার ভেতরের দিকের প্রহরীর নজরে পড়ল তের নং ঘরের জানলা দিয়ে পুঁটলি মত কি একটা ফেলে কয়েদি সাঁৎ করে সরে গেল। প্রহরী সৎ। পুঁটলিটা সুপারের কাছে পৌঁছল। সুপার সাদা কাপড়ের পুঁটলির ভেতরে পেলেন হাতে লেখা চিঠি সঙ্গে পাঁচ ডলারের নোট। চিঠিতে লেখা,

প্রিয় রেনসাম,

য় যানোলা পায়পা উকনে "অ"

সংকেতে লেখা বাক্যের মর্ম না বোঝা গেলেও প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে ডঃ রেনসামের কাছে চিঠি পৌঁছে পালানোর চক্রান্ত পরিষ্কার। তক্ষুনি তের নং ঘরে গিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে সুপার বললেন, "পালানোর প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ। জামার কাপড়ে লিখে - ঘুষ দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। জামা আর টাকা বাজেয়াপ্ত করব।" ডুসন জামা খুলে দিয়ে দিলেন। সত্যি, বেশ খানিকটা ছিঁড়ে নেওয়া। তারপর পকেট থেকে তিনটে পাঁচ একটা দশ ডলারের বার করে দেখিয়ে বললেন, "শর্ত মত পঁচিশ ডলার রাখতে পারি। দেখতেই পারছেন পুরোটাই আছে, ঘুষ বাবদ ব্যবহার করা হয় নি। টাকা বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।" "আপনাকে একটা পাঁচ আর দুটো দশ দেওয়া হয়ছিল, বাড়তি দুটো পাঁচ কোত্থেকে এল? একটা দশই বা গেল কোথায়?" কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন সুপার। উত্তর এল, "সে সমস্যার সমাধান করা জেলসুপারের কাজ।" অপমানিত হলেও বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের বন্ধ করতে পারায় আত্মতৃপ্ত সুপার।

পঞ্চম দিন ভোররাত্রে তেতাল্লিশ নং ঘর থেকে চিৎকার চেঁচামিচির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। ঘরটার বন্দীর বিরুদ্ধে গায়ে এসিড ঢেলে নিজের স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ। সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি তবে তদন্ত চলছে।

প্রহরী ছুটে গিয়ে দেখে ভীষণ আতঙ্কিত অবস্থায় সে খালি ভুত ভুত বলে চ্যাঁচাচ্ছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরে সুপার দেখা করবেন বলে কোনমতে তাকে চুপ করানো গেল। সকালে দেখা হতেই সে হাত জোড় করে সুপারকে বললো, "হ্যাঁ হুজুর এসিড ঢেলে বউকে খুন করেছি যা সাজা দেবার দিন, কিন্তু দয়া করে ভুতুড়ে ঘরে আর রাখবেন না। ওঘরে রেতের বেলা গিন্নির ভুত এসে বিভৎস গলায় এসিড এসিড বলে ভয় দেখায়।"

"ঠিক আছে ঠিক আছে।" বলে বেরিয়ে সাহেব সোজা ডুসেনের তল্লাশি নিতে গেলেন এবং যথাযথ পাঁচটা এক আর দুটো দশ ডলারে নোট এবং অন্ধকার কোণে দুএকটা ইঁদুর ছাড়া অন্য নতুন কিছু দেখা গেল না।

ডুসন ষষ্ঠ দিন সারাক্ষণ ইঁদুর তাড়া করেছে আর ঘুমিয়েছে। এমনকি সন্ধে পর্যন্ত বন্দী ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন বলেই রিপোর্ট দিল প্রহরী। সপ্তম দিন সকালে সুপারকে ডেকে পাঠিয়ে ধমকের সুরে ডুসন বললেন, "কোনো অন্যায় করিনি তবু আমাকে বন্দী করে রেখেছ। এই মুহূর্তে না ছেড়ে দিলে পরে মামলা করে তোমাদের সবকটাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেব।" জিদ চেপে গেল সুপারের, কোনো মূল্যেই বন্দীকে ছাড়া হবে না।

সুপার যদিও জানেন ডুসন পালানোর আশা ছেড়ে দিয়েছেন তবুও কৌতূহল মেটাতে শেষ দুদিন সন্ধের দিকে তের নং ঘরে গেলেন টাকার হিসেব নিতে। ষষ্ঠদিনে পাঁচটা এক, দুটো পাঁচ আর একটা দশ এবং শেষদিনে পঁচিশটা এক ডলার। ম্যাজিক দিয়ে নোট পালটাতে পারেন তবে পালাতে পারেন নি। জয় সুপারের জয়। প্রফুল্ল মনে অফিসে ফিরলেন তিনি।

সূর্য ডুবে গেল। কিছু পরে জেলের মুখ্য দরজার পাহারাদার এসে ডাক যোগে আসা সুপারের নাম লেখা একটা খাম টেবিলে রাখল। খামের ভেতর এক টুকরো কাগজে লেখাঃ

'আজ রাত্রি সাড়ে নটায় আমার বাড়িতে নৈশাহার করতে আসতে ভুলবেন না।'

নিঃসন্দেহে ডুসনের হাতের লেখা। চিঠিটা বাইরের ডাকবাক্সে ফেলা তাই ডাকযোগে এসেছে। তবে কি... দৌড়ে গেল তেরো নম্বরে সুপার। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছেন ডুসন, কপালের একটু আর তাঁর বড় বড় চুলের খানিকটা চাদরের বাইরে। শেষ বারের মত জেলের আরামপ্রদ বিছানায় হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বেচারা, তোলা ঠিক হবে না। ফিরে গেলেন তিনি।

সাড়ে সাতটা নাগাদ আলো নিভে গেল, সারানোর জন্যে ফোন করা হল। কিছু পরে সারানোর লোকজন হাজির। প্রায় আটটায় দলের প্রধান সুপারের ঘরে গিয়ে "সারনোর কাজ শেষ, ল্যাম্প পুরো ঠাণ্ডা হবার পরই জ্বলবে। তাই একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে। এক সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরত যাচ্ছি বাকিরা আলো না আসা অব্দি থাকবে।" বলে নিজের গাড়িতে বেরিয়ে গেল। তারপর মেরামতির তদারকি করে সন্তুষ্ট হয়ে আরেকবার ডুসনকে দেখে এলেন আগের মতই চাদর মুড়ে ঘুমচ্ছেন। এবার নেমন্তন্ন খেতে যাই ভেবে রক্ষীদের আলো এলে খবর দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন।

#

বাড়ির ঘণ্টা বাজাতে স্বয়ং থিংকিং দরজা খুললেন। পালানোর পথ নেই মা ধরণী তুমিই বরং দ্বিধা হও মনে হল সুপারের।

।। ৩ ।।

খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হল, সবার মনে কৌতূহল কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। ডুসন সবাইকে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আরাম করে বসে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, "জানি কীভাবে বেরিয়ে এলাম তা জানতে তোমরা উদগ্রীব, তবে তার আগে বল সমস্ত শর্ত মেনে চিন্তাশক্তির জোরে বুদ্ধি খাটিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে পেরেছি কিনা?"। "হ্যাঁ হ্যাঁ" সমস্বরে মেনে নিলেন সবাই, শুধু বিনিত কণ্ঠে সুপার জানতে চাইলেন, "কালি কলম কোথায় পেলেন স্যার?"

"জুতোর পালিশের সঙ্গে জল মিশিয়ে কালি আর জুতোর ফিতের দুপ্রান্ত লাগানো ছুঁচলো ধাতুর পাত আমার কলম। এবার আমাকে শুরু থেকে নিজের মত করে বলতে দাও।

নিয়ম অনুযায়ী বন্দী চাইলে তাকে টুথ পাউডার দিতে আর জুতো পালিশ করতে জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য – এগুলো বাড়তি সুবিধে নয় আর পরে বুঝবে টাকাটা না পেলেও আমার বিশেষ অসুবিধে হত না। জেলঘরে ঢোকার সময়ে কতগুলো গেট আছে আর কোথায় কীভাবে পাহারা দেওয়া হয় তা ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। এটাও জানতাম যে, আমি পালানোর চেষ্টা করব তা সুপারকে বলা আছে এবং সেটা বিফল করার জন্যে উনি বদ্ধপরিকর। আমার গতিবিধির ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে। আমরা দুজনেই বুঝেছিলাম জেল থেকে বেরুতে গেলে বাইরের কারুর সাহায্য প্রয়োজন অতএব বেরিয়ে যাওয়া প্ল্যান কষা এবং সেটা কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে বার বার ভুল সূত্র দিয়ে জেলসুপারকে ভুল পথ দেখাতে হবে। প্রথমে ডঃ রেনসামের নামে পাঠানো সংকেত লিপি পড়ে ভাববেন আমার সহকর্মী কাছে সাহায্য চাইছি। উনি ঠিক ভেবেছিলেন। ঘুষ দেবার, ভয় দেখানোর বা ঘষে গরাদ কাটার চেষ্টা এসবই বিপরীত মার্গদর্শক। সুপারসাহেব ফাঁদে পা দিয়েছিলেন প্রত্যেকবার। এও জানতাম প্রথম বার জানলা দিয়ে ফেলা কাপড়ের টুকরো জামা থেকে ছেঁড়া তা সুপারবাবু বুঝতে পারবেন। তবে এটাও বুঝেছিলাম যে উনি জামার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন না আরও কোন ছোটো কাপড়ের টুকরো ঘরে আছে কিনা জানবার জন্যে। কয়েদির জামা পরিয়েই সন্তুষ্ট তিনি। দুটো ছোটো টুকরো রেখে দিয়েছিলাম।" ডুসন থামলেন। সুপারের মুখ লাল।

কফি এল, পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ডুসন আবার শুরু করলেন, "প্রথম রাত্রেই লক্ষ্য করেছিলাম যে গোটা কয়েক ইঁদুর ইচ্ছে মত ঘরে ঢোকে আর বেরিয়ে যায়। কিন্তু জানলা বা দরজা দিয়ে নয়, অন্য কোনো রাস্তা আছে। রক্ষীর কাছে জানলাম জল বার করার পুরোনো পাইপ পরিত্যক্ত, কিন্তু অক্ষত। এটাই সেই পথ। পাইপের জল বেরনোর প্রান্ত জলের মধ্যে না মাঠে ওপর বুঝতে কয়েকটা ইঁদুর পরীক্ষা করে দেখি একটাও ভিজে নয়।

ঘরের কোণে ওদের পাইপে পৌঁছানর ছোট্টো ফুটোটা আবিষ্কার করলাম। পাঁচিলের বাইরে পাইপের মুখ আনুমানিক কুড়ি ফুট, পঁচিশ ফুট ভেতর রাস্তা আর একতলার মেঝে থেকে বাড়ির তলা দিয়ে ভেতরের দৈর্ঘ জুড়লে পাইপটা আন্দাজ মত সত্তর ফুট লম্বা। আমার দামী গরম মোজা শক্ত উলে বোনা। অন্ধকার ঘরে বসে দুটো জুতোর ফিতের দুধারে লগানো

#

ধাতুর পাতের সাহায্যে তিরিশ গজ মত উলের দড়ি মোজা থেকে খুলে বার করলাম। দুটো থেকে সমান লম্বা দড়ি বার করি যাতে মোজাগুলো ছোটোবড় হয়ে সন্দেহ সৃষ্টি না করে। কাজটা কঠিন আর ধৈর্যসাপেক্ষ, কিন্তু রেনসাম ভালভাবেই জানে অন্ধকার গবেষণাগারেও আমি সারারাত কাজ করতে পারি। এরপর সকাল ছটার অনেক আগে উঠে খুব যত্ন করে ছোটো হরফে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাকসাইটে সাংবাদিক হাচকে চিঠিতে খুবই সংক্ষেপে আমার অবস্থার জানিয়ে লিখলাম;

'বাহককে পত্রপাঠ দশ ডলার পুরস্কার দিও আর ওকে দেখিয়ে দিতে বোলো মাঠের কোথা থেকে চিঠিটা পেয়েছিল। সেখানে দেখবে একটু উলের দড়ি একটা পাইপ থেকে বেরিয়ে আছে। তারপর নব্বই ফুট মত লম্বা গিটারের তার আর কাগজ পেন্সিলে ভরা মজবুত ব্যাগে নিয়ে রাত্রি একটার পর ওখানে গিয়ে তারের একদিক উলের সঙ্গে অন্যদিক থলির সঙ্গে সাবধানে বেঁধে উলের দড়িতে তিনবার টান দিও আর অপেক্ষা করতে থেকো।'

অন্য কাপড়ের টুকরোতে মিঃ হাচের ঠিকানা দিয়ে লিখলাম যে অন্য চিঠিটা ওপরের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্যে পাঁচ ডলার পুরস্কার রইল এবং চিঠি পেলে মিঃ হাচ আরও দশ ডলার দেবেন। একটা ইঁদুর ধরে তার পিঠে প্রথমে হাচের তার ওপর দশ ডলার বেঁধে খুব সাবধান ইঁদুরটাকে গর্তে ছেড়ে দিলাম।

রাত্রি নটার পর পায়ের আঙ্গুলে দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে শুয়ে পড়লাম। ভীষণ উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় সময় কাটতে লাগল। ইঁদুরটা তার পিঠ-পেটে বাঁধা কাপড় বা টাকা কাটতে পারবে না তবে অন্য কোনো ইঁদুর সেটা করতে পারে যদিও সে সম্ভাবনা খুব কম। আশা করেছিলাম স্বভাবমত পাইপ থেকে বেরিয়ে পালানোর সময় টান পড়লেই দড়ি কেটে বেরিয়ে যাবে। অবশেষে, কত রাত্রে জানি না, পায়ের আঙ্গুলে তিনবার হাল্কা টান অনুভব করলাম। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারটা ওপরে তুলে রাত্রিবেলা ইচ্ছে মত জিনিসের সরবরাহ পেতে লাগলাম। এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এরকম কিছু উপাদান আর স্কিপিং রোপ থেকে খুলে দুটো কাঠের হ্যান্ডেল আনিয়ে রেখেছিলাম। অফিসঘর থেকে জেলঘর যাবার বারান্দার লোহার গেট খুললে বেশ আওয়াজ হয়। সে শব্দ শুনলেই আমার আনানো জিনিস, গর্তের মধ্যে লুকিয়ে অজ্ঞান করা ইঁদুর চাপা দিতাম। সুপারবাবুকে রাগানোর জন্যে টাকা আনানো আর ভাঙানো। শুনেছি রাগ মানুষের চিন্তাশক্তি শিথিল করে।" ডুসন দম নিতে একটু থামলেন, মুখে মুচকি হাসি – সুপার নিজের জুতো নিরীক্ষণে ব্যস্ত।

ডুসন আবার শুরু করলেন, "চারতলার ১৩ নং কয়েদির ব্যাপারটা নেহাৎই কাকতালীয়। তারের সাহায্যে যোগাযোগ ছাড়াও পরের দিকে ইঁদুরগুলোর যাতায়াতের রাস্তাকে খুব সরু সুড়ঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করি। এ ভাবে ক্ষীণ শব্দ বহুদূর যায় তবে পাইপের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিধ্বনি কথাগুলোকে বিকৃত করে তোলে। যখন এসিড পাঠানোর জন্যে বলতাম। তারই বিকৃত প্রতিধ্বনি শুনেছে ৪৩ নং কয়েদি। খুনি আসামীর স্বীকারোক্তি বার করার জন্যে আমার পুরস্কার পাওয়া উচিৎ তাই না সুপারবাবু!

যাইহোক, খাটের ওপর দাঁড়িয়ে জানলার গরাদগুলোর সবচেয়ে তলার অংশ এসিডে ডোবানো তার দিয়ে কাটতাম সারারাত, টুথ পাউডার এসিড ছড়াতে দিত না। দিনের বেলা ওপরের অংশে ঘষে দাগ করতাম। মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে তলার অংশ কাটা যায়, খাটের ওপর দাঁড়ালে দূর থেকে দেখলে মনে হবে ওপরে অংশ কাটার চেষ্টা করছি। সেই ভেবে সুপার ওপরটা নিরীক্ষণ করে কিছু আঁচড়ের দাগ দেখে রোজ বিদ্রুপ করতেন।

এবার শেষ অঙ্কে আসা যাক। আমার হাতে লেখা আমন্ত্রণ পত্রটা হাচের মাধ্যমে পোস্টঅফিসে দিয়ে পালানোর নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে সুপারের ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি। যথাযত ভাবে তের নং ঘরে চাদরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা ঠিক আমার চুলের মতন পরচুলা দেখে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যান তিনি। রক্ষা ব্যবস্থা যেন একটু শিথিল হল। সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে চাঁদ উঠবে সাড়ে নটার পর। হাচ জানিয়ে ছিল বৈদ্যুতিক গণ্ডগোল সারানোর মত কর্মচারী নেই জেলের, কাজটা হাচের বাবার নামকরা কারখানাকে চুক্তিতে দেওয়া। তা না হলেও আমার প্ল্যান সফল হত। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে কাঠের হ্যান্ডলওলা তারটা জানলার তলা দিয়ে যাওয়া কার্বন আর্কের বিদ্যুত সরবরাহের তারদুটোর ওপর ফেলতেই শর্ট সার্কিটের দরুন সব অন্ধকার হয়ে গেল। দলের প্রধান সেজে কারখানা থেকে আরও কিছু লোক নিয়ে একটু পরে হাচের দল এল; একটা জাল পরিচয়পত্র, লোহার টুপি সহ ইলেক্ট্রিসিয়নের পোষাক, কাঠের সিঁড়ি আর গরাদ বেঁকানোর যন্ত্র নিয়ে। ইলেক্ট্রিসিয়ানদের কাছে এগুলো সবসময় থাকে শুধু ওই জাল পরিচয়পত্র ছাড়া।

তার ঠিক হবার পরও কার্বন আর্ক পুরোপুরি ঠাণ্ডা না হওয়া অব্দি সেটা জ্বলবে না তাই বহুক্ষণ অন্ধকার থাকবে। এরপরের হিসেব সোজা। হাচ জেলে ঢুকেই চটপট আমার জানলার তলায় সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে যন্ত্র দিয়ে গরাদ বেঁকিয়ে দিলেন, তলাটা কাটা ছিল ফলে সহজেই হয়ে গেল। সিঁড়ি দূরে সরিয়ে হাচ সহকারীদের কাছে গিয়ে শুনলেন একটা ফিউজ (FUSE) পুড়ে গিয়েছিল তা সারানো হয় গেছে। 'তোমরা আলো না জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করো আমি যাচ্ছি' বলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আমাকে নিয়ে সোজা এ বাড়িতে হাজির" ডুসন থামলেন।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ। নীরবতা ভেঙে একটা জেল থেকে সুপারের জন্যে ফোন এল 'আলো বহুক্ষণ এসে গেছে স্যার আপনাকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। তবে চারজন এসেছিল দুজন আগেই বেরিয়ে যায় কিন্তু ভেতরে এখন তিনজন।'

"ওদের যেতে দাও" ভাঙ্গা গলায় সুপার আদেশ দিলেন। সবাই চুপ।

নীরবতা ভেঙে রেনসাম বলল সুপারকে, "তুমিও সংকেত পারোনি, আশ্চর্য, এত সোজা। ডান থেকে বাঁদিকে পড়ার সময় অক্ষরগুলো মাঝের ফাঁক কম-বেশী করে নাও।"

য় যানোলা পায়পা উকনে "অ" = "অ"নেক উপায় পালানো যায়।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

ডঃ জি মিত্র আলোক বিজ্ঞানে ইমেজ ইভালুয়েসনে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী, উত্তর ভারতের এক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার থেকে ডাইরেক্টর গ্রেড সায়েন্টিস্ট অবসর নিয়েছেন। অনুবাদকের নামে এমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশের বারোটা পেটেন্ট আছে এবং আন্তর্জাতিক পত্রিকায় বহু মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ছে। নেশা দেশ বিদেশ ভ্রমণ আর সবরকম বই পড়া।

...সাঁকোটা দুলছে

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

দোদুল্যমান সাঁকোটার কাছে আমি,

গেছি কতবার হাজার প্রশ্ন নিয়ে,

সাঁকোর দুলুনি ধীরে ধীরে গেছে থামি,

বুনো ঝোপঝাড় দুপাশে গেছে উজিয়ে।

যে সাঁকোটা দিয়ে চলত আমার খেলা

আনোয়ার তায় ছিল যে খেলার সাথী,

সাঁকোর দুপাশে এখনো বয়সে যে মেলা –

সাঁকো জেগে থাকে কত বিনিদ্র রাতি।

সাঁকোটার কথা মনে পড়ে না'তো কারো –

ওটাই এখনও আছে যে ছায়ায় ঢাকা –

সব কিছু হলো টুকরো টুকরো আরও –

সাঁকোটায় ছায়া অখণ্ডতায় মাখা।

বন্ধু তুমি যে চলে গেছ কত দূরে –

সাঁকোটার কাছে গিয়ে আমি বয়সে ভাবি।

আর কোনোদিন আসবে না তুমি ফিরে

মনে ভেসে আসে টুকরো টুকরো ছবি।

ছবি ধরা আছে সুনীলবাবুর গানে,

#

লেখাটি সে যেন স্মৃতির ভরা আধার।

মনে করে আমি নিজেই হাসি যে মনে –

মুখ তুলে দেখি ঘনিয়ে এসেছে আঁধার।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি –

সকাল সন্ধ্যা বন্ধুর নাম জপে –

হঠাত দেখি যে সাঁকোটা উঠেছে দুলি,

গাছ মাটি ওঠে উত্তেজনায় কেঁপে।

প্রকৃতির সুর বেসুরো বাজিছে তারে,

মানুষ হয়েছে মানুষের মুখোমুখি –

ইতিহাস খানি আবার আসিছে ফিরে,

ধর্মের ধ্বজা উড়তে আবার দেখি।

বৃদ্ধ সাঁকোটি দুর্বল বড় আজি –

অব্যবহারে কোনোমতে আছে টিঁকে

দুলুনিটা তার হৃদয়ে উঠিছে বাজি,

নুব্জ্য বুকেতে মাথা নেমে আসে ঝুঁকে।

একদিন ভোরে দেখি যে সেথায় গিয়ে –

সাঁকোটা ভগ্ন, দুটি তীর বসে কাঁদে-

দুচোখের কোলে ধারা যে নামে গড়িয়ে,

সংহতি মরে ধর্মান্ধের ফাঁদে।

এতদিন ধরে সাঁকোটা ছিল যে জেগে,

#

দুঃখ সুখেতে, ভালবাসা ঝগড়ায় –

আজ সেখানেতে নদী বয়ে চলে বেগে,

সজল চোখেতে দুই কুল শুধু চায়।

সাঁকোটার কথা মনে আছে আনোয়ার –

এতকিছু গেল, সাঁকোটা তবুও ছিল।

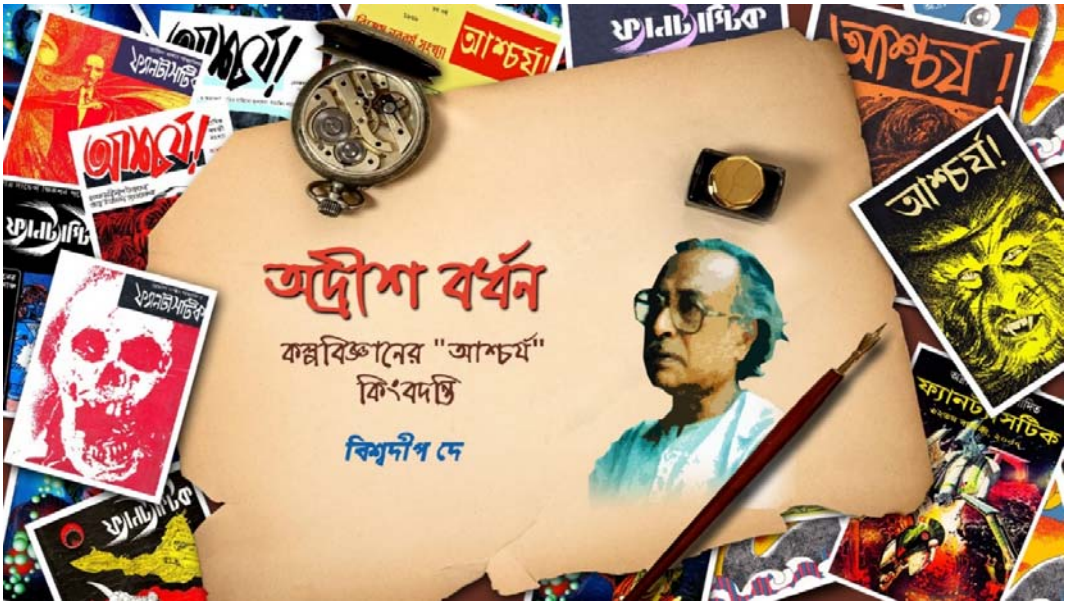
এখন ছড়িয়ে ধ্বংসাবশেষ তার –

তোর সঙ্গে আজ সেই ছাড়াছাড়ি হলো।

লেখক পরিচিতি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - ইনি সুনীল শক্তি খ্যাত সন্দীপন নন - বরং সেই প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সমনামী উপচ্ছায়া মাত্র। পেশায় চাকুরে কিন্তু নেশা লেখালেখি এবং আরও নানাবিধ।

#



বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব অদ্রীশ বর্ধন। ছয়ের দশকে তাঁর সম্পাদনায় 'আশ্চর্য' পত্রিকাটির প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই সূচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। বলা যেতে পারে ছয়ের দশক থেকেই বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রকৃত জয়যাত্রা শুরু। কেননা এই সময় থেকেই 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতা ভরাতে হাতে কলম তুলে নিলেন সত্যজিৎ রায়। শঙ্কু-কাহিনি ও 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'র মতো আরও অজস্র ছোটগল্প রচনা করলেন তিনি, যেগুলি বাংলা কল্পবিজ্ঞানের মাইলফলক হিসেবে অচিরেই চিহ্নিত হবে। এটা যদি একটি কারণ হয়, তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই অদ্রীশের 'আশ্চর্য' আবির্ভাব। মনে রাখতে হবে কাজটা কিন্তু কঠিন ছিল। কেননা 'কল্পবিজ্ঞান' বস্তুটি সেই সময় ছিল একেবারেই 'অন্ত্যজ' শ্রেণিভুক্ত। এমনকী 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধটিরও তখনও জন্ম হয়নি। লেখা হত বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি ইত্যাদি। 'সায়েন্স ফিকশন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটি অদ্রীশেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে স্বভাবের অদ্রীশের মনের মধ্যে ছিল অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাই দশটা-পাঁচটার চাকরি করতে মন সায় দিত না। একে একে সাতটি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি ঠিক করলেন এমন কাজ করবেন, যেটা কেউ করেনি। ব্যাস, যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হল 'আশ্চর্য'। বাড়িতেই বসিয়ে ফেললেন প্রেস। কম্পোজও হত ওখানেই। সম্পাদকের নাম হিসেবে ছদ্মনাম (আকাশ সেন) ব্যবহার করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য, যাতে নিজের নামে অনেক লেখা লিখতে পারেন।

বাংলার তো বটেই ভারতেরও প্রথম সাই-ফাই পত্রিকা ছিল 'আশ্চর্য'! ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম সংখ্যা। শুরু থেকেই সঙ্গে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতো কল্পবিজ্ঞানের আরও দু'জন কিংবদন্তি। কিছু পরে সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং সত্যজিৎ রায়! ধীরে ধীরে বাংলার সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে কল্কে পেল 'কল্পবিজ্ঞান'। পত্রিকার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হল পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব। প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ, সেক্রেটারি অদ্রীশ। সূচনা হল বাংলা কল্পবিজ্ঞানের এক স্বর্ণযুগের।

#

পরবর্তী সময়ে জীবনের একটি ভয়ানক ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হন অদ্রীশ বর্ধন। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। একমাত্র সন্তান তখন একেবারেই শিশু। ফলে বন্ধ হয়ে যায় 'আশ্চর্য'। এর কিছু সময় পরে সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে আবার পত্রিকা সম্পাদনায় হাত দেন তিনি। এবার আর 'আশ্চর্য' নয়, নাম দিলেন 'ফ্যান্টাস্টিক'। লেখক তালিকায় যুক্ত হল আরও নাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আরও অনেকে। শুধু পত্রিকা নয়, প্রকাশনীও আরম্ভ হল।

বলাই বাহুল্য, বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে অদ্রীশ বর্ধনের পরিচয় কেবল 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দের জনক বা 'আশ্চর্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই শেষ হয়ে যায় না। পত্রিকার নিত্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিশ্চিতভাবেই নিয়মিত লেখার সরবরাহ। মূলত সেই অভাবকে পূরণ করতেই তাঁকে লিখতেও হয়েছে। এবং সেটা দু-হাতে। 'আশ্চর্য'-র একেকটি সংখ্যায় একাধিক লেখা লিখতে হয়েছে তাঁকে। কোনটা নিজের নামে। কোনওটা ছদ্মনামে। অবশ্য পত্রিকা প্রকাশের আগেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। গল্প লিখে পেয়েছিলেন 'প্রসাদ পুরস্কার'-ও। কিন্তু পত্রিকা শুরুর পরে লেখার পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সন্দেহ নেই।

মৌলিক ও অনুবাদ---দুই ধরনের লেখাতেই তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আজও তাঁর লেখা পাঠককে মুগ্ধ করে চলেছে। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বা গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রের মতো বিখ্যাত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি। লিখেছেন সবরকমের কিশোর সাহিত্য। কেবল সাই ফাই নয়, গোয়েন্দা, ভূত---সর্বত্রই তাঁর অবাধ যাতায়াত! সবেতেই তিনি 'বেস্ট সেলার'।

পাশাপাশি অনুবাদক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। এডগার অ্যালান পো, এইচ পি লাভক্র্যাফট, জুল ভের্ন, আর্থার কোনান ডয়েল সহ বহু লেখকের লেখা তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি অনুবাদই অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। তিনি যদি একটিও মৌলিক লেখা না লিখে কেবল অনুবাদই করতেন, তাহলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকত।

অদ্রীশ বর্ধনের এই বিপুল কর্মকাণ্ড তাঁকে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের তো বটেই, সমগ্র বাংলা কিশোর সাহিত্যেরই এক অন্যতম নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যের, তাঁর অনেক বই আজ আর বাজারে পাওয়া যায় না। কেননা 'ফ্যান্টাস্টিক' প্রকাশনী একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছে।

তবে আশার কথা, অন্য প্রকাশনী থেকে তাঁর বইগুলি রিপ্রিন্ট হওয়া শুরু হয়েছে। আশা করা যায় ধীরে ধীরে তাঁর হারিয়ে যাওয়া অন্য বইগুলিও নতুন চেহারায় পাঠকের কাছে ফিরে আসবে।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

বিশ্বদীপ দে - পেশা সাংবাদিকতা। পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেন। আকাশবাণী কলকাতার আমন্ত্রিত গল্পকার। প্রথম সারির বহু পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

#

অদ্রীশ বর্ধনের গ্রন্থতালিকা

সংকলক – টুইটুই ও অপ্টিমাস প্রাইম

গ্রন্থের নাম	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
অমানুষিকী	পত্র ভারতী, ১৯৮৪
অতি মানুষ	ফ্যানট্যাস্টিক
অদ্রীশ বর্ধন রচনাবলী ১-৪ খণ্ড	ফ্যানট্যাস্টিক
অদ্রীশ বর্ধন রচনাবলী অখণ্ড	ফ্যানট্যাস্টিক
অলৌকিক অমনিবাস	ফ্যানট্যাস্টিক
অলৌকিক দুনিয়া	ফ্যানট্যাস্টিক
অসম্ভবের দুনিয়া	ফ্যানট্যাস্টিক
অসহ্য সাসপেন্স ১	পত্র ভারতী, ২০০১
অসহ্য সাসপেন্স ২	পত্র ভারতী, ২০০৬
অসহ্য সাসপেন্স ৩	পত্র ভারতী, ২০০৮#
আজগুবি গল্প	ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৯
আতঙ্ক অমনিবাস	ফ্যানট্যাস্টিক
আদিম আতঙ্ক	আরুণী, ২০০১
আমার মা সব জানে ১-৩ খণ্ড	আনন্দ, ১৯৯২#
আবার শার্লক হোমস্	নাথ, ২০০৭
আশ্চর্য দুনিয়া	গ্রন্থপ্রকাশ
আশ্চর্য আলমারী	নাথ ,২০০৮
আষাঢ়ে গপ্‌প	টার্গেট, ১৯৮৯
আপ টু ডেট বুক অব নলেজ, সুশান্ত কুমার পালের সঙ্গে	বসাক, ১৯৯৫
ইটি	ফ্যানট্যাস্টিক
এডগার অ্যালান পোর রচনা সংগ্রহ ১৩- খণ্ড	ফ্যানট্যাস্টিক
কংক্রিট বুট	গ্রন্থপ্রকাশ
কালোগর্ত	ফ্যানট্যাস্টিক
কিশোর সায়েন্স ফিকশান	শৈব্যা
কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড	ফ্যানট্যাস্টিক
গোয়েন্দা অমনিবাস	জয়দীপ
গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র সমগ্র – ১-১৩ খণ্ড	নাথ, ২০০৭
চাঁদ কি এক মহাকাশ যান?	ফ্যানট্যাস্টিক

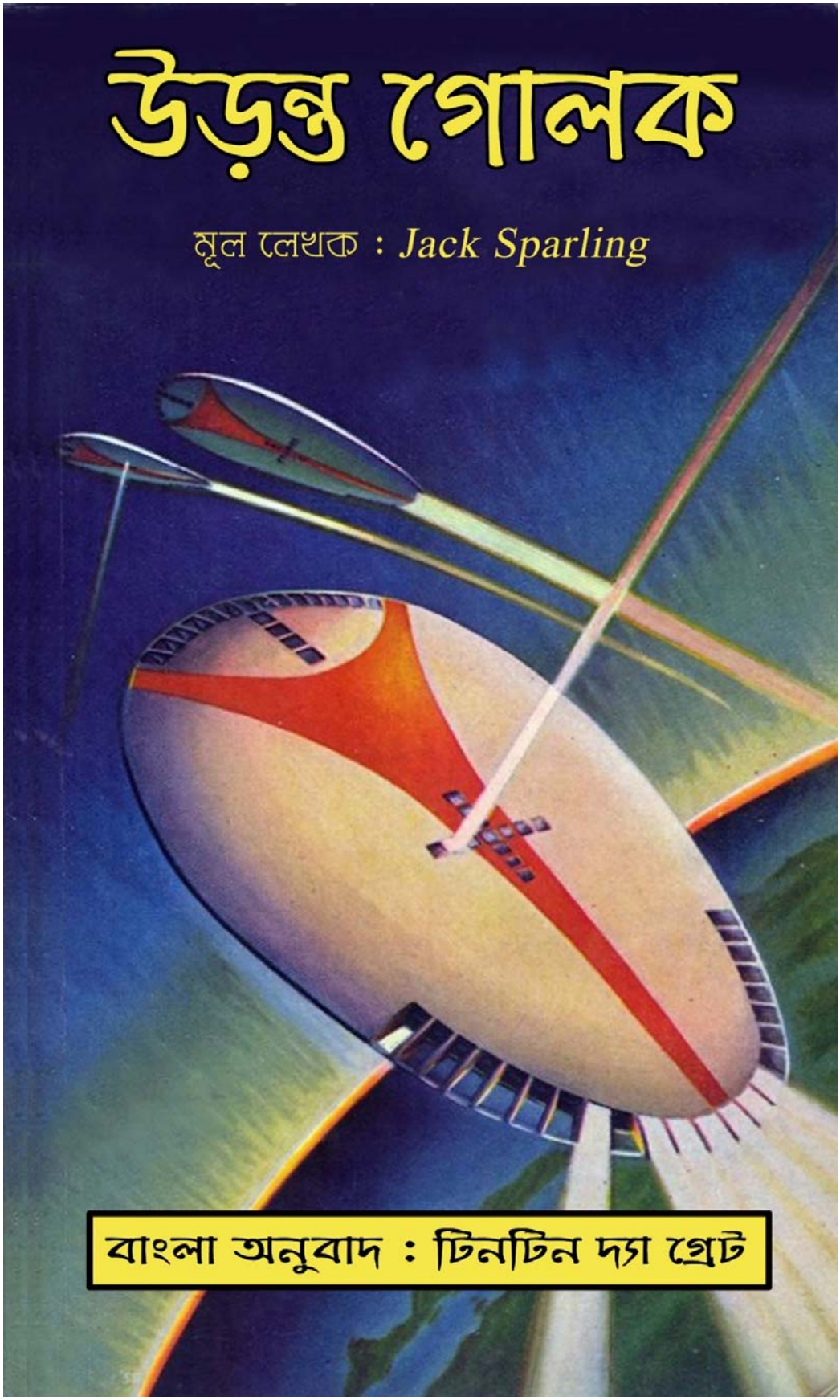
#

ছোটদের লস্ট আটলান্টিস্	মৌসুমী, ১৯৯০
ছোটদের সেরা কল্পবিজ্ঞান	শশধর, ১৯৯২
জুল ভের্ণ সমগ্র ১৩- খণ্ড	লালমাটি
জুল ভের্ণ রচনাবলী ৯ খণ্ড-১ -	বেঙ্গল পাব
জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্বকোষ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
দশ রহস্য	বেঙ্গল পাবলিশার্স
টারজান ফিরে এলো	লালমাটি, ২০০৬
ড্রাকুলা ফিরে এলো	গ্রন্থপ্রকাশ
নিতঙ্ক	ফ্যানট্যাস্টিক, ২০০৮
পঞ্চমৃত্যুর দ্বীপ	শৈব্যা, ২০০২#
পাতায় পাতায় রহস্য	আনন্দ, ১৯৯৪#
প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চক্র ১-২ খণ্ড	বেঙ্গল পাব
প্রফেসর নাট বল্টু চক্র	ফ্যানট্যাস্টিক
প্রফেসর নাট বল্টু চক্র সংগ্রহ ১২- খণ্ড	আনন্দ, ২০০৯
প্রফেসর নাট বল্টু চক্র সমগ্র	নাথ, ২০০৫
প্রেত প্রেয়সী	বিশ্ববাণী
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস	পত্রভারতী, ২০০৪
ফাদার ঘনশ্যাম অমনিবাস	গ্রন্থপ্রকাশ
ফ্যানট্যাস্টিক	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ফ্যানট্যাস্টিক একাদশ বার্ষিকী	ফ্যানট্যাস্টিক
ফ্যানট্যাস্টিক বার্ষিকী ১৯৮৮	ফ্যানট্যাস্টিক, ১৯৮৮
ফ্যানট্যাস্টিক বার্ষিকী ১৯৯৭	ফ্যানট্যাস্টিক, ১৯৯৭
ফ্যানট্যাস্টিক বার্ষিকী ১৯৯৮	ফ্যানট্যাস্টিক, ১৯৯৮
ফ্যানট্যাস্টিক বার্ষিকী ২০০৭	ফ্যানট্যাস্টিক, ২০০৭
ফ্যানটাস	গ্রন্থপ্রকাশ
বনমানুষের হাড়	গ্রন্থপ্রকাশ
বিশ রহস্য	পত্র ভারতী
বিশ্বসেরা সায়ান্স ফিকশান	দে'জ
বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন	গ্রন্থপ্রকাশ
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য গল্প	পত্রলেখা
বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে	ফ্যানট্যাস্টিক
ভূতের রাজা দিল বর	ফ্যানট্যাস্টিক
ভূত কুতুমের দেশে, হিমাংশু সরকারের সঙ্গে	চয়নিকা, ১৯৯৬#
ভৌতিক অমনিবাস	গ্রন্থপ্রকাশ
মঙ্গল গ্রহে মানুষ	ফ্যানট্যাস্টিক

#

মাকড়শা আতঙ্ক	পত্র ভারতী, ২০০৮
মিলক গ্রহে মানুষ	ফ্যানট্যাস্টিক
যন্ত্রদানোর শহরে	শৈব্যা, ২০০২
রোবার হলেন আকাশরাজা	ফ্যানট্যাস্টিক
শার্লক হোমস এর প্রথম এ্যাডভেঞ্চার	ছন্দম
শার্লক হোমস ক্লাব	বেঙ্গল পাব
শার্লক হোমস ফিরে এলেন	ফ্যানট্যাস্টিক
শার্লক হোমস সমগ্র ১-২ খণ্ড	লালমাটি
শার্লক হোমসের আরও অ্যাডভেঞ্চার	দে'জ
সবুজ মানুষ	ফ্যানট্যাস্টিক
সময় গাড়ী	গ্রন্থপ্রকাশ
সমুদ্র শয়তান	ফ্যানট্যাস্টিক
সায়েন্স ফিকশন অমনিবাস	বেঙ্গল
সায়েন্স ফিকসানের দানব মিউজিয়াম	বেঙ্গল
সুপারম্যান বিক্রমজিৎ	পত্র ভারতী, ২০০৮
সুবর্ণগোলক রহস্য	পত্রলেখা
সেরা আশ্চর্য ! সেরা ফ্যানট্যাস্টিক	ফ্যানট্যাস্টিক, ১৯৯৪
সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস	পত্র ভারতী, ২০০৪
সেরা গোয়েন্দা উপন্যাস - ইন্দ্রনাথ রুদ্রের চারটি রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার	পত্র ভারতী
হাঙরের কান্না	পত্রলেখা
হাজার রহস্যের দ্বীপ ঈস্টর	গ্রন্থপ্রকাশ
২১ আতঙ্ক	ফ্যানট্যাস্টিক, ২০০৭

#


উড়ন্ত গোলক
মূল লেখক : Jack Sparling
বাংলা অনুবাদ : টিনটিন দ্যা গ্রেট

#

উড়ন্ত গোলক

বাংলা অনুবাদঃ
টিনটিন দ্য গ্রেট ও
অপ্টিমাস প্রাইম



#

আমার মাথা ভারী হয়ে আসছিল! শুধু মনে আছে আমি তীব্র বেগে নীচে নেমে আসছিলাম।

তারপরেই সব অন্ধকার !কিন্তু অচেতন ভাবেও আমি নিশ্চই কাজ করছিলাম! কারন জ্ঞান আসার পরেই দেখি...

আরে! আমি তো ঠিক ভেসে আছি? পড়ে যাইনি!

একরাশ চোখ ধাঁধানো আলো যেন আমার মাথার মধ্যে ঢুকে ফেটে পড়ল...

আরে ... আলো? কী জিনিস ওটা?

আমি ওই আলোর পেছনে ধাওয়া করলাম! কিন্তু ওটা আমার থেকে অনেক দ্রুতগামী! কয়েক মহূর্তেই সামনে আবার নিকষ কালো অন্ধকার! ওটা আর নেই!

তারপরেই আমার নজরে এলো ভয়ানক গতিতে কী যেন একটা ওপরের মেঘের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে গেল! কল্পনাতীত বেগে।

আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না ওর সঠিক আকৃতিসমন্ধে! প্রথম দর্শনে মনে হচ্ছিল আগুনের গোলা পরে আবার চ্যাপ্টা ডিশের মত লাগছিল!

আমি এত ভয় পেয়ে গেছিলাম যে কিছু ভাবার মত অবস্থায় ছিলাম না। আর এ তো অসম্ভব অবাস্তব বস্তু!

এ তো ঘন্টায় ১০০০ মাইলের থেকেও দ্রুতগামী! তাহলে কী উড়ন্ত চাকী? দেখতেই হবে আমাকে! ওর কাছে পৌঁছাতেই হবে!

#

যখন মনে হচ্ছিল অজানা বস্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে তখনই দেখি ওটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে ! পাথরের মত!

এইরকম ভাবে দাঁড়িয়ে পড়া অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব।

আমার মাথা মনে হচ্ছিল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! আর গালের ওপর রক্তের ধারা ! নিশ্চই হঠাৎ ঝাঁপানোর সময় আমি ড্যাশবোর্ড ঠোকা খেয়েছিলাম!

মাথা ব্যাথায় ছিঁড়ে যাবার উপক্রম! চোখেও ঝাপসা দেখছি... ... সেইমুহূর্তে হঠাৎ

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

আমি জানতাম যে কোন সময়ে যা কিছু ঘটতে পারে! তাই আমি রেডিও নিয়ে বেসক্যাম্পে যোগাযোগ করলাম!

হক টু বেস! হক টু বেস ! ওভার!

জিম তুমি? আমরা তো ভাবছিলাম তুমি সমুদ্রে ভেঙে পড়েছ?

কপাল ভালো রেডিও যোগাযোগ ঠিক আছে ! পড়ে সবাই যা কিছু বলুক না কেন, আমার রেডিও রিপোর্ট ঠিক লেখা থাকবে

আমি রহস্যময় আগুনের গোলাকে ধাওয়া করেছি ... ঘণ্টায় ১০০০ মাইলবেগে ছুটতে পারে ... আবার মুহূর্তের মধ্যে পাথরের মত স্থির হয়ে যেতে পারে!

ইয়ার্কি হচ্ছে? আকাশে এবার বাঘ উড়বে!

আমি মজা করছি না... আরে এ কি?? না না! ওহ!

#


হক? হক? কী হয়েছে? উত্তর দাও?
আমি ... আমি ... ওর আলোর ছটায় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
বেস ক্যাম্পে সবাই গভীর উৎকণ্ঠায়!
ওটা একটু আগেই মেঘের আড়ালে ছিল! আর এখন তীব্র আলোকরশ্মির আকার নিয়ে খোলা আকাশে চলে এসেছে!
আশ্চর্য ব্যাপার! এ তো পুরো কর্পূরের মত বাতাসে মিলিয়ে গেল!
হক! হক! শুনতে পাচ্ছো?
আমি সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি! সেইসময় ... আবার ওটা আমি দেখতে পেলাম মাথার উপরে!
সর্বনাশ! এ তো আমার দিকে উল্কার মত ছুটে আসছে!
তুমি যাই হও না! আমি তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেব!
র্যাঙ্গ্রাম
হা ভগবান! বুলেটগুলো ভেদ করে চলে যাচ্ছে! কিন্তু ওর তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না?
4

#

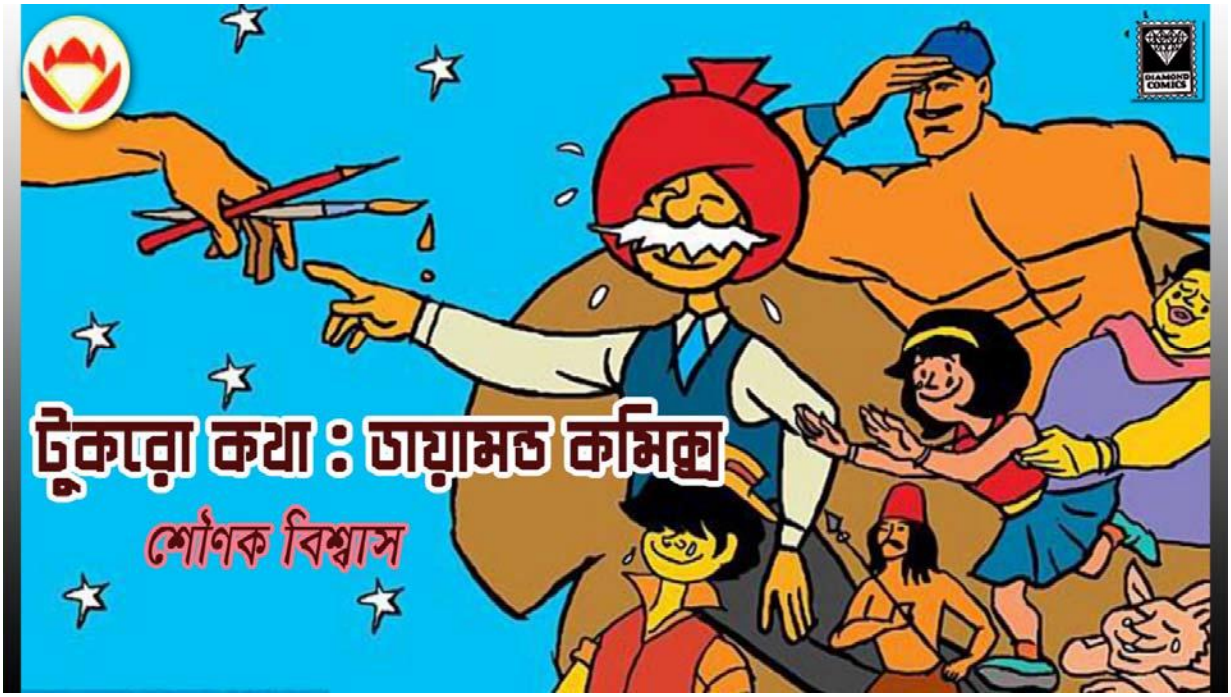

জানি না বুলেটগুলোর কী হল ..... আর এরপরে যা হল তা ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়।
বাঁচাও!
আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! বিমানটাকেও এগোতে পারছি না! কোন অপার্থিব শক্তি পুরো বিমানটাকে ধরে রেখেছে!
এটা যাই হোক না, গোটা বিমানটাকে মাঝ আকাশে যেন কোন কিছুর সাথে বেঁধে রেখেছে!
কতক্ষন এভাবে উল্টোদিকে ঝুলে ছিলাম ভগবান জানেন! আতঙ্কে সময়ের হিসেব রাখার কথা মনেই ছিল না! হঠাৎ ঝাকুনি দিয়ে বিমানটা দুলতে শুরু করল।
আ আ আল্ল!
সবকিছু এমন ভয়ঙ্করভাবে দুলতে শুরু করল যেন এই মুহূর্তে সব কলকব্জা আলাদা হয়ে যাবে।
আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে গোঁত্তা খেয়ে সমুদ্রের দিকে পড়তে শুরু করলাম!
আ আ মাথা! মাগো! কী যন্ত্রনা!
প্রায় অজ্ঞান হতে হতে কোনমতে সোজা হয়ে সলিলসমাধি এড়ালাম!
5

#



লেখক পরিচিতি

টিনটিন দি গ্রেট বই আর কমিক্স পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে অবসর পেলে ইংলিশ থেকে বাংলায় কমিক্স অনুবাদও করে থাকেন।



গল্পের বইয়ের জগতে আমার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল ডায়মন্ড কমিক্স দিয়ে। প্রাইমারি স্কুলে থাকতেই প্রথম যেটা হাতে পাই সেটা ছিল ডায়মন্ড কমিক্সের চাচা চৌধুরীর একটা অনবদ্য সংখ্যা, আর তারপর থেকেই কমিক্সটির গ্রাহক হয়ে গিয়েছিলাম। বাবাই দায়ী ছিল আমার এই কমিক্সপ্রীতির জন্য। তবে এমন কিছু ব্যাতিক্রমী সময় গেছে যখন হয়তো কমিক্স আর কিনে ওঠা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত আমার কাছে যে পরিমাণ ডায়মন্ড কমিক্স-এর সম্ভার হয়েছিল তা আমার সমবয়সী আর কারুর কাছে ছিল না, আজ এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি। যাইহোক, যতদূর জানি ডায়মন্ড কমিক্সের সব থেকে বড় চরিত্র হলেন এই চাচা চৌধুরী এবং এর স্রষ্টা হলেন প্রাণ কুমার শর্মা। কমিক্সটি দশটি ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ পেত। প্রাণ বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাঁর জীবদ্দশায়। তাঁর সৃষ্ট কমিক্সের এই বহুল প্রচলনের কারণে লিমকা বুক অফ রেকর্ডস ১৯৯৫ সালে তাঁকে 'পিপল অফ দ্য ইয়ার' এর একজন ঘোষণা করে। চাচা চৌধুরীর দুটি স্ট্রিপ আমেরিকার 'ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ্ কার্টুন আর্ট'-এ স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট জনপ্রিয় আরও কিছু চরিত্র হল শ্রীমতিজি, বিল্লু, পিঙ্কি, রমন ইত্যাদি। প্রাণ ২০১৪ সালের ৫ই অগাস্ট কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারপরের বছর তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সন্মানে ভূষিত হন।

চাচাজি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর বুদ্ধির কথা, যা কিনা কম্পিউটারের থেকেও বেশি প্রখর। তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকে বৃহস্পতি গ্রহের থেকে আসা দানবাকৃতি সাবু এবং কুকুর রকেট। চাচা চৌধুরীর প্রতিটা সংখ্যাই ছিল এক কথায় অনবদ্য। যখনই পড়তাম, পাতায় পাতায় অ্যাকশান আর কমেডির এক অসামান্য সংমিশ্রণ আমাকে সব সময়ই মোহিত করে তুলত। কিছু স্পেশাল সিরিজ প্রকাশিত হত রাকাকে নিয়ে। রাকা এক দুর্ধর্ষ দানব যে

#

অমরত্বের ওষুধ খেয়ে পরাক্রমী হয়েছিল। চাচাজির কমিক্সের মধ্যে বলতে গেলে এই রাকা সিরিজই আমার সবথেকে বেশি প্রিয় ছিল।

কিছু কিছু গল্পে চাচাজির সঙ্গে দলগতভাবে দেখা যেত বিল্লু আর পিঙ্কিকে। বিল্লু একটি স্কুলে পড়া ছোট ছেলে যে কিনা মাঝে মাঝেই নানান ঝামেলা বিপদে জড়িয়ে পরে। প্রতিবেশী বজ্রং পালোয়ানের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ভালো নয়। পিঙ্কি বয়সে আরও ছোট, সেও স্কুলে পড়ে। কিন্তু পিঙ্কি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওর দুষ্টুমি আর চালাকি নিয়েই চাচাজির সঙ্গে নানা ঘটনা বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পেত।

কখনো মধ্যবিত্ত পরিবারের সুবিধা অসুবিধা আবার কখনো দাপুটে গিন্নী নিয়েও ডায়মন্ড কমিক্স প্রকাশিত হয়েছে। যেমন চান্নিচাচী, শ্রীমতিজী, রমন ইত্যাদি। এছাড়াও অন্য স্বাদের কমিক্সও ছিল, যেমন ডায়নামাইট সিরিজ। ছেলেবেলায় মা বাবাকে হারানো এক ছেলের গল্প যে কিনা বড় হয়ে নিজের মা বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। আমার এখনো মনে আছে, যখন এই ডায়নামাইট সিরিজের বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকতো অন্য ডায়মন্ড কমিক্সগুলোতে তাতে লেখা থাকতো, "His hobby is to paly with fire. His mission is to spread destruction. He creates terror everywhere. For the first time Diamond Comics presents a KHALNAYAK rather than a HERO." আরও কিছু চরিত্র ছিল ডিটেকটিভ কমিক্সের মধ্যে। যেমন লম্বু-মোটু, রজন-ইকবাল। এরা কিছু বেসরকারি গোয়েন্দাদের মতো যারা কিনা পুলিশকে নানা বিষয়ে সাহায্য করতো। ঠিক হলিউডের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মতো।

কল্পবিজ্ঞানের ওপর আধারিত কিছু সুপারহিরো কমিক্সও আছে। যেমন অগ্নিপুত্র-অভয়, ফওলাদ সিং। অগ্নিপুত্র আর অভয়কে 'ডায়নামিক ডুও' বলা হত। মার্শাল আর্ট আর ম্যাজিকের এক মনোগ্রাহী মেলবন্ধন, এবং যাদের কাছে লেসার গান, ডিস্ক কাটার, রকেট, স্ট্র্যাংগ্লার স্ট্রিং এরকম বেশ কিছু আধুনিক অস্ত্রের সম্ভার ছিল। ফওলাদি সিং লম্বু আর ডঃ জনের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তো নানা মহাজাগতিক মিশনে। কৈশোরের শুরুর দিকে এতো কিছুর মানে না বুঝলেও পড়তে দারুণ লাগতো। প্রাচীন ভারতীয় আত্মরক্ষার কৌশল নানাভাবে বর্ণিত আছে এই কমিক্স সিরিজে, দেশীয় কমিক জগতে যা অভূতপূর্ব।

ডায়মন্ড কমিক্স বেশ কিছু বিদেশী কমিক চরিত্রেরও লাইসেন্সড অ্যাডাপশান করেছিল। যেমন স্পাইডারম্যান, ফ্যান্টম (অরণ্যদেব), ম্যানড্রেক, জেমস বন্ড ইত্যাদি। অ্যাকশান আমার বরাবরই প্রিয় ছিল, সেই বয়সে কারই বা না থাকে। 'চলমান অশরীরী' অরণ্যদেবের কমিক্স পড়ে রীতিমত গায়ে কাঁটা দিত। সেই বনের মধ্যে খুলি গুহা, ইডেন দ্বীপ এসবই স্বপ্নের মতো মনে হতো। লি ফকের এই অসামান্য সৃষ্টি চিরকাল অমর হয়েই থাকবে, সন্দেহ নেই।

আরও কিছু চরিত্র যেমন মহাবলি শাকা, মোটু-পাতলুও বেশ জনপ্রিয়। শাকা পড়লে মাঝে মাঝে মনে হয় এ যেন টারজানের থেকে অনুপ্রাণিত এক চরিত্র, যে কিনা কোহিমার জঙ্গলে পশু পাখিদের নিয়ে বাস করে। মোটু আর পাতলু মংলু মাদারি আর বাঁদর বিহারী এক যাযাবর কাহিনী। এছাড়া আরও অনেক চরিত্র রয়েছে। মন চায় সব পড়তে। কিন্তু ২০০২ সালের পর থেকে সম্ভবত আর বাংলায় ডায়মন্ড কমিক্স প্রকাশিত হয় না। শুধুই হিন্দি আর ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়।

#

ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করে অপটু হাতে দু-চার কথা লিখলাম। কিছু নতুন করে জানাতে বা বোঝাতে একেবারেই নয়। শুধুই নিজের অনুভূতি আর ভালো লাগা টুকু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

লেখক পরিচিতি

শৌণক বিশ্বাস। নিবাস ১০, মালিবু পয়েন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা। বর্তমানে মার্ভেল সিনেম্যাট্রিক ইউনিভার্স-এ কর্মরত। কেউ আমার সঙ্গে ডেট্-এ যেতে চাও? সুন্দরীদের জন্য আমার কাছে অফুরন্ত সময় আছে।



গতবারের নকুলবাবুর বাড়িতে দারোয়ান দম্পত্তির চুরির রহস্য উন্মোচন করায় ক্লাসের বাইরেও অভিকের বেশ নামডাক হয়ে উঠেছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর পরিতোষবাবুও মাঝে মধ্যে তাকে সঙ্গে নিয়ে যান এটা ওটা দেখাতে, আর পুলিশি তদন্তের কিছু কায়দা কানুন দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই তদন্তের ফাঁকফোকরগুলো খুঁজে পেয়ে যায় অভিক। অভিকের অবশ্য এই বিষয়ে তেমন আর আগ্রহ নেই। কারণ যেসব কেসে সে কাকানের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে সেগুলি নিতান্তই মামুলী অথবা মাথা খেলাবার তেমন কিছু নেই বা পুলিশের দ্বারাই আগে ভাগেই কেস খতম... আসামী গ্রেপ্তার। কিন্তু কাকানের আদরমাখা ডাকটা উপেক্ষাও করতে পারে না সে আর কাকানের সঙ্গে গেলে আপ্যায়নটাও মন্দ হয় না।

একদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ পরিতোষবাবুর ফোন।

-"কিরে অভি, ক্লাস কয়টা অবধি আজ?"

-"এই তো কাকান, লাস্ট পিরিওড বাকী।"

-"আচ্ছা তবে ক্লাস সেরেই চৌরাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করিস। আমি চলতি পথেই তুলে নেব তোকে।"

-"এবার কি কেস?"

-"তেমন কিছুনা, একটা বনিয়াদী বাড়িতে মামুলী একটা কাজের ছেলের হঠাৎ মৃত্যু।"

-"শুনেই তো মনে হচ্ছে আলুনী কেস, তুমি একাই যাওনা।"

#

-"আরে তোকে যেতে বলছি অন্য একটা কারণে। ওই এলাকায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে, তার বাড়িতে দুপুরের আহারাদির ব্যবস্থা আছে, খাঁটি মেঘনার ইলিশ সঙ্গে..."

-"তুমি দেখছি আমাকেও তোমার মত পেটুক বানিয়ে ছাড়বে... ঠিক আছে, তুলে নিও সময়মত।"

যে বাড়িতে কাজের ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে সেই বাড়িটাকে ছোটখাট একটা প্রাসাদ বা অট্টালিকা বললেও তেমন ভুল বলা হবে না। অভি পটাপট তার শখের ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল।

বাড়ির মালিক থাকেন কুয়েতে। দেখাশোনার জন্য একজন কেয়ারটেকার রাখা আছে। সঙ্গে গোটাকতক চাকরবাকর আর রান্নার লোকজন মিলে আট দশজনের কম হওয়ার কথা নয়। ওরা যেতেই কেয়ারটেকার এগিয়ে এসে ওদের উপরের তলায় নিয়ে গেল। কেয়ারটেকারের বয়স অনুমান করাটা কঠিন, চাপ দাড়ি আর কৃত্রিম কালি মাখানো চুল বয়স লুকানোর জন্য বা একটা ভারিক্কি ভাব আনার আপ্রাণ চেষ্টা। পরিতোষবাবু সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন।

- "আচ্ছা তো খুনটা কখন হয় আর কিভাবে হয়?"

- "খুন কেন বলছেন স্যার, এটা একটা স্বাভাবিক মৃত্যু।" হকচকিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলেন ভারীক্কি চেহারার কেয়ারটেকার। হঠাৎ করে খুন বলে প্রতিপক্ষকে দূর্বল করে দেওয়ার এই মেথডটা বেশ ভালোই লাগে অভিকের।

- "আচ্ছা? ছেলেটার বয়স কত হয়েছিল?"

- "এই ধরুন তেরো কি চৌদ্দ।"

- "হুম! তেরো চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে রাত্রে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ঘুমালো, আর সকালে দেখা গেল বিছানায় তার লাশ। এটাকে আপনি স্বাভাবিক মৃত্যু বলতে চাইছেন মিঃ অজয়?"

কথাবার্তা শুনে অভির মনে হল কাকান আগেভাগেই অনেক কিছু জেনেশুনেই এসেছে। তাতে তদন্তের অনেক সুবিধে আর সত্যাসত্য যাচাইও হয়ে যায়।

অজয়বাবুর মুখটা শুঁটকি মাছের মত শুকিয়ে গেল। তারপরেও মিনমিন করে বললেন, "খুন! কিন্তু কেমন করে খুন বলি স্যার, শরীরে তো কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। আর ওতো ছোট ছেলেকে কেউ খুন করবেই বা কেন?"

- "সেকি! তার মানে আপনারা ডেডবডি ছুঁয়ে ফেলেছেন?"

- "ইয়ে, মানে... কি করব স্যার! এত ডাকাডাকির পরেও যখন উঠছিল না তখন ওর কাকা মধুলাল... এ বাড়ির বহু পুরানো কাজের লোক ... সেই গিয়ে ঠেলাঠেলি করে, পরে বোঝে যে শ্বাস চলছে না। তারপর আমরা সবাই যাই। গিয়ে দেখি হার্টবিট বন্ধ।"

- "তাহলে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আর কোন লাভ নেই। তারপরেও নিয়মের খাতিরে নেওয়াটা আবশ্যক। সবাইকে ডাকুন এঘরে।"

সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হতে লাগল একে একে। অভিক এর মাঝেই বাইরে এসে অন্য একটা চাকরকে বলতেই সে মৃতের থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিল। দরজায় একজন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। তাকে বাইরে রেখে অভিক একাই ঘরে ঢুকল। ঘরটা মোটামুটি বড়, দুটি বিছানা পাতা। ছেলেটিকে নিয়ে এঘরে মধুলাল থাকত। ডেডবডির বিছানাটা খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে অভিক বেরিয়ে গেল। মাথার কাছে দেওয়ালে একটা তাক আর তাতে কিছু বইপত্র। এ সবের বেশ কিছু ফোটোও তুলে নিল অভিক।

একটু খোঁজ করে মধুলালকে পাওয়া গেল অন্য এক ঘরে শোওয়া অবস্থায়। সে মাঝে মাঝেই ডুকরে কেঁদে উঠছে আর সাধন বলে চিৎকার করছে। অভিক বুঝল ছেলেটির নাম ছিল সাধন। তাকে দেখে জড়সড় হয়ে উঠে বসল মধুলাল। ঘরে আর চেয়ার না থাকায় অভিক খাটেরই এক কোণে বসল।

-"আচ্ছা মধুলাল, সাধন তোমার কে হয়?"

-"আজ্ঞে আমার বড়দাদাবাবুর ছেলে ও"

-"আচ্ছা তুমি কখন খেয়াল করেছিলে সাধন আর নেই?"

-"আজ সকালে বাবু। ঘুম থেকে ডাকতে গিয়ে দেখি..." আবার ডুকরে কেঁদে উঠল মধুলাল।

-"সাধন কতদিন আছে এ বাড়ীতে?"

-"এই তো মাস দুয়েক হল ওকে এনেছি বাবু গেরাম থেকে। বন্যায় সব চলে গেল। ওর বাপ মাও মরি গেল। আমি ওকে নিয়ে এলাম।"

-"সাধন পড়াশুনা জানত?"

-"হ্যাঁ বাবু আগে ইস্কুলে পড়তি তো। ওর খুব ইচ্ছা ছেল আবার ইস্কুলে ভত্তি হবে। তার আগেই কি ঘটে গেল দেখেন দিকি।"

-"আচ্ছা গতকাল রাত্রে কি সাধনের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলে?"

-"নাতো বাবু। তবে কিছু একটা নিয়ে একটু উত্তেজিত ছেল বাবু। আমি জিজ্ঞেস করতে বলল আজ সকালেই আমায় বলবে।"

-"সাধন গ্রামের আর ছেলেদের সঙ্গে কেমন মিশত?"

-"ও এই বাড়ী থেকেই বেরোত না বাবু। বাপ মা হঠাৎ করে মরে যাওয়াতে একটু কেমন জানি হয়ে গেছেল।"

-"সাধন কি তোমায় কিছু বলেছিল মধুলাল?"

মধুলাল চমকে উঠল। মুখে একটা ভয়ের ছায়াও পড়ল, "কি বলবে বাবু?"

#

-"কিছু কথা... অন্যরকম?"

-"না না বাবু আমায় কিছু বলে নাই।" মধুলাল সজোরে মাথা নাড়ল। কিন্তু মধুলালের এই হঠাৎ পরিবর্তনটা চোখ এড়াল না অভিকের। ততক্ষণে তার ডাক পড়েছে অন্য একটা রুমে পুলিশ যেখানে ছেলেটার ডেডবডিটা সরিয়ে রেখেছে।

ছেলেটির শরীরে সত্যিই কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু ছেলেটির চোখে মুখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের ফুলো ফুলো। এছাড়া মুখটা স্বাভাবিকই আছে, তাই শুধু মুখ দেখে মৃত্যুর কারণ বোঝার উপায় নেই। ভালো করে দেখে বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে দুতিনটে ছবি তুলে রাখল অভিক।

পরিতোষবাবুও খানিক দেখে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। অভিক একা একা সারা বাড়ি ঘুরে দেখতে লাগল আর মাঝে মাঝেই ক্যামেরা চালাতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে একটু বাদে সে রান্নাঘরে এসে পড়ল। একজন মাঝবয়সী মহিলা রান্নায় ব্যস্ত আছে আর বয়স্ক গোছের এক কাজের লোক তাকে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। অভিক ঢুকতেই মহিলাটি মাথায় লম্বা ঘোমটা দিল আর কাজের লোকটা হাত জোড় করে নমস্কার জানালো। রান্নাঘরেও আভিজাত্যের ছাপটা স্পষ্ট। একটা বড় শোকেসে অনেক ডিজাইনের পোর্সেলিনের থালাবাসন রাখা যেগুলো আগের আমলে জমিদারেরা ব্যাবহার করত। বাড়ির মালিক সৌখিন হলে হয়ত সেগুলির ব্যবহার হয়, তিনি দেশে ফিরলে। পাশে একটা মাঝারি আলমারিতে বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য এমন কিছু থালা গামলা, আর কিছু রান্নাবান্নার তৈজসপত্র রাখা। সেখানে একই রকম দেখতে কয়েকটা থালা এক সারিতে সাজানো আছে, আর দুখানা সুদৃশ্য থালা রাখা আছে আলাদা ভাবে। অভিক কি মনে করে সেই থালা সাজানোর আলমারিরও একটা ছবি তুলে নিল।

ঘরের মেঝেটা বেশ ঝকঝকে। দেওয়ালগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা।

অভিক বয়স্ক লোকটাকে একধারে ডেকে নিল।

- "আপনার নাম কি?"

- "আজ্ঞে... সদা।"

- "আচ্ছা সদাবাবু, বলুন তো কাল ঠিক কী হয়েছিল?"

- "আজ্ঞে, আমি যদ্দুর শুনেছি তাতে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কাল রাত্তিরে সবাই একসঙ্গে খেয়েদেয়ে যার যার মত শুতে চলে গেল। সকালে উঠেই শুনি সাধন আর নেই। বড় ভালো ছেলে ছিল। আপন বলতে তো সেরকম কেউ ছিল না, মধুলালই মাস দুয়েক আগে কোথা থেকে যেন ধরে এনে অজয়বাবুকে বলে কয়ে এ বাড়িতে রেখে দিল।"

- "আচ্ছা সদাবাবু, এবাড়িতে আপনারা মোট কতজন কাজ করেন?"

- "আজ্ঞে কাল পজ্জন্ত তো আট জন ছিল, আজকে থেকে ছয়জন।"

- "ছয়জন কেন?"

- "আজ্ঞে কাল রাত্তিরের গাড়িতে সুখেন দেশের বাড়ি গেছে। ওর বউটার নাকি অসুখ।"

- "কাল কখন রওনা দেয় সুখেন?"

- "আজ্ঞে সন্ধে সন্ধে খেয়েদেয়েই রওনা দেয়। এই ধরেন আটটা নাগাদ, অজয়বাবুই ওকে গাড়ি করে ইস্টিশনে এগিয়ে দিয়ে আসেন।"

- "আর আপনারা খাওয়া দাওয়া করেন অজয়বাবু ফিরলে?"

- "আজ্ঞে, তিনি আমাদের স্যার মানুষ। তাকে রেখে কেমনে খাই, আর তিনি ফিত্তেও দেরী করেননি। এই ঘন্টাদেড়েক পর তিনি ফিরলেই সকলে মিলে একসঙ্গে খেয়েদেয়ে যে যার ঘরে চলে যাই।"

সদাইয়ের কথা শুনে বোঝা গেল এ বাড়িতে ঘরের অভাব না থাকায় চাকরবাকরেরাও যে যার আলাদা ঘর পেয়েছে থাকার জন্য।

অভিক বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলে সাধন ও বাড়ির বাকিদের সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিল। সেদিনের মত পরিতোষবাবু রুটিন মাফিক যা যা করণীয় তা করলেন। তারপর অভিককে নিয়ে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে মেঘনার ইলিশ সঙ্গে ট্যাংরামাছের ঝোল আর বেগুনভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে, খানিকক্ষণ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মেরে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ফিরলেন।

রাত্রে অভিক ক্যামেরাটা তার ল্যাপটপে কানেক্ট করে যা যা ছবি তুলেছিল সেগুলো দেখতে থাকে। কয়েকটা ছবি ভালোভাবে দেখেই তার মাথায় কিছু একটা খেলে গেল।

পরিতোষকাকাকে তার বাড়ির নাম্বারে পেল অভিক। জানা গেল মৃতের শরীরে বাড়ির লোক ছাড়াও আরও দু'জনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। ঠিক হল পরদিন আবারও যাওয়া হবে ঘটনাস্থলে। অভিক গভীর রাত অবধি জেগে ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশুনা করতে লাগল। চাক্ষুষ দেখা ঘটনা ও সকলের থেকে শোনা কথাগুলো আগাগোড়া মিলিয়ে নিতে লাগল।

পরদিন সকালে অভিক কলেজে না গিয়ে সোজা কাকানের সঙ্গেই ঘটনাস্থলে গেল। পরিতোষবাবু আগেই অজয়বাবুকে জানিয়ে রেখেছিল যাতে ঐ ঘরের কোনকিছুই নাড়াচাড়া না করা হয় আর বাড়ীর কাউকে গ্রামের বাইরে বেরতে না দেওয়া হয়।

কথামতই কাজ হল। বাড়িতে সকলেই উপস্থিত আছেন। অভিকের কথামত পরিতোষবাবু সবাইকে এক এক করে ডেকে জেরা করে চলেছেন। ভয় দেখিয়ে তথ্য আদায় করতে চাইছেন। কিন্তু সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। অভিক এদিক ওদিক ঘুরছে আর চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। একসময় ঘুরতে ঘুরতে নীচতলার কোনার

#

দিকে একটা ঘরে এসে থেমে গেল। সেই ঘরের দরজায় একটা ঝকঝকে নতুন তালা ঝুলছে। ঘরটাকে দেখে অব্যবহৃত বলেই মনে হচ্ছে। এরকম অব্যবহৃত ঘরে সাধারণত সেই পুরানো আমলের তালা ঝোলাই স্বাভাবিক, যেমনটা বাকী ঘরগুলোতে ঝুলছে।

হাঁক ছেড়ে একজন চাকরকে ডাকিয়ে নিল অভিক। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারল না। তার থেকেই অভি জেনে নিল এই ঘরটা অনেক বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে, কখন সখন পরিষ্কারের জন্য খোলা হয়। পরিতোষকাকাকে ডেকে ঘরটা খোলার ব্যবস্থা করা হল। অজয়বাবু জানালেন এই ঘরটার আগের যে তালা ছিল সেটা জং ধরে বেশ পুরানো হয়ে যায়। গতসপ্তাহে সুখেনই ব্যাপারটা বললে তিনিই তালাটা পাল্টে দিয়ে একটা নতুন তালা ঝুলিয়ে দেন।

ঘুরে ফিরে সেই সুখেন। অভিক অজয়বাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সুখেন কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি?"

-"সেরকমতো কিছু বলেনি।"

অজয়বাবু দরজা খুলে দিয়ে চলে যেতে কাকার দিকে তাকাল অভিক। পরিতোষবাবু অভিকের মনের কথা জেনে বলল, সুখেনের গ্রামে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আজকেই জানা যাবে ব্যাপার কি?

কাউকেই সেই ঘরে প্রবেশ করতে দিলেন না পরিতোষবাবু। অভি কাকানের টর্চটা হাতে নিয়ে অন্ধকার ঘরটার চারিদিক দেখতে লাগল।

ঘরটা অনেকদিন বন্ধ থাকায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ আর গুমোট ভাব। একটা মাত্র জানালা তাও পুরোপুরি বন্ধ। বায়ু চলাচলের কোন রাস্তা নেই। চারিদিকের দেওয়াল পরীক্ষা করতে করতে অভি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে একটা বিশাল বড় মাপের ছবি লাগানো দেওয়ালের সঙ্গে। তৈলচিত্র হলেও একদম জীবন্ত যেন। এতো বছর পর এখনো ঠিকঠাক আছে। অভি কাকানকে বলল অজয়বাবুকে ডাকতে। ঘরের ভিতর এসে ছবিটা দেখিয়ে তিনি জানালেন যে ইনি জমিদার ছিলেন এবং এই বাড়ির মালিক ছিলেন দুই পুরুষ আগে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা আর দুধারে পাকানো গোঁফ আর চোখের ধূর্ত চাহনি দেখলেই তার ব্যক্তিত্ব অনুমান করা যায় অনেকটা। ছবির মানুষটি তার বামহাতটি পিছনের পানে নির্দেশ করার মত করে মেলে রেখেছেন।

- "কাকান, আমাদের মনে হয় অনেকদূর যেতে হবে এই কেসে, এখনো আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই।"

- "কি বলছিস? আমার তো মনে হয় ঐ সুখেনই কালপ্রিট। ব্যাটাকে ধরতে পারলেই হল।"

- "এতো সহজ নয় কাকান। আচ্ছা আজ তোমার বন্ধুর বাড়িতে কি রান্নার আয়োজন সেটা খোঁজ নিয়েছ?"

এই সময় অজয়বাবু বলে উঠলেন, "স্যার যদি অনুমতি দেন তবে আমাদের এখানেই মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করি? কচি পাঠার মাংস, ফলুই মাছের ঝোল সঙ্গে মুড়িঘন্ট ডাল আর তেঁতুলের চাটনি। আরও কিছু আজ্ঞা করলে সে ব্যবস্থাও হতে পারে স্যার। আর আমার বন্ধু অমলও আসবে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

এটা শুনেই খাদ্যরসিক পরিতোষবাবু বলে উঠলেন, "না না। আর কিছুর দরকার নেই। এতেই আমাদের মত ভেতো বাঙালী খুশ।"

খানিকক্ষণ সবাই মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল।

-"আচ্ছা অজয়বাবু, এই ঘরে কার কার যাতায়াত ছিল? এই ছবির কথা কি বাইরের কেউ জানত?"

ঘরে ধূলোর উপরে বেশ কিছু পায়ের ছাপ দেখিয়ে অজয়বাবুকে প্রশ্নটা করলেন পরিতোষবাবু।

- "এ ঘরে কারো যাতায়াত ছিল না স্যার। বছরে এক দুই বার খুলে আমিই একটু ঝাড়পোঁছ করতাম। বিশেষ করে ছবিটার জন্য। ছবির কথা তেমন কেউ তো জানত না।"

- "আচ্ছা আপনি যেতে পারেন, কাছাকাছি থাকবেন।"

অজয়বাবু বেরিয়ে গেলেন খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতে।।

অভি তখন থেকেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কাকানের ডাক শুনেই ফিরে তাকায়।

- "কিরে, এত মন দিয়ে কি দেখছিস?"

- "এই ছবিটা কিছু একটা নির্দেশ করছে কাকান।"

- "কি বল তো?"

- "সেটা বুঝতে পারলে তো অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যেত।"

হঠাৎ ছবিটার গায়ে হাত বুলাতে শুরু করল অভিক। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর অভিকের মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল।

-"কাকান, এদিকে এস। এই ছবিটাই মনে হয় রহস্যের কিনারা করবে।"

অভিক ছবিটার একদিকের ফ্রেমের উপর খানিক চাপ দিতেই একটা মচ করে শব্দ হয়ে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। পরিতোষবাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল তার অজান্তেই। দুজন মিলে আর একটু চাপ দিতেই ছবিটা ঘুরে গিয়ে মাঝ বরাবর দাঁড়াল আর দুধার দিয়ে দুজন মানুষ গলে যাবার মত গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখা দিল। অভিক মোটামুটি চিকন স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় বেশ সহজেই একধারের সুড়ঙ্গ দিয়ে টুক করে ঢুকে গেল, একটুও দেরী না করে। পরিতোষবাবু খানিক লম্বা চওড়া হওয়ায় বেশ কসরত করেই ঢুকলেন। দুজনেই সেই সুড়ঙ্গ বেয়ে টর্চের আলোয় সাবধানে নিচে নামতে লাগল। প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা প্যাঁচানো সিড়ি পেরিয়ে তারা আর একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাড়াল। দরজায় কোন তালা নেই। তবে সেই আদ্যিকালের শক্ত হাতলওয়ালা লোহার খিল। যেটা খুলতে পরিতোষবাবুকে বেশ কসরত করতে হল।

দরজা খুলেতেই একটা হালকা ভ্যাপসা গন্ধ এসে দুজনের নাকে লাগল। সঙ্গে একটা ঝাঁঝালো গন্ধে রুমাল চাপা দিয়ে পরিতোষবাবু কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলেন। অভিক টর্চটা হাতে নিয়ে একটু ভিতরে ঢুকে গেল।

এই ঘরটা পুরো অন্ধকূপ বললেও ভুল বলা হবে না। মাটির প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে তাই কোন জানালা নেই। গুমোট ভ্যাপসা ভাবটা খুব বেশী। ঘরটাতে কোন আসবাবপত্র নেই। হয়ত জমিদার বাড়ির গুপ্ত কোষাগার বা ওইরকম কিছু ছিল। তবে মেঝেতে ধুলোর আস্তরণের উপর বেশ কয়েকটা জুতো আর স্যান্ডেলের ছাপ দেখল অভিক। চারদিকের দেওয়ালে টর্চ ফেলে দেখা গেল সবখানেই কোন শাবল জাতীয় কিছু দিয়ে খুঁড়ে কোন কিছুর সন্ধান করা হয়েছে। সেই চুন সুরকি আর বালিতে সারা ঘর ভরে আছে, তার উপরেই বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখা গেল, আর একজায়গায় দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে খানিকটা জায়গার ধুলো বালি মুছে গেছে। দেখে মনে হয় ওখানে কেউ বসে পড়েছিল হঠাৎ। সেগুলি বেশ ভালভাবে দেখে নিল অভি। সারা দেওয়ালে আলো ফেলে একধারে একটা বেশ লম্বা বক্ররেখার মত ফাটল দেখতে পেল। অভি এগিয়ে গিয়ে ফাটলটা ভালভাবে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার কেমন যেন শরীর খারাপ লাগছে টলতে টলতে অভিক পরিতোষবাবুকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। হঠাৎ সিঁড়িতে কারো সন্তর্পণে পা ফেলার শব্দ, অভিকরা ঘরের বাইরে বেরোতেই পায়ের শব্দটা থেমে গেল।

- "চল কাকান, এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাদের পরিণতিও সাধনের মত হবে।"

- "কি বলছিস!"

- "চল উপরে, আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আর একজন নতুন মানুষের সঙ্গে সম্ভবত সাক্ষাৎ করতে হবে।"

- "একটু খোলসা কর বাপধন আমার।"

- "আগে এই গ্যাসচেম্বার থেকে তো বেরই, তারপর বলছি।"

বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই কিছু দূরে সামনে একটা অন্ধকার মূর্তি দেখতে পেল। ওদের উপরে উঠতে দেখে সেই অন্ধকার মূর্তিটি পড়িমরি করে দৌড়ে উপরে উঠে চোখের নিমিষে হাওয়া হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার দরুন আর অক্সিজেনের অপ্রতুলতায় দুজনেই খানিকটা কাহিল হয়ে পড়ায় কারোরই আর সেই আগন্তুকের পিছু নেবার শক্তি নেই। তবুও পরিতোষবাবু হন্তদন্ত হয়ে এগোতে চাইলে অভিকই হাত ধরে থামায়।

- "তার আর দরকার নেই কাকান, আগন্তুককে খুঁজে বের করতে আর মনে হয় না বেশী বেগ পেতে হবে।"

- "তার মানে?"

- "মানেটা জানতে পারবে একটু পরেই। আগে চল একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে লাঞ্চটা সেরে নেওয়া যাক।"

পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে কাকানকে নিয়ে সোজা বাড়ীর বাইরে বেড়িয়ে এল অভিক। তার সন্দেহের কথা কিছু কিছু খুলে বলতেই পুলিশি তৎপরতায় পরিতোষবাবু একজন অফিসারকে ডেকে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন কিছু।

খাওয়ার টেবিলে ওদের সঙ্গে অজয়বাবু ছাড়াও আর একটি নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়েছেন। ইনি স্থানীয় স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক শ্রীমান অমল চৌধুরী। অজয়বাবুর বন্ধু। এ বাড়িতে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। তবে গতকাল তিনি আসেননি। পাঁঠার মাংস আর ফলুইমাছের ঝোলের সঙ্গে মুড়িঘন্ট ডাল আর তেঁতুলের চাটনি দিয়ে ভাত খেয়ে সবাই মিলে অন্য একটা ঘরে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ রান্নার প্রশংসা করার পর অভিক শুরু করল ...

- "আচ্ছা কাকান লাশের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ কি বলছে?"

- "ফুসফুসে অক্সিজেনের অপ্রতুলতা। তাই বলা যেতে পারে শ্বাসকষ্টে মৃত্যু।"

- "হুম, এটা অনুমেয়ই ছিল। শরীরে যখন কোন আঘাতের চিহ্ন নেই তখন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধই একমাত্র মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আর কার কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে লাশের গায়ে?"

- "মোট চারজনের। মধুলাল, অজয়বাবু, আর অজ্ঞাত দুজন কেউ।"

অভিক এবার অজয়বাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আপনার ওই কাজের লোকটার নাম যেন কি, যাকে সেদিন রাত্রে আপনি স্টেশনে ছেড়ে এলেন?"

- "ওর নাম সুখেন। ওর বউ নাকি মারাত্মক অসুস্থ, তাই খবর পেয়ে রাত্রের গাড়িতেই চেপে বসল।"

- "আচ্ছা। তা তাকে গাড়িতে চেপে বসতে কি আপনি দেখেছেন?"

- "না তা দেখিনি, আমি কাউন্টারে ছেড়ে দিয়েই ফিরেছিলাম।"

- "আমার যতদূর মনে হয় আপনার সুখেন সেদিন রাতের গাড়িতে না উঠে আপনার পরপরই চুপিচুপি এ বাড়িতে ফিরে এসেছে।"

- "বলেন কি ? কিন্তু ও যে বলল বউয়ের নাকি এখন তখন..."

- "আর আমার মনে হয় ও একা আসেনি, আরও একজন সঙ্গে এসেছিলেন।"

- "কে সে?"

- "সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।"

- "কিন্তু সুখেন বাড়ি না গিয়ে ফিরেই বা আসবে কেন আর ওর সঙ্গেই বা কে এসেছিল? আর কেনই বা এসেছিল?"

- "এসব জানতে হলে আগে পুরান তালা বদলে নতুন তালার রহস্য ভেদ করতে হবে যে। ওটার ব্যাপারে সদাই তো আপনাকে জানিয়েছিল? ডাকুন তাকে।"

- "হ্যাঁ সদাই বলছিল কত্তা তালাটা বদলে দ্যান, জং ধরে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" বলেই সদাই বলে ডাক ছাড়লেন অজয়বাবু।

- "কিন্তু তালাটা এতটা নষ্ট হওয়া উচিত না আমার যতদূর মনে হয়। সেই জমিদারি আমলের তালা। এত সহজে নষ্ট হবার নয়। ওটাতে রোজ জল ছিটিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে তাড়াতাড়ি জং ধরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

সদাই এলে অভিক সরাসরি তাকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা সদা মধুলালের ঘুম কেমন ছিল? গাঢ় না পাতলা?

সদাই এরকম আচমকা প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল। কোনমতে বলল, "আজ্ঞে গা-গা গাঢ় ছিল খুব।"

-"মিথ্যা কথা। আমি বাকিদের কাছে খোঁজ নিয়েছি সদা। মধুলালের ঘুম একদম পাতলা ছিল। আমার বিশ্বাস তাকে ওই রাতে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। আর সেটা দিয়েছিলে তুমিই। কারণ রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরে বাকিদের খাবার তুমিই এনে মাটিতে সাজিয়ে রেখে তারপর সবাইকে খেতে ডাকো। সবার বসার জায়গা ও থালা আলাদা থাকায় তোমার পক্ষে মধুলালের খাবারে ঘুমের ওষুধ দেওয়া কঠিন কিছু না।

একথা শুনেই সদাই হাউমাউ করে কেঁদে উঠে যা বলল তার মর্মার্থ এই যে, তাকে ঘুমের ওষুধ মেশাতে স্বয়ং সাধন নিজেই বলেছিল। সাধন এও বলেছিল মধুলালের যে দাদা বৌদির মৃত্যুর পর থেকে কাকার একদম ঘুম হচ্ছে না, তাই সে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধ আনিয়েছে। যাতে করে কাকাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো যায়। সদাই সরল মনেই তাকে বিশ্বাস করে মধুলালের খাবারে ওষুধ মিশিয়েছে।

এমন সময় অজয়বাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন, "কিন্তু সাধনকে তবে কে খুন করল? কেন করল?"

- "অজয় বাবু আমরা ধাপে ধাপে এগোই, লাফে লাফে নয়।"

একথা শুনে অজয়বাবু হাওয়াবিহীন বেলুনের মত চুপসে গেলেন।

- "এরপর আসি অন্য একটা প্রসঙ্গে। কাকানের বন্ধুর বাড়িতে সেদিন গিয়ে এই বাড়ি সম্পর্কে নানান গল্পকাহিনী শুনেছি। যার মধ্যে গুপ্তধন কথাটা বেশীই। আর পুরানো আমলের রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়িতে গুপ্তধন থাকাটা আগের দিনে অনেক ঘটেছে যেটা আমরা সবাই জানি। আর সেই গুপ্তধনের লোভই সাধনকে এমন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।"

- "একটু পরিষ্কার করে বলুন অভিকবাবু।"

- "আপনি তো এ বাড়ির নাড়িনক্ষত্র সব জানেন অজয়বাবু। সেই হিসেবে গুপধনের জনশ্রুতিটাও আপনার অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়?"

- না তা নয়, কিন্তু আমি যতদূর জানি এ বাড়িতে কোনকালেই কোন গুপ্তধন ছিল না। কারণ মাত্র দুই পুরুষ আগে উনিশ শতকের প্রথম দিকে এ বাড়ির তৎকালীন মালিক জমিদার মনমোহন রায়বাহাদুরসাহেব অভাবে পড়ে বাড়িটি বিক্রি করেন বর্তমান মালিকের ঠাকুরদাদার কাছে। গুপ্তধন যদি থেকেও থাকত সেটা নিশ্চয় রায়বাহাদুর সাহেব নিজের কাছে আগেভাগেই সরিয়ে রেখেছিলেন।"

- "আর এ বাড়ির খানিক দুরেই ছোটখাট একটা কয়লার খনি আছে সেটাও তো আপনি আমাদের বলেননি।"

- "কয়লা খনি! হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন অভিকবাবু, এই বাড়ির পিছনের মাঠে একটা পরিত্যক্ত খনি আছে বটে। কিন্তু সেতো বহুদিন আগের কথা। সেখানে তো কিছুই হয় না, আর খনির মুখও মাটি পড়ে পড়ে বুজে গেছে।"

- "এককালে এই বাড়ির প্রাক্তন মালিক মনোমোহন রায়বাহাদুরের ঠাকুরদা রামমোহন রায়বাহাদুরের মালিকানাধীন ছিল ঐ খনি। আঠারো শতকে এদেশে খনি আইন বলে কিছু ছিল না। জমিদার রামমোহনবাবু কিছু অদক্ষ শ্রমিক আর অনভিজ্ঞ প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে খননকাজ চালিয়ে উত্থিত আকরিক বিদেশী দরবারের বিক্রি করে বেশ ভালো টাকা জমিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে শ্রমিকরা সেই খনির আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন নাকি একটা দেওয়াল পায় সামনে। কিন্তু ততদিনে খনির আকরিক প্রায় সবই ওঠানো হয়ে যায়। তারপর কোন কারণে রামমোহন রায়বাহাদুর হঠাৎ করেই খোঁড়ার কাজ থামিয়ে দেন আর খনিমুখও বন্ধ করে দেন। তখন থেকে ওটা পরিত্যক্ত। পরবর্তীকালে টাকার অভাবের জন্য মনমোহন রায়বাহাদুর সেই খনিটা বিক্রি করার কথা ভাবেন সরকারের কাছে। তখন সরকারী খাতায় এই খনির নাম ওঠে কিন্তু সরকারী দপ্তর থেকে কোনপ্রকার আগ্রহ দেখানো হয়নি ওই খনির জন্য।" এতখানি কথা একসঙ্গে বলে অভিক একটু থামল। তার গলা শুকিয়ে গেছে।

-"কিন্তু কোন গুপ্তধন ছিল বলে তো শুনিনি কখনোই আমি", অভিককে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন অজয়বাবু।

- "হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন। কিন্তু একটা জিনিস জানেন তো, লোভ কোন যুক্তি বা বাস্তবতা মানে না। আর তাই এ বাড়ীর একজন বাইরের একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই গুপ্তধনের অনুসন্ধানে নামলেন। তাদের একজন হল সুখেন। যে কিনা রাত্রে বাড়ি যাবার কথা বলে বাড়ি না গিয়ে আবার চুপিচুপি এ বাড়িতে ফিরে আসে শুধু সাধনকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এর পিছনে আছে আরও একজন। যার বুদ্ধি ছাড়া সুখেনের পক্ষে জীবিত থেকে গুপ্তধনের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না।"

- "এটা আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন অভিকবাবু?" অজয়বাবুর কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

- "আমি তালাবন্ধ ঘরটাতে এবং নিচের গুপ্তঘরটিতে বেশ কয়েকজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি অজয়বাবু। আমার বিশ্বাস তাদের একটা সাধনের আর একটা সুখেনের। আমি সবার কাছ থেকে কমবেশী যে তথ্য পেয়েছি তাতে সুখেনই একমাত্র সারাদিন খালি পায়ে বেড়াত। ওই ঘরে সেরকম খালি পায়ের ছাপ একজনের ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকবার আছে। পুলিশ সেটা প্রুফ করে ফেলবে ঠিকই।"

- "কিন্তু ওই ঘরে এরা কেনই বা যেত? আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিই বা কে?"

- "সেটা এখনো বুঝতে পারলেন না? গুপ্তধনের খোঁজ। জনশ্রুতি আছে এ বাড়ির কোন একঘরের দেওয়ালে সোনার মোহর লুকানো আছে। আসলে সবই জনশ্রুতি। আর বাকী মানুষটির পরিচয়ও নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।"

- "আচ্ছা সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু সাধন কিভাবে এদের দলে ভিড়ল?" জিজ্ঞেস করলেন অজয়বাবু।

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে পরিতোষবাবুকে সেলাম করলেন। পরিতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে অফিসারের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি ফিরে এসে অভিককে একটা কাপড়ের ব্যাগ দিলেন আর চোখের ইশারায় কিছু জানালেন। অভিকের মুখে একটা সাফল্যের হাসি খেলে গেল। সে অজয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,

- "প্রথম থেকে সাধন এদের দলে ছিল না। কিন্তু সে কোনভাবে সুখেনের নিচের ঘরে যাতায়াতের ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ব্যাপারটা জানায় সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকেই, যাকে সাধন খুব শ্রদ্ধা করত আর মাঝেমাঝেই তার থেকে নানা রকম পড়াশুনার বা গল্পের বই নিত।" বলেই অভিক অমলবাবুর দিকে ফিরে তাকাল।

অমলবাবু মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন সাধনের খুনের জন্য আমি দায়ী?"

- "এই দেখুন, স্বীকারোক্তি করে আপনি ব্যাপারটা অনেক সহজ করে দিলেন।"

- "তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?"

- "অমল বাবু, গতকাল সাধনের ঘরে দেখলাম একটা ইতিহাসের গল্পের বই। তাছাড়া কয়েকদিন আগে মধুলালকে সাধন বলেছিল যে এই বাড়ীর কয়েকজনের উপরে তার সন্দেহ আছে। তখন মধুলাল চাকরি যাবার ভয়ে সেই কথা অজয়বাবুকে বলতে নিষেধ করেছিল সাধনকে। উত্তরে সাধন মধুলালকে বলে সেই ব্যাপারে সে ভালো লোকের পরামর্শ নিয়েই কাজ করবে। সেই ভালো লোকটা অজয়বাবু ছাড়া আর কে হতে পারে যে এই বাড়ীতে অজয়বাবুর সমকক্ষ? রান্নাঘরে দেখেছিলাম একইরকম দুটো থালা। অজয়বাবুর সঙ্গে নিয়মিত তাহলে কে খান এই বাড়ীতে? তার সমকক্ষ কে ই বা আছে এই বাড়িতে? তারপর বাড়ির চাকরদের কাছ থেকেই জানলাম যে আপনার এ বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত আছে, তার উপর আপনি আবার ইতিহাসজ্ঞ। জমিদার বাড়ীর গুপ্তধন আর সাধনের মৃত্যুর সঙ্গে কিছু যে সম্পর্ক আপনার আছে তাতো বোঝাই যাচ্ছে।"

অভিক একটু থেমে টেবিলের উপরে রাখা কাপড়ের ব্যাগ থেকে বার করল একটা পলিথিনে মোড়া মুখোশ। সেটা দেখেই অমলবাবু এক লাফে চেয়ারটাকে ঘরের কোণে ছিটকে ফেলে পালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারটি তৎপরতার সঙ্গে তাকে ধরে হ্যান্ডকাফ বন্দী করল।

- "বসুন অমলবাবু, বসুন। পুরো গল্পটা শুনে তারপরেই না হয় যাবেন।"

হতভম্ব হয়ে অজয়বাবু মুখোশটার দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু এটা কি?"

-"এটা একটা মুখোশ অজয়বাবু। এটা পাওয়া গেছে অমলবাবুর বাড়ী থেকে। এরকম আরও একটা মুখোশ পাওয়া গেছে সুখেনের ঘর থেকে। এটাই সাধন হত্যার সবথেকে বড় প্রমাণ।"

অমলবাবু ঘাড় গুঁজে আরেকটা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লেন। পরিতোষবাবু বলে উঠলেন, "কিন্তু সাধন খুনটা হল কিভাবে?"

- "খুন বললে পুরো ঠিক বলা হবে না কাকান।"

- "তাহলে?"

- "ইউথেনসিয়া।"

- "বলিস কি? এটা তো পশ্চিম বিশ্বে পশুদের যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যুদানে ব্যবহৃত একটা পদ্ধতি।"

- "এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। অমলবাবু শিক্ষক মানুষ। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনাই তার জানা আছে যেটা এই যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত। যাতে খুনি থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে, আর প্রমাণও মৃতের শরীরে থাকে না।"

- "কিন্ত সাধনকে এই যন্ত্রণাহীন মৃত্যু কিভাবে দেওয়া হল?"

- "তোমার মনে আছে কাকান, নিচের ঘরটার মেঝেতে বেশ খানিকটা জায়গায় দেওয়াল ঘেঁষে চুন বালির মুছে যাওয়া ছাপ ছিল?"

- "হ্যাঁ! তার মানে তুই বলতে চাইছিস ওইটা সাধনের..."

- "হ্যাঁ, সাধন যেদিন সুখেনের নিচের ঘরটাতে যাতায়াতের ব্যাপারে বলে, সেদিনই অমলবাবু ঠিক করে ফেলেন সাধনকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নয়ত গুপ্তধনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। আর এ বাড়িতে কারো মৃত্যু হলে সেটার ও একটা ভৌতিক কেচ্ছা রটানো যাবে। তাতে করে যদি বাড়ীর চাকরবাকর কমে যায় তাহলে অমলবাবুর পক্ষে অনেক সুবিধের হবে। সেইমত তিনি সুখেনকে বলে দিলেন রাত্রে বাড়ি যাবার বাহানা করতে। আর সাধনকে তিনি বোঝালেন যে রাতে তারা দেখবে কারা ঐ ঘরে যায়, কেনই বা যায়; কিন্তু তারজন্য ঘুম পাড়াতে হবে তার কাকাকে, কারণ মধুলাল প্রায় সারা রাত্তিরই জেগে থাকে। কিশোর মন, তাই রোমাঞ্চের নেশাতে মত্ত হয়ে উঠল। অমলবাবু ঘুমের ওষুধ তুলে দিলেন সাধনের হাতে। সাধন সেটা সদাকে হাত করে মিশিয়ে দিল কাকার খাবারে। মধুলাল আগেভাগেই ঘুমের ওষুধের ক্রিয়ায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল, তাই সাধনের রাত্রে বাইরে বেরনোর কোন সমস্যাই রইল না। রাত্রে সেই সদর দরজা খুলে বাড়ীতে ঢোকায় অমলবাবুকে। আবার পরে অমলবাবু কোন কায়দা করে ঢোকান সুখেনকে।

অমলবাবু কোন না কোন ভাবে ছবির সুড়ঙ্গের কথা জানতেন। হয়ত এ বাড়ির নকশা দেখে বা অন্য কোন উপায়ে যেটা উনিই ভালো বলতে পারবেন। পরে ঘর খুলে ছবির সুড়ঙ্গের কাছে এসে সাধনকে বলে নিচে নেমে দেখতে। নিচে

আগে থেকেই সুখেন মুখোশ পরে অপেক্ষা করছিল। সাধন আলো আঁধারিতে ঐরকম মুর্তি দেখে খুব সম্ভবত ভিরমি খায়। তখন সাধনকে ঐ ঘরে আটকে সুখেন উপরে উঠে আসে। আর গোটা ঘরটাই একটা গ্যাসচেম্বারে পরিণত হয়।

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে... "গ্যাসচেম্বার?"

- "হ্যাঁ গ্যাসচেম্বার, কাকান তুমি তো জানো, ইউথেন্সিয়াতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?"

- "কার্বন-ডাই-অক্সাইড।"

- "হ্যাঁ, কিন্তু তফাত হচ্ছে ইউথেন্সিয়াতে বাইরে থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করা হয়, আর এখানে ঐ ঘরে আগেভাগেই ওই গ্যাসটি ছাড়াও আরও কিছু মারাত্মক গ্যাস মজুত ছিল। যেমন মিথেন..."

- "কিভাবে?"

- "আমি বলেছিলাম না, লোকশ্রুতি যে খনির খোঁড়াখুড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে একটা দেওয়াল সামনে পড়ে। আর সেই দেওয়ালটা আর কিছুই না, এবাড়ির ওই পাতালপুরীর ঘরের দেওয়াল। সেই দেওয়ালে শাবল দিয়ে খোঁড়ার দরুন বেশ কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা দেয়, আর সেই ফাটল দিয়ে সরাসরি পরিত্যক্ত খনিতে জমা মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড সহ বিষাক্ত সব গ্যাস এসে ওই ঘরটাতে জমা হয়। ঘরটা বাইরে থেকে খিল দিয়ে দেওয়ায় সাধন আক্ষরিকভাবে গ্যাসচেম্বারেই আটকা পড়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্বল হয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ঐ খিলের গায়েও হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। খানিকক্ষণ পর সেখান থেকে টেনেহেঁচড়ে সুখেন তাকে ছবির সুড়ঙ্গ অবধি নিয়ে আসে। তারপর তারা সাধনকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার বিশ্বাস সুখেনের একার পক্ষে সাধনকে কোলে করে তোলা সম্ভব ছিল না। এই কাজে তাকে সাহায্য করেছেন অমলবাবুও। অমলবাবু কালকে এই বাড়ীতে আসেনি কিন্তু আমি নিশ্চিত অমলবাবুর আঙ্গুলের ছাপ মিলে যাবে ঐ দুই অজানা ছাপের সঙ্গে। কাল না এসে সত্যি আপনি বড় ভুল করেছেন অমলবাবু।"

অমলবাবু ঘাড় গুঁজে গোঁ গোঁ করে কি একটা বলল ঠিক বোঝা গেল না।

অভিক তাকে পাত্তা না দিয়ে আবার বলতে শুরু করল, "সাধনের জামাপ্যান্টে ধুলোবালি লেগে ছিল। সেই বালি লেগেছিল বিছানাতেও। অমলবাবু আর সুখেনের জামাকাপড় খুঁজে হয়ত কালকের ধুলো বালিমাখা জামাকাপড় পাওয়া যাবে। সুখেন সেই রাতেই বাড়ি রওনা হল বা অন্য কোথাও গা ঢাকা দিল। আর আমরা আজ ওই ঘরের সন্ধান পেয়েছি জেনে অমলবাবুই আমাদেরকে ওই গ্যাসচেম্বারে আটকে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসায় এযাত্রা সেটা আর সম্ভব হল না।

ঘরটাতে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা নেমে এল। অভিক আবার বলল, "কাকান, আমার কাজ শেষ। এবার বাকি করণীয় তুমি ঠিক কর।"

ফেরার পথে কাকান অভিকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তুই এত কিছু নিশ্চিত হলি কিভাবে?"

জমিদারবাবুর ছবিটির ওই পিছনপানে হাত উঁচিয়ে থাকা আর পায়ের ছাপ এক্ষেত্রে বেশ কাজ দিয়েছে। তবে সত্যি বলতে কি আসল ক্রেডিট মেঘনার ইলিশের। ওটা খেয়েই মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর কিছুটা অনুমান আর গুগলের দাক্ষিণ্যে পরপর মিলিয়ে নিতে পারলাম।

অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

মিঠুন ভালোবাসে ছবি তুলতে, ঘুরে বেড়াতে, মাছ ধরতে আর মায়ের হাতের আদর খেতে। তার প্রধান কাজ খাওয়া আর বনের মোষ কিলিয়ে বেড়ানো।

#



সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পার্কটা হঠাৎ করে কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। এক গভীর নিস্তব্ধতায় গ্রাস হয়ে গেল গোটা জায়গাটা। সবেমাত্র ছ'টা বাজে আর এরই মধ্যে অন্ধকারের নিগূঢ়তায় নিজেকে ধীরে ধীরে সঁপে দিচ্ছে গোটা পরিবেশটা। ছোট্ট দার্জিলিং শহরে শীতের আগমন ঘটেছে। তরুগণ তাদের পুষ্প ও পত্র পরিত্যাগ করা শুরু করে দিয়েছে। সুন্দর সবুজ শহর ধীরে ধীরে নগ্নতার পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। যখন বসন্ত বিরাজমান হবে আবার তারা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হবে।

ঝিকিমিকি তারারা আরও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে তাই তাদের মধ্যে থেকে সঙ্গিহীন ক্ষেপানাথ আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হছে। আসলে সেও ঠিক বেঞ্চে বসে থাকা লোকটার মত, সবার মাঝে থেকেও কেমন যেন একা একা। কাঠের বেঞ্চটা ঠাণ্ডা হচ্ছে আস্তে আস্তে। অদূরে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লাইট পোস্টগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এখন ডিসেম্বর মাসের শুরু, ক্রমাগত তাপমাত্রা হ্রাসের কারণে শহর কম্পিত।

আমিই মনে হয় শেষ ব্যক্তি যে এখনও পার্কের মধ্যে বসে আছে। নাঃ এবার উঠতে হয় দেখছি। মনে হয় এখনও কেউ আছে এখানে। ..... সমর্পিতা!!! না না সে কি করে এখানে আসবে। দশ বছর আগে সে আমাকে নিজের হাতে বোনা একটা সুন্দর হাতকাটা সোয়েটার উপহার দিয়েছিল। সেই আবেগঘন মুহূর্তে তখন তাকে বলেছিলাম "শীতের আগমন কি বসন্তের পূর্বাভাষ নয়?" কিন্তু হায়! আমার জীবনে আর কখনই বসন্তের সমাগম ঘটেনি আর ঘটবেও না। গাছেরা নিজেদের পাতা দিয়ে সাজাতে ভুলে গেছে, কোকিলের আর কুহু ডাক মনে নেই। কারণ সমর্পিতা, আমার জীবন থেকে সরে গেছে।

#

প্রতি বছরের মতই এবারেও আমি সেই সোয়েটারটা পরেছি, সমর্পিতাকে অনুভব করি এতে। কে জানে, হয়তো সে আর আগের মত সোয়েটার বুনতে পারে না, বা হয়তো পুরো ভুলে গেছে। তবে আমার মনে হয় সে বুঝি অন্য কারোর জন্য সোয়েটার বোনে। তার নিপুণ হাতের মহিমায় উলের অন্তর্জাল বুনে চলেছে।

- "আর দুটো মাস অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে সামনের বসন্তেই বিয়ে করব। কেউ আলাদা করতে পারবে না আমাদের"। আমি পাস থেকে আসা শব্দটা শুনে সেই দিকেই অনুসরণ করতে লাগলাম। অদূরে দেখলাম, একটি অল্পবয়সী ছেলে তার প্রণয়িনীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, বসন্তের অপেক্ষা করছে। ছেলেটি আবার বলল – "শীতের আগমন কি বসন্তের পূর্বাভাষ নয়?"।

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল- "কে জানে, এই দু মাসের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো এই দুমাসের মধ্যে আমায় দার্জিলিং ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার বাবার ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে অন্য শহরে।"

এবার ছেলেটি নিজের ভাষা হারিয়ে ফেলল, বোধহয় তার নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল। এই শীতের ঠাণ্ডা আবহাওয়া বোধকরি তার এই দুর্বলতাকে বুঝে উঠতে পারেনি।

-"আছা এবার আমাদের উঠতে হবে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হতে চলল, এবার ওঠো" - ছেলেটি তার প্রেয়সীর জন্য অপেক্ষা করল।

-"না, যাব না। আমি তোমার শেষ রায় জানতে চাই" মেয়েটি, ছেলেটির দৃঢ় জবাব শুনতে চাইল।

-"বললাম তো!!! শীতের আগমন কি বসন্তের পূর্বাভাষ নয়?"

"গর্দভ, কেউ বসন্ত আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না। কে জানে, তুমি হয়তো এই শীতের পর কেবল গ্রীষ্মকেই দেখতে পাবে। হয়ত তোমার এই সময়টার জন্য সারা জীবনে অনুশোচনা থেকে যাবে। ভালবাসায় আবার শীত কি বা বসন্ত কি? ঋতু কখনও ভালবাসার মাঝে সেতু হয়ে দাঁড়াতে পারে না।"

-"একি করছেন আপনি। আমার সোয়েটারটা ছাড়ুন। নাহলে কিন্তু ভাল হবে না"।

আমি বাধা অগ্রাহ্য করে জোর করে তার গা থেকে সোয়েটারটা খুলে নিলাম। "ইয়ং ম্যান ভালবাসায় কখনও শীত আসে না, আর কাউকেই বসন্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। ভালবাসায় সব ঋতুই সমান হয়"।

-"কিন্তু কিন্তু!! আমার সোয়েটার?" বেচারা আমার কথা বুঝতেই পারছিল না। সে যথাসম্ভব আমার হাত থেকে তার প্রিয় সোয়েটারটি ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল।

আমি তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, তার সোয়েটারটা ছিনিয়ে নিয়ে জোরে দৌড় লাগালাম। ছেলেটি পিছন থেকে চিৎকার করতে লাগল – "চৌকিদার !! চৌকিদার !! চোর। চুরি করে পালাচ্ছে।"

-"কি হল দাদা? কি হল? চোর? কোথায় চোর? আর আপনি এই ঠাণ্ডাই সোয়েটার খুলে কি করছেন? আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?" চৌকিদার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। পাগল টাগল ভাবছে বোধহয়।

আমি লক্ষ্য করলাম আমার সোয়েটার আমার হাতে ঝুলছে। আর গোটা শরীর এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছে। কিন্তু সেই কপোত কপোতী গেল কোথায়?? তারা দুজনেই কখন উধাও হয়ে গেছে বুঝতে পারি নি। যেন জাদুকরের কাছ থেকে তারা জাদু দেখাতে এসেছিল। আমার অলক্ষ্যে সেই জাদুকর বুঝি তারিয়ে তারিয়ে আমার এই পরিণতি উপভোগ করছে।

-"দাদা এখন আট-টা বাজে। এবার আসুন। আমাকে পার্ক বন্ধ করতে হবে"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। প্রত্যেক বারের মতই শীত আসে আর চলে যায়, কিন্তু শীতের পর বসন্ত কখনোই আসেনা। সমর্পিতার সঙ্গে ঋতুটাও আমার জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে।

অলঙ্করণঃ অর্পণ মণ্ডল

লেখক পরিচিতি

অর্পণ মন্ডল (জন্ম ১৯শে মে, ১৯৯৩) সদ্য স্নাতক, ভালবাসে বই পড়তে, ছবি আঁকতে, ঘুরে বেড়াতে। ভোজনরসিক এই ছেলের একটা নিজের হাতে তৈরি শ্রুতিনাটকের গ্রুপ আছে, নাম অল ডে ননসেন্স। কখনো সখনো মুড হলে লিখে ফেলে প্রেমের গল্প।



বসের টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে বসার পরেই কাঁপুনিটা টের পেল অনিন্দিতা। প্রথম ঝটকাতেই বুঝতে পেরেছিল, নিশ্চিত হয়ে নিল টেবিলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে। কাচের গ্লাসে অর্ধেকটা ভর্তি ঢাকা দেওয়া জলটা তিরতির করে কাঁপছে। নিশানজি অভ্যাসমতো রিভলবিং চেয়ারে বসে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছিলেন। একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল অনিন্দিতা।

"হোয়াট হ্যাপেনড?"

"আর্থকোয়েক স্যার।"

চেয়ারের ঘূর্ণি থেমে গেল। একটু বুঝি অনুভব করলেন কম্পনটা। বাঁদিকে সাইড টেবিলের ওপর অল্প ঝুঁকে ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডস একটু সরিয়ে দিলেন। জানালার কাচের ওপারে আরেকটি বহুতল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দুলছে।

"ওহ মাই গড! আমাদের এক্ষুনি নিচে নেমে যাওয়া উচিত।"

"স্যার, লিফট বা সিঁড়ি ব্যবহার করার থেকে কিন্তু এখানে আমরা সেফ আছি। ভূমিকম্পের প্রথম অভিঘাতটাই জোরালো হয়, এগারো তলা থেকে নিচে নামতে নামতেই সবথেকে খারাপ কিছু ঘটার থাকলে ঘটে যাবে।"

জানালার দিক থেকে অনিন্দিতার দিকে চোখ ফেরালেন নিশানজি। গ্রিক দেবতার মতো দেহসৌষ্ঠব, ছ'ফুট দু'ইঞ্চি উচ্চতা, বত্রিশ বছরের গাঢ় বাদামী গাত্রবর্ণের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিশান বাগরির এই দৃষ্টির সামনে যে কোন মহিলাই দুটি

#

বা একটি হৃদস্পন্দন হারিয়ে ফেলবে। অনিন্দিতা আই-কন্টাক্ট হতে না দিয়ে জানালার বাইরে তাকাল, "কিন্তু দেখুন, সবাই কেমন উদভ্রান্তের মতো ছুটে নিচে নামছে।"

বাস্তবিকই পাশের বহুতলের সিঁড়ি দিয়ে বহু লোককে নামতে দেখা যাচ্ছে। অনেকের হাতেই শেষ সম্বলের মতো অফিস ব্যাগ বা ছাতাটি পাকড়ানো। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই মহামূল্য সম্পদগুলিকেও এতো তাড়াতাড়ি কেউ হারাতে চায় না। পিঁপড়ের ঢিপিতে ঢিল মারলে যেমন মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা পিঁপড়েতে ছেয়ে যায়, নিচের ফাঁকা চত্বর ও অফিসপাড়ার রাস্তাও মানুষের কিলবিলে ভিড়ে ঢেকে গেল।

"ঠিক বলেছেন মিস সেন। তবে তাড়াহুড়ো না করলেও আমাদের নিচে নেমে যাওয়াই উচিত। মনে নেই লাস্ট টাইম উইদিন হাফ এন আওয়ার আরেকটা ম্যাসিভ শক হয়েছিল!"

"স্যার, আফটার শকের তীব্রতা মূল ভূমিকম্পের থেকে বেশী হয় না।"

"তা হলেও, এখন তো সাড়ে চারটে বাজে। আজ অফিস ছুটি দিয়ে দিন, সবাই সেফলি বাড়ি পৌঁছে যাক।"

"ঠিক আছে। ... স্যার, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন..."

"হ্যাঁ, স্কাইফিল প্রজেক্টের ফাইনাল প্রেজেন্টেশানে একটা ফল্ট আমার চোখে পড়েছে।"

নিশানজির চেম্বার থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। অফিস প্রায় ফাঁকা। অন্যদিন ছ'টায় ছুটির পরেও সাড়ে ছ'টা সাতটা পর্যন্ত অনেকেই থাকে। আজ ভূমিকম্পের দৌলতে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো তাড়াতাড়ি ছুটিটা কেউ হাতছাড়া করতে চায় নি। পূজোর মুখে উইক ডে-তে এমন একটা ছুটির খুব দরকার, পূজোর বাজারের জন্য। শুধু দারোয়ান আর অফিস বয় বরুণ আছে।

ওয়াশরুমে একটু ফ্রেশ হয়ে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে অনিন্দিতা লিফটের মুখে এসে সুইচ টিপে দাঁড়ানোর পরেই বরুণ নিশানজির ব্যাগ আর ল্যাপটপ হাতে পাশে এসে দাঁড়াল, মানে নিশানজিও বেরোবে। বরুণ জিনিসগুলি নিশানজির গাড়িতে তুলে দেয়। লিফটের দরজা যখন অর্ধেক বন্ধ হয়ে আসছে তখন শুনতে পেল নিশানজির গলা, "লিফট!"

বরুণ সুইচ টিপে লিফটের গতিরুদ্ধ করল। নিশানজি লিফটে উঠেই অনিন্দিতার দিকে একঝলক তাকিয়ে আলগা করে হাসলেন, গালে প্রায় দেখা যায় না এমন একটা টোল পড়ল।

লেডিকিলার! মনে মনে শব্দবন্ধটা বলে অনিন্দিতাও হালকা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে লিফটের দেয়ালের দিকে তাকাল।

"সরি, ছুটি ডিক্লেয়ার করেও আপনার কোন লাভ হল না।"

"তাতে কি হয়েছে স্যার। সেকেণ্ড টাইম আর্থকোয়েকও তো হল না।"

"হলে অবশ্য আপনার সঙ্গে আমিও চাপা পড়তাম।"

"এই বিল্ডিংএর যা অবস্থা তাতে আর্থকোয়েকের দরকার নেই, যে কোন দিন এমনিই ভেঙে পড়বে।"

"আসলে কি জানেন, বিল্ডিংটা বাইরে থেকে দেখে – বাংলায় কি যেন বলে – ঝরঝরে লাগলেও ভেতর থেকে কিন্তু অনেক মজবুত। এখনকার হাইরাইজগুলোর থেকে অনেক বেশী তো বটেই।"

লিফট গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসেছে। অনিন্দিতা বিদায় সম্ভাষণ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল নিশানজির পরের কথা শুনে, "আপনাকে কিছুটা কম্পেনশেট করতে পারি লিফট দিয়ে। আপনি তো টালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরেন, রবীন্দ্র সরোবরে নামিয়ে দিতে পারি।"

"না না, ঠিক আছে স্যার। আমি তো মেট্রোতে..."

"হ্যাঁ, মেট্রোতে মনে হয় আমার আগেই আপনি রবীন্দ্র সরোবর পৌঁছে যাবেন। তবু আমার ভাল লাগত আপনি এলে।"

অনিন্দিতা হয়তো সামনে ড্রাইভারের পাশেই বসতো, কিন্তু নিশানজি তার আগেই পেছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিন্দিতা একটু কুণ্ঠিতভাবেই উঠে বসল। আর যাই হোক, নিশানজির চরিত্র নিয়ে কোন খারাপ কথা কানাঘুষোতেও কখনো শোনা যায় নি। আর অফিসেও মহিলাদের সঙ্গে উনি কখনো অসম্মানজনক ব্যাবহার করেন নি। মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে অনিন্দিতা কোনদিন কিছু খারাপ ইঙ্গিতও পায় নি। কিন্তু ওই বুকে তীর-মারা হাসি, চাহনি? অনিন্দিতার বড় ভয় করে।

নিশানজি অনিন্দিতার পাশে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করলেন। নিশানজির চেম্বারে ঢুকলেই যে পারফিউমের গন্ধ অনিন্দিতাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে তা লাফিয়ে চলে এল মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

বরুণ দেখল। কাল অফিসে এটা একটা বড় খবর হবে। পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব নেওয়ার এই ছ'বছরের ইতিহাসে প্রথমবার নিশানজি কোন এমপ্লয়িকে নিজের গাড়িতে লিফট দিলেন। তাও আবার অনিন্দিতার মতো সুন্দরী অবিবাহিত মহিলা। এ খবর মুখরোচক না হয়ে যায়!

দামী গাড়ির নরম গদিতে এবং সেই নাম না জানা পারফিউমের গন্ধে অনিন্দিতা ডুবে যাচ্ছিল। নিশানজি স্কাইফিল প্রোজেক্ট নিয়ে দু'একটা কেজো কথা বলছিলেন। অনিন্দিতার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিচ্ছিল। তার অনীহার কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় নিশানজি একসময় চুপ করে গেলেন। রাসবিহারী ক্রসিং-এ সিগনালে গাড়িটা দাঁড়াতে অনিন্দিতা হঠাৎ বলে উঠল, "স্যার, আমি বরং এখানেই নেমে যাই।"

"এখানে? এনি প্রবলেম?"

অনিন্দিতা ঘাড় ঘুরিয়ে নিশানজির দিকে তাকাল।

"সরি, এমনিই জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম।"

"না না স্যার, ছিঃ ছিঃ। আসলে একটু তাড়াতাড়ি তো হলই। ভাবছিলাম গড়িয়াহাট যাব। কিছু কেনাকাটার ছিল।"

"আচ্ছা আমার সঙ্গ আপনার কেমন লাগে?"

"ইয়ে ভাল স্যার। মানে খুব ভাল।"

"তাহলে আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তাহলে কি কিছু মনে করবেন?"

আজ নিশানজির কি হয়েছে? অনিন্দিতা যে এরপর ভেসে যাবে সেটা কি বুঝতে পারছে না লোকটা। নাকি বুঝতে পেরেও... ক্যাসানোভা – হঠাৎই নামটা মাথায় এল অনিন্দিতার। তারপরই ভাবল মাথাটা বোধহয় তার নিজেরই খারাপ হচ্ছে।

সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল সে, "বিন্দুমাত্র না স্যার। বরং ভালই লাগবে আপনাকে পেলে।"

"কোথায় যাবেন, কোন মল..."

"সেরকম কোথাও না স্যার। ফুটপাথ ... ইয়ে মানে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোন দোকানে কিছু ভাল দেখলে..."

"দ্যাটস গ্রেট! আমিও এটাই চাইছিলাম।" নিশানজির নির্দেশে গাড়ি ক্রসিং থেকে বাঁ-দিকে মোড় নিল।

গড়িয়াহাটে এসে গাড়িটা পার্কিং-এ পাঠিয়ে দিয়ে অনিন্দিতার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন নিশানজি। পূজোর বাজার ইতিমধ্যেই বেশ জমে উঠেছে। ফুটপাথে এবং দোকানগুলোতেও বেশ ভিড়।

"অনেকদিন পর এমন ভিড়ে ফুটপাথে হাঁটছি। সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। স্কুল কেটে – এই রে! আপনার সামনে এসব বলে ফেলছি আবেগতাড়িত হয়ে। কালকেই অফিসময় রটিয়ে দেবেন।"

"আপনার তাই মনে হল, স্যার। আমি রটিয়ে দেবো?"

"আচ্ছা। বিশ্বাস করছি আপনাকে।" আবার সেই মনমোহিনী হাসি। উফফ! অনিন্দিতা লক্ষ্য করেছে আশে পাশের অনেক অল্পবয়সী মেয়েরাই নিশানজির দিকে লোলুপ এবং তার দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত করছে।

অনিন্দিতার যা মনের অবস্থা তাতে অনেক আগেই সে বুঝে গেছে আজ আর কেনাকাটা কিছু হবে না। আর সে যা কিনতে চায় বা যে দোকান থেকে কিনতে চায় অফিসের বসকে নিয়ে তা কেনা যাবে না। তাও দুএকটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানে ঢুকে এটা সেটা ঘেঁটে দেখল সে। আড়চোখে সবসময়ই লক্ষ্য রাখছে নিশানজির দিকে। নিশানজির চোখে মুখে এক বালখিল্য খুশীর আভা দেখতে পাচ্ছিল অনিন্দিতা। কি নিষ্পাপ! সুন্দর! সে আরও বেশী করে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ রাস্তার ধারে একটি দোকানের দিকে চোখ পড়ল তার। এ কী দেখছে সে! এমনও হয়! দোকানটির দরজার পাশে দাঁড় করানো আছে একটি পুরুষ ম্যানিকুইন। গাঢ় বাদামী বর্ণের। বটল গ্রিন টি শার্ট আর ডেনিম জিন্স পরানো আছে। সে ক্রমান্বয়ে ম্যানিকুইন আর নিশানজির দিকে দেখতে লাগল।

#

সে এগিয়ে গেল ওই দোকানের দিকে। ম্যানিকুইনটার গায়ে হাত রাখল।

নিশানজিও তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, "আপনার পছন্দের প্রশংসা করতেই হয়। টি-শার্টটা সত্যিই খুব সুন্দর। চলুন কিনে ফেলি। এখনো তো কিছু কিনলেন না।"

উচ্চতাও একদম এক! অনিন্দিতা অবাক হয়ে নিশানজির দিকে তাকাল। উনি কি এখনো বুঝতে পারছেন না! অনিন্দিতা অস্ফুটে বলল, "টি-শার্ট নয়, এই ম্যানিকুইনটা।"

"হোয়াট?"

অনিন্দিতা মনঃস্থির করে ফেলেছে। সে দোকানে ঢুকে এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে।

"ইয়েস ম্যাম।" এক সুবেশ তরুণ এগিয়ে এল তার দিকে।

"আপনাদের ওই এন্ট্রান্সে যে মেল ম্যানিকুইনটা দাঁড় করানো আছে সেটার কত দাম?"

তরুণটি বেশ অবাক হয়েছে মুখ দেখেই বোঝা গেল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে পেশাদারী হাসি হেসে বলল, "সরি ম্যাম, ওটা তো বিক্রির জন্য নয়।"

নিশানজি অবাক হয়ে অনিন্দিতার কার্যকলাপ দেখছিলেন। এবার বুঝি ব্যাপার কিছুটা বোধগম্য হয়েছে তাঁর। এগিয়ে এসে বললেন, "মিস সেন, আমার চেনা একজন ম্যানিকুইন ডিলার আছেন। আপনার যদি প্রয়োজন হয় আমি কথা বলে দেখতে পারি।"

"না স্যার, আমার এইটাই চাই। প্লিজ।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আমি দেখছি।" তরুণটির দিকে ফিরে নিশানজি বললেন, "আপনাদের দোকানের মালিক কে আছেন?"

"ওই যে, ক্যাশে বসে আছেন।"

নিশানজি ক্যাশে বসা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনিন্দিতা আবার চলে এল দরজার পাশে। ম্যানিকুইনটা পাশে এসে দাঁড়াল। এরা কি পারফিউম মাখিয়েছে এটাকে? একটা চেনা গন্ধ আবার ঝাপটা মারল তার নাকে।

দূর থেকে দেখল নিশানজি মালিকের সঙ্গে কথা বলছে। ভদ্রলোক প্রথমে অসম্মতি সূচক মাথা নাড়াচ্ছিলেন। পরে সেটা সম্মতিসূচক হয়ে গেল। নিশানজি পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ড বের করে সোয়াইপ করতে গেলেন।

অনিন্দিতা ছুটে গেল, "কত দাম স্যার? আমি দিচ্ছি।"

"আহ! মিস সেন!" নিশানজির ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টির সামনে অনিন্দিতা একটু কুঁকড়ে গেল।

#

"আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন, এঁরা পাঠিয়ে দেবেন।"

"স্যার, আজই কি এটা নিয়ে যাওয়া যায় না কোনভাবে?"

নিশানজি কিছুক্ষণ চুপ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন অনিন্দিতার দিকে। অনিন্দিতা চোখ নামিয়ে নিল। উনি কি ভাবলেন কে জানে। বললেন, "বেশ। আপনি তো বাটানগরে থাকেন। আমার গাড়ি আমাকে আলিপুরে ড্রপ করে দিয়ে আপনাকে নিয়ে চলে যাবে। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। আপনার আর কিছু কেনার আছে? থাকলেও প্লিজ পোস্টপন করুন।"

"অ্যাট আ সেম টাইম সরি অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

নিশানজির ভুরুটা একটু উঠে আবার স্বস্থানে ফিরে এল। আবার সেই খুনি হাসি।

চোখের সামনে জায়গাটা আমূল পালটে গেল। বাটানগর এখন রিভার সাইড। অনিন্দিতারা যে বাড়িটায় থাকতো সেটা তো দূরস্থান সেই জায়গাটাও এখন খুঁজে বার করা মুশকিল, এমনভাবে গোটা একটা নগরী গোড়া থেকে উপরে ফেলে নতুন করে সাজানো হচ্ছে কমপ্লেক্স। অনিন্দিতারা এখন স্টেশান রোডের কাছে একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট-এ থাকে। অনিন্দিতার ঘরের জানালা দিয়ে রিভার সাইডের সব থেকে উঁচু টাওয়ার দুটো দেখা যায়। ওই টাওয়ার দুটো একদম গঙ্গার পাশে।

জানালা দিয়ে তির্যক ভাবে রোদ্দুরের ফলা এসে পড়েছে নিশানের বাঁ দিকের গালে। ম্যানিকুইনটার একটা নাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এর থেকে ভাল নাম কিই বা হতে পারে। ওই সুপার মডেলের মতো উঁচিয়ে থাকা চিবুকের হাড়, মুখের আদল, গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোখের মণির রঙ মায় ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত সবটাই যে হুবহু একজনেরই প্রতিচ্ছবি সেটা তো অনিন্দিতা প্রথম ঝলক দেখেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু আশ্চর্য! নিশানজি ধরতে পারলেন না, গাড়িতে যখন ধরাধরি করে তোলা হচ্ছিল তখন অনিন্দিতা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য রাখছিল, নিশানজির ড্রাইভার পাশোয়ানজিরও মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করল না। আচ্ছা, ওই দোকানের লোকগুলোও তো ম্যানিকুইন আর নিশানজি দুজনকেই দেখেছে, ওরাও কি ধরতে পারল না যে ম্যানিকুইনটা হুবহু নিশানজির মতো দেখতে! না কি পুরোটাই অনিন্দিতার মনের ভুল! তাই বা কি করে হয়! এই তো চোখের সামনেই রাখা আছে জিনিসটা। সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ এমনকি, শরীরের পেশীগুলোর মধ্যেও কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! আচ্ছা ঠোঁটের কোণে ওই হাল্কা হাসি আর গালে প্রায় না দেখতে পাওয়ার মতো টোল – এটা কি কাল ছিল? নিশ্চয়ই ছিল, চোখ এড়িয়ে গেছিল, আজ সকালের আলোতে তা স্পষ্ট হয়েছে।

কাল সারারাত একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে অনিন্দিতার। একটা অদ্ভুত ভাল লাগা। প্রথম দর্শনের চার বছর তিন মাস পর শারীরিকভাবে সব থেকে কাছে পাওয়া, এর থেকে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ আশা করাই সুদূর স্বপ্নাতীত। কিন্তু সেই মানুষটার ছায়া অনিন্দিতার সঙ্গে তার নিজের ঘরে। কিন্তু সর্বক্ষণ অনিন্দিতা যেন সেই জীবন্ত মানুষটিরই সঙ্গ অনুভব করছে। নাকে আসছে পরিচিত পারফিউমের মাদক গন্ধ। তাই অভ্যাসবশত রাতে ঘরের দরজাটা লক করেও বিছানায় শোওয়ার পর উঠে আবার হাট করে খুলে দিয়ে এসেছে। বন্ধ ঘরে একটি পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো তার রুচি বা শিক্ষায় বাধবে।

ম্যানিকুইনটা দেখে মা একটু আশ্চর্যই হয়েছিল প্রথমে। যখন শুনলেন অনিন্দিতার অফিসের কাজে ওটা লাগবে তখন আর কোন প্রশ্ন করে নি। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে মা জাগতিক বিষয়ে অনেকটাই নিঃস্পৃহ হয়ে গেছে। সেই পুরনো আমলের দিদা ঠাকুমাদের মতো সাদা থান পরে থাকে, নিরামিষ তো বরাবরই খেত, এখন শুধু গুরুদেবের বই আর ঠাকুরঘর এই নিয়েই আছে। অনেক বলা-বোঝানোর পর অনিন্দিতাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। মেনে নিয়েছে মায়ের এই প্রকট বৈধব্য। তিন কামরার এই ফ্ল্যাট এ দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত মায়েতে মেয়েতে থাকে তারা।

রাতে ঘুম না হওয়ায় সকাল থেকেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। একটু দোনামোনা করে মোবাইল থেকে লিভ অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠিয়েই দিল এইচ আর ডিপার্টমেন্টে, সিসি নিশান বাগরি। আজ আর বেরোবে না সে।

একটু পরেই দরজায় মা, "আধ ঘণ্টা পর একটা ওলা ডেকে দিস। মানিকতলা যাব। ভাণ্ডারা আছে।"

মানে আজও মা গুরুদেবের আশ্রমে যাবে, "ফিরবে কখন?"

"বিকেল তো হবেই। তোকে ফোন করে দেব বেরনোর আগে।"

মা বেরিয়ে যাওয়ার পর টাওয়েল নিয়ে স্নান করতে ঢুকল অনিন্দিতা। স্নান করে খেয়ে নিয়ে একেবারে লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে। তাহলে শরীর একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে।

মা বেরনোর সময় একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "কি রে? আজ দেরি করে যাবি অফিসে?"

সে যাবে না শুনে আর কোন কৌতূহল দেখাল না। একেক সময় মায়ের এই উদাসীনতায় অনিন্দিতার কান্না পেয়ে যায়। আজ আর অতটা খারাপ লাগল না। বরং কোন প্রশ্নের হাত থেকে বেঁচে গেল বলেই যেন একটু খুশী হল সে।

শাওয়ারের প্রতিটি জলকণা যখন রোমকূপে রোমকূপে শিহরণ জাগাচ্ছিল সেই সময়ই জলধারার শব্দ ছাপিয়ে হলঘর থেকে একটা শব্দ কানে এল। কিছু ঘষটে যাওয়ার শব্দ।

দরজাটা অল্প ফাঁক করে ঘরের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখতে পেল না অনিন্দিতা। তবে স্নানের পর ঘরে এসে নিশানের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল তার। নিশানের জায়গাটার কি একটু পরিবর্তন হয়েছে? নিশানের মুখে রোদ্দুর এসে লাগছিল আগে, অনিন্দিতার মনে পড়ল নিশানজির রোদ্দুর একদম সহ্য হয় না। একবার শুনেছিল ওঁর গায়ে রোদ্দুর লাগলে নাকি র‍্যাশ বেরিয়ে যায়।

তবে ম্যানিকুইনটা নিজে নিজে কি করে জায়গা পরিবর্তন করবে! সকালবেলার থেকে এখন সূর্যের কৌণিক অবস্থান পালটে গেছে, তাই রোদ্দুরটাই আপনা আপনি সরে গেছে। অনিন্দিতা নিশানের কাছে এগিয়ে এল, নিশানের বাঁ দিকের গালের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট বাবলস চোখে পড়ল। এগুলো কি আগে থেকেই ছিল?

অনিন্দিতা নিশানের ডান হাতটা নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিল।

।। ২ ।।

স্কাইফিল প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশানটা শেষবারের মতো একবার দেখে নিয়ে ল্যাপটপ বন্ধ করে দিল নিশান। সামনের রবিবার প্রথম বিজ্ঞাপনটা বেরোবে কলকাতার প্রথম সারির সবকটা বাংলা আর ইংরেজি খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে। মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইসিং এ নিশান কোন কার্পণ্য করে নি, সেরা এজেন্সিকেই বেছে নিয়েছে সে, সঙ্গে মিশিয়েছে তার নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা। এই প্রজেক্টের সাফল্য তার কোম্পানিকেও আকাশচুম্বী প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দেবে।

গত কয়েকদিন কাজের চাপে মাথা তুলতে পারে নি নিশান। ঠিক এই সময়ই অনিন্দিতাও ছুটি নিয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ। অথচ এই প্রজেক্টে এই মেয়েটাকেই সব থেকে বেশী ভরসা করেছিল সে।

প্রফেশনালিজমের বাইরেও একটা ভাললাগা ইদানিং টের পাচ্ছিল নিশান। ভাললাগাটার শুরু এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গির থেকে। লাঞ্চব্রেকে একদিন হঠাৎই নিশান দেখতে পায় অনিন্দিতা ডেস্কে ব্যাগের পাশে পড়ে আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যসমগ্রের একটা খণ্ড। সম্ভবত লাঞ্চবক্স বের করার সময় বইটা বের করে রেখে থাকবে।

আবাল্য নিশান দেখে এসেছে তার মা অসম্ভব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভক্ত। নিশানের বাবা মায়ের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মারোয়াড়ি আর বাঙালি পরিবারের মধ্যে বিয়ের চল এখনকার মত হয় নি। মাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল অত্যন্ত বিদুষী মহিলা হয়েও শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার সুবাদে। তাই একরকম জেদের বশেই তিনি নিশানকে বাংলা শিখিয়েছেন, বাংলা সাহিত্য পড়িয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ চিনিয়েছেন, বাংলা শিল্প সংস্কৃতি যা বাঙালিদের গর্ব তার সবই নিশানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন।

কাজের বাইরে অনিন্দিতার মনোজগৎ কেমন তা জানার জন্য অদমনীয় কৌতূহল নিশানকে টানছিল। ক্রমশ সে অনিন্দিতার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফলো করতে শুরু করে। অনিন্দিতা তার ফ্রেণ্ড লিস্টে ছিলই, তাই তার দেওয়াল দেখায় কোন বাধা ছিল না। নিশান শুধু কোন প্রমাণ রাখত না তার প্রোফাইল ভিজিটের। কিন্তু অনিন্দিতার সব ছবি, টুকরো কবিতার কোলাজ কিছুই তার নজর এড়াতো না।

তার আবেগ বাঁধনছাড়া হয়েছিল ওই একদিনই। সেদিন ভূমিকম্প এসে বোধহয় সবকিছু নাড়িয়ে দিয়ে গেছিল। অনিন্দিতা যখন তার অননুকরণীয় তির্যক দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইয়ে তাকিয়ে বলেছিল "আফটার শকের তীব্রতা মূল ভূমিকম্পের থেকে বেশী হয় না", অপরাহ্নের আলোয় অনিন্দিতার ডান ভ্রুর একটু ওপরে মাথার চুলের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা ছোট্ট আঁচিল, সব মিলে এক অভূতপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করেছিল।

প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে অনিন্দিতাকে নিজের গাড়িতে ডেকে নিয়েছিল। তারপর গড়িয়াহাটের ফুটপাথ ধরে হাঁটা।

আশ্চর্য হয়ে গেছিল মেয়েটার খামখেয়ালিপনা দেখে। ওই ম্যানিকুইনটা কেনার জন্য কি অসম্ভব জেদ যে খেলা করছিল তা এক মুহূর্ত মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল সে।

তবে সবথেকে আশ্চর্য হয়েছে তার পরেরদিন থেকেই অনিন্দিতার ছুটি নেওয়ায়। এই ক'দিন অনিন্দিতা ফেসবুকেও অনলাইন হয় নি। ফোন করলেও সুইচড্ অফ্ পেয়েছে। অথচ অনিন্দিতা জানে এই সময়ে অফিসিয়ালি তাকে কতোটা প্রয়োজন ছিল নিশানের।

পাশোয়ানজি ম্যানিকুইনটা দিতে গেছিল, অনিন্দিতার বাড়ি চিনে গেছে সেদিন। আজ নিশান অফিস থেকে বেরিয়ে অনিন্দিতার বাড়ি যাবে।

নিশান বেল বাজিয়ে বরুণকে ডাকল।

কলকাতার উপকণ্ঠে মহেশতলার এই দিকটায় নিশানের কোনদিন আসা হয় নি। সারা কলকাতার মতো এখানেও বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে ফ্লাইওভারের কাজ চলছে বলে আধঘন্টার রাস্তা একঘন্টারও বেশী লাগল। চারতলার ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল চাপার পরেই মনে হল একটু কি বেশী হটকারি হয়ে গেল এখানে আসাটা!

দরজা খুললেন সাদা শাড়ি পরিহিতা এক প্রৌঢ়া। নিশান পরে জেনেছিল উনি অনিন্দিতার মা।

নিশান অনিন্দিতার খোঁজে এসেছে শুনে তাকে দরজার বাইরেই দাঁড় করিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই দরজার ফাঁক দিয়ে অনিন্দিতাকে হল পেরিয়ে আসতে দেখা গেল। অনেকদিন পর অনিন্দিতাকে দেখে নিশানের বুকের কাছে হৃদপিণ্ডটা একবার লাফিয়ে ওঠার অনুভব হল। মুখে যথাসম্ভব পেশাদারি কাঠিন্য বজায় রাখল সে।

নিশানকে অপ্রত্যাশিতভাবে তার বাড়িতে আসতে দেখে অনিন্দিতার মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। অত্যন্ত সহজভাবে অনিন্দিতা তাকে ভেতরে ডেকে নিল।

ড্রয়িং রুমের এক পাশে সোফার ওপর নিশান বসল। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছে, ঘরের অন্য পাশে একটা খোলা খাট, আলমারি আলনা স্তুপাকার করে রাখা যা বাকি ঘরের অন্দরসজ্জার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না।

"সরি স্যার, আপনাকে আসতে হল। আমি নিজেই যেতাম দু-একদিনের মধ্যে।"

"মিস সেন, আপনাকে দেখে আপনার শারীরিক সুস্থতা নিয়ে কোন সন্দেহের কারণ দেখছি না। কাজেই বিনা নোটিশে হঠাৎ এমন উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ জানতে পারি কি?"

"স্যার, এটা একদম ব্যক্তিগত একটা কারণ, আমি তো লিভ অ্যাপ্লিকেশানে জানিয়েছিলাম..."

"দেখুন মিস সেন, আপনি কোন সাডেন ইমারজেন্সিতে ছুটি নিতেই পারেন – তা কোম্পানির যতই আপনাকে প্রয়োজন থাকুক না কেন – আপনার ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া ছিল। কিন্তু আপনি ফোনটা সুইচড্ অফ্ রেখেছেন কেন?"

"এগেন সরি স্যার। এটাও অত্যন্ত পারসোনাল একটা রিজন..."

"আপনি কি বুঝতে পারছেন, ইন ফিউচার কোম্পানি আপনাকে আর রিলাই করবে না..."

#

"আমি জানি। প্লিজ একটু বসুন স্যার, আমি আসছি।"

অনিন্দিতার মা এইসময় চা নিয়ে এলেন।

"মা, ইনি আমার কোম্পানির এম. ডি., মি. নিশান বাগরি। আমার মা।"

নিশান হাত জোর করে নমস্কার জানাল। অনিন্দিতার মা যেন অস্ফুটে দুবার তার নামটা উচ্চারণ করলেন।

অনিন্দিতা উঠে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে চলে গেল।

অনিন্দিতার মা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "আমার বলা উচিত হচ্ছে কি না জানি না বাবা, কিন্তু আপনাদের কোম্পানি থেকে কি এমন কাজ দিয়েছেন যে বাড়িটাকেই অফিস বানিয়ে ফেলতে হবে?"

"মানে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আন্টি। মিস সেন তো এই এক সপ্তাহ অফিসেই যান নি।"

"অফিসে গেলেই তো ভাল ছিল বাবা। কিন্তু বাড়িতে থেকে ও যা করছে...ওই দেখুন, নিজের ঘরের বিছানা, আলমারি সব লোক ডেকে সরিয়ে এই ঘরে জমিয়ে রেখেছে। নতুন চেয়ার টেবিল কিনে...আমি যাই, ঠাকুরকে বিশ্রাম দেওয়ার সময় হয়ে গেল।"

অনিন্দিতাকে আসতে দেখেই বোধহয় ভদ্রমহিলা ত্বরিতে চলে গেলেন।

অনিন্দিতা এসে একটা খাম বাড়িয়ে ধরল।

"কি এটা?" নিশান দৃশ্যতই বিরক্ত।

"স্যার, আমার রেজিগনেশান লেটার।"

"মানে? মিস সেন, আমি কিন্তু আপনাকে সো কজ করতে এখানে আসি নি। এই কয়েকদিন অনেকরকমভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে একটা হিউম্যান অ্যাংজাইটি থেকেই আপনার খোঁজ নিতে এসেছি।"

"এটাও জানি স্যার।" অনিন্দিতার মুখে ম্লান হাসি খেলে গেল, "কিন্তু একই সঙ্গে দুই জায়গায় জব করি কি করে বলুন তো?"

"ওহ! এই ব্যাপার? তাহলে মিস সেন, অফিসিয়ালি বলছি, একটা মিনিমাম নোটিশ পিরিয়ড ছাড়া এভাবে তো আপনি ছাড়তে পারেন না।"

"আমার রেজিগনেশান লেটারে লিখে দিয়েছি এর জন্য যা কম্পেনশেট করতে হয় আমি করব। আপনি আজ এলেন বলে আপনাকে জানালাম, অফিসিয়ালি আমি কাল গিয়ে এটা আপনার টেবিলে জমা দিয়ে আসতে পারি।"

"তার দরকার নেই। কিন্তু মিস সেন আপনি আমার কোম্পানিকে এতো ছোট ভাবছেন কেন? উই নিড ইউ। আপনি বারগেন করুন। ওরা আপনাকে কত দিচ্ছে?"

"না স্যার, প্লিজ। ব্যাপারটা সেটা নয়।"

"তাহলে কি?"

"সেটাও খুব ব্যক্তিগত স্যার।"

"আচ্ছা।" দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিশান বলল, "আমি তাহলে উঠছি মিস সেন। তবু বলব আপনি আরেকটু চিন্তা করুন। সেকেণ্ড থট এলে অবশ্যই এনি টাইম আমাকে জানান। আমি আপনার কলের জন্য ওয়েট করব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

নিশান উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অনিন্দিতা দরজা খুলে দিতে নিশান বেরোতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাই দ্য ওয়ে, সেদিন যে ম্যানিকুইনটা কিনলেন সেটা কোথায় সাজিয়ে রেখেছেন দেখলাম না তো!"

অনিন্দিতা স্পষ্টতই একটু বিব্রত হয়ে বলল, "ওটা স্যার আমার বেডরুমে রাখা আছে।"

"বেডরুমে?"

"হ্যাঁ।" অনিন্দিতা ভেতরের একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। একটু আগে ওই ঘরে ঢুকেই সে রেজিগনেশান লেটারটা নিয়ে এসেছিল যেটা এখন নিশানের বুকের বাঁ দিকের পকেটে হুল ফোটাচ্ছে।

"একবার দেখতে পারি?"

"না... মানে...বেডরুমে..."

"তাতে কি হয়েছে?" নিশানের মধ্যে হঠাৎ একটা জেদ চলে এল, সেদিনে ওই ম্যানিকুইনটা দেখার পর থেকেই অনিন্দিতার মধ্যে একের পর এক অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছে। আর আজ এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

নিশান অনিন্দিতার হাত ঠেলে এগিয়ে গেল সেই দরজার দিকে। দরজাটা ঠেলে ভেতরে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই স্থানু হয়ে গেল সে।

ধীর পায়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল সে। যেন কত পরিচিত এই ঘর। এই ঘরের সবকিছুই তার চেনা। এই ঘরের প্যাটার্ন। আসবাব, এই চেয়ার, ওই ডেস্ক, দেওয়ালের ওই ক্যালেণ্ডার... এ সবই তো সে প্রতিদিন দেখে। আর, টেবিলের অপর প্রান্তে রিভলবিং চেয়ারে বসে আছে তারই প্রিয় স্ট্রাইপ ব্লু শার্ট পরে সেই ম্যানিকুইনটা।

বিস্ময়ে এতটাই হতবাক হয়ে গেছিল নিশান, যে অনিন্দিতা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা খেয়াল করে নি। সম্বিৎ ফিরল অনিন্দিতার কথায়, "দেখা হয়েছে? স্যার?"

অনিন্দিতার দিকে ঘুরলেন নিশান। বিস্ময়ে, ভয়ে তার মুখের পেশীগুলো কাঁপছে। প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কেন মিস সেন?"

"এটাই আমার নতুন অফিস স্যার। আর ওই আমার বস, নিশান বাগরি।"

"হোয়াট আ ম্যাডনেস!" ফেটে পড়ল নিশান "তুমি নিজের বেডরুমটাকে আমার অফিসের চেম্বারের অনুকরণে সাজিয়েছ। একটা পুতুলকে বলছ নিশান বাগরি। ইউ আর ড্যাম সিক অনিন্দিতা। কি হয়েছে তোমার?"

"প্লিজ স্যার। আপনি কিন্তু আমাকে মিস সেন বলেন।"

"হ্যাঁ বলতাম, যখন তুমি আমার এমপ্লয়ি ছিলে। নাউ ইউ আর নট। তোমার অবিলম্বে চিকিৎসার দরকার।"

নিশানের উত্তেজিত কথাবার্তা কানে যেতে অনিন্দিতার মা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে। অবাক চোখে দেখছেন ভেতরে। নিশান আর বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে এল ওদের ফ্ল্যাট থেকে।

গাড়িতে উঠে দু'হাতে নিজের মাথার চুলটা খামচে ধরে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মোবাইল বের করে নম্বর ডায়াল করল। তার বাল্যবন্ধু রাহুল। এখন বিখ্যাত নিউরোসার্জন।

"হ্যাঁ রাহুল, তোর চেনা কোন ভাল সাইক্রিয়াটিস্ট আছে?...আমার এক পরিচিতর জন্য...আছে? দেখ, আজই অ্যাপোয়েন্টমেন্ট পেলে ভাল হয়...তাহলে আর তোকে বলছি কেন?...না পেশেন্ট যাবে না, পেশেন্টের হয়ে আমিই যাব, মেনলি একটা ওপিনিয়ন নেওয়া আর কি, তাই দেরি করতে চাইছি না...আচ্ছা জানা তাহলে।"

কিছুক্ষণ পর রাহুল কলব্যাক করে অ্যাপোয়েন্টমেন্টটা কনফার্ম করল। গোলপার্কের কাছে ডাক্তারের চেম্বার। পাশোয়ানজিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিশান গাড়ির সিটের ওপর শরীরের ওজন ছেড়ে দিল। খুব স্ট্রেস্‌ড লাগছে।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোতে বেরোতে প্রায় ন'টা বাজল। ডক্টর মুখার্জীকে সেদিনের ম্যানিকুইন কেনা থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা শোনানোর পর তিনি বললেন অনেকরকম কারণ থাকতে পারে এইরকম মেন্টাল ডিসঅর্ডারের পেছনে। সেটা পেশেন্টের পাস্ট লাইফ হিস্ট্রি না জেনে বোঝা যাবে না। কিন্তু ঘটনায় যেহেতু নিশান জড়িয়ে আছে, অর্থাৎ অনিন্দিতা যখন একটা ম্যানিকুইনকে নিশানের প্রতিবিম্ব বা সাবস্টিটিউট কল্পনা করছে, সেক্ষেত্রে নিশানের সাহায্য একান্তই জরুরী তাকে এই মানসিক অবস্থা থেকে বের করে আনতে।

নিশান জানে সে আমৃত্যু অনিন্দিতার পাশে থাকবে। কিন্তু অনিন্দিতা থাকবে কি?

#

গোলপার্ক থেকে গাড়ি চলেছে গড়িয়াহাট ক্রসিং এর দিকে। সব দোকানগুলি একে একে বন্ধ হচ্ছে দিনের শেষে। বাঁ দিকে সেই দোকানটা, যেখান থেকে সেদিন ওই ম্যানিকুইনটা কেনা হল। সেই ম্যানিকুইনটার জায়গায় একটা নতুন ম্যানিকুইন রাখা। এটা ফিমেল। হাল্কা গোলাপি টপ আর জিন্স পরানো আছে।

হঠাৎ নিশান সোজা হয়ে বসল।

"স্টপ! স্টপ! পাশোয়ানজি! একটু দাঁড়ান।"

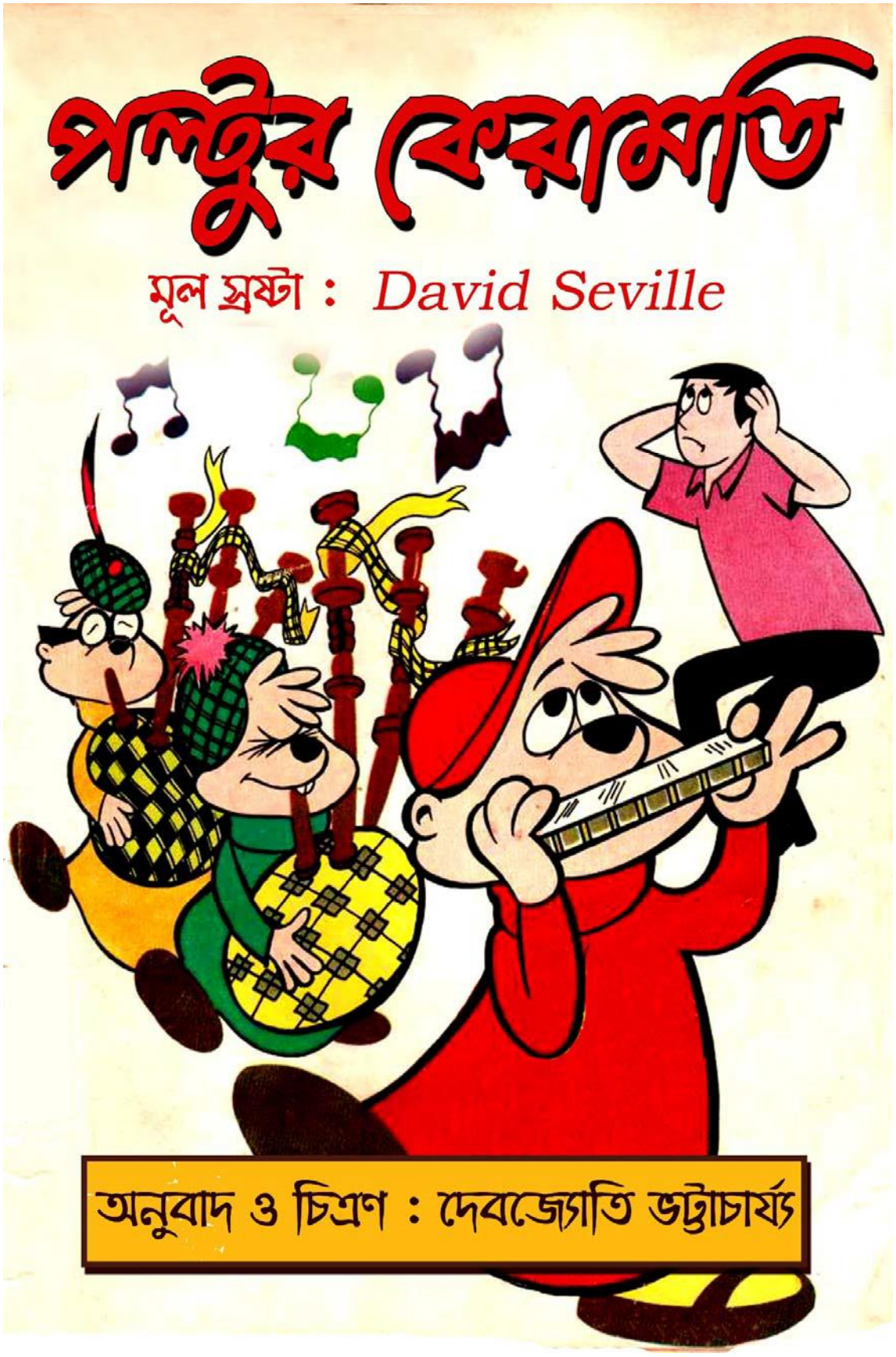
গাড়ি দাঁড়াতেই নিশান দরজা খুলে নেমে গেল সেই দোকানটার দিকে। ম্যানিকুইনটার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। নিয়নের আলোয় ম্যানিকুইনটার ডান ভ্রুর একটু ওপরে মাথার চুলের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা ছোট্ট আঁচিল অদ্ভুত মোহ বিস্তার করেছে।

নিশান ক্যাশে বসা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওই যে দরজার পাশে ফিমেল ম্যানিকুইনটা রাখা আছে ওটার কত দাম?"

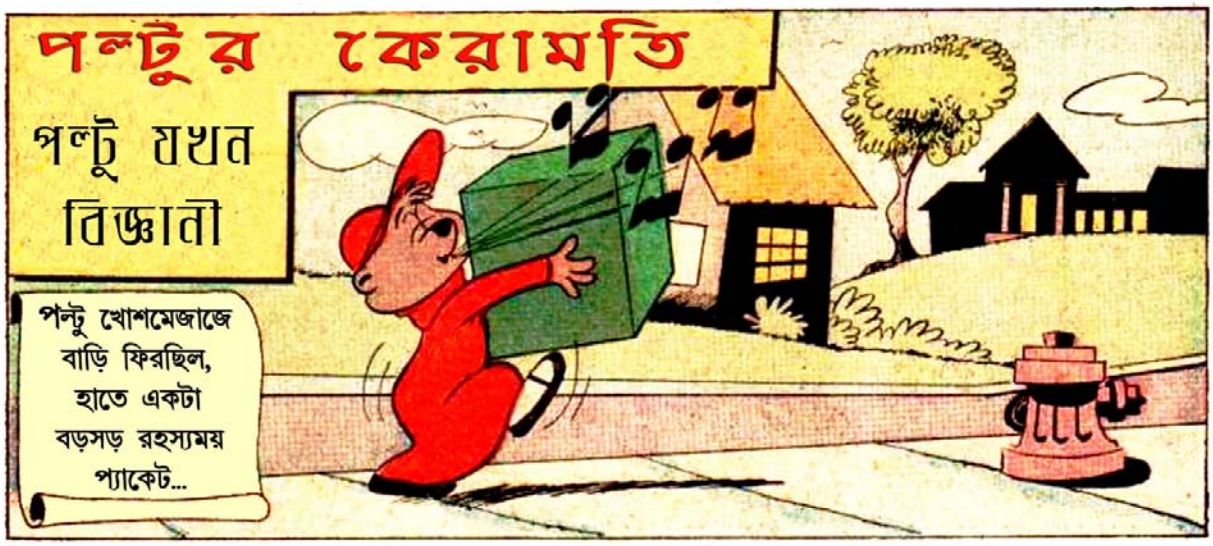
অলঙ্করণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

সুদীপ দেব মূলত বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবেই নিজেকে দেখতে ভালবাসেন। স্কুল ম্যাগাজিন এবং বহুমুখীতে সম্পাদনার কাজ করলেও লেখালেখি শুরু একবছর আগে এই বহুমুখীতেই - জটায়ু ছদ্মনামে। প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বই পড়া ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গান অন্ত প্রাণ।


পল্টুর কেরামতি
মূল স্রষ্টা : David Seville
অনুবাদ ও চিত্রণ : দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

#





পল্টুর দুই ভাই, বিল্টু আর গোল্টু দুজনেই পল্টুর প্যাকেট দেখে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না...





#


ধুস ! তুই একদম চিন্তা করিস না বিল্টু, এই কেমিস্ট্রি সেটটায় কোনো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক কিছু নেই ! বাবাইদা আমাদের কিছু বলবে না !
বাবাইদা কি বলবে না রে ? আর এই কেমিস্ট্রি সেটটা এখানে কে আনল ?
বাবাইদা ! আমি অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে এটা কিনেছি ! দারুন জিনিস তাই না ?
বলিস কি পল্টু ! এসব বিপদজনক রাসায়নিক নিয়ে এই বয়েসেই নাড়া ঘাঁটা করতে চাস ? কোনও বিপদ হবে না তো ?
আরে না বাবাইদা, দ্যাখো এখানেই লেখা আছে....সম্পূর্ণ নিরাপদ !! ঠিক এটাই আমি বহুদিন ধরে চাইছিলাম !
পরীক্ষামূলক রসায়ন * সম্পূর্ণ নিরাপদ
এবার একটার সাথে আরেকটা তরল মিশিয়ে আমি রসায়নিক পরীক্ষা করবো, আর এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো !
আমাদের সরকারও তো চাইছে যাতে ছাত্ররা আরও বেশী করে হাতে কলমে বিজ্ঞানকে বুঝতে শেখে। আমরাও তাই চাই, আমরাও তাই চাই, এই দ্যাখো এরমধ্যেই আমি কী সুন্দর গোলাপের সুগন্ধওয়ালা মিশ্রন তৈরী করেছি !
ওহঃ ! এক্কেবারে তাজা ফুলের সুগন্ধ !!
আমাকে এখন কাজে বেরোতে হবে ! তোরা এই সেটটা রাখতে পারিস, তবে খুব সাবধান ! তোদের আর এই বাড়ির যেন কোনওরকম ক্ষতি না হয় !! বাড়ি কিন্তু একটাই আছে !
নিশ্চিন্ত থাকো, সবকিছুই নিরাপদে থাকবে !

#


ধুস ! তুই একদম চিন্তা করিস না বিল্টু, এই কেমিস্ট্রি সেটটায় কোনো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক কিছু নেই ! বাবাইদা আমাদের কিছু বলবে না !
বাবাইদা কি বলবে না রে ? আর এই কেমিস্ট্রি সেটটা এখানে কে আনল ?
বাবাইদা ! আমি অনেকদিন ধরে টাকা জমিয়ে এটা কিনেছি ! দারুন জিনিস তাই না ?
বলিস কি পল্টু ! এসব বিপদজনক রাসায়নিক নিয়ে এই বয়েসেই নাড়া ঘাঁটা করতে চাস ? কোনও বিপদ হবে না তো ?
আরে না বাবাইদা, দ্যাখো এখানেই লেখা আছে....সম্পূর্ণ নিরাপদ !! ঠিক এটাই আমি বহুদিন ধরে চাইছিলাম !
পরীক্ষানিরীক্ষা * সম্পূর্ণ নিরাপদ
এবার একটার সাথে আরেকটা তরল মিশিয়ে আমি রসায়নিক পরীক্ষা করবো, আর এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো !
আমাদের সরকারও তো চাইছে যাতে ছাত্ররা আরও বেশী করে হাতে কলমে বিজ্ঞানকে বুঝতে শেখে। আমরাও তাই চাই, আমরাও তাই চাই, এই দ্যাখো এরমধ্যেই আমি কী সুন্দর গোলাপের সুগন্ধওয়ালা মিশ্রন তৈরী করেছি !
ওহঃ ! এক্কেবারে তাজা ফুলের সুগন্ধ !!
আমাকে এখন কাজে বেরোতে হবে ! তোরা এই সেটটা রাখতে পারিস, তবে খুব সাবধান ! তোদের আর এই বাড়ির যেন কোনওরকম ক্ষতি না হয় !! বাড়ি কিন্তু একটাই আছে !
নিশ্চিন্ত থাকো, সবকিছুই নিরাপদে থাকবে !

#

বাবাইদা কাজে বেরিয়ে যাবার পর....



পল্টু তার আলমারিটা খুলতেই দেখা গেল তার ভিতরে অজানা, অদ্ভুতদর্শন সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ঠাসা রেয়েছে !





কিছুক্ষণের মধ্যেই পল্টু ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাগলা বৈজ্ঞানিকের গবেষনাগার বানিয়ে ফেলল !



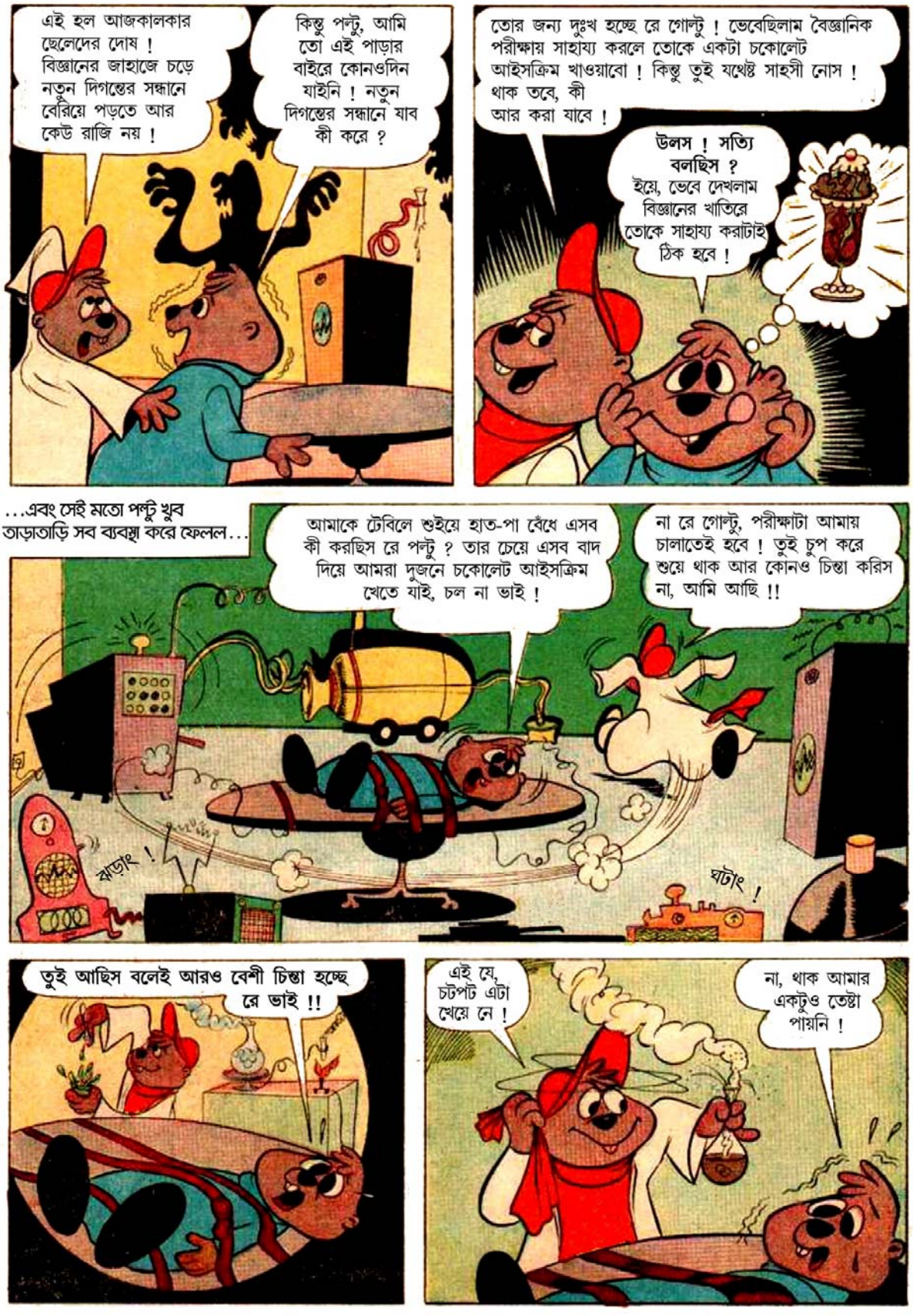
#


তুই কি করতে চলেছিস রে পল্টু ?
আমিও ঠিক জানি না, তবে অজানা জিনিসের সন্ধান কারাই বিজ্ঞানীদের কাজ বুঝলি ?
অজানার সন্ধান শীঘ্রই পেল পল্টুরা, তবে ফলাফল খুবএকটা সুখকর হলো না বলাই বাহুল্য !!....
বাপরে !
দুড়ুম !


সৌভাগ্যক্রমে ওদের শারীরিক কোনও ক্ষতি হয়নি...সব শান্ত হলে....আরে ! টেবিলের উপর সাদা রঙের ওটা কী ?!
গোল্টু রে ! কেল্লা ফতে ! ঠিক জানি না জিনিসটা কি, কিন্তু নতুন কিছু আবিস্কার করেছি বলে মনে হচ্ছে !


দেখে বরফের টুকরো মনে হচ্ছে ! পুরোপুরি রাসায়নিক উপায়ে তৈরী ! দারুন তাই না ?
শুধুই বরফ ! এটা তো ফ্রিজেও তৈরী হয় রে ! আর ওটাতে বিস্ফোরনও হয় না !!
সে যাই হোক, গোল্টু আমার মনে হয় বড়সড় বৈজ্ঞানীক পরীক্ষা করার জন্য আমি তৈরী ! তুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবে ইতিহাসের পতায় নিজের নাম তোলার জন্য তৈরী তো ?!
অ্যাঁ ! আমার মনে হয় ইতিহাসের পতায় নিজের নাম তোলার পক্ষে বয়েসটা একটু কম ! তুই শুরু কর, আমি দেখি !

#


এই হল আজকালকার ছেলেদের দোষ ! বিজ্ঞানের জাহাজে চড়ে নতুন দিগন্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে আর কেউ রাজি নয় !
কিন্তু পল্টু, আমি তো এই পাড়ার বাইরে কোনওদিন যাইনি ! নতুন দিগন্তের সন্ধানে যাব কী করে ?
তোর জন্য দুঃখ হচ্ছে রে গোল্টু ! ভেবেছিলাম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সাহায্য করলে তোকে একটা চকোলেট আইসক্রিম খাওয়াবো ! কিন্তু তুই যথেষ্ট সাহসী নোস ! থাক তবে, কী আর করা যাবে !
উলস ! সত্যি বলছিস ?
ইয়ে, ভেবে দেখলাম বিজ্ঞানের খাতিরে তোকে সাহায্য করাটাই ঠিক হবে !
...এবং সেই মতো পল্টু খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলল...
আমাকে টেবিলে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে এসব কী করছিস রে পল্টু ? তার চেয়ে এসব বাদ দিয়ে আমরা দুজনে চকোলেট আইসক্রিম খেতে যাই, চল না ভাই !
না রে গোল্টু, পরীক্ষাটা আমায় চালাতেই হবে ! তুই চুপ করে শুয়ে থাক আর কোনও চিন্তা করিস না, আমি আছি !!
ঝাড়াং !
ঘটাং !
তুই আছিস বলেই আরও বেশী চিন্তা হচ্ছে রে ভাই !!
এই যে, চটপট এটা খেয়ে নে !
না, থাক আমার একটুও তেষ্টা পায়নি !

#



এরপরেই গোল্টুর সঙ্গে অদ্ভুত সব কান্ড ঘটতে শুরু করলো....

#


পল্টু, দয়া করে এটাকে থামা ! আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে ! জল খাব !
ধরেছি ! তবে, আজ বোধহয় তোকে মেঘ নিংড়ে জল খেতে হবে !! তার আগে এটা থামবে বলে মনে হচ্ছে না !
ঐ দ্যাখ, নীচেই বিল্টু....
আমরা একটু ঘুরে আসছি রে বিল্টু !!
বেশ, যা তবে ডিনারের আগেই ফিরে আসিস !
ব্যাপারটা অদ্ভুত যে, ছেলেগুলো ঐ পুরোনো কফি টেবিলটায় চড়ে ঘুরতে বেরোলো ! ওদের বোঝা উচিত ছিল ওটা বাবাইদার খুব প্রিয় জিনিস !!
ঐ কফি টেবিল ?! সর্বনাশ !!
দেখেছিস গোল্টু, আমারা এবারে অফিস পাড়ার উপর দিয়ে উড়ে চলেছি !
বাবাইদার অফিসটাও হয়তো কাছাকাছিই আছে !
ভালো থাকবেন ভদ্রমহিলাগণ !
আরে, ঐ ছেলেদুটো কী অদ্ভুত ভাবে কফি বিরতি কাটাচ্ছে !! ওরা গোটা একটা কফি টেবিল নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে !

#



লেখক পরিচিতিঃ দেবজ্যোতি প্রাণীবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি পড়তে ভালোবাসেন বিভিন্ন গল্পের বই এবং প্রচুর কমিকস। এডিটিং-এ দেবজ্যোতির অনুপ্রেরণা বিডির সুদীপ দেব। প্রথম কমিকস অনুবাদে হাতেখড়ি অলিম্পিকে অ্যাসটেরিক্স কমিকস দিয়ে। সফলভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অ্যাসটেরিক্স, ব্যাটম্যান, আয়রন ম্যানের বেশ কিছু কমিকস।

#

প্রচ্ছদ পরিচয়

সুমন দাস ও অঙ্কিতা

'বহুমুখী'র এবারের প্রচ্ছদ দশমহাবিদ্যাকে উৎসর্গীকৃত। এখানে মহামাতৃকাশক্তিকে বহুমুখীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এক নৃত্যপরায়ণা নারীদেহের উপরে দশটি শক্তিস্বরূপা তৃতীয় নয়ন আর মুখমন্ডল কল্পনা করা হয়েছে। শাক্তদের মতে, সংস্কৃত শব্দ 'মহাবিদ্যা'-র অর্থ মহৎ প্রকাশ। রূপের প্রকাশ, জ্ঞানের প্রকাশ, ভক্তির প্রকাশ। আর এই প্রকাশ বিশ্বজননীর দশটি রূপের মধ্যে দিয়ে। 'মহাবিদ্যা' বা 'দশমহাবিদ্যা' হিন্দুধর্মে দেবী অর্থাৎ দিব্য জননীর দশটি বিশেষ রূপের সমষ্টিগত নাম। দেবীত্বের এই ক্রমবিন্যাসের একদিকে যেমন রয়েছেন ভয়ঙ্কর দেবীমূর্তি, তেমনই অন্য প্রান্তে রয়েছেন এক অপরূপ সুন্দরী দেবীপ্রতিমা।

মুণ্ডমালা তন্ত্রানুসারে দশমহাবিদ্যা হলেনঃ

কালীঃ সর্বসংহারকারিণী, জন্ম ও শক্তির দেবী। কালীকুল সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবী।
(তিনি কালো রূপের অধিকারিণী।)

তারাঃ পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকারিণী (তারিণী) দেবী। বিশ্বের উৎস হিরণ্যগর্ভের শক্তি এবং মহাশূন্যের প্রতীক।
(আমার মতে এই মুখমণ্ডলের রঙ হওয়া উচিত ছিল শ্যামবর্ণ মানে চলিত মতানুসারে নীল তবে বহুক্ষেত্রে দেবী তারা কৃষ্ণবর্ণা।)

ত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতা-ত্রিপুরসুন্দরীঃ (ষোড়শী) পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার স্বরূপ। শ্রীকুল সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবী। তান্ত্রিক পার্বতী নামে পরিচিতা।
(এই দেবী পূর্ণতা আর পূর্ণাঙ্গতার প্রতিভূ বলেই আলাদা করে কোন মুখমণ্ডল নয়, বরং সর্বঅঙ্গে বিরাজমান তা বোঝাতেই নারীদেহের হৃদয়ে অবস্থিত।)

ভুবনেশ্বরীঃ বিশ্বজননী। পার্থিব জগতের শক্তিসমূহের প্রতীক।
(আমার মতে এই দেবীর মুখমণ্ডলের রঙ হওয়ার দরকার ছিল গোলাপী আভা যুক্ত। তবে কমলা রঙও শক্তির প্রতীকরূপে বিবেচিত হয়।)

ভৈরবীঃ ভয়ঙ্করী দেবী। সেই কামনা ও প্রলোভনের স্বরূপ যা মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়।
(এই দেবীর মুখমণ্ডলের রঙ রাখা হয়েছে লাল।)

ছিন্নমস্তাঃ উলঙ্গিনী দেবীমূর্তি। তিনি স্বহস্তে নিজ মস্তক ছিন্ন করে নিজ রক্ত নিজেই পান করেন। চক্রপথে আত্মধ্বংস ও আত্মপুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতের অবিরাম বিদ্যমানতার শক্তির প্রতীক।
(দেবী ছিন্নমস্তা হওয়ার কারণে তার কোন মুখমণ্ডল নেই। কিন্তু তার শক্তি বিরাজমান বলে তাঁর তৃতীয় নয়নকে শক্তি প্রতিভূরূপে ছবির মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে।)

ধূমাবতীঃ বিধবা দেবীমূর্তি। অগ্নির দ্বারা জগৎ ধ্বংসের পর ভস্মরাশির মধ্য থেকে যে ধূম নির্গত হয়, তার স্বরূপ। তিনি কখনও কখনও অলক্ষ্মী বা জ্যেষ্ঠাদেবী নামেও অভিহিতা হন।
(এই দেবী নায্যকারণেই ধূসরবর্ণা)

#

বগলামুখীঃ শত্রুনিষ্ক্রিয়কারিনী দেবী। ঈর্ষা, ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতার মতো মানবচরিত্রের অন্ধকার দিক নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সারস-মুণ্ড রূপেও কল্পনা করা হয়।
(এই দেবী পীতবর্না। আমার মতে এই দেবীর মুখমন্ডল হলুদ কিন্তু ছবিতে কিঞ্চিৎ ভুলবশতঃ তিনি কমলারঙে বিরাজমান।)

মাতঙ্গীঃ কর্তৃত্ব শক্তির দেবী। জাতিহীন দেবী (কালীকুল সম্প্রদায়ে), ললিতার প্রধানমন্ত্রী (শ্রীকুল সম্প্রদায়ে); তান্ত্রিক সরস্বতী।
(এই দেবী শ্যামবর্ণা, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শ্যামবর্ন দুই প্রকারের, তারমধ্যে একটি হল দূর্বাদলশ্যাম। এখানে দেবী দূর্বাদলশ্যাম তাই তিনি সবুজবর্ণা।)

কমলাকামিনীঃ বরাভয় প্রদায়িনী শুদ্ধ চৈতন্যের দেবী। ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর অন্যরূপ। তান্ত্রিক লক্ষ্মী নামেও অভিহিতা।
(ইনি কাঁচা সোনার মত রঙবিশিষ্টা, এখানে এনাকে সঙ্গত কারণেই কমলা রঙ্গেই রাঙ্গানো হয়েছে।)

আজ দেবীর আরাধনায় বসে 'বহুমুখী' ভেবেছে দেবীর এই প্রজ্জ্বলিত দশরূপ। অলংকারে দশমহাদেবী একদেহী, কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দেবীর এই দশরূপের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই ছবিতে দেবী অগ্নি আসনা। মানুষের মনের ভিতরে এই দশটি রূপ মশালের উগ্রতার মতই দপ করে জ্বলে উঠুক, একত্রে। মুছে যাক মনের কালিমা, বিকলতা, অন্ধকার। প্রকাশিত হোক জ্ঞান, প্রেম ও করুণা। হৃদয়ে জাগরিত হোক মাতৃচেতনার বোধ। বহুমুখী'র সমস্ত কাজ দেবীর আশীর্বাদে শুরু হোক, দেবীর পদতলে অঞ্জলীরূপে শেষ হোক। মানুষের মঙ্গলের জন্য বহুমুখী থাকুক সদাজাগ্রত। জ্ঞানের দেবী, জগন্মাতা আপন ক্ষেত্র বিস্তৃত করুক বহুমুখীর প্রতি বিভাগে। দিনে দিনে বর্ধিত হোক তার সম্পদ, যা মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে সহায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

#